বিষয়: অনুবৃত্তি

অনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নাই—ইহাই হইল বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের অধিকাংশের মনোভাব। সাইকলজির এই বিবর্ত্তনটিকে Woodworth চমৎকার কাব্য-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সাইকলজি প্রথমে তাহার আত্মাকে হারাইয়াছিল, তাহার পর মনকে হারাইল এবং পরিশেষে চৈতন্যকেও হারাইল, তবে এখনও ইহার মধ্যে একটা আচরণের ধারা আছে*।"

মনস্তত্ত্বের এই বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই শাস্ত্রটি দর্শন শাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্লেটো এবং আরিষ্টটল্এর সময় এই শাস্ত্রটি পূর্ণভাবেই দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিক হইতেই ইহা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া একটা বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া উঠিল। ফলে ইহার আলোচনার রূপটিও বদ্লাইয়া গেল।

মনস্তত্ত্ব জিনিষটা যতদিন দর্শনের অভিভাবকত্বে ছিল ততদিন ইহাকে শুধু দার্শনিক চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির আলোচ্য শাস্ত্র হিসাবেই ভাবা হইত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়া অনেক জিনিষই, বিশেষতঃ আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অন্তর্দৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অবসর এবং সমাহিত মনোভাব। কর্ম্মচেষ্টা বা 'আচরণের' সংঘাত ও আবর্ত্তনের মধ্যে এই মনোভাব রাখা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। ক্রোধের বা ভয়ের সময় মানুষের মন কি ভাবে কাজ করে, তাহা ক্রুদ্ধ বা ভীত অবস্থায় ভাবা যায় না। ক্রুদ্ধ মানুষ যদি ক্রোধের সময় থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তাহার ক্রোধও খানিকটা উপিয়া যায়।

অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক চিন্তার আর একটি দোষ আছে। ইহার সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা এতখানি প্রভাবান্বিত হয় যে, তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective), সার্ব্বজনীন ও প্রমাণযোগ্য সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

* "First psychology lost its soul, then it lost its mind. Then it lost consciousness! it still has behaviour of its kind"—Woodworth Psychology. A study of mental life p. 2.

এইজন্যই বর্ত্তমান মনোবিদ্‌গণ মন সম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া শুধু আচরণকেই তাঁহাদের গবেষণার লক্ষ্য বস্তু স্থির করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু মানুষের শরীর ও মনোগত আচরণের নানা দিক আছে। সংবেদন (Sensation), প্রত্যক্ষীকরণ (Perception), প্রতিবেদন (response), স্মরণ, মমন, অনুকরণ, অভিভাবন Suggestion), অভিনিবেশ, কামনা, প্রেষণা, (motivation), ধারণা প্রভৃতি মানুষের আচরণের অন্ত নাই। মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেহ মনে করেন সংবেদনের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের মনের সমস্ত রহস্য, কেহবা হয়ত মনে করেন মনের রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহার কামনার ইতিহাসের মধ্যে, কেহ আবার মনে করেন তাহা পাওয়া যাইবে প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে অথবা শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা চলাফেরার মধ্যে। এইভাবে তাহারা নিজের নিজের ধারণা অনুসারে পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন ও নানাবিধ তথ্যের সন্ধান করিতেছেন। এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রদায়—(Schools) ; এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান, যথা —

ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায় (Functional school)
অবয়ববাদী সম্প্রদায় (Structural school)
অনুষঙ্গবাদী সম্প্রদায় (Associationist school)
আচরণবাদী সম্প্রদায় (Behaviorist school)
গেস্‌টাল্ট্ সম্প্রদায় (Gestalt school)
মনোবিকলনবাদী সম্প্রদায় (Psycho-analysis school)
জীবনপ্রয়াসবাদী সম্প্রদায় (Hormic school)
ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায় (Personalistic school)

মানুষের ক্রিয়া-কলাপের আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়, সংবেদনকে (sensation) কেন্দ্র করিয়া structural সম্প্রদায়, প্রত্যক্ষীকরণ (or perception)-কে কেন্দ্র করিয়া Gestalt সম্প্রদায়, স্মৃতি শিক্ষা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া অনুষঙ্গবাদী সম্প্রদায়, আদিম যৌন

কামনাকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিকলনবাদী সম্প্রদায়, জীবনপ্রয়াসের প্রেরণায় জগতের সহিত "উদ্দেশ্যমূলক কারবারকে" কেন্দ্র করিয়া Hormic সম্প্রদায় চেষ্টা বা আচরণকে কেন্দ্র করিয়া আচরণবাদী সম্প্রদায় এবং সমগ্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায়। এই সমস্ত সম্প্রদায় (school)-গুলির প্রণালীগত বিভিন্নতাও যথেষ্ট। কেহবা খণ্ড খণ্ড অনুভূতি বা আচরণ হইতে সমগ্র মনের সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহবা সমগ্রের "প্যাটার্ণ" হইতে খণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ ভাবিয়াছেন, মানুষ বা প্রাণীরা প্রাগ্‌জন্মগত কর্ম্মপটুতা বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ বলেন, প্রাণীরা জন্মান্তর-প্রসারী কোনও বৈশিষ্ট্যই লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহারা জীবনের চলতি পথে নানা জাতীয় উদ্দীপক (stimulus) এবং তাহার প্রতিক্রিয়া, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই যাহা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি অর্জ্জন করে।

এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা মানুষের মনের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচিত্র তথ্যের সন্ধান করিয়াছেন সেইগুলিকেই ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইয়া আবার মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। মনোবিদ্যার তথ্যগুলিকে কলকারখানার শ্রমিকদের উপর প্রয়োগ করিয়া কিভাবে ভাল উৎপাদন হইবে ইত্যাদি বিচার করিতে যাইয়া সৃষ্টি হইল Industrial Psychologyর, অস্বভাবী মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তৈয়ারী হইল Abnormal Psychology, শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া তৈয়ারী হইল Educational Psychology, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার ব্যাপারে উদ্ভূত হইল Individual Psychology, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া child psychology, animal psychology, social psychology প্রভৃতি শাখা-প্রশাখার অন্ত নাই।

শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রয়োজন ঃ

পরিপূর্ণাঙ্গ Educational psychology জিনিষটি একটা নূতন শাস্ত্র হইলেও, শিক্ষার ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের সম্পর্কের কথাটা মানুষ বহু প্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোমক পণ্ডিত Quintilian (মৃত্যু ৯৫

খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ছাত্রদের বক্তৃতা-বিজ্ঞান শিখাইবার পূর্ব্বে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। ইহাকেই বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের intelligence testএরই সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। এই মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব লইয়াই Thomas Fuller বলিয়াছেন, "একজন ভাল শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যেভাবে ছাত্রদের উচিত পাঠ্য-পুস্তককে বুঝিবার চেষ্টা করার।"

অবশ্য শিক্ষা-বিজ্ঞানের সহিত মানস-বিজ্ঞানের সম্পর্কটা সোজাসুজি ভাবে যাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুইস্ স্কুল-শিক্ষক Pestalozzi-ই প্রথম। Sir John Adamsও যখন বলিয়াছিলেন, "শিক্ষা ক্রিয়াটির দুইটি কর্ম্ম আছে, একটি হইতেছে ছাত্র এবং আর একটি হইতেছে শিক্ষার বিষয়"—তখনও তিনি পরোক্ষভাবে এই মানস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কথাই বলিয়াছিলেন।

তবে শিক্ষাতত্ত্বে মানস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কথাটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও অনেকের ধারণা ছিল, ভাল শিক্ষক হইতে হইলে যে তাহাকে ভাল মনস্তাত্ত্বিকও হইতে হইবে ইহা খানিকটা আদিখ্যেতার কথা। অধ্যাপক জেমস্ বলিয়াছেন "মনস্তত্ত্বের অত্যন্ত মৌলিক কথাগুলিই (fundamental conceptions) শিক্ষার প্রয়োজনে লাগে"; Stout বলেন, "মানস-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হিসাবে যে তত্ত্বটি আমাদের দিয়াছে, তাহা হইতেছে শিক্ষা ব্যাপারে যাহা কিছু নূতন তথ্য দেওয়া হইবে, তাহাকে পুরাতন জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই করিতে হইবে।"

তাহা হইলে কি শিক্ষাতত্ত্বের সহিত মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই? তত্ত্ব যখন 'গুহা-নিহিত থাকে, যখন মহাজনদের মতবাদ আমাদের পথ-নির্দ্দেশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই দিকেই মহাপুরুষগণের অভিমত রহিয়াছে। তাহা হইলে আমরা কোন্ মতটিকে গ্রহণ করিব?

সাধারণ মনস্তত্ত্ব, যাহা পরিণত-বয়স্কদের মনের ক্রিয়া-কলাপ লইয়া আলোচনা করে, তাহার সহিত শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব বেশী নাই।

কারণ স্কুল পাঠশালায় যাহাদের শিখা দেওয়া হয়, সেই শিশু ও বালকদিগের সহিত পরিণত বয়স্কদের সম্পর্ক খুব বেশী নয়। একটি বেঙাচিকে যেমন ছোট বেঙ্ বলিয়া মনে করা চলে না, অথবা একটি গুটিপোকাকে যেমন ছোট প্রজাপতি বলিয়া মনে করা চলে না, তেমনই একটি শিশুকেও ছোট মানুষ বলিয়া মনে করা চলে না। পরিণত বয়সের মানুষ হইতে শিশু একেবারে অন্য স্তরের জীব। কাজেই সাধারণ মনস্তত্ব আর শিশু-মনস্তত্ব এক জাতীয় বিষয় হইতে পারে না—শিক্ষা-বিজ্ঞানে মনস্তত্বের প্রয়োজন খুব বেশী না থাকিলেও, শিশু-মনস্তত্বের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। তাহা ছাড়া গণমন প্রভৃতির প্রভাবও শিক্ষাতত্বে প্রযুজ্য।

ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। কিভাবে পড়াইলে পড়ান সার্থক হইবে, কিভাবে চেষ্টা করিলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হইবে, অপচয় নিবারিত হইবে, আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে, সমাজ-সংঘাত নিবারিত হইবে, চরিত্র সুগঠিত হইবে, নীতিজ্ঞান বিকশিত হইবে, আদিম পশু-প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ হইবে, মনের জট্ (complex) সরলায়িত হইবে, অপরাধপ্রবণতা উন্মূলিত হইবে—এইরূপ সহস্র প্রশ্নের সমাধান Educational psychology দিতে পারে।

তবে এই ব্যাপারে শিক্ষাতত্ব বা দর্শনের সহিত Education psychologyর একটা পার্থক্য আছে। দর্শন বিচার করে কি পড়াইতে হইবে এবং কেন পড়াইতে হইবে, কিন্তু Educational psychology বিচার করিবে কিভাবে তাহা পড়াইতে হইবে, কখনইবা পড়াইতে হইবে। অর্থাৎ দর্শন শিক্ষা ব্যাপারে যে আদর্শটি স্থির করিবে, শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ব সেই আদর্শটিকে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। ধরা যাইল দর্শন বিচার করিয়া স্থির করিল যে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, পাঠ্যসূচীর মধ্যে বীজগণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, কুসংস্কার দমিত করিতে হইবে, চরিত্র গঠিত করিতে হইবে ইত্যাদি। এইবার শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্বের কাজ হইবে কিভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, কোন্ বয়সেইবা তাহা আরম্ভ করিতে হইবে, কোন্ বয়সেইবা বীজগণিত শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে,

কিভাবে পড়িলে বিদেশী শব্দসম্পদ মুখস্থ হইবে ও মুখস্থ থাকিবে; কিভাবে কাজ করিলে কুসংস্কার দমিত হইবে, চরিত্র সুগঠিত হইবে, এই সমস্ত স্থির করা।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমাজ-প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইবেও। শিক্ষা-বিষয়ক মনস্তত্ত্ব তখন অগ্রসর হইয়া বলিয়া দিবে—এই আদর্শটি সম্ভাব্য হইয়াছে কিনা, ইহা "অসম্ভব ভালো"র ব্যর্থ গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া "যথাসাধ্য ভালো"র ব্যবহারিক পথের সন্ধান দিবে।

শিক্ষার আদর্শ সমাজ-প্রয়োজনে, যুগ-পরিবর্ত্তনে যেভাবে পরিবর্ত্তিত হয় হউক, পণ্ডিতেরা তাহা ঠিক করুন, মনস্তত্ত্বের তাহাতে অধিকার নাই, কিন্তু যে আদর্শই তাঁহারা গ্রহণ করুন না কেন, তাহাকে সফল করিতে হইলে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন। সে বলিয়া দিবে এই পথে চলিলে ভুল-ভ্রান্তির ব্যর্থ পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প, আর এই পথে চলিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ইত্যাদি।

শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা-মনোবিদ্যার (Educational Psychology) মোটা-মুটি প্রয়োজন হইবে :

(১) ছাত্রের মনের মূলধন ও সম্ভাবনাকে বুঝিবার জন্য।
(২) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ছাত্রের ব্যক্তিত্বের উপর কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিবে তাহা বুঝিবার জন্য।
(৩) সামাজিক জীব হিসাবে বালকগণের মান-অভিমান ও মনের ঘাত-প্রতিঘাতের জটিলতা সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য।
(৪) যাহাতে অপচয় নিবারিত হয়, শৃঙ্খলা স্বাভাবিক হয় এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ সারলায়িত হয় এইরূপ একটা পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণের জন্য।
(৫) গণমনের সাহায্যে ছাত্রের মনের বিকাশ কিভাবে হইবে, তাহা বুঝিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য।
(৬) জীবন-পরিক্রমায় মানুষ কিভাবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পথে যাত্রা করে, তাহা বুঝিয়া শৈশব, বাল্য, কৈশোরের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া অপরাধ-প্রবণতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা ও মানুষ হইতে সাহায্য করার জন্য।

(৭) মানুষের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ও মনোবৈকল্যের কারণ বুঝিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি-স্নিগ্ধ এবং রোগ-প্রতিকারমূলক ব্যবহার করিবার জন্য।

(৮) শিক্ষার পথ ও পাথেয়র সন্ধান করিয়া শিক্ষার সঞ্চারণ, শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রামের বিন্যাস, শিক্ষার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা, শিক্ষার পথে বাধা ও সহায়তার উপায় নির্দ্ধারণ, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা প্রভৃতির জন্য।

(৯) বুদ্ধির মাপকাঠির সন্ধান করিয়া ছাত্রদের যথাযথ শ্রেণী বিভাগ করা, প্রতিভাশালী ও জড়বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য অন্য প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রভৃতির জন্য।

(১০) শিক্ষা-ব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে একটা নির্ভুল, বস্তুনিষ্ঠ, নির্ব্ব্যক্তিক (objective) পরীক্ষা-মান স্থির করিবার জন্য।

ইহা ছাড়া শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন আরও অনেক ব্যাপারেই হইতে পারে। সন্ধানী শিক্ষক তাহাকে কাজে লাগাইয়া শিক্ষা-প্রণালীকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান কিভাবে আহরণীয় ?

শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন যে কি তাহা না হয় বুঝিতে পারা যাইল ; এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান আমরা আহরণ করিব কি প্রকারে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নহে। কারণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা শুধু স্মৃতির আলোকেই আমরা আমাদের অতীত আচরণের পরিচয় জানিতে চেষ্টা করি। তাহা ছাড়া একজন সুধী-পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কিংবা অসভ্য বর্ব্বরের মনের পরিচয় পাওয়া কঠিন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়া কর্তৃপুরুষের নিজের মনের কথা যতটা বুঝিতে পারা যায়, অপরের মনের কথা ততটা বুঝিতে পারা যায় না। সেইজন্য পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বকে (experimental psychology) তথ্য সংগ্রহ

করিতে হইয়াছে এবং সেই সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, মানুষের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বহু লোকের উপর এক একটি তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়া মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলিকে খানিকটা জড়বিজ্ঞানের মত ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) গবেষণার বিষয়বস্তু করিয়া তুলিতে হইয়াছে।

কিন্তু মনস্তত্ত্বকে যতই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ব্যবহারিক জড়বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলা যাক না কেন, তাহার আচরণকে যতই সূক্ষ্ম এবং ব্যাপকভাবে গবেষণা করা যাক না কেন, আমাদের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝান যায় না। সেইজন্যই যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভাল ভাবে জানি—যে আমাদের পরম প্রিয়, সেও আমাদের বলিতে পারে—

"মম জীবনের তটিনীর রেখা
তোমার কুটির হ'তে
যতটুকু দেখো, আমি কি গো তাই
হে প্রিয় তোমার মতে ?
সৃষ্টি-প্রভাতে ঝরণা বহিয়া,
কত অতীতের তুষার গলিয়া,
কত দেশ বহি চলিয়া চলিয়া,
মিলেছি তোমার পথে ;
কত জগতের তীর্থের রেণু
লেগেছে আমার রথে।"

প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ণ পরিচয়ের একটা সামান্য অংশমাত্র প্রকাশ করে, আমাদের সবটকুর সন্ধান তাহাতে মিলে না এবং তাহা দিয়া আমাদের সব আচরণের ব্যাখ্যাও করা যায় না। সেইজন্য ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ আমাদের অনেক জটিল আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অবচেতন মনের কথা বলিয়াছেন, Mc. Dougall প্রভৃতি Mental Structureএর কথা আনিয়াছেন, Stout প্রভৃতি Dispositionএর উল্লেখ করিয়াছেন, amuel Butler প্রভৃতি unconscious memory এবং Nunn প্রভৃতি সংরক্ষণ-প্রয়াসের (Mneme) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

সে কথা যাক্, ধরিয়া লওয়া যাউক তুই একটি জটিল আচরণের ক্ষেত্র ছাড়া আমরা অধিকাংশ আচরণকে জড়বিজ্ঞানের মত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ গবেষণার বিষয়বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি কি সত্যই রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার মত শুধু ল্যাবরেটারির ব্যাপার হইবে? না, সেই সিদ্ধান্তগুলিতে সিদ্ধান্তকারীর ব্যক্তিগত (subjective) রঙের খানিকটা কষ লাগিয়া যাইবে?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনস্তত্ত্বকে ইচ্ছা করিলেও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) জড়বিজ্ঞানের মত আলোচনা করা পুরাপুরি ভাবে সম্ভব নহে। যে অন্তর্দৃষ্টি বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমরা কিছুতেই আমল দিতে চাহি নাই, তাহারও খানিকটা আসিয়া পড়ে।

তাহা হইলে আগ্রহশীল শিক্ষকেরা কি কবিবেন? তাঁহাদের উচিত, প্রায়োগিক (emperical) মনস্তাত্ত্বিকগণের যে সমস্ত প্রচলিত প্রণালী আছে অর্থাৎ (১) গবেষণাগারের প্রায়োগিক প্রণালী (experimental method) (২) রোগ পরীক্ষামূলক প্রণালী (clinical method) এবং (৩) অন্যান্য তথ্য সংগ্রহমূলক প্রণালী (যথা প্রশ্নগুচ্ছ, ইন্‌টারভিউ, জীবনেতিহাস, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মন্তব্য, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা, চেক্ লিষ্ট (check list) প্রভৃতির সদ্ব্যবহার-করা, বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিকদের মতবাদ ভালভাবে পড়াশুনা করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আচরণ, এমনকি ইতর-প্রাণীদের আচরণ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া নিজেদের শৈশব-কৈশোরের কথা চিন্তা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের পণ্ডিতদের গবেষণার ফলগুলি বিচার করিয়া দেখা। এইভাবেই তাঁহাদের চলিতে হইবে এবং পরে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ক্রমশঃ "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।"

মৌলিক প্রকল্প
[Fundamental Hypothesis]

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প (Fundamental hypothesis) থাকে। এই প্রকল্পগুলিকে মানিয়া লইয়া সেইগুলির উপর দিয়াই সে তাহার যুক্তিকে পরিচালিত করে এবং বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আমাদের মানস-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রারম্ভে আমাদিগকেও কতকগুলি মৌলিক প্রকল্পকে মানিয়া লইতে হইবে।

মনোবিদ্যা কি কি প্রকল্পকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে?—এই প্রশ্নের উত্তরটি সহজ নহে।

কারণ মানুষের মন বা আচরণ এমনই একটা বিচিত্র জটিল অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার যে, ইহাকে লইয়া প্রয়োগশালায় চরম পরীক্ষার পরও আমরা ইহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তাই ইহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মনোবিদ্‌কেও বলিতে হয়

"নাহি জানি সমগ্র বারতা
সকল ঘটনা তার, ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে,
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই ভয় জাগে মনে"

সেইজন্যই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কেহ কেহ প্রাক্‌জন্মগত প্রবৃত্তি (instinct) প্রভৃতিকে স্বীকার করিয়াছেন, কেহ আবার জন্মোত্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুকেই স্বীকার করেন নাই, কেহ মানুষের বহু আচরণের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া মানুষের সজ্ঞান মনের নিম্নে অবস্থিত নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আবার কেহবা আর একটু অগ্রসর হইয়া জাতকের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনও সম্পর্ক নাই, এইরূপ গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞান স্মৃতি (racial mneme), architype প্রভৃতিকে মানিয়া লইয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, মনোবিদ্যাকে কেহ হয়ত শরীর বিদ্যার অঙ্গ মাত্র বলিয়া মনে করেন, কেহ হয়ত রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা দিয়া মনের বিচিত্র লীলা বুঝিতে

চেষ্টা করেন, কেহবা সমাজতত্ত্ব দিয়া, কেহবা জীবতত্ত্ব দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন।

মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণার (motivation) মূল উৎস সম্বন্ধেও বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণের মতের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। কেহ মনে করেন, মানুষের সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণার মূলে আছে তাহার আদিম যৌন-কামনা, কেহ মনে করেন মানুষের ক্রিয়া-কলাপের মূল উৎস হইতেছে "ক্ষমতা-লিপ্সা" (will-to-power), আবার কেহ মনে করেন পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জগতের সহিত "উদ্দেশ্যমূলক কারবার" হইতেছে মানুষের সমস্ত আচরণের মূল কথা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মনোবিদ্‌গণের সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের মৌলিক প্রকল্পের বিভিন্নতা থাকিবেই।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা কোনও একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া মাতামাতি করিব না। আমাদের বিশ্বাস প্রাচীনত্বের গোঁড়ামিও যেমন আমাদের সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনই নূতনত্বের ফ্যাশন্-বিলাসও আমাদের চোখে দম্ভের ঠুলি পরাইয়া অনেক সত্যকে দেখিবার সুযোগই দেয় না। সেইজন্য সমন্বয় ও মুক্তদৃষ্টির মধ্যেই আছে সত্যিকারের সত্যানুসন্ধান। এই সমন্বয়ের ভঙ্গীতেই আমরা এই শাস্ত্রটি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকা ও রাশিয়ার আচরণবাদ বা চেষ্টিতবাদ, জার্ম্মানীর গেস্‌টাল্ট্ মতবাদ, অষ্ট্রিয়ার মনোবিকলনবাদ, গ্রীসের আত্মাবাদ, প্রাচীন অনুষঙ্গবাদ, অবয়ববাদ প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে যে একটা একদেশদর্শিতা আছে, তাহা পরিহার করিয়া আমরা ইংলণ্ডীয় মনোবিদ্ নান্ (Sir Percy Nunn), ম্যাক্ ডুগাল (Mc. Dougall) প্রভৃতির প্রদর্শিত পথেই খানিকটা যাত্রা করিব। ইহা দাস-মনোবৃত্তির পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে নহে। ইংলণ্ডের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মতই ইংলণ্ডের মনোবিদ্যার মধ্যেও প্রাচীন ও নবীনের একটা সমন্বয়ের ভাব আছে। এই সমন্বয়টি আমাদের ভাল লাগে বলিয়াই এই পক্ষপাতিত্ব।

যাঁহারা মানুষকে একটি জটিল যন্ত্র মাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন মানুষের সব কাজই রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। কথাটা অবশ্য অনেকখানি সত্য। আমাদের দেহের চরম উপাদানগুলি ভৌতিক পদার্থ মাত্র ; তাহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যাহা তৈয়ারী করা যায় সেই কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি হইতে অন্য কিছুই নয়। আমাদের শরীরে জলীয় পদার্থ অন্য জলীয় পদার্থেরই অনুরূপ। জড়-জগতে অক্সিজেন যে কাজ করে, আমাদের নিশ্বাসে গৃহীত অক্সিজেনও সেই কাজই করে। উভয় ক্ষেত্রেই কাজ হইতেছে যৌগিক পদার্থের অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যদ্রব্য হইতে আমরা যে উত্তাপ আহরণ করি, তাহা আমাদের দেহযন্ত্রকে পরিচালিত করে। রেল ইঞ্জিন বা মোটার ইঞ্জিনও ঐ একই ভাবে উত্তাপ হইতে কর্ম্মশক্তি লাভ করে। তাহা হইলে মানুষকে একটি জটিল যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার প্রয়োজন কি ? যদি কেহ বলেন, "প্রয়োজন আছে বৈকি ; যন্ত্রের তো প্রাণ নাই, কিন্তু মানুষ প্রভৃতির প্রাণ আছে এবং এই প্রাণ পদার্থটিই প্রাণীকে যন্ত্র হইতে পৃথক করিয়াছে।" ইহার উত্তরে জড়বাদী পণ্ডিত বলিবেন, "এই প্রাণ পদার্থটি ত জড় পদার্থ নিরপেক্ষ একটা সূক্ষ্ম শক্তি মাত্র নহে, জড় পদার্থের দ্বারাই ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীদের দৈহিক হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ইহাই প্রমাণ করে যে, উপযুক্ত বিদ্যা থাকিলে প্রাণকেও রাসায়নিক ঔষধপত্রের মত বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে সৃষ্টি করা যাইত।" এই প্রাণের রহস্যই যদি জড়বিজ্ঞান দিয়া উদ্ঘাটিত হইল, তখন মনস্তত্ত্বের আলোচনায় আত্মা, প্রাণের সুখ-দুঃখ বোধ, এই সব সূক্ষ্ম-তত্ত্বের প্রসঙ্গ আনিবার প্রয়োজন নাই ; জীব-জগতের সমস্ত আচরণই উত্তেজক এবং তাহার প্রতিক্রিয়া (Stimulus & Response), শরীর-রসায়ন-পদার্থতাত্ত্বিক কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সাহায্যেই বুঝান যাইতে পারে। একটি হারমোনিয়ামে 'সা' পর্দ্দা টিপিলে তাহাতে যেমন 'সা' ধ্বনি উত্থিত হইবে, আর "গা" পর্দ্দা টিপিলে তাহাতে যেমন 'গা' ধ্বনি উঠিবে, তেমনি প্রাণীদিগের বিশিষ্ট অনুভূতির গ্রাহক-যন্ত্রে বিভিন্ন সঙ্কেত (stimulus) থাকিলে তাহা

হইতে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া (response) আসিবে। একটি কুকুরের মুখের কাছে মাংসখণ্ড ধরা হইল, তাহাতে তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহার মুখ দিয়া লালা ক্ষরণ হইল ; তাহার গায়ে কেহ ঢিল মারিল, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ইহাও ঐ হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দ্দার প্রতিক্রিয়ারই অনুরূপ। শুধু তাই নয়, মানুষের যত কিছু ক্রিয়াকলাপ—আইনষ্টাইনের 'রিলেটিভিটি' আবিষ্কার হইতে সেক্সপীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট্' বা রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' 'বলাকা' সৃষ্টি পর্য্যন্ত—ঐ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই জটিল অভিব্যক্তি মাত্র। জড়বাদী পণ্ডিতেরা বলেন, জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দিন আসিবে, যখন আমরা একটা বিশিষ্ট অশ্ব-শক্তির মেসিন দেখিয়া যেমন তাহার কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি, তেমনিই একটি মানুষকে দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে সব কিছুই বলিয়া দিতে পারিব—শুধু তাহার শারীর সম্ভাবনা নহে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরাগ, সিদ্ধি-সাধনা সব কিছুই।

প্রত্যেক বিজ্ঞানই তাহার আলোচনার প্রারম্ভে কতকগুলি মৌলিক প্রকল্পকে (Fundamental hypotheses) মানিয়া লইয়া তাহারই উপর তাহার যুক্তির ইমারত তৈয়ারী করে। আমাদের মানস-বিজ্ঞান কি তাহা হইলে এই প্রকল্পকেই ভিত্তি করিয়া তাহার যুক্তির পথে অগ্রসর হইবে যে, রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যাই মানস-বিজ্ঞানের আদি এবং মূল তত্ত্ব এবং ইহার বাহিরে অন্য কিছু কল্পনা করিবার প্রয়োজন মানস-বিজ্ঞানের নাই ?

আমাদের মনে হয় তাহা নহে। প্রাণী যে যন্ত্রমাত্রই নহে, তাহা প্রকৃতির রাজ্যের নিম্নতম প্রাণীর প্রতিক্রিয়া হইতেই বুঝা যায়।

একটি কিঞ্চুলিকার (কেঁচো) কথা লইয়াই দেখা যাক। সে তাহার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া চলিতেছে। তাহার মুখের কাছে একটি কাঠি ধরা হইল, সে তখন সোজা পথটি ছাড়িয়া ডান দিকে চলিতে লাগিল, আবার তাকে বাধা দেওয়া হইল, এবার সে বাঁদিকে চলিতে লাগিল, আবার বাধা দেওয়া হইল, এবার সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিল এবং পরে পিছু হটিতে লাগিল ;

আবার তাহাকে বাধা দেওয়া হইল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়ার ধারা একেবারেই বদ্‌লাইয়া মুখটিকে একটু উঁচুতে তুলিয়া বাধাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, এই সামান্য কেঁচোটিও একটি জটিল যন্ত্র হইতে অনেক পৃথক। হারমোনিয়ামে যতবার 'সা' পর্দ্দা টেপা হইবে, তাহা হইতে ততবারই 'সা' ধ্বনিই বাহির হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়ার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। একটি কুকুরকে ঢিল মারিলে প্রথম বারে সে হয়ত 'কেঁউ' করিয়া ডাকিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় বার মারিলে সে হয়ত লেজ গুটাইয়া পলাইয়া যাইবে, আবার প্রতিপক্ষকে হীনবল বুঝিতে পারিলে সে হয়ত গর্জ্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যন্ত্র সম্বন্ধে এই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ জটিলতা বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এই কেঁচো হইতে কুকুর এবং কুকুর হইতে মানুষ, ইহাদের প্রতিক্রিয়া একই জাতীয়; তাহাদের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকৃতিগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। প্রত্যেকেই তাহার অনুভূতির যন্ত্র (জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারবার করে। কেঁচোর ক্ষেত্রে এই অনুভূতির যন্ত্র হিসাবে তাহার মূলধন ছিল শুধু স্পর্শানুভূতির যন্ত্র—শুধু কাছের জিনিষ অঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিয়া তবে সে কিছু অনুভব করিতে পারে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দূরানুভূতির যন্ত্র তাহাদের নাই বলিয়া তাহারা দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, দূরের শব্দ শুনিতে পায় না, দূরের জিনিষের ঘ্রাণও বুঝিতে পারে না। প্রাণী যতই উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, তাহার অনুভূতির প্রসার ততই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইতে থাকিবে। কেঁচোটি দূরের কোন জিনিষই অনুভব করিতে পারে না, কুকুরটি কিন্তু দূর হইতে শিকারের বস্তুর আঘ্রাণ পাইয়া তাহার অনুসরণ করে, দূর হইতে শত্রুকে দেখিয়া বা তাহার শব্দ শুনিয়া পলায়ন করে। মানুষের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত পঞ্চেন্দ্রিয়ের আবেদন ছাড়াও ধর্ম্ম, আদর্শ, প্রেম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির আবেদনেও তাহার সহিত জগতের কারবারের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে মানুষের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রতিক্রিয়া যাহার যে স্তরেরই হউক না কেন সর্ব্বত্রই তাহার ধারা একই রকম, তাহা নিছক যান্ত্রিক আচরণ মাত্র নহে, তাহা বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে কারবার করিবার জন্য একটা প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক ভাব তাহার মধ্যে আছে। তবে এই উদ্দেশ্যমূলক ভাবটি কেঁচো প্রভৃতির ক্ষেত্রে আত্ম-সচেতন ভাবে হয় না, আর মানুষের ক্ষেত্রে তাহা সচেতন ভাবেই হয়।

এইখানেই যন্ত্রের সহিত প্রাণীর আচরণের পার্থক্য; যন্ত্র কর্ত্তার ইচ্ছায় কাজ করে, আর প্রাণী নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণার বশে জগতের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কাজ চালাইতে পারে। এই প্রেরণা বা উদ্দেশ্য হয়ত সব সময়েই পরিস্ফুট নয় এই মাত্র। পরিস্ফুটই হউক বা অপরিস্ফুটই হউক, এই জীবন-প্রেরণা কোনও যন্ত্রের মধ্যে নাই। এই জিনিষটিকে Sir Percy Nunn "**জীবনপ্রয়াস**" (Horme) নাম দিয়াছেন।

এই জীবন-প্রয়াস নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে অন্ধভাবেই কাজ করে। পরে প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে ততই এই অন্ধ জীবন-প্রয়াস ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক কার্য্য বা **সজ্ঞান কর্ম্মপ্রয়াসে** (conation) পরিণত হয়। এই জীবন-প্রয়াস জীবনের প্রয়োজনেই নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে এমন সমস্ত কাজ করায় যাহা উচ্চ স্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঠিক সজ্ঞান কর্ম্মপ্রয়াসেরই অনুরূপ। অনেকের বিশ্বাস প্রাণীজগতের মধ্যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্ত্তনের পথে ক্ষুদ্র "এ্যামিবা" হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যে নব নব জীব তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নব নব যন্ত্রগুলিও ঐ জীবন-প্রয়াসের প্রেরণাতেই হইয়াছে। Samuel Butler এই তত্ত্বটিকে একটু অদ্ভুতভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের যখন কোন কিছু ধরিবার প্রয়োজন হয় তখন আমরা শাঁড়াসী বা চিমটা ব্যবহার করি; Butler বলেন, আদি কাঁকড়াও এক জোড়া শাঁড়াসী জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্ধ জীবন-প্রয়াসের প্রেরণায় তাহার শরীরের মধ্যে দাঁড়া তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহার পর সেই কাঁকড়ার বংশধরগণ একটা "নির্জ্ঞান-স্মৃতির" প্রেরণায় ঐ দাঁড়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়া দাঁড়াটিকে তাহাদের শরীরের

কর্ম্ম-যন্ত্র হিসাবে রাখিয়া দিল এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কাঁকড়ারই দাঁড়া গজাইয়া থাকে। নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে "নির্জ্ঞান স্মৃতি" এই-ভাবে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভাল ভাল কাজগুলি সংরক্ষিত করিয়া রাখে তাহাই আবার উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সজ্ঞান-স্মৃতিরূপে কাজ করিয়া অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই স্মৃতির নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান লীলাকে একটা ব্যাপক নামের দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে। Sir Percy Nunn ইহারই নাম দিয়াছেন "Mneme" বা **সংরক্ষণ-প্রয়াস**।

এই "জীবন-প্রয়াস" ও "সংরক্ষণ-প্রয়াস", ইহাই হইতেছে প্রাণীদের আচরণের মূলধন। ইহা সজ্ঞান ভাবেই কাজ করুক অথবা নির্জ্ঞান ভাবেই করুক সেই কাজের মধ্যে একটা "প্রেরণার" ভাব আছে, জগতের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে কারবার চালাইবার জন্য একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে। এখন কথা হইতেছে, এই যে উদ্দেশ্য-প্রবণতা ইহাকেই ত সাধারণ লোকে মনের কাজ বলে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুন না কেন সাধারণ লোকের বুঝিবার স্থবিধার জন্য 'মন' বলিয়া বস্তুটিকে স্বীকার করিয়া লইতে ক্ষতি কি? কাজের স্থবিধার জন্য মনস্তত্ত্বের আলোচনায় উপস্থিত 'মন'-কে যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু পরিষ্কার ধারণা থাকা ভাল। মন বলিতে আমরা কি বুঝি? Mc. Dougall বলিয়াছেন, "We may define mind as an organised system of mental or purposive forces." কিন্তু এই সংজ্ঞাটি কাল জিনিষকে অন্ধকার বলিয়া বুঝাইবার মত হইল।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মন হইতেছে চৈতন্য-পদার্থ, ইহা জড় পদার্থের বিপরীত এবং জড়দেহকে এই মনই নিয়ন্ত্রিত করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মন যদি চিন্ময় পদার্থ হইল এবং দেহ যদি মৃন্ময় পদার্থ হইল, তাহা হইলে এই দুইটির সংযোগ হয় কি করিয়া?

কেহ কেহ বলেন, জড় এবং চৈতন্য এই দুইটি পৃথক সত্তা; ইহারা পৃথক ও সমান্তরালভাবে কাজ করে (doctrine of psychological parallelism)

বা **সহচারবাদ** ; ইহা হয়ত সবাক সিনেমা-চিত্রের মত একটা ব্যাপার—যাহার মধ্যে দুইটি পৃথক কাজ একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটিমাত্র সত্ত্বা আছে। তবে জড় চৈতন্যকে সৃষ্টি করিয়াছে অথবা চৈতন্য জড়কে সৃষ্টি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ ভাবেন, চরম সত্ত্বা জড়ের মধ্যেও নাই, চৈতন্যের মধ্যেও নাই—তাহা জড় ও চৈতন্যের অতিরিক্ত একটি অস্তিত্ব।

Descartes মানুষকে একটি যন্ত্র এবং একটি আত্মার মিলন বলিয়া ভাবিতেন। Epictetus-এর ধারণা, মৃতদেহের উপর ভূতে ভর করিয়া যে ভাবে কাজ করিয়া যায়, মানুষের কাজকর্ম্মও ঐরূপ একটা দেহাতিরিক্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে আচরণবাদী Watson প্রভৃতির মতবাদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

Watson প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, চৈতন্যের সন্ধানের জন্য জড়বস্তুর বাহিরে অন্য কিছুর খোঁজে যাইবার প্রয়োজন নাই। Albert B নামক একটি ছোট শিশুর উপর ভয়ের প্রতিক্রিয়া দিয়া তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। শিশুটি একটি সাদা ইঁদুরকে খুব পছন্দ করিত এবং তাহার সহিত খেলা করিতে চাহিত। কিন্তু কোনও বিকট শব্দ শুনিলে শিশুটি ভয় পাইত। Watson সাহেব ছেলেটিকে লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি ইঁদুর যতবার ছেলেটির সমুখে উপস্থাপিত করেন, ততবারই একটা বিকট শব্দ করেন। ফলে, ভীতিজনক শব্দ আর ঐ ইঁদুরটি ছেলেটির কাছে এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গেল এবং পরে শব্দের সম্পর্ক বাদ দিয়াও, ঐ ইঁদুরটি একক ভাবেই ঐ ছেলেটির কাছে ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল। পরিণামে তাহার আদরের ইঁদুরটিই যে তাহার কাছে ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল তাহা নহে, যে কোনও রোমশ দ্রব্য, যথা—খরগোশ, লোমযুক্ত শীতের পোষাক প্রভৃতিও তাহাকে ভীত করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমে শব্দের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়, পরে শব্দ + ইঁদুরের প্রতিক্রিয়াও হইল ভয় এবং আরও পরে একক ইঁদুরের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (conditional reaction) হইল ভয়। অতএব দেখা

যাইতেছে, 'ভয় পাওয়া' বলিয়া যে মানস ক্রিয়াটি আছে, তাহা কোনও সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তির লীলায় সংঘটিত হয় না, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি শুধু দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া দিয়াই বুঝান যায়। সেইজন্য আচরণবাদীরা বলেন, আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির জন্য কোনও সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণার প্রয়োজন নাই। আমাদের স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি শারীর ক্রিয়া দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা যদি বলি, একজন দক্ষ সেতারী তাঁহার আঙ্গুল দিয়া চিন্তা করে, বা একজন ভাল টেনিস্ খেলোয়াড় তাহার হাত দিয়া চিন্তা করে, তাহা হইলে খুব বেশী ভুল বলা হয় না। যাহাকে আমরা সূক্ষ্ম চিন্তা বলিয়া অভিহিত করি, তাহাও চিন্তার স্থূল প্রতিরূপ দিয়া মনে মনে সাজাইয়া বিচার করি। যেমন, যখন আমরা দুই আর দুইএ যোগ করিয়া চার এই সিদ্ধান্ত করি, তখন দুই দুইটি স্থূল জিনিষকে পাশাপাশি রাখিয়া মানসনেত্রে চারিটি স্থূল জিনিষ দেখিয়া লইয়া তবে প্রথম যোগ দিতে শিক্ষা করিয়াছি। কাজেই দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্ম চিন্তার মূলে আছে স্থূল জিনিষের অনুভূতির আবেদন।

Bertrand Russell বলেন, চৈতন্য বস্তুকে এইভাবে আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিলে মানুষের দম্ভে বড়ই আঘাত লাগে, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে "তাহা হইলে মানুষের চৈতন্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম জিনিষগুলি কি দৈহিক আচরণেরই পরিণতি ?"

হয়ত তাহাই ; তবু মনে হয়, চৈতন্য, অনুভূতি, চিন্তা, সিদ্ধান্ত, মনোযোগ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত প্রাচীন নামগুলি তৈয়ারী হইয়াছে এবং তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যে অর্থ-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের আপাততঃ অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের জীবন-নাট্যের অভিনয়কে ভালভাবে বুঝিতে হইলে এই প্রাচীন নামগুলির অন্ততঃ রূপক হিসাবেও প্রয়োজন কম হইবে না।

Nunn, Ross প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুরাপুরিভাবে "আচরণবাদ"কে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, আবার ভারতীয়দের মত আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতিও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, জড় ও চৈতন্য অথবা দেহ ও মন ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বিচার করিতে যাইয়া নিছক "দেহবাদ" বা

"মানসবাদ" ইহাদের কোনটিকেই গ্রহণ না করিয়া, "দেহ-মানস-বাদ" গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, আমরা "দেহ-নিরপেক্ষ মন" বা "মন-নিরপেক্ষ দেহ" ইহাদের কোনটিকেই পৃথকভাবে দেখিতে পাই না। এই দেহ-নিরপেক্ষ মন বা মন-নিরপেক্ষ দেহ হয়ত নিছক কল্পনার বস্তু (hypostatizations) হইতে পারে এবং দেহের সহিত মনের সম্পর্ক কি, তাহা হয়ত দার্শনিকের গবেষণা-বিলাসের বস্তু হইতে পারে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। তবে কাজের সুবিধার জন্য দেহ-যন্ত্রের কথাও পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং মনের তত্ত্ব এবং মনের বিভিন্ন লীলাগুলিও আলোচনা করিতে হইবে। দেহ-যন্ত্রের কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে, উপস্থিত মনের তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

Ross বলিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের বিচারে মনের তত্ত্বটিকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে সকল আচরণবাদী মনকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট, তাহা শরীরতত্ত্বের (physiology) শাখা হিসাবে আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দিয়াছে। Ross বলেন, আচরণবাদ কিছুতেই মনের লীলার কথা এড়াইয়া চলিতে পারে না। কারণ, আচরণের সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হইলেও প্রাণ, মন, কর্ম্মপ্রয়াস, উদ্দেশ্যমূলক প্রেরণা প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়ে।

মনের কথা আলোচনা করিতে হইলে দুইটি জিনিষের কথা আলোচনা করিতে হয় (১) বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা এবং (২) পূর্ব্বসঞ্চিত স্মৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি।

কোনও জিনিষ অনুভব করা, কোন কিছু ইচ্ছা করা, চোখে দেখা, কানে শোনা, মনে ভাবা ইত্যাদি বিষয়গুলি অভিজ্ঞতার পর্য্যায়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতার জন্য একটি অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু এবং একটি অভিজ্ঞতার কর্ত্তা-পুরুষ, এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজন হয়।

অভিজ্ঞতা (১) জ্ঞানমূলক (cognition) (২) সংবেদনমূলক (affection) এবং (৩) কর্ম্ম-প্রচেষ্টা-মূলক (conation)—এই তিন প্রকারের হইতে পারে।

জগতের সঙ্গে কারবার করিবার সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তাহার মধ্যে এই জ্ঞান, সংবেদন এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা এক সঙ্গে মিশিয়া থাকে।

এই অভিজ্ঞতা কখনই স্থিতিশীল নহে, ইহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ঠিক এক জাতীয় অভিজ্ঞতা আমরা পর পর দুই বার পাইতে পারি না। এইজন্য অনেকে অভিজ্ঞতাকে স্রোতের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে, এক হিসাবে এই তুলনা সার্থক হইলেও মনের সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে আমরা একটা চির-চঞ্চল স্রোতের চেয়ে একটা স্থায়ী সত্ত্বারই কল্পনা করিতে চাই। মনের একটা অতীত ইতিহাস, একটা জ্ঞানের সঞ্চয় আছে, তাহা যেন বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতাকে নূতন ব্যঞ্জনা দান করে। অতীতের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা আহরণ এবং তাহার পর অতীত এবং বর্ত্তমান মিলাইয়া ভাবী কর্ম্মতন্ত্রকে পরিচালনার ইঙ্গিত, এই সমস্তই যেন মন বলিয়া পদার্থটির পরিচালনায় হইয়া থাকে।

এই যে অতীতের অভিজ্ঞতা, তাহার ব্যাপকতা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই বিস্তৃত নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া সমগ্র জাতিগত জীবনের অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যেন আমাদের ব্যক্তিগত মনকে একটি বিশিষ্ট গঠন দান করে। এই জন্যই যে 'মন' দিয়া আমরা জীবনের কারবার আরম্ভ করি, তাহাকে কেহ কেহ মানসিক গঠন বা **মানসিক কাঠামো** (mental structure) বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন (Mc. Dougall : Outline of Psychology)।

এই কাঠামো কথাটি কিন্তু আমাদের যেন বিভ্রান্ত না করে। মনের কাঠামো এমনই একটা ব্যাপার যাহা বর্ত্তিষ্ণু (static) নহে,—তাহা চলিষ্ণু (dynamic)। ইহার মধ্যে একটা স্থায়ী সত্ত্বা আছে বটে, কিন্তু সেই স্থায়িত্বের ভিতরেই এমন একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে বর্ত্তমান পরিবেশ বুঝিয়া নিজের গঠনের সংস্কার করিতে পারে, গঠনভঙ্গীর পরিবর্ত্তনও করিতে পারে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ কাঠামো বা structure বলি, তাহার এই ক্ষমতাটি নাই।

এইজন্য অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকগণ এই মানসিক বৈশিষ্ট্যটিকে মানসিক কাঠামো না বলিয়া **"স্ব-ভাব"** (Disposition) নাম দিয়াছেন। Stout বলিয়াছেন, "Our actual experience at any moment is determined by conditions which are not themselves actual experience, but the abiding after-effects left behind by prior experience." অর্থাৎ "আমাদের বর্ত্তমানে যাহা অভিজ্ঞতা, তাহার ব্যঞ্জনা শুধু অভিজ্ঞতাটি দিয়াই আমরা লাভ করি না, অতীত অভিজ্ঞতার যে রেশটুকু আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহা দিয়াই আমরা বর্ত্তমানকে বুঝি।"

অতীতের যে অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিক কাঠামো তৈয়ারী করে, তাহা সব সময়েই আমাদের মনের সজ্ঞান স্তরেই ঘটে না, আমাদের অজ্ঞাতসারেও তাহার গঠন নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। কাজেই মনস্তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই অবচেতন মনের কথাও কিছু কিছু আলোচ্য।

অবচেতন মন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন জার্ম্মান দার্শনিক Hartman। যে মতবাদ চৈতন্যকেই মনস্তত্ত্বের চরম তত্ত্ব বলিয়া মনে করিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াই অচৈতন্যকে মানুষের মূল তত্ত্ব বলিয়া তিনি প্রচার করেন এবং ইহাকে তিনি দুষ্ট প্রেতাত্মার মত একটা অতিভৌতিক শক্তি বলিয়া মনে করিতেন।

হার্টম্যানের মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ফ্রয়েডীয় অবচেতন-তত্ত্বই অনেকের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফ্রয়েডের মতে, অবচেতন মনটি যেন চেতন মনের নিম্নস্তরে অবস্থিত একটি কক্ষের ব্যাপার—যেখানে আমাদের অতৃপ্ত এবং অবদমিত কামনা-বাসনাগুলি জট্ পাকাইয়া গোপনে বাসা বাঁধে এবং সেখান হইতে অধিকতর শক্তি লইয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ফ্রয়েডীয় মতবাদটি অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না, অথচ অবচেতন মনের আলোচনা তাঁহারা একেবারে বাদ দিতেও চাহেন না। তাই তাঁহারা অবচেতন মনের অন্য জাতীয় একটা ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে Dr. Drever বলিয়াছেন, "অবচেতন কথাটি যদি বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের কাজে

ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতার সেই সমস্ত মানসিক প্রভাবগুলিকেই বুঝিব যাহাদের সম্বন্ধে আমরা কখনই সচেতন হইতে পারি না। সুতরাং মানসিক অবস্থার দুইটি দিক আছে (১) সচেতন প্রণালী এবং (২) সচেতনপ্রণালীর অচেতন প্রেরণা; কিংবা সংক্ষেপে "সচেতন প্রণালী ও অচেতন প্রণালী।"

Dreverএর উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, মনের দুইটি দিক আছে: (১) সচেতন অভিজ্ঞতা এবং (২) মনের একটা সক্রিয় কাঠামো (mental structure) বা গঠনভঙ্গী অথবা অচেতন প্রেরণা যাহা সচেতন অভিজ্ঞতাকে নূতন ব্যঞ্জনা দান করে।

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জ্ঞানমূলক, সংবেদনমূলক এবং কর্ম্ম-প্রেরণামূলক তিনটি দিক আছে, তাহা বুঝিবার জন্য এই অবচেতন মনস্তত্ত্ব কোনও নূতন আলোকপাত করিতে পারে কি?

আমরা কিছু পূর্ব্বে কিঞ্চুলিকার প্রতিক্রিয়ার কথা বলিয়াছি। সম্মুখে যাইতে যাইতে সে যখন বাধা পাইয়াছিল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একবার বামদিকে একবার বা ডানদিকে ফিরিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই প্রতিক্রিয়ার নিছক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ঠিক হয় না, কিন্তু তা বলিয়া কেঁচোটির আচরণের মধ্যে মানবীয় বুদ্ধি সিদ্ধান্তপ্রসূত কর্ম্মপ্রচেষ্টার শক্তির আরোপ করাও অত্যন্ত আদিখ্যেতার কথা হইবে। তাহা হইলে কেঁচোটির প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কি?

কেঁচোটি যখন প্রথম বাধা পাইল তখন সে বুঝিল বাহিরে একটা কিছু ঘটিয়াছে এবং নিজের সঙ্গে তাহার সহিত একটা বোঝা পড়ার জন্য সে ভিতর হইতে একটা কিছু করিল। এই বাহিরের আবেদন এবং এই ভিতর হইতে প্রেরণার প্রতিক্রিয়া—ইহা যে দুটি পৃথক ব্যাপার তাহা কেঁচোটি বুঝিতে পারে না। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাহিরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে যদিও জ্ঞানমূলক (cognitive) আবেদন আসিয়াছে বহির্জগৎ হইতে এবং কর্ম্মপ্রয়াস (conation)-মূলক প্রেরণা আসিয়াছে তাহার নিজের ভিতর হইতে। কেঁচোটির এই অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট জ্ঞানমূলক

এবং সামান্য একটা কর্ম্মপ্রয়াসের প্রতিক্রিয়া ছিল ; কিন্তু অভিজ্ঞতার আর একটি দিক অর্থাৎ সংবেদনটি (affection) সুস্পষ্ট ছিল না। ভাল লাগা, মন্দ লাগা, ভয়ে অভিভূত হওয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া এগুলির কিছুই তাহার মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইল কিরূপে ? Drever বলেন, একটা "feeling of worthwhileness" অর্থাৎ "এইটি করিলে ঠিক হইবে"—এই জাতীয় একটা অস্পষ্ট চেতনাই তাহার প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

একটি ফোটা ফুল দেখিয়া প্রজাপতিটি যখন তাহার দিকে উড়িয়া আসে তখনও এই জাতীয় একটা অনুভূতি অর্থাৎ "ফুলটির উপর বসিলে বেশ হয়" এই প্রকার একটা প্রেরণা তাহাকে ফুলের নিকট যাইবার জন্য প্রযুক্ত করে। ফুল সম্বন্ধে সংবেদনের তীব্র আনন্দও তাহার নাই, মননের গভীর সিদ্ধান্তও তাহার নাই এবং কর্ম্মপ্রয়াসের কার্য্যাবলীও খানিকটা যান্ত্রিক ব্যাপারের মত। কিন্তু ঐ ফুলটি দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন : "ফুলও আমাদের কাছে প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে, সংসারের সোনার লঙ্কার রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্ব্বাসিত হয়ে আছি। রাক্ষস কেবলি বলছে 'আমি তোমার পতি, আমাকে ভজনা কর।' কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে 'আমি এসেছি আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন'।"

ফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা সংবেদনের মধুরতম ব্যঞ্জনা, মননের গভীরতম দার্শনিকতা ও কর্ম্মপ্রয়াসের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির সন্ধান পাইলাম।

শিশু বৃক্ষের একক অঙ্কুর হইতে বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত বনস্পতির পার্থক্য যেরূপ মাত্রা ও পরিণতিগত, প্রজাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি-ক্রিয়ার পার্থক্যও সেইরূপ। নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তথাকথিত নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানমূলক (cognitive) অনুভূতি নাই, সংবেদনমূলক (affective) অনুভূতিও নাই এবং কর্ম্মপ্রেরণামূলক (conation) প্রতিক্রিয়াও খানিকটা অন্ধভাবে পরিচালিত হয় এবং এই জ্ঞান, সংবেদন ও কর্ম্মপ্রয়াস সবগুলিই

একমাত্র প্রাণ-প্রেরণার অন্ধ আবেগ এক হইয়া কাজ করিতেছে। অঙ্কুর সেখানে একটি মাত্র কাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে শাখা-প্রশাখা কিছুই নাই। বৃক্ষ-শিশুটি যতই বড় হইতে থাকে, কাণ্ডটি ততই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রাণীজগতেও তেমনি প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে ততই সে নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতা, সজ্ঞান সংবেদন, কর্ম্মপ্রয়াস ও মননশক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

শারীর-মানস যন্ত্র

ললিতবাবু একজন বিখ্যাত গায়ক। সঙ্গীতকে তিনি জীবনের পরম ধন বলিয়া মনে করেন। গান গাহিতে-গাহিতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান, যে ব্যক্তি গান জানে না তাহাকে তিনি মানুষ বলিয়াই মনে করেন না, তাহার একমাত্র পুত্রটি গান শিখিল না বলিয়া তাহাকে তিনি দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না এবং মনে মনে ভাবেন এই অযোগ্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্ব-সঞ্চয় একটি কৃতী ছাত্রকে উইল করিয়া দান করিয়া যাইবেন। ললিতবাবুর এই যে গান সম্বন্ধে ভালবাসা, এই যে সুরের কড়ি, কোমল, ঔড়ব, খাড়ব, গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, এগুলি কিভাবে তাঁহার মধ্যে সঞ্চিত হইল ? প্রথমতঃ তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, একদিন শৈশবে হয়ত তাঁহার কানে কাহারও গান খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি তাহা মন দিয়া শুনিয়াছিলেন। তাহার পর হয়ত তিনি গানটি গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয়ত প্রথম চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহাকে গানে আরও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া গানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নিবিড়তর হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ গান সম্বন্ধে তাঁহার একটি সংস্কার বা রসবোধ (sentiment) তৈয়ারী হইয়াছিল, পরে এই রসবোধ তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়াছিল। তাঁহার এই যে পরিণতি, এই যে গান সম্বন্ধে জ্ঞান, আদর্শবাদ প্রভৃতি, ইহা যতই জটিল, যতই সূক্ষ্ম ব্যাপার বলিয়া মনে হউক না কেন, স্থূল শারীর অনুভূতি, স্থূল শারীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টাজনিত সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানের ও প্রীতির সঞ্চার,—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই উহার আরম্ভ হইয়াছে।

বস্তুতঃ জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মপ্রচেষ্টার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। জ্ঞান কেবলমাত্র একটা কর্ম্মনিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শক্তির ফলমাত্র নহে। প্রত্যেক কর্ম্ম-প্রচেষ্টাই একটি জ্ঞানের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক জ্ঞানই কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত হয়। একটি ছবি দেখিয়া ছবি সম্বন্ধে যখন আমরা জ্ঞান আহরণ করি তখন সূক্ষ্ম মনোযন্ত্রের সাহায্যেই তাহা করি না, দেহ-যন্ত্রের অবদান তাহাতে

সামান্য নহে। ছবিটিকে দেখিবার জন্য দেহের উপযুক্ত সংস্থান করিয়া আমরাই চক্ষুকে যথাযথভাবে নিবদ্ধ করি, আলোক, দূরত্ব প্রভৃতির হিসাব করিয়া চক্ষুর "ক্যামেরা"টিকে যথাযথভাবে বিন্যাস করি, দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে একটা খবর স্নায়ু-তন্ত্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করি এবং মস্তিষ্ক হইতে দৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে একটা প্রেরণা অনুভব করি, তবেই ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের সর্ব্বক্ষেত্রেই এইরূপ একটা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবদান আছে। যাহাকে সূক্ষ্ম চিন্তা করা বলা হয়, তাহার মধ্যেও এই স্থূল কর্ম্ম বা স্থূল অনুভূতিগ্রাহ্য জড় পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলিকে সূক্ষ্ম চিন্তার কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু Nunn সাহেব দেখাইয়াছেন, জ্যামিতির সিদ্ধান্তের জন্য যখন একটি ত্রিভুজকে অন্য একটি ত্রিভুজের উপর স্থাপন করা হয়, তখনও আমরা নিছক সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা সে কাজটি করি না, মনে মনে ত্রিভুজের মত একটা স্থূল জিনিষ লইয়া আর একটি স্থূল জিনিষের উপর স্থাপন করি; সুতরাং এক হিসাবে আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই মনোযন্ত্রের কাজ করি। এই জন্যই Bradley বলিয়াছেন, "যুক্তি জিনিষটা হইতেছে স্থূল জিনিষের মানস প্রতিরূপগুলি লইয়া মনে মনে একটা পরীক্ষা করা মাত্র (To perform an ideal experiment)।" এখানে ideal কথাটির অর্থ 'আদর্শ' নহে, idea সংক্রান্ত অথবা 'মানসিক'।

চিন্তার সহিত কর্ম্মপ্রচেষ্টার যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত জটিল। চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অবদান তাহার মধ্যেও আছে। কাজেই "কাজের ভিতর দিয়া শিখ (Learn by doing)"—এই উপদেশটির শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ একটা মূল্য আছে। এইজন্যই গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার সময় ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলি (practical experiment) নিছক যুক্তিমূলক ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইতিহাস প্রভৃতি তত্ত্বমূলক বিষয়গুলি পড়াইবার সময় রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব প্রভৃতির মত হস্তসম্পাদ্য পরীক্ষাগুলি হয়ত করান যায় না; তাহা হইলেও, ইতিহাসের ঘটনাকে অভিনয় করাইয়া অথবা ইতিহাসের তত্ত্বগুলি বর্ত্তমানের রাজনীতিক সমস্যার

সমাধানে প্রয়োগ করিয়া, ইতিহাসের বিষয়কেও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অতীতের মনস্তাত্বিকগণ মনে করিতেন যে, জগতের সহিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়াই আমাদের জ্ঞানের কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান মানসবিজ্ঞান বলে, শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি নহে, আমাদের অঙ্গসংস্থানবোধ, পেশীর বিক্ষেপ, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, সংবেদন (ভাল লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতি)—এগুলিও আমাদের জ্ঞানকে সাহায্য করে। কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত জ্ঞানবুদ্ধির যে একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে, তাহা একটী বিপরীতমুখী প্রমাণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যে সব ছেলেরা বুদ্ধিতে 'মাট' অথবা জড়বুদ্ধি, তাহারা জটিল গতিবিশিষ্ট অঙ্গপরিচালনা করিতে পারে না। লাঠিখেলা বা মুগুর ঘুরাইবার জটিল কৌশল দেখান, জিম্‌নাষ্টিকের জটিল অঙ্গভঙ্গী বা ব্যালেন্সের খেলা দেখান, সুন্দর পোজে দেহকে বিন্যস্ত করা, সুন্দরভাবে নৃত্য করা, ছবি আঁকা, সেতার, বীণ, এস্‌রাজ প্রভৃতি বাজান—এসব কাজ তাহারা ভালভাবে করিতে পারে না। এই জন্য মনে হয় একটি ভাল মানস-যন্ত্র একটি ভাল দেহযন্ত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবে Hellen Kellerএর মত একজন মূক-বধির এবং অন্ধ বালিকা অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্র লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াও উত্তরকালে যে জ্ঞানী পণ্ডিত ও লেখিকা হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা নিয়মের ব্যর্থতা প্রমাণ করে না, ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে। এমন ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে।

এই দেহ-যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির দ্বারা মানস যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যই Montessori স্কুলে ফিতা বাঁধা বোতামের গর্ত্তে সূতা পরান, রংএর সহিত রং মিলাইয়া উল্ সাজান, খেলাঘরের কলকব্জা ফিট্ করা, ঢাকনিবদ্ধ কৌটা নাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা বলিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি করান হয়। Montessori বলেন, এইভাবে অনুভূতি তথা শরীরগত দক্ষতার পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

এই অনুভূতি এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টাগত প্রতিক্রিয়া "সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া" (Sensory motor reactions)। ইহারই উপর মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি,

আদর্শ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সব কিছু নির্ভর করে। যে গায়কটির উদাহরণ দিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছি, সেই ললিতবাবুও তাঁহার গায়কত্বের সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন নিছক অনুভূতি এবং অনুভূতির কর্ম্মপ্রচেষ্টাগত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জগতের অসংখ্য আবেদন দেহযন্ত্র দিয়া কিভাবে অনুভূতিতে ধরা পড়ে এবং সেই অনুভূতি কিভাবে আমাদের মধ্যে কর্ম্মগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এ সমস্ত আলোচনা ও মানসবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। উপস্থিত আমরা এই শারীর-মানস যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

ধরা যাইতে পারে, এই রচনাটি যখন লেখা হইতেছে তখন আমার ডান হাতের উপর একটা মশা হুল ফুটাইল, অমনি আমার বাম হাতটি তাহার উপর আপতিত হইয়া তাহাকে সংহার করিল। ঘটনাটি যত সরল বলিয়া মনে হইতেছে, ব্যাপারটা তত সরল নহে। মশাটি যখন কামড়াইয়াছিল, তখন আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই; তাহা হইলে বাম হাত দিয়া তাহাকে মারিলাম কি করিয়া? ব্যাপারটা হইল এইরূপঃ মশাটি হুল ফুটাইল। সে যে আমার দেহের কোনও অংশে আক্রমণ করিয়াছে, সেই খবরটি কতকগুলি জ্ঞানবহা অন্তর্ম্মুখী স্নায়ুর বা সংবেদন স্নায়ুর (sensory nerve) দ্বারা দেহের হেড্ অফিসে প্রেরিত হইল। এই হেড্ অফিসের অফিসার হিসাবে কোনও অধিরাজ মন বা আত্মাকে যদিও অনেকে স্বীকার করেন না, তাহা হইলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য একটা রূপকের সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে, মশার কামড়ের এই খবরটি যখন হেড অফিসে পৌছাইল, তখন অফিসারটি অতীত অভিজ্ঞতার ফাইল ঘাঁটিয়া বুঝিতে পারিল যে, এটা একটা মশামাত্র। তখন সে কর্ম্মবহা বহির্ম্মুখী স্নায়ুর (motor nerve) সাহায্যে বাম হাতের পেশীর নিকট অর্ডার পাঠাইল মশাটিকে মারিবার জন্য। বাম হাতটি সেই নির্দ্দেশ অনুসারে উঠিল এবং মশার পৃষ্ঠে পতিত হইল। এই এতগুলি জটিল প্রক্রিয়া ঘটিতে হয়ত আধ সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই। কারণ স্নায়ু মধ্য দিয়া এই সংবাদ এক সেকেণ্ডে ২০০ ফুট বেগে যাতায়াত করে।

এই ঘটনাটি হইতে দেখা যাইতেছে, আমাদের কর্ম্মযন্ত্রের তিনটি বিশেষ বিভাগ আছে। একটি দ্বারা আমরা অনুভূতি গ্রহণ করি (Affectors) ; আর একটির দ্বারা এই অনুভূতির খবরটি মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দিই ও মস্তিষ্ক হইতে উপযুক্ত নির্দ্দেশগুলি পেশীর নিকট লইয়া আসি (connectors) এবং তৃতীয়টির দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করিয়া আমরা কাজ করি (effectors)।

কর্ম্মযন্ত্রের বিভাগ তথা অনুভূতির যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

অনুভূতির যন্ত্র (Affectors, End organs) :

"দৃশ্য-গন্ধ-গানে" ভরা জগতের আবেদন অসংখ্য। এই সমস্ত আবেদনই যে আমাদের দেহ-যন্ত্রে ধরা পড়ে তাহা নহে। সূর্য্যকিরণে লক্ষ লক্ষ রঙ খেলা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সাতটিকে আমরা চক্ষু দিয়া ধরিতে পারি, প্রতি সেকেণ্ডে ১২-১৬ হইতে ২৫,০০০-৩০,০০০ কম্পনবিশিষ্ট শব্দকেই আমরা কর্ণ দিয়া ধরিতে পারি এবং ৩২ হইতে ৪০৯৬ কম্পন বিশিষ্ট শব্দকেই সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু এই মাত্রার চেয়ে নিম্নতর বা উচ্চতর গ্রামের অসংখ্য শব্দগুলি আমরা কর্ণ দিয়াও শুনিতে পারি না এবং কণ্ঠ দিয়াও উচ্চারণ করিতে পারি না। এইভাবে জিহ্বা দ্বারা আমরা রাসায়নিক কয়েকটি বস্তুর মাত্র স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। ঘ্রাণ যন্ত্রটি অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম, আশী লক্ষ ভাগ বায়ুতে এক ভাগ মাত্র মৃগনাভি-রেণু থাকিলেও মানুষ তাহার গন্ধ বুঝিতে পারে; কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি আরও তীব্র। একটি আম কাটিলে বা একটি কাঁঠালের কোয়া বাহির করা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মাছি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। তাহা হইলেও প্রাণীগণ সমস্ত বায়বীয় গন্ধদ্রব্যের সমস্ত মাত্রাই অনুভব করিতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেহ হয়ত পোড়া ভাতের গন্ধটি ঠিক বুঝিতে পারে, কিন্তু বেল, মল্লিকার গন্ধ বুঝিতে পারে না, সামান্য সিগারেটের গন্ধে কাতর হইয়া উঠে, কিন্তু ঘী-এর গন্ধ পায় না; কাজেই ঘ্রাণের শক্তিও সীমাবদ্ধ। এইরূপ ত্বকের শক্তি খুবই

সীমাবদ্ধ, শীতাতপ এবং স্পর্শের খানিকটা অংশমাত্রই আমরা বুঝিতে পারি। যাহা হউক, এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ লইয়া আমাদের যে জগতের সঙ্গে পরিচয়, তাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের (End organs) সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া শরীরের সুস্থতা বোধ (organic sense), দেহসংস্থানবোধ (posture and balance sense), গতিবোধ (kinaesthetic sense) প্রভৃতি আরও অনেক ইন্দ্রিয়ই আমাদের আছে। বস্তুতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বহুদিন হইতে শুনা থাকিলেও, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা অনুভূতির যন্ত্র হিসাবে পাঁচের অনেক বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়েরই সন্ধান পাইয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ই প্রধান।

আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিরই বাইরের অংশটি এমন কতকগুলি কোষ (epithelial cell) দ্বারা গঠিত যেগুলি এক একটা বিশিষ্ট রকমের উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়। যে উত্তেজনা কর্ণ অনুভব করিতে পারে, চক্ষুর নিকট তাহা অর্থহীন, আবার চক্ষু দিয়া যাহা বুঝিতে পারি, ত্বকের দ্বারা তাহা পারি না। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই সাড়া দেওয়ার কাজটি কিভাবে ঘটিয়া থাকে ?

যখন বহির্জগতে একটি বিশিষ্ট আবেদনের সহিত একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, তখন ঐ ইন্দ্রিয়ের Epithelial কোষগুলির মধ্যে একটি শারীর-রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এই পরিবর্ত্তনের ফলে একটা রাসায়ন-বৈদ্যুতিক বা তজ্জাতীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া বহু শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত স্নায়ুশাখার সাহায্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতে (মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক) আনীত হয়। সেখানে তখন এই তরঙ্গগুলি যাইয়া আবার আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহার ফলে কর্ম্মবহা স্নায়ু (motor nerve) দিয়া একটি নির্দ্দেশ পেশী (বা গ্রন্থি)-তে উপস্থিত হয় এবং সেই নির্দ্দেশ অনুসারে পেশী নড়াচড়া করে, অথবা গ্রন্থি রস নিঃসরণ করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Connecters, Nervous system):

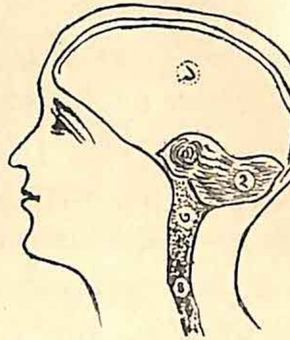
বহির্জগতের আবেদন যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনও একটিতে উপস্থিত হয়,

তখন স্নায়ুমণ্ডলীই সেই আবেদনটি মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, আবার মস্তিষ্ক হইতে সেই আবেদনের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া-নির্দ্দেশও মস্তিষ্ক হইতে বহন করিয়া আনে। এই স্নায়ুতন্ত্রের পরিণতিই মানুষকে নিম্নতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। জীবজগতের নিম্নতম সৃষ্টি একটি "এ্যামিবা" একটিমাত্র জীবকোষ লইয়া গঠিত। ইহার শরীরের প্রত্যেকটি অংশই সমান প্রয়োজনীয়; কারণ প্রত্যেকটি অংশ দিয়া ইহারা নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে, জীবনের সবকিছু কার্য্যই করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহার শরীরের যে কোনও অংশ কাটিয়া মূল দেহ হইতে পৃথক করিয়া দিলে তাহা বাঁচিয়া থাকে, বৃদ্ধি পায় এবং সন্তানসন্ততিও সৃষ্টি করে।

প্রাণী যতই উন্নততর হইতে থাকে, তাহার শরীর ততই অধিক সংখ্যক জীবকোষের দ্বারা গঠিত হইতে থাকে। এই কোষগুলি এ্যামিবার কোষের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিষ হয় না। একটি মানুষের একটি আঙ্গুল কাটিয়া দিলে সেই কাটা আঙ্গুলটি হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈয়ারী হয় না। উচ্চতর প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অনন্য-নিরপেক্ষ নয় বলিয়াই তাহাদের পরস্পরের পূর্ণতা বিধানের জন্য, পরস্পরের সাহায্যের জন্য, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্র এই ব্যবস্থা করে। প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে, তাহার স্নায়ুতন্ত্র ততই জটিল হইতে থাকে। ক্রমশঃ স্নায়ুরজ্জুকে (বা সুষুম্না কাণ্ডকে) ধারণ ও রক্ষা করিবার জন্য ফাঁপা হাড়ের মেরুদণ্ডের বিকাশ হইতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুর রাজধানী হিসাবে মস্তিষ্কেরও বিকাশ হইতে থাকে এবং দেহযন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি মস্তিষ্ক-সাপেক্ষ হইয়া পড়িতে থাকে। কাজেই মানুষের স্নায়ুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মস্তিষ্কের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

মস্তিষ্ক চারিভাগে বিভক্ত, যথা (১) প্রধান মস্তিষ্ক বা গুরুমস্তিষ্ক, (cerebrum), (২) মধ্যমস্তিষ্ক বা লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum), (৩) অধঃমস্তিষ্ক বা সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata) এবং (৪) সেতুমস্তিষ্ক (Pons-varolii)।

প্রধান মস্তিষ্ক (Cerebrum) : ভ্রূযুগলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া ঘাড়ের চুল যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার দুই ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত স্থান জুড়িয়া মাথার খুলির প্রায় ⅞ অংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহা বাম ও দক্ষিণ দুই অর্দ্ধ গোলাকার অংশে (hemisphere) বিভক্ত। এই দুইটি বিভাগের মধ্যে একটা ফাটলের মত আছে। এই প্রত্যেক গোলার্দ্ধের মধ্যে আবার তিনটি করিয়া অংশ (lobe) আছে। সুতরাং প্রধান মস্তিষ্ক ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধতম অংশে ⅛ হইতে ¼ ইঞ্চি পুরু ধূসর বর্ণের এবং তাহার ভিতরে শ্বেত বর্ণের স্নায়ু স্তর আছে। ধূসর বর্ণের অংশটি উচ্চতর চিন্তাকে পরিচালিত করে।



(১) প্রধান মস্তিষ্ক (২) মধ্য মস্তিষ্ক
(৩) অধঃমস্তিষ্ক (মেডুলা)
(৪) মেরুরজ্জু

প্রধান মস্তিষ্ক মানুষের বুদ্ধি-চৈতন্য, আবেগ (emotion)-ইচ্ছাশক্তি, দেহের ঐচ্ছিক পেশীর পরিচালনা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। আঘাত, পতন, অস্থায়ী অস্ত্রোপচার, বৈদ্যুতিক শক্ প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হইলে আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বাক্‌শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শক্তিও বিনষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রমাণ হইতে এখন প্রায় নিঃসংশয় রূপেই জানা গিয়াছে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আমাদের বিভিন্ন কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে বামদিকের মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor area) রোগগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে আমরা দক্ষিণ দিকের হাত-পা নাড়িতে পারি না, মস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের চক্ষু নিয়ন্ত্রিতকারী অংশটি নষ্ট হইলে আমরা বাম চক্ষু দ্বারা কিছুই দেখিতে পাই না, ইত্যাদি।

মধ্য মস্তিষ্ক (Cerebellum) : প্রধান মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নে অর্থাৎ ঘাড়ের ঠিক উপরে মধ্য মস্তিষ্ক অবস্থিত ; আকারে ইহা মাঝারী কমলা লেবুর মত। ইহাও দুই গোলার্দ্ধে বিভক্ত ; ইহার উপরেও ধূসর ও শ্বেত

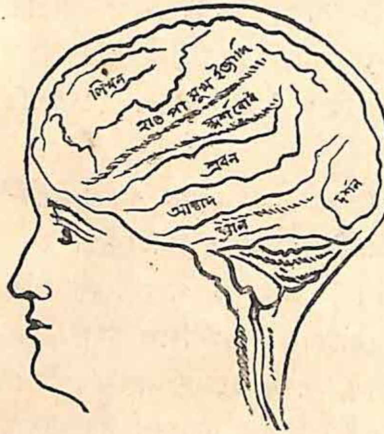
বর্ণের স্নায়ু-চাপ বিদ্যমান আছে। মধ্য মস্তিষ্ক শরীরের পেশীতন্ত্রের কার্য্যের সমতা রক্ষা করা, শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখা, চলাফেরা করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই মস্তিষ্ক অসুস্থ হইলে মানুষ চোখ বুজিয়া দাঁড়াইতে যাইলে পড়িয়া যাইবে বা কোনও কিছু করিতে হইলে তাহার হস্ত-পদাদি কাঁপিতে থাকিবে।

অধঃ মস্তিষ্ক (Medulla Oblongata) : অধঃ মস্তিষ্ক বস্তুতঃ মেরু-মজ্জার উর্দ্ধভাগ মাত্র। মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে ইহা অবস্থিত এবং ধীরে ধীরে মেরুমজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। অধঃ-মস্তিষ্ক প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা এবং উর্দ্ধদিকে পৌণে এক ইঞ্চি মোটা। নীচের দিকে ইহা ক্রমশঃ মেরুমজ্জায় মিশিয়াছে। অধঃ মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবহা নাড়ীর পেশী ও গিলিবার পেশীর উপর কাজ করিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধদেশ নষ্ট হইলে মানুষের বোধশক্তি লোপ পায়, ফলে হয়ত সে বাঁচিয়া থাকিবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবে, কিন্তু বেদনা বোধ করিতে পারিবে না। প্রধান মস্তিষ্কের সহিত ইহার যোগ নষ্ট হইলে মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক নড়িয়া বেড়াইতে পারে না। ইহার নিম্নদেশ নষ্ট হইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্য্য বন্ধ হইবে। মস্তিষ্কের এই অংশ পরিপাক ক্রিয়া ও ঘর্ম্ম সৃষ্টির সহায়তা করে।

পনস্ বা সেতু-মস্তিষ্ক (Pons) : অধঃ মস্তিষ্কের ঠিক উপরেই স্নায়ু-সূত্রগুলি প্রস্থে বিস্তৃত হইয়া মস্তিষ্কের দুই অংশকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অংশটির নাম পনস্ বা সেতু-মস্তিষ্ক। আমাদের দক্ষিণ দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির কাজ যে বামদিকের মস্তিষ্কের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার একটা কারণ এইখানে পাওয়া গেল। আমাদের স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ড বহিয়া আসিয়া এই "পনস্" বা সেতু-মস্তিষ্কে আসিয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া বিপরীতমুখী গতি লইয়া যাত্রা করিয়াছে।

মেরু-মজ্জা প্রণালী : অধঃ মস্তিষ্ক সরু হইয়া মেরু মজ্জা (বা সুষুম্না কাণ্ড) রূপে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশ মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বা প্রথম লাম্বার ভার্টিব্রা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং ইহাকে মস্তিষ্কের অব্যাহত অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অথবা বিপরীত বিচারে জীব-

তন্ত্রের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া মস্তিষ্ককেই মেরুমজ্জার পূর্ণ পরিণতি

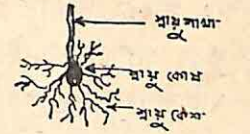


বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মেরু-মজ্জা দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি এবং কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত স্থূল। মেরুমজ্জা হইতে ৩১ জোড়া স্নায়ুগুচ্ছ মেরু-দণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এইগুলিকে স্পাইনাল নার্ভ বলা হয়। প্রত্যেক স্পাইনাল নার্ভের দুইটি শিকড় আছে—একটি শিকড় মেরুমজ্জার সম্মুখ অংশ হইতে এবং অপরটি পশ্চাৎ অংশ হইতে নির্গত হইয়া আবার পরস্পর মিলিত হইয়াছে। তখন তাহাদের স্নায়ুগুচ্ছ (Nerve trunk) বলা হয়। মেরুদণ্ড ছাড়িয়া এই স্নায়ুগুচ্ছগুলি বহুধা বিভক্ত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া ইন্দ্রিয়ের মুখ, পেশী-তন্তু, ত্বক প্রভৃতি শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া মস্তিষ্কের সহিত দেহের দূরতম অংশের সংযোগ স্থাপন ও একত্ব বিধান করিয়াছে। শরীরের মধ্যে কেবল নখ, চুল, উপাস্থি এবং উপত্বকে স্নায়ুসূত্র নাই। এইজন্যই চুল বা নখ কাটিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না।

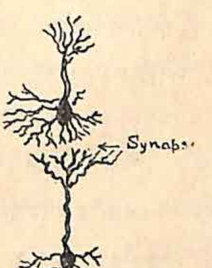
কাজের দিক দিয়া স্নায়ুগুলি জ্ঞান-বহা বা অন্তর্মুখী (Afferent), কর্ম্মবহা ও বহির্মুখী (Efferent) এবং মিশ্র—এই তিন জাতীয় হয়। জ্ঞানবহা স্নায়ু বহির্জগতের আবেদনের খবর মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, কর্ম্মবহা স্নায়ু মস্তিষ্কের নির্দ্দেশ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের দিয়া কাজ করাইয়া লয় এবং মিশ্র স্নায়ুগুলি উভয় কার্য্যই করে।

স্নায়ুকোষ (Neuron) : মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সূক্ষ্মতম অংশ হইতেছে স্নায়ুকোষ (neuron)। শরীরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ কোটী স্নায়ুকোষ আছে। মস্তিষ্কের মধ্যে যত স্নায়ুকোষ আছে, তাহাদিগকে খালি চোখে দেখিবার মত বড় করিয়া তুলিলে তাহাদের জন্য যে আয়তনের প্রয়োজন

হইত, তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজের চেয়েও বড় হইত। প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটি কেন্দ্রীয় কোষ (cell body), একটী স্নায়ুকোষ (axon) এবং তাহার প্রান্তে বহু শাখায় প্রসারিত স্নায়ুকেশ (dendron) আছে। স্নায়ুশাখা ও স্নায়ুকোষের সাহায্যে একটি স্নায়ুর সহিত অন্য একটি স্নায়ুর সংযোগ সাধিত হয়। কাজের দিক দিয়া স্নায়ুকোষগুলিকে কর্ম্মবহা, জ্ঞানবহা ও সংযোগকারী এইভাবে ভাগ করা যায়। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হইলে তাহাকে গ্যাঙ্গ্লিয়া (Ganglia) বলে। ইহাদিগকে এক হিসাবে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা যাইতে পারে। মেরু-মজ্জার উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক গ্যাঙ্গ্লিয়া আছে। এইগুলি "সিম্প্যাথেটিক" স্নায়ুর কার্য্য পরিচালিত করে। এই সিমপ্যাথেটিক্ স্নায়ুর নির্দ্দেশেই প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়া (Reflexes), পরিপাক ক্রিয়া, নিঃশ্রবণ ক্রিয়া প্রভৃতি মস্তিষ্কের বিনা আজ্ঞায় চলিতে থাকে।



"সাইন্যাপ্স" (The Synapse): নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে একটি স্নায়ুকোষই তন্নিম্নস্থ পেশীকে কর্ম্ম-নির্দ্দেশ প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীদের বিস্তৃততর দেহযন্ত্র আছে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে নির্দ্দেশ পাঠাইতে হইলে অন্ততঃ দুইটি স্নায়ুকোষের প্রয়োজন হয়। যে স্থানে এই দুইটি স্নায়ুর কর্ম্মগত মিলন হয় (স্পর্শ নয়), তাহাকে synapse বলে। এই synapse-এর ক্ষেত্রে দুইটি স্নায়ুকোষের শাখা-প্রশাখাগুলি একেবারে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হয় না—শুধু এমন কাছাকাছি আসে যাহাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত অনুভূতি-নির্দ্দেশের বা কর্ম্ম-নির্দ্দেশের তরঙ্গগুলি একটি পথ করিয়া লইয়া ছুটিতে থাকে। Synapse-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া মিলিত হয় নাবলিয়াই কোনও একটি স্নায়ুকোষ অসুস্থ বা বিনষ্ট হইলে অপরটিও তাহার সংক্রমনে বিনষ্ট হয় না। Synapse-এর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্য দিয়া "One way"



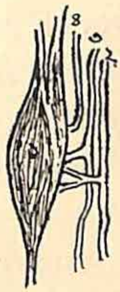
পথের মত তরঙ্গগুলি একমুখী ভাবেই যাইতে পারে, অর্থাৎ জ্ঞানবহা হইতে জ্ঞানবহা অথবা কর্ম্মবহা হইতে কর্ম্মবহা স্নায়ুপথেই অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী গতি লইয়াই যাইতে পারে—বিপরীতমুখী যাত্রা করিতে পারে না।

স্নায়ু-তরঙ্গস্রোত যখন একটি স্থান হইতে অন্যত্র যাত্রা করে, Synapse তখন তাহাতে বাধাই দান করে। তবে একবার একটি স্নায়ু-প্রবাহ চলিয়া যাইলে দ্বিতীয় বারের বাধা অল্পতর হয়, পরে আরও অল্পতর হয় এবং পরে খাল-কাটা পথে জলস্রোতের মত স্নায়ুপ্রবাহের যাত্রা সহজ হইয়া যায়। অভ্যাসের জন্য আমাদের কাজে যে দক্ষতা আসে, তাহা হইতেছে এই খাল-কাটা পথে স্নায়ু-তরঙ্গের সহজতর যাত্রা-প্রবাহের ব্যাপার মাত্র। বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব বলে, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা কোন আত্মা বা মন-মহারাজের কর্ত্তৃত্বে নিষ্পন্ন হয় না, তাহা হইতেছে এই Synapse-এর বাধা ভাঙ্গিয়া স্নায়ুতরঙ্গের জন্য সহজ যাত্রাপথের সৃষ্টি করা। Synapse-এর বাধা বেশী হইলে কর্ম্মের ক্ষমতা ও অনুভবের ক্ষমতা কমিয়া যায়। কারণ এই বাধা বেশী হইলে কর্ম্ম-নির্দ্দেশের বা অনুভূতি-বোধের চরম কেন্দ্র মস্তিষ্কের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক কমিয়া যায়; এইজন্যই বড় বড় অস্ত্রোপচারের সময় ঔষধের দ্বারা Synapse-এর বাধা (Synaptical resistance) বাড়াইয়া দিয়া যন্ত্রণানুভূতির ক্ষমতা সাময়িক ভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া যাইলে যেমন দেশের প্রান্তের খবর রাজধানীতে পৌছায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় মস্তিষ্কও খবর পায় না যে, শরীরের এই অংশটীতে কাটা-কাটি হইতেছে, তাই তখন মস্তিষ্ক শরীরকে যন্ত্রণার অনুভূতি দিতে পারে না।

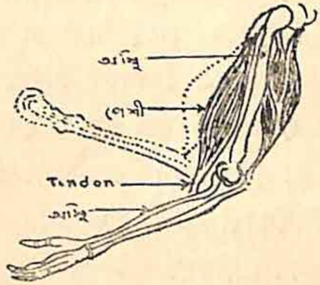
কর্ম্মেন্দ্রিয় (Effectors ; muscles & glands) ঃ

শারীর-মানস যন্ত্রের কথা আলোচনা করিতে হইলে যে তিনটি প্রধান যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একটি হইতেছে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণের যন্ত্র (Receptors), দ্বিতীয়টি হইতেছে এই অনুভূতিজনিত শারীর রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের খবর মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং মস্তিষ্ক হইতে কর্ম্ম নির্দ্দেশের খবর বহিয়া আনিবার যন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র (Connec-

tors) এবং তৃতীয়টি হইতেছে মস্তিষ্ক হইতে আগত নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার যন্ত্র (Effectors)। প্রথম দুই শ্রেণীর যন্ত্রের কথা ইতোপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এইবার আমরা কর্ম্মযন্ত্রগুলির কথা আলোচনা করিব।



(১) পেশী (২) ধমনী
(৩) শিরা (৪) স্নায়ু।



বাহুর Biceps ও Triceps পেশী ও "টেণ্ডন" চিমটা জাতীয় লিভারের দ্বারা অস্থিকে টানে।

আমাদের কর্ম্মযন্ত্রগুলি পেশী ও গ্রন্থি এই দুই ভাগে বিভক্ত। পেশীগুলি আবার ঐচ্ছিক (Biceps, Triceps প্রভৃতি) এবং অনৈচ্ছিক (পেটের অভ্যন্তরের পেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি)—এইভাবে বিভক্ত। গ্রন্থিগুলিকেও সচ্ছিদ্র বহির্মুখী রস-নিঃসারক (Duct gland) এবং নিশ্ছিদ্র অন্তর্মুখী রস-নিঃসারক (ductless glands)—এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

ঐচ্ছিক পেশী ঃ ঐচ্ছিক পেশীকে আমরা ইচ্ছা করিলে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারি। ইহারা সংখ্যায় দুই শতেরও উপর এবং নরকঙ্কালের সমগ্র আবরণই প্রায় এই পেশীর দ্বারা গঠিত। এই পেশীগুলির দুইটি প্রান্ত দুইটি অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। পাম্পের হাতল, জাঁতি, চিমটা প্রভৃতিতে যে তিন জাতীয় লিভার (Lever) আছে, অস্থি-সংলগ্ন পেশীগুলি সেই বিভিন্ন জাতীয় লিভারের কার্য্য করিয়া আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়ার কাজ করে। আমরা যে মাথা নাড়ি তাহা হইতেছে প্রথম শ্রেণীর লিভারের কার্য্য, যখন আমরা পায়ের গোড়ালি তুলিয়া বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াই তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার কাজ করে এবং যখন আমরা biceps পেশীর

সাহায্যে নিম্ন হস্তটি যে উর্দ্ধ হস্তের সহিত মুড়িয়া থাকি তখন হয় তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের কাজ।

শরীরের এই পেশীগুলিকে সঙ্কোচক (Flexors) ও প্রসারক (Extensors)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সঙ্কোচক পেশীর দ্বারা আমরা কোনও জিনিষকে কাছে টানা বা চাপ দেওয়ার কাজ করি আর প্রসারক পেশী দ্বারা আমরা কোনও জিনিষকে দূরে ঠেলিবার চেষ্টা করি। শরীরের সর্ব্বত্রই এই সঙ্কোচক এবং প্রসারক পেশীগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে জোড়ায়-জোড়ায় সাজান আছে। যেমন হাতের সমুখ দিকের Biceps সঙ্কোচক পেশী, আবার পিছন দিকে Triceps প্রসারক-পেশী।

এই পেশীগুলি রক্তভর্ত্তি স্পঞ্জের সূতার গুচ্ছের মত। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্য ভাগ স্থূল এবং দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া দুই দিকের অস্থির সহিত মিলিত হয়। এই প্রান্তদ্বয়ে মাংসের পরিবর্ত্তে শক্ত সাদা ফিতার মত বন্ধনী দেখা যায়। ইহাদিগকে tendon বলে। পেশীতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রেরণ করিবার জন্য এবং উহা হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য শিরা ও ধমনী আছে। মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত নার্ভ পেশীকে কাজ করিবার জন্য প্রেরণা দিয়া থাকে। এই প্রেরণা পাইবামাত্র পেশী-কোষটি সঙ্কুচিত হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। ফলে যে অস্থি দুইটির সহিত পেশীটি সংযুক্ত, তাহারা পরস্পর কাছাকাছি আসে।

মানুষের সুখদুঃখ প্রভৃতির জন্য পেশীর শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পেশীর কার্য্য হইবার সময় শরীরে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা চমক্‌প্রদ। ধমনীযোগে রক্ত খাদ্যের রস এবং শর্করা পেশীতে বহন করিয়া আনে। সেখানে পেশীর কোষগুলিতে সেগুলি glycogen প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সঞ্চিত থাকে। পরে পেশীর কার্য্য যখন চলিতে থাকে, তখন এই খাদ্যরস হইতে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তাহার ফলে চলাফেরা সম্ভব হয় ও উত্তাপ তৈয়ারী হয়। পেশীর সঙ্কোচনের ফলে যে ক্ষয় হয়, তাহাতে co^2, latic acid এবং acid Potessium phospate তৈয়ারী হয়। ইহার পর দূষিত জিনিষগুলি (Waste products) রক্তের সঙ্গে শিরার দ্বারা ফুস্‌ফুসে

প্রেরিত হয় এবং সেখানে প্রশ্বাসের বায়ুর সাহায্যে শোধিত হইয়া আবার হৃৎযন্ত্রের মধ্য দিয়া দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

পেশীর কার্য্য যখন জোরে চলিতে থাকে, তখন শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। এই তাপের সমতা রক্ষার জন্য ঘর্ম্মগ্রন্থি হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং উত্তাপের সমতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

অনৈচ্ছিক পেশী ঃ অনৈচ্ছিক পেশীগুলি পাকস্থলী যন্ত্র, পিত্তকোষ, ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতিতে কাজ করে। আমাদের জ্ঞানের অগোচরে ইহারা আপনার মনে কাজ করিয়া যায় বলিয়া ইহাদের প্রয়োজন আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। কিন্তু এইগুলি দ্বারা আমাদের জীবনধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিষ্পন্ন হয়।

ইচ্ছা করিয়া এই পেশীগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না বটে, তবে আমাদের মানসিক অবস্থার উপর ইহাদের কর্ম্মশক্তির তারতম্য হয়। ক্রোধ, হিংসা, বিষণ্ণতা প্রভৃতি এইসব পেশীগুলির কাজে বাধা দান করে; আবার আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি এগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে।

ব্যায়াম দ্বারা যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে আমরা ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে সুস্থ ও পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি, অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে সেরূপ করিতে পারি না বটে, তবে পরোক্ষভাবে তাহা করা যায়। কারণ অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপরে শরীরের বাহিরের দিকে যে সমস্ত ঐচ্ছিক পেশীর আস্তরণ আছে, সেই ঐচ্ছিক পেশী-গুলির উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে তাহাতে যে অধিকতর রক্ত চলাচল হইতে থাকে, সেই রক্তস্রোত যেমন বাহিরের দিকের পেশীগুলিকে পুষ্ট করে, তেমনই ভিতরের দিকের অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলে।

সচ্ছিদ্র গ্রন্থি (Duct glands) ঃ এই গ্রন্থিগুলি ছিদ্র বা নালীর সাহায্যে বাহিরের দিকে রস নিঃসরণ করে। পিঁয়াজ কুটিবার সময় চোখ দিয়া জল পড়ে, লোভের খাদ্য দেখিলে জিহ্বা হইতে যে লালা নিঃসরণ হয় বা গরম হইলে যে দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তাহা এই সচ্ছিদ্র গ্রন্থির কার্য্য। এই গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ হজম কার্য্যের এবং শরীর হইতে দূষিত পদার্থের নির্গমনের সহায়তা করে।

নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি (Ductless glands) ঃ এই গ্রন্থিগুলি বাহিরের দিকে কোনও রস নিঃসরণ করে না এবং ইহাদের মধ্যে ছিদ্র নাই। ইহারা ভিতরের দিকে যে রসক্ষরণ করে, তাহা সোজাসুজি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়।

মানস-বিজ্ঞানের দিক দিয়া এই গ্রন্থিগুলির কাজ খুব প্রয়োজনীয়।

থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid glands) ঃ ইহা গ্রীবাদেশের সম্মুখে ও নিম্নদেশে স্বরোৎপাদক যন্ত্র (larynx) এবং বায়ুনালীর (Wind pipe) দুই পার্শ্বে অবস্থিত। জন্ম হইতে থাইরয়েড্ গ্রন্থি অকর্ম্মণ্য হইলে মানুষের জীবন-যাত্রার উপর তাহার প্রভাব অল্প হইবে না। গ্রীণ (Green), লিওপোল্ড লেভি (M. M. Leopold Levi), এইচ্. ডি. রথ্ চাইল্ড্ প্রভৃতি গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন, অল্প বয়সে থাইরয়েড্ অসুস্থ হইলে বালকের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, চর্ম্ম শুষ্ক এবং চুল পাতলা হইবে, যৌনচেতনা ও যৌন পরিণতি বিলম্বিত হইবে এবং সে Cretin জাতীয় খর্ব্বাকৃতি কুৎসিৎ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপদার্থ যুবকে পরিণত হইবে।

পরিণত বয়সে থাইরয়েড শুষ্ক হইয়া যাইলে টিটানী (tetany), মৃগী, মূর্চ্ছাদি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের চর্ম্ম পুরু ও শুক্না হইয়া যায়, চর্ব্বি কমিয়া যায়, চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, শরীরের তাপ, উৎসাহ, শক্তি কমিয়া যাইতে থাকে, শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, পরিশ্রান্ত না হইয়াও অবসাদ অনুভূত হয় এবং অকারণে নিদ্রাপ্রবণতা দৃষ্ট হয়।

আবার থাইরয়েডের রস-নিঃসরণ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুততর হয়, মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, চক্ষুতারকা বড় হইয়া উঠে এবং অনিদ্রার লক্ষণ প্রকাশ পায়। থাইরয়েডের ক্রিয়া আরও বেশী হইলে গণ্ডমালা (Goitre) রোগ হয়। শরীর হইতে থাইরয়েড্ তুলিয়া ফেলিলে অকালে বার্দ্ধক্য আসে, আবার অষ্ট্রিয়ার ডাক্তার ভার্ণফ দেখাইয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে অকর্ম্মণ্য থাইরয়েড্ তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে যুবক বানরের থাইরয়েড বসাইলে মানুষের পুনর্যৌবন লাভ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের শরীর-মন তথা ক্রিয়াকলাপের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ইহা বেশী ক্রিয়াশীল হইলেও ক্ষতি হয়, কম হইলেও তাই।

থাইরয়েডের রসক্ষরণের স্বল্পতাজনিত অসুখগুলি দুশ্চিকিৎস্য নহে। থাইরয়েড পদার্থ সেবন করাইয়া এই অসুখের প্রতিকার হইতে পারে। সাধারণতঃ মেষ দেহের থাইরয়েড হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া Cretin জাতীয় বহু জড়বুদ্ধি বালক স্বাভাবিক যুবকে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা একটি প্রয়োজনীয় তথ্য।

থাইরয়েডের রসক্ষরণের প্রাচুর্য্যজনিত Goitre প্রভৃতি খানিকটা দুশ্চিকিৎস্য হইলেও, ইহা potassium iodine-ঘটিত পদার্থযোগে নিবারণ করা যায়।

যোগব্যায়ামের সর্ব্বাঙ্গাসন, হলাসন জাতীয় আসন অভ্যাস করিলে থাইরয়েডের কাজ ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland) : এই গ্রন্থি দুইটি **কিডনির** উপরে ছোট হল্‌দে রংয়ের টুপীর আকারে অবস্থিত আছে। ইহাদের প্রত্যেকটির ওজন চার গ্রাম করিয়া। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে : (১) শরীরের রক্ত-চাপ (blood pressure) ঠিক রাখা এবং (২) যৌন-ভাবটি নিয়মিত রাখা।

যে সব পুরুষের দেহ বেশী রোমশ, ঘৃণা ও ক্রোধ যাহাদের খুব প্রবল, আনন্দ ও যন্ত্রণার সময় হৈ চৈ করিয়া যাহারা মনোভাব প্রকাশ করে, তাহাদের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি খুব ক্রিয়াশীল, আর যে নারীর মধ্যে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, স্বর মোটা হইয়া যাইতেছে, গায়ে লোম ও মুখে গোঁফ-দাড়ী গজাইতেছে তাহাদের মধ্যেও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এমন কি ইহার অস্বাভাবিক রসক্ষরণে নারীর লৈঙ্গিক পরিবর্ত্তনও হইতে পারে।

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অনৈচ্ছিক পেশী আছে, সেগুলি যেমন সমবেদনপ্রবণ স্নায়ুর (sympathetic nervous system) নির্দ্দেশে

পরিচালিত হয়, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণেও তেমনই সেগুলি অনেকখানি পরিচালিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে : (১) অ্যাড্রিনাল রস লিভারের মধ্যে সঞ্চিত glycogenকে মুক্ত করিয়া তাহাকে রক্তের মধ্যে চালাইয়া দেয়, ফলে তাহাতে পেশীর কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ; (২) ইহা পাকস্থলীর পেশীর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সেই কাজের জন্য যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন হইত, সেই রক্ত-টুকুকে ঐচ্ছিক পেশীর কাজে পাঠায়, ফলে অধিকতর রক্তের যোগান পাইয়া ঐচ্ছিক পেশীগুলির কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায় ; (৩) রক্তকণিকাগুলিকে জমাট বাঁধিবার শক্তি দান করে, ফলে যুদ্ধবিগ্রহের সময়, আপদবিপদের সময়, হাত-পা কাটিয়া যাইলে রক্তপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায় ; (৪) হৃদয়ের স্পন্দন ও ফুসফুসের কার্য্য বাড়াইয়া দিয়া শক্তি, পরিশ্রম, ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিবার সাহায্য করে ; (৫) অত্যন্ত পরিশ্রমের সময় শরীরের যে তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহার সমতা রক্ষার জন্য ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি খুলিয়া দেয়।

ফলে দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থিটি দুঃসাহসিক বীরকে তাহার বীরত্বের কাজেও যেমন সাহায্য করে, চরম কাপুরুষকেও তেমনিই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেও সাহায্য করে। অতীতের যুগ হইতে নানা আপদ-বিপদের সহিত লড়াই করিয়া আমরা যে আজ পর্য্যন্ত জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া আছি, তাহাতে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির দান সামান্য নহে।

অধ্যাপক ক্যানন (Prof. Cannon) তাঁহার "Bodily changes in Pain, Fear and Rage" নামক নিবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতির সময় রক্তের মধ্যে Adrinalinএর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। Adrinalinএর একটি প্রধান কার্য্য হইতেছে পাকস্থলীর রক্তস্রোত বন্ধ করিয়া হজমের কার্য্যকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া সেই রক্তস্রোতের দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের শক্তি বাড়াইয়া তোলা। অধ্যাপক ক্যানন আরও দেখাইয়াছেন, একটি খরগোসের শরীরে অন্য একটি শান্ত অবস্থার প্রাণীদেহের রক্ত ইন্‌জেক্‌শান করিলে তাহার পাকস্থলীর কার্য্য স্থগিত হয় নাই, কিন্তু একটি ক্রুদ্ধ বা ভীত প্রাণীর রক্ত ইন্‌জেক্‌শান্ করিলে তাহার পাকস্থলীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

Adrinalinএর শক্তি এত তীব্র যে কুড়ি কোটি ভাগ দ্রবণের মধ্যে এক ভাগ মাত্র Adrinalin থাকিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া কার্য্যকরী হয়। অধ্যাপক ক্যানন একটি জীবন্ত বিড়ালের উপর দিয়াও X-Rayর সাহায্যে অ্যাড্রিনালের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। X-Rayর আলোকে যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইভাবে খাদ্যের সহিত বিশমাথ্ মিশাইয়া তিনি একটি বিড়ালকে খাওয়াইয়াছিলেন। দেখা গেল পাকস্থলীর পেশীগুলি তালে তালে সঙ্কুচিত প্রসারিত হইয়া খাদ্য হজম করিতেছে। হঠাৎ বিড়ালটির সমুখে একটি কুকুর আনিয়া তাহাকে ভীত বা ক্রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে Adrinalinএর রসক্ষরণের জন্য পাকস্থলীর পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কুকুরটিকে তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। তবুও সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর পেশীর কার্য্য আরম্ভ হইল না, প্রায় আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পরে আবার স্বাভাবিকভাবে পেশীর কার্য্য আরম্ভ হইল। ভয় বা ক্রোধ যে আমাদের হজমের ব্যাঘাত করে, আর আনন্দ, সুমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি যে আমাদের হজম কার্য্যে সহায়তা করে, ইহা আমরা বহুদিন হইতেই জানিতাম। এই Adrinalinএর পরীক্ষাগুলি আমাদের সেই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যৌগিক ব্যায়ামের ভুজঙ্গাসন জাতীয় আসন প্রভৃতির দ্বারা এই গ্রন্থিটি সমৃদ্ধ হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Glands) : মাথার খুলির নিম্নদেশে একটি ফাঁপা নলের মত জিনিষের উপর মটর শুঁটির মত ইহারা অবস্থিত আছে। ইহাদের anterior ও posterior—দুইটি অংশ আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের কার্য্যও পৃথক। Anterior অংশটির কার্য্য নিয়মিত না হইলে আমাদের দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়, পদক্ষেপেও গতিভঙ্গ শিথিল হয়, দেহ শীর্ণ হয় এবং পেটের পীড়া হয়। আবার ইহাদের কাজ বেশী হইলে যৌনগ্রন্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেহ দৈত্যের মত অতিকায়বিশিষ্ট হইয়া উঠে।

পিটুইটারি গ্রন্থির posterior অংশটির সহিত পাকস্থলীর পেশী, কিডনী প্রভৃতির সম্পর্ক আছে; ইহার রসক্ষরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে মানসিক শক্তি,

চিন্তাশীলতা এবং যৌনশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, দেহে শর্করার ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরীর স্থূল ও অপটু হয়। এই গ্রন্থির রস শরীরের মধ্যে ইন্‌জেক্‌শান করিলে শিরা, ধমনী, অন্নবহা নলী, মূত্রাশয় এবং জরায়ুর কার্য্য বৃদ্ধি পায়। পিটুইটারি রস জরায়ুর উপর এতটা ক্রিয়াশীল যে, অনেক সময় তাড়াতাড়ি প্রসব করান প্রভৃতির জন্য পিটুইটারি ঘটিত ঔষধ ইন্‌জেক্‌শান করা হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid glands) : ইহারা থাইরয়েড গ্রন্থির নিকটেই অবস্থিত। এই গ্রন্থি সংখ্যায় চারিটি এবং ওজনে সর্ব্বশুদ্ধ দু' গ্রেণ। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে, শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়ামের (Calcium) মাত্রা ঠিক রাখা। শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম হইলে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, হাত পা কাঁপিতে থাকে, রক্ত জমিয়া যাইবার শক্তি হ্রাস পায়। ইহার যথাযথ রসক্ষরণে পরিশ্রমজনিত ও কর্ম্মবহা স্নায়ুর ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়, দন্ত ও অস্থির পুষ্টির দিক দিয়াও ইহা সাহায্য করে।

থাইমাস্ গ্রন্থি (Thymus gland) : হৃৎপিণ্ডের উপর দিকের ঘাড়ের গোড়ার কাছাকাছি ইহা অবস্থিত। শরীরের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র এই গ্রন্থি শুকাইয়া যায়। ইহার প্রধান কাজ হইতেছে শিশুকে যুবক করিয়া তোলা। এই গ্রন্থির যথাযথ রসক্ষরণ না হইলে বালকবালিকাদের মধ্যে অকালে যৌনক্ষুধার উন্মেষ হয়, নতুবা তাহা অস্বাভাবিক ভাবে বিলম্বিত হইতে থাকে। এই দুইটি জিনিষই শরীর মন তথা সমাজের দিক দিয়া ক্ষতিকর এবং ইহা অনেক অস্বাভাবিক যৌন অপরাধেরও কারণ হইতে পারে।

গ্রন্থিতত্ত্ব একটি অর্ব্বাচীন বিজ্ঞান। ইহার সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্যের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে মনুষ্যের আচরণের উপর এই গ্রন্থিগুলির যে বিশেষ একটা প্রভাব আছে, তাহা এখন স্বীকৃত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, এমন অনেক দুর্ব্বোধ্য জড়বুদ্ধি শিশু এমন কি অনেক অপরাধী পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য ততটা দায়ী নহে, যতটা দায়ী হইতেছে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে স্থিত এই ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি।

মনের শক্তি

আমরা যে কত প্রকার কার্য্য করিতে পারি তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। আমরা দেখি, শুনি, শিখি, স্মরণ করি, ভাবি, কল্পনা করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পছন্দ করি, অপছন্দ করি, অনুভব করি, অভিভূত হই, ইচ্ছা করি, কামনা করি, অভিনিবেশ করি, অনুরাগ করি, বিরক্ত হই, ভীত হই, ক্রুদ্ধ হই, উৎফুল্ল হই, অনুতপ্ত হই, সমবেদনা প্রকাশ করি, প্রিয়চিকীর্ষা করি, অনুকরণ করি—ইত্যাদি শত শত কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। মনোবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকগণ আমরা কি কি করি, কেন করি, কি ভাবে করি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কি কি করি, ইহার উত্তর খুব কঠিন নহে; কিন্তু কিভাবে করি এবং কেন করি তাহার উত্তরটি খুব সহজ নহে।

প্রথমতঃ কি কি কাজ করি তাহার একটা শ্রেণীবদ্ধ তালিকা তৈয়ারী হইল। Aristotle কতকগুলি ক্রিয়াত্মক বিশেষ্য শব্দের (verbal noun) দ্বারা আমরা কি কি করি তাহার একটা তালিকা তৈয়ারী করেন।

পরবর্ত্তী যুগে Aristotleএর গ্রীক ভাষায় লেখা রচনাগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তখন গ্রীক ক্রিয়াত্মক বিশেষ্যপদগুলিকে ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার সময় ল্যাটিনের বাগ্বিধির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য faculty (শক্তি) কথাটির আমদানী করিতে হইল। ফলে গ্রীক ভাষায় "স্মরণ" (remembering) শব্দটির অনুবাদকল্পে ল্যাটিন্ ভাষায় হয়তো, "স্মরণের শক্তি" (faculty of remembering) এই জাতীয় শব্দ তৈয়ারী করিতে হইল। কি কি কাজ করি এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় "স্মরণ শক্তির কাজ" করি বা "মনন শক্তির কাজ" করি তাহা হইলে খুব ভুল বলা হয় না; তবে কেন করি বা কি ভাবে করি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যদি শক্তিবাদের ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে ঠিক উত্তরটি দেওয়া হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করি "আমরা কি ভাবে স্মরণ করি?" না, স্মরণের শক্তি দিয়া স্মরণ

করি, ; "কি ভাবে কল্পনা করি ?" না, কল্পনার শক্তি দিয়া কল্পনা করি ; তাহা হইলে নূতন কথাও কিছুই বলা হয় না, প্রকৃত ব্যাখ্যাও কিছুই দেওয়া হয় না।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক কাজের পিছনেই যে একটা অনন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ পৃথক পৃথক শক্তির প্রভাব আছে, একথাও সত্য নহে। এই জন্যই অনুষঙ্গ-বাদীগণ (associationist) বলেন যে, মানুষের মনের একটি মাত্র গুণের প্রভাবেই মানুষের অসংখ্য ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়। সেই গুণটি হইতেছে **অনুষঙ্গ** (association)।

'আমরা কি কি করি'—তাহার তালিকা দিয়া যে সমস্ত মনোবিদ্‌গণ মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন তথাকথিত "faculty psychology"র ; এবং কিভাবে কাজ করি ও কেন করি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাঁহারা মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন "functional psychology"র।

Functional Psychologyর কথা এখন থাক। উপস্থিত facultyর কথাই আমাদের আলোচ্য। এই শক্তিবাদের বিশ্বাস হইতেছে, মন জিনিষটা স্মরণ চিন্তন মনন আগ্রহ অভিনিবেশ প্রভৃতি শক্তির পুঁটুলি মাত্র। কিন্তু একথা সত্য নহে। গণিত শাস্ত্রে দুই আর দুইএর যোগফল অনিবার্য্যভাবেই চার হয়, কিন্তু মনস্তত্ত্বে তাহা হয় না। মনস্তত্ত্বে মনের সমষ্টির উপাদানীভূত শক্তির সমষ্টির চেয়ে সমগ্র মনের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্মরণ মনন চিন্তন প্রভৃতি শক্তি মনের আছে বটে, কিন্তু আসল মন জিনিষটা এই শক্তিগুলির নিছক সমষ্টির চেয়ে অনেক বড়। যে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া এই শক্তিগুলি কার্য্য করিতেছে, অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া বর্ত্তমানের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিতেছে এবং প্রয়োজন বোধে স্মৃতি অভিনিবেশ প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে, সেই "আমি"টির পরিচয় এই অনন্য-নিরপেক্ষ শক্তি-সমষ্টির মধ্যে নাই। এই জন্যই বর্ত্তমানে faculty psychology পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, নিছক শক্তির (faculty) সমষ্টি দিয়াও যেমন পূর্ণ মনটির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই এই শক্তিগুলির আলোচনাকে

বাদ দিয়াও মনের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হয় এ কথা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য। কাজেই কর্ত্তার প্রসঙ্গ দিয়াই যে কর্ম্মের ব্যাখ্যা হইবে এ কথাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মের আলোচনাকে বাদ দিয়া কর্ত্তার পরিচয়ই বা পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? ফলের দ্বারাই যেমন বৃক্ষের পরিচয় হয়, তেমনই কর্ম্মের দ্বারাই পরিচয় হয় কর্ত্তার। কাজেই কর্ত্তার আচরণের পরিচয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, সেই মনস্তত্ত্বে বিভিন্ন কর্ম্ম বা কর্ম্মের শক্তিগুলির (faculties) আলোচনা অনিবার্য্যভাবেই আসিয়া পড়ে। এই জন্যই faculty psychology বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, মনের বিভিন্ন faculty গুলির আলোচনা মনোবিদ্যার একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতেই হইবে। এইজন্যই স্পিয়ারম্যান (Spearman) বলিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের মধ্যে শক্তিবাদ (faculty) বিতর্কের প্রত্যেক খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইলেও সেই পরিণামে যুদ্ধ জয়ী হয় (The faculties have a way of losing every battle but always winning the war)। কথাটার বক্তব্য হইতেছে এই যে, মনের অর্থ বুঝিতে হইলে ব্যষ্টিগতভাবে মনোযোগ, স্মৃতি প্রভৃতির অর্থ না থাকিলেও, মনের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন্ কেন্দ্রীয় শক্তি এই সমস্ত শক্তিগুলিকে পরিচালিত করে, কাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য এই শক্তিগুলি নিয়োজিত হয়, তাহার পরিচয় প্রাচীন faculty psychologyর মধ্যে মিলে না বলিয়াই মনের একত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন, চৈতন্যই হইতেছে আমাদের বিভিন্ন লীলার মূল কারণ; ম্যাক্‌ডুগাল বলিয়াছেন, সহজাত প্রবৃত্তি (instincts)গুলি হইতেই আমাদের মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

যাহাই হউক, মনের পরিচয় পাইবার জন্য মনের একত্ব ও একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিতে হইলেও, একটি একটি করিয়া তাহার বিভিন্ন শক্তিগুলির আলোচনার ব্যবহারিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আমরা এই অধ্যায়ে প্রাচীন faculty psychologyতে আলোচিত শক্তিগুলির আলোচনা না করিয়া মনের অন্য কতকগুলি ব্যাপকতর শক্তির আলোচনা করিব।

(১) সংরক্ষণ প্রয়াস (Mneme) :

মনের শক্তির আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আলোচনা করিতে হয়, মনের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা। অধ্যাপক Nunn এই শক্তিটির নাম দিয়াছেন Mneme বা 'সংরক্ষণ-প্রয়াস'। এই শক্তির দ্বারা অতীতের অনুভূতির অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু অনুভব করি, তাহার একটা ছাপ মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। এমন কি আমাদের জন্মের সময়ও আমরা মনের যে বিশেষত্বগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহার মধ্যেও অতীতের পিতৃপুরুষের অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু থাকিয়া যায়। যাহাকে আমরা স্মৃতি বলি, তাহা হইতেছে মনের এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের একটা আংশিক এবং সচেতন অভিব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু মনের মধ্যে আমাদের যত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার অতি অল্প অংশই স্মৃতির সাহায্যে মনের চেতন-রাজ্যে ভাসিয়া উঠে। পথ চলিতে চলিতে যখন একটি লোককে দেখিয়া চিনি-চিনি বলিয়া মনে হয়, তখন বুঝিতে হইবে এই "সংক্ষরণ প্রয়াসের" জন্যই তাহা হইতেছে। রস্ (Ross) বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। ধরা যাইতে পারে, আজ আমি কয়েকটি ছত্র অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করিলাম। কিছুদিন পরে সেগুলি হয়ত ভুলিয়া গেলাম। তখন শব্দগুলিকে আবার মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবারে দেখিলাম, মুখস্থ করার কাজটি প্রথমবারের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র করা গেল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সচেতন স্মৃতির রাজ্য হইতে সরিয়া গেলেও, এই শব্দগুলির অভিজ্ঞতার ছাপ মনের কোনও না কোনও স্থানে সংরক্ষিত ছিল।

স্মৃতি বলিতে মনের যে সচেতন অবস্থার কথা আমরা বুঝি, তাহা হয়ত ইতরপ্রাণীদের মধ্যে নাই, কিন্তু অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ তাহাদের মধ্যেও আছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, একটি পোকাকে "Y" আকারের নলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই নলটির একটি বাহুতে বৈদ্যুতিক ধাক্কা লাগাইবার ব্যবস্থা করা আছে। দেখা যাইবে যে, পোকাটী কয়েকবার ভুল

ভ্রান্তির পর যে পথটি নিরাপদ সেই পথটিই বাছিয়া লইয়া সেই পথটি দিয়াই বারবার চলিতে চেষ্টা করে। অতীতের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত হইয়া এইভাবে তাহার বর্ত্তমানের কর্ম্ম-প্রেরণাকে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে।

জীবজন্তুদের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সহজাত সংস্কার বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করি তাহাদের অনেকগুলিই হইতেছে এই সংরক্ষণ প্রয়াসের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত রূপ। শুইবার পূর্ব্বে কুকুর যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চারিদিক দেখিয়া লয়, পাখীরা যে নিজেদের জাতিগত বিশেষ ভঙ্গীতে বাসা তৈয়ারী করে এবং প্রতি বৎসর একটি বিশিষ্ট স্থান হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রে পাড়ি দেয়—সমস্তই হইতেছে এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের গোষ্ঠীগত অভিব্যক্তি।

(২) সংরক্ষণ ছাপ (Engram) :

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই সংরক্ষণ প্রয়াসের দ্বারা মনের মধ্যে যাহা থাকিয়া যায়, তাহার প্রকার কি? পণ্ডিতেরা বলেন, যাহা সংরক্ষিত হইয়া মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, তাহা হইতেছে অভিজ্ঞতার ছাপটুকু মাত্র।

কি ভাবে তাহা সম্ভব হয়? আমরা জানি অভিজ্ঞতা থাকে এবং চলিয়া যায়, হয়ত সারা জীবনেই আর তাহার প্রত্যাগমন হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি এইখানেই শেষ হয় না। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা ছাপ রাখিয়া যায়। এই ছাপগুলি cold storage-এ সংরক্ষিত বস্তুভারের মত অচেতন সামগ্রী মাত্র নহে। তাহারা ক্রিয়াশীল। সেইজন্য অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি আমাদের বর্ত্তমানের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। দেহবাদী মনোবিদ্গণ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থকে (brain staff) পরিবর্ত্তিত করে বলিয়াই এই ব্যাপারটা ঘটে। আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিক কাঠামো (mental structure) বা স্ব-ভাব (disposition)কে পরিবর্ত্তিত করে বলিয়া এইরূপ ঘটে। সে কথা যাক্। উপস্থিত দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞতার খানিকটা ছাপ আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতার যে ছাপটি আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়া থাকে সার পার্শি নান্ তাহার নাম দিয়াছেন engram বা সংরক্ষণ ছাপ।

(৩) জীবন প্রয়াস :

মনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে তাহার কর্ম্মক্ষমতা। একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভাবে কাজ করা, বিশেষ একটি অবস্থার মধ্যে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করা এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের কর্ম্ম-প্রেরণাকে নিযুক্ত করা হইতেছে মনের বিশেষত্ব। মনের এই বিশেষত্বটিকে লেমার্ক, বাট্‌লার, বের্গস°, বার্ণাড শ, ফ্রয়েড্ প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পরিভাষায় অভিহিত করিয়াছেন। কেহ ইহার নাম দিয়াছেন বাঁচিবার ইচ্ছা (will to live), কেহ ইহাকে বলিয়াছেন প্রাণশক্তি (Elan vital), কেহ বলিয়াছেন প্রাণ-প্রেরণা (life urge), কেহ বলিয়াছেন কাম-শক্তি (libido) ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে মনে হয় নান্ সাহেবের Horme বা "জীবন-প্রয়াস" নামটি খুব সার্থক হইয়াছে। মনুষ্য বা গবাদি প্রাণীর আত্মসচেতন ক্রিয়াকলাপই হউক, অথবা কীট-পতঙ্গ বা ইতরপ্রাণীদের নির্জ্ঞান বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত খাদ্যান্বেষণ বা আত্মরক্ষাজনিত অঙ্গসঞ্চালনাদিই হউক—সমস্ত ক্রিয়াকলাপই জীবন-প্রয়াসের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

(৪) কর্ম্মপ্রয়াস (Conation) :

যাহাকে আমরা কর্ম্মপ্রয়াস (Conation) বলি, সেইগুলি অর্থাৎ চেষ্টা করা, সঙ্কল্প করা, ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত করা ইত্যাদি সমস্তই হইতেছে এই "জীবন-প্রয়াসের" সচেতন অভিব্যক্তি। স্মৃতির সহিত সংরক্ষণ প্রয়াসের যে সম্পর্ক, কর্ম্মপ্রয়াসের সহিত জীবন-প্রয়াসের সেইরূপ সম্পর্ক। প্রথমগুলির কার্য্য শুধু আত্মসচেতন ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ আর দ্বিতীয়গুলির কার্য্য আরও একটু ব্যাপক। কাঁচপোকা যে তাহার সন্তানাদির জন্য তাজা খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য গুটিপোকাকে প্রাণে না মারিয়া শুধু হুল ফুটাইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া নিজের বাসায় টানিয়া লইয়া যায়, তাহাতে আমরা এই জীবন-প্রয়াসের একটা সচেতন অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চ প্রাণীদের মধ্যেও এই জীবন-প্রয়াসের সচেতন অথবা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাজ আমরা প্রায়ই দেখিতে

পাই। উজ্জ্বল আলোক দেখিলে চোখের পাতা বন্ধ করা, কোনও কিছু আঘাতের ভয়ে মাথা নীচু করা হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের বিরুদ্ধে জীবনী-শক্তির সংগ্রাম, রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য প্রভৃতি সমস্তই হইতেছে সজ্ঞান কর্ম্মপ্রয়াসের (conation) নিম্নস্তরে প্রবাহিত নির্জ্ঞান জীবন-প্রয়াসের (Horme) কার্য্য।

(৫) সংযোগ প্রয়াস Co-hesion) :

এই সংরক্ষণ প্রয়াস ও জীবন-প্রয়াস ব্যতীত মনের আর একটি সম্পদ আছে। ডাঃ ড্রেভার (Dr. Drever) ইহার নাম দিয়াছেন "সংযোগ-প্রয়াস" (Co-hesion)। এক জাতীয় অভিজ্ঞতার ছাপগুলি মনের মধ্যে অনন্য-নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করে না। তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন নূতন একক বা জোট সৃষ্টি করে। তাহার কারণ হইতেছে, সংরক্ষণ ছাপগুলি অতীত অভিজ্ঞতার মৃত খোলস মাত্র নহে—তাহারা অনেকটা জীবন্ত জিনিষ এবং জীবন্ত জিনিষের মত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দল পাকাইবার মত ক্ষমতা তাহাদের আছে। ড্রেভার এই ক্ষমতাটির নাম দিয়াছেন অন্তর্মানসিক প্রক্রিয়া (endopsychic Process)।

অনুষঙ্গবাদী পণ্ডিতেরাও এক হিসাবে এই সংযোগ প্রয়াসকে স্বীকার করিয়াছেন। ভাবগুলি (idea) যে আপনা-আপনিই একটির সহিত আর একটি জুড়িয়া যায়, এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়া তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় সত্যকেই স্বীকার করিয়াছেন।

তবে তাঁহাদের ভুল হইয়াছিল এই যে, তাঁহারা ভাবগুলিকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে মনে করিয়াছিলেন—এবং মনের একত্বের কথা স্বীকার করেন নাই। চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তাঁহারা ভাব (idea), প্রতিরূপ (images), সংবেদন (sensation) প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, শুধু অনুষঙ্গের প্রভাবেই খানিকটা যান্ত্রিক ভাবেই এই সমস্ত ভাবগুলির একটি আর একটির সহিত আপনা আপনি জুড়িয়া যায়—এবং তাহার ফলেই আমাদের আচরণে বিচিত্র লীলার সৃষ্টি হয়।

(৬) ছাপ জট (Engrams Complex) :

প্রাচীন অনুষঙ্গবাদ বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, অনুষঙ্গবাদীগণ অনুষঙ্গবাদের দ্বারা মনের একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মনের একটি অভিজ্ঞতা যে আর একটি অভিজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া যে নূতন এককের সৃষ্টি করে ইহা খুবই সত্য কথা। হার্বার্ট (Herbart) এই শক্তিটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার "apperception masses" মতবাদ এই শক্তিটিরই সমর্থন মাত্র। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮৮০) ব্রাউন (Thomas Brown) তাঁহার "mental chemistry" মতবাদের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী যুগে হুবূন্ (Wundt) (১৮৯৪) তাঁহার "creative synthesis" মতবাদের দ্বারা এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, একটি ভাব অন্য একটি ভাবের সহিত মিলিত হইয়া এমন একটি এককের সৃষ্টি করে যাহা দুইটি ভাবের নিছক সমষ্টি মাত্র নহে, তাহা সম্পূর্ণ একটি নূতন জিনিষ। আরও পরবর্ত্তী কালে গেস্টাল্ট (Gestalt) মনোবিদ্‌গণ (১৯২২-২৭) এই মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই প্যাটার্ণ, গঠন, সুর প্রভৃতি সম্বন্ধে চমক্‌প্রদ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহারা দেখাইয়াছেন, একটি জিনিষের অঙ্গীভূত উপাদানগুলির সংস্থান ও গ্রন্থন পার্থক্য সমগ্র জিনিষটির রূপটিকে বদ্‌লাইয়া দিয়া তাহাকে একটি নূতন জিনিষে পরিণত করে। সা রে গা মা প্রভৃতি বিভিন্ন সুরের উপাদান লইয়াই রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সুরগুলির সংস্থানের পার্থক্যের জন্যই একটি রাগিণীকে অন্য একটি রাগিণী হইতে সম্পূর্ণ একটা পৃথক জিনিষ বলিয়া মনে হয়।

যাক্ এই "Gestalt quality" উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নহে। তবে এটুকুই আমরা বলিতে চাই যে, একটি অনুভূতির ছাপ অন্য একটি অনুভূতির ছাপের সহিত মিলিত হইয়া যে নূতন একটি এককের সৃষ্টি করিতে পারে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকগণ প্রায় একমত। যে শক্তির প্রভাবে এই ব্যাপারটা ঘটে তাহার নাম association-ই হউক co-hesionই হউক, mental chemistryই হউক অথবা creative synthesis-ই হউক, তাহা লইয়া আমরা বিতর্ক তুলিব না। তবে বিভিন্ন অনুভূতির ছাপ লইয়া নূতন যে একটা

এককের সৃষ্টি হয় সেই বৃহত্তর এককের জন্য একটা সংজ্ঞার প্রয়োজন আমাদের আছে। আমরা এই নূতন জিনিষগুলির নাম দিব ছাপ জট্ (engrams complex) বা জট্ (complex) ; অবশ্য এ কথা এইখানে স্মরণীয় যে, জট্ বা complex বলিতে ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন, সে অর্থে আমরা জট্ কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। ফ্রয়েডীয় জট্ হইতেছে "গূঢ়ৈষা" বা মনের নির্জ্ঞানের রাজ্যে অবদমিত গোপন কামনা। উপস্থিত আমরা যে "জটের" কথা বলিতেছি ইহা হইতেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাপগুলি সংহত হইয়া নূতন নূতন একক সৃষ্টির ব্যাপার। বর্ত্তমানে বহু মনস্তাত্ত্বিকের মতেই ইহা হইতেছে মনের একটা প্রয়োজনীয় শক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, একটি ছাপ আর একটি ছাপের সহিত জড়াইয়া গিয়া যে নূতন নূতন "জট্"এর সৃষ্টি করে তাহার নিয়ম কি? কোন জাতীয় অভিজ্ঞতার ছাপ পরস্পর মিলিত হয় এবং কি নিয়মেই বা তাহা সংঘটিত হয়?

অনুষঙ্গবাদীরা বলিবেন, এই মিলিত হইবার কারণটি হইতেছে সময়ের দিক দিয়া সন্নিকটতা। যে দুইটি অভিজ্ঞতা কাছাকাছি সংঘটিত হয় তাহাদের ছাপটি জড়াইয়া যায়। যখন একটি ঘটনা ঘটে তখন যদি আর একটি ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিও আমাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া যায়। সুতরাং সময়ের দিক দিয়া অভিজ্ঞতার নৈকট্যই মনের সংযোগ-প্রয়াসকে সাহায্য করে।

অধ্যাপক স্টাউট্ (Stout) কিন্তু এই নিছক নৈকট্যবাদকে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, সংযোগ-প্রয়াসের মূল কথা হইতেছে অনুভূতির নৈকট্য নহে, তাহা হইতেছে "আগ্রহের নৈকট্য" অথবা "আগ্রহের রেশ" (not contiguity but continuity of interest)। যে ঘটনাগুলি, জাতকের জীবনের প্রয়োজনেই হউক অথবা আনন্দ প্রভৃতির জন্যই হউক, তাহার মনের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে, সেই ঘটনাগুলিই পরস্পর গাঁথিয়া যায়,—নিছক নৈকট্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়।

রস্ (Ross) একটি চমৎকার উদাহরণের দ্বারা এই ব্যাপারটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাড়ীর ঠিকা ঝি ঝাঁটা লইয়া ঘরদোর পরিষ্কার

করিতেছে, বাড়ীর পুষি বিড়ালটি তাহার সহিত একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। ঝাঁটাটিকে হয়ত সে খেলার বস্তু মনে করিয়া গোঁফ ফুলাইয়া লেজ তুলিয়া তাহাকে থাবা মারিতে গেল। ঝি বিড়ালের মনস্তত্ত্ব অত শত বুঝিল না এবং তাহার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য বিড়ালটির পিঠে বেশ দুই এক ঘা ঝাঁটা বসাইয়া দিল। এই ঘটনাটির পর হইতেই 'ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা' গৃহভৃত্যটি পুষির নিকটে একটি দৈত্য-দানবীর মত ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল এবং ইহার পর হইতে যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে পুষি তখনই লুকাইয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, যে ঝি-টি তাহাকে প্রহার করিয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর, ঝাঁটার শব্দ, প্রহারের যন্ত্রণা, ভয়-ক্রোধ—এই সবগুলি একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়া বিড়ালটির মনে একটি ছাপজটের সৃষ্টি করিবে।

একটি অভিজ্ঞতা যে আর একটি অভিজ্ঞতার সহিত জট্ পাকাইয়া একটি সংহত এককের সৃষ্টি করে, তাহার প্রমাণ আমরা আর একটি ঘটনা হইতে পাইয়া থাকি। অনেকেই জানেন, একটানা কাজ করার চেয়ে উপযুক্ত বিশ্রামের অবসর দিয়া কাজ করিয়া অধিকতর দক্ষতা অর্জ্জন করা যায়। এই জাতীয় ব্যাপারের জন্যই ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "আমরা গ্রীষ্মকালে স্কেট্ খেলিতে এবং শীতকালে সাঁতার কাটিতে শিখি।" কিন্তু এটা কি প্রকারে সম্ভব হয়? গ্রীষ্মকালে ত স্কেট্ খেলিবার মত বরফ থাকে না এবং শীতকালে বরফ-ঢাকা নদীতে সাঁতার কাটাও সম্ভব নয়। তাহা হইলে এই প্রবাদের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, কাজের ব্যস্ততার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাপগুলি ঠিক জট্ বাঁধিতে পারে না, কিন্তু অবসরের সময় একটি অভিজ্ঞতা অন্য একটি অভিজ্ঞতার সহিত জুড়িয়া গিয়া শিক্ষা ও দক্ষতাকে পূর্ণতর করিয়া তুলে। এইজন্যই আমরা ঘুমের পর অনেক সময় আমাদের জটিল সমস্যা প্রভৃতির সমাধান খুঁজিয়া পাই। নিদ্রান্তে শরীর মন তাজা হইয়া উঠে বলিয়াই যে এটা সম্ভব হয় তাহা নহে। ইহার প্রকৃত কারণ হইতেছে এই যে, নিদ্রিত অবস্থার নিরিবিলি সময়টিতে আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের কার্য্য চলিতে থাকে এবং আমাদের মন আমাদের

অভিজ্ঞতার ছাপগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া একটির সহিত একটিকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া এমনভাবে জড়াইয়া রাখে যে, পরে কাজটি করিবার সময় আমরা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহা করিতে সমর্থ হই।

মন যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই এইভাবে কাজ করিয়া যায়, তাহার পরিচয় আমরা আরও অন্যভাবে পাই। ধরুন, আমি একটি নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তখন সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম এবং অন্য কাজে মন দিলাম। এমন সময় দেখিলাম নামটি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? আমি যখন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম তখন আমার মনের বিভিন্ন ছাপজটের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং মনে করিবার চেষ্টাটি যখন সাময়িক ভাবে বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াছিলাম তখনও সেই ছাপজটের তরঙ্গগুলি এটা ওটাকে আঘাত করিতে-করিতে প্রয়োজনীয় সত্যটিকে সন্ধান করিয়া তাহাকে যেই চৈতন্য রাজ্যের সীমানার মধ্যে আনিয়া হাজির করিয়া ফেলিল, অমনি নামটি আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

পড়াশুনার ব্যাপারে মনঃশক্তির অপচয় নিবারণের দিক দিয়া এই তত্ত্বটি খুব প্রয়োজনীয়। ভাল ছাত্রদের এই সত্যটি মনে রাখা উচিত। হয়ত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে—আমি কি করিব? হঠাৎ কালি কলম লইয়া রচনায় ঝাঁপাইয়া পড়িব? না, তাহাতে কাজ ভাল হইবে না। আমাকে প্রবন্ধের বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে হইবে, ইতোমধ্যে মনের ছাপজট্গুলি ভালভাবে সংহত হইতে থাকিবে এবং প্রবন্ধের তথ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত হইতে থাকিবে; শুষ্ক তালিকা সুন্দর মালিকাতে পরিণত হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহা হঠাৎ হইতে পারে না। প্রবন্ধটির জন্য পড়াশুনা করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, মনকে নিজের অজ্ঞাতে কাজ করিবার জন্য বিশ্রাম ও অবসর দিতে হইবে। তাহার পর একটি নিদ্রার পর হয়ত দেখিব প্রবন্ধের চিন্তাগুলি অদ্ভুতভাবে সংহত হইয়াছে; যুক্তিতে, সামঞ্জস্যে, সৌন্দর্য্যে তাহা বিস্ময়করভাবে লেখনী দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

যাহারা ভাল বক্তৃতা করেন, তাঁহারাও এই সত্যটিকে কাজে লাগাইতে থাকেন। বক্তৃতার সব কথা হয়ত নোট করিতে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহা লইয়া যদি মাঝে মাঝে চিন্তা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং চিন্তার পর মনকে বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে বক্তৃতাটী ভাল হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে।

(৭) অন্তঃপূর্ত্তি (Consolidation) :

বিশ্রাম এইভাবে অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি লইয়া একটা "অন্তঃপূর্ত্তি"র (consolidation) ব্যবস্থা করে, তাহা জীবনের নানা ক্ষেত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম যখন আমরা কোনও ক্রীড়া-কৌশলের কাজ করি, তখন প্রায়ই ভুলভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকি, কিন্তু এই ভুল প্রচেষ্টাগুলি ক্রমশঃই অভ্যাসের মধ্য দিয়া কমিয়া যাইতে থাকে। কার্য্যে দক্ষতালাভের আগ্রহের জন্যই ক্রমশঃ ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার ছাপগুলি অন্তঃপূর্ত্তির প্রভাবে সুবিন্যস্ত হইয়া দক্ষতাটি অর্জ্জিত হইতে থাকে। এই জন্যই কোনও কার্য্যে একবার কৃতকার্য্য হইলে সেই কৃতকার্য্যতা ভাবী কাজের কৃতকার্য্যতাকে সাহায্য করে।

আমাদের সজ্ঞান মনের অজ্ঞাতসারেই অন্তঃপূর্ত্তির সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি একত্র হইয়া গ্রথিত হইতে থাকে—এই তত্ত্বটী শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া নানাভাবে প্রয়োজনীয়। এই তত্ত্বটী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সিদ্ধির জন্য কাজের প্রয়োজন যতটা আছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের প্রয়োজনও ঠিক ততটাই আছে। এই তত্ত্বটী আরও এক দিক দিয়া প্রয়োজনীয়। আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন আমরা দেখি, আমাদের উন্নতি যেন খানিকটা থমকাইয়া বা থামিয়া গিয়াছে, তখন আমাদের হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কারণ নাই। যেহেতু আপাতঃ দৃষ্টিতে যখন উন্নতি বন্ধ হইয়া আসে তখন মনের অগোচরে হয়ত ধীরে ধীরে অন্তঃপূর্ত্তির কার্য্য চলিতেছে, শেষে হয়ত একদিন দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমরা দেখিব, আমাদের চিরায়িত তপস্যা বিপুল সিদ্ধিতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

(Instinct and Emotion)

যে দুইটি বিশেষ মূলধনকে লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহা হইতেছে সংরক্ষণ-প্রয়াস (Mneme) এবং জীবন-প্রয়াস (Horme)। প্রথমটির দ্বারা সে অতীতের অভিজ্ঞতার বর্ত্তমানের জন্য এবং বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহার কর্ম্ম-প্রয়াসকে (Conation) জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক জীবনের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সংরক্ষণ-প্রয়াস প্রভৃতির কার্য্য জীবনের চল্‌তি পথে চলিতে চলিতে জাতক যে সমস্ত টুকরা অভিজ্ঞতাকে অর্জ্জন করে, তাহাকে সম্বল করিয়াই যে সে তাহার কাজ আরম্ভ করে, তাহা নহে। জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই যখন অর্জ্জিত হয় নাই, তখনও যেন কতকগুলি বিশিষ্টতার অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার ফলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও পরিবেশ তাহার কর্ম্ম-প্রয়াসকে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালিত করে। যে শিশু-সর্প কখনও নেউলের আক্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে নাই, সেও হয়ত নেউল দেখিয়া ভয় পাইবে এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে, মোরগ-শিশু হয়ত শস্যের কণা দেখিলেই লুব্ধ হইবে এবং তাহা খুঁটিয়া খাইতে চেষ্টা করিবে এবং যে গৃহপালিত শারিকাটি কখনও পাখীর বাসা দেখে নাই, সেও হয়ত সন্তান-সম্ভাবনার সময় খড়-কুটা লইয়া তাহাদের গোষ্ঠীগত প্রথামত বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বাসা বাঁধিতে চেষ্টা করিবে। যে গুণের জন্য এই সমস্ত অনুভূতি এবং প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ এবং অশিক্ষিত-পটু-আচরণগুলি আমাদের মধ্যে আসে, তাহাকে মনস্তাত্ত্বিকগণ সহজাত প্রবৃত্তি বা বৃত্তি (instinct) নাম দিয়াছেন।

এগুলির বিশেষত্ব হইতেছেঃ (১) বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই আচরণগুলি বিশেষ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়; (২) এগুলি এক একটি

গোষ্ঠীর (species) প্রত্যেকের পক্ষেই সমানভাবে কার্য্যকরী হয় ; (৩) এগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখিতে হয় না।

এই জন্যই মনে হয়, প্রত্যেক জাতকই তাহার জন্মের সময় হইতেই তাহাদের গোষ্ঠীর সংরক্ষণ-প্রয়াসের কতকগুলি ছাপজট্ (engrams complex) লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, যেন জাতির অতীত স্মৃতির অস্পষ্ট দাগ তাহাদের দেহ ও মনোযন্ত্রের মধ্যে থাকে এবং তাহার ফলে (১) একটি বিশিষ্ট পরিবেশে তাহার অনুভূতি বিশিষ্টভাবে অনুরঞ্জিত হয় এবং (২) তাহার আচরণটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়।

প্রবৃত্তির সংখ্যা ঃ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কি কি এবং আমাদের আচরণের মধ্যে কোন্গুলিই বা সহজাত প্রবৃত্তির লীলা, এই লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিতণ্ডা আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমাদের প্রবৃত্তির সংখ্যা হইতেছে দুইটি মাত্র ; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহাদের সংখ্যা ছাপ্পান্নটি।

অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণীদিগের জীবন-প্রয়াসের আচরণ দেখিলে দুইটি জিনিষ আমাদের নজরে পড়ে। একটি হইতেছে তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের প্রয়োজনে লাগে এইরূপ আচরণ করা, আর একটি হইতেছে তাহাদের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত মঙ্গলের জন্য কাজ করা। একটি হইতেছে স্বার্থরক্ষা-মূলক, আর একটি হইতেছে বংশরক্ষামূলক, অর্থাৎ একটি হইতেছে স্বার্থ-সাধনপ্রবৃত্তি ও অপরটি হইতেছে যৌন-প্রবৃত্তি। এই দুইটি মূল প্রবৃত্তি লইয়াই তাহাদের কারবার।

এই দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে আবার কোন্টি মুখ্য এবং কোন্টি গৌণ, ইহা লইয়াও বিতণ্ডা আছে। কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, যৌন-প্রবৃত্তিই হইতেছে মূলপ্রবৃত্তি, আবার কেহ কেহ স্বার্থকেই (self-interest) প্রধান প্রবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই উভয় মতবাদের মধ্যেই একদেশদর্শিতা আছে। বস্তুতঃ যৌন-প্রবৃত্তি এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি এই দুইটিই হইতেছে জীবনের প্রয়োজনের জন্য একই জীবন-প্রয়াসের দুইটি

ভঙ্গী মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইবার পর উদ্ভিদ-শিশুর একটিমাত্র মূল কাণ্ড থাকে। পরে ঐ মূল কাণ্ডটি হয়ত দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং গাছটি যত বড় হইতে থাকে তাহার শাখা-প্রশাখা ততই অধিক সংখ্যক হইতে থাকে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। জীবন-প্রয়াস হইতেছে মূল কাণ্ডস্বরূপ এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি (self-interest) এবং যৌনপ্রবৃত্তি হইতেছে তাহার প্রথম দুইটি শাখা।

"এ্যামিবা" নামক একটিমাত্র জীবকোষবিশিষ্ট প্রাণীর জীবন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই মতের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহটি ছিন্ন হইয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহার পর এই দুইটি অংশই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকে। এ্যামিবার ক্ষেত্রে একই কার্য্যের দ্বারা মৃত্যুকে এড়াইয়া তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের (self-interest) কাজ এবং বংশগত মঙ্গলের বা যৌন-প্রবৃত্তির কাজ হইয়া থাকে। কাজেই এ্যামিবার ক্ষেত্রে মনে হয় জীবন-প্রয়াস-বৃক্ষের মূল কাণ্ডটি এখনও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় নাই। সেইজন্য তাহাদের একই কাজের মধ্য দিয়া দুইটি বৃহৎ এবং বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির (যৌন-প্রবৃত্তি ও স্বার্থপ্রবৃত্তি) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে তাহা হয় না। জীবনের বিবর্ত্তনের পথে মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রবৃত্তিগুলি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে মানুষের ক্ষেত্রে তাহার বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি শুধু যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং পৃথকই হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধীও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ্যামিবা একটি কাজের দ্বারাই তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল এবং জাতিগত মঙ্গল সাধন করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য জাতির প্রতি "মীরজাফরের" কাজ করিতে হয়, আবার জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির স্বার্থ বলি দিতে হয়। যৌনপ্রবৃত্তির সহিত সমাজের দ্বন্দ্বও এ্যামিবার ক্ষেত্রে নাই; যে কাজের দ্বারা তাহার যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা দ্বারাই সমাজের মঙ্গল হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণে যৌনপ্রবৃত্তির দমন এবং যৌন-প্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করা, নিত্যই সংঘটিত

হইতেছে। ব্যক্তি ও সমাজ, দেহগত ক্ষুধা ও সমাজগত আদর্শের সংঘাত লইয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন প্রবৃত্তি ঃ

কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া প্রাণী জীবনের কারবার আরম্ভ হয়, ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিরোধের যথার্থ কারণ নাই। একটি পূর্ণ-বয়স্ক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দুই হইবে, কি দশটি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে কোন্ স্থান হইতে আমি গণনা করিতেছি। ম্যাক্‌ডুগাল (Mc. Dougall) তাঁহার 'Introduction to Social Psychology' গ্রন্থে প্রথমতঃ সাতটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার 'Outline of Psychology' নামক গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, যাহার জন্য একটি বিশিষ্ট ঘটনায় প্রাণীকে বিশেষভাবে কাজ করিবার প্রেরণা জাগায়। তাঁহার মতে এই প্রবৃত্তিগুলির দুইটি দিক আছে ; একটি হইতেছে অনুভূতির দিক এবং আর একটি হইতেছে প্রতিক্রিয়ার দিক ; ফলে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে বিশেষভাবে অভিভূত হই এবং পরে বিশেষ-ভাবে কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করি। এই প্রবৃত্তিগুলিকে চিনিবার মাপকাঠি ঃ (১) ইহারা সহজাত (২) ইহারা গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে ক্রিয়াশীল (৩) ইহারা মনুষ্য ও ইতর প্রাণী সকলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

(১) **অপত্য প্রবৃত্তি (Parental)** ঃ প্রবৃত্তিগুলির তালিকার মধ্যে ম্যাক্‌ডুগাল প্রথমেই অপত্যপ্রবৃত্তি বা জনকের প্রবৃত্তিটি ধরিয়াছেন। এই প্রবৃত্তিকে তিনি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আবিষ্কার, বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতির জননীস্বরূপা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রাণীসকল তাহাদের বৎসদের রক্ষার জন্য এবং তাহাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিটি নানাপ্রকার কর্ম্মের জন্য প্রেরণা দান করে। মানুষের স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতির শত সহস্র প্রকার কার্য্যই এই বৃত্তি হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

ভবভূতি বলিয়াছেন ঃ "একোরস করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।"
(৩।৪৭, উত্তর রাম চরিত)

সাহিত্যক্ষেত্রে এই কারুণ্য সব রসেরই উৎস, জীবনের ক্ষেত্রেও এই বৃত্তিটি সমস্ত প্রবৃত্তির উৎস।

(২) **যুযুৎসা (Combat)** ঃ এই প্রবৃত্তিটি এক হিসাবে অপত্য প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়াছে। কেহ হয়ত নবজাত শাবককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মনের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুযুৎসা জাগিয়া উঠে। অবশ্য অন্য কারণেও এই প্রবৃত্তিটি জাগে। সাধারণতঃ কোনও স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই এই প্রবৃত্তি জাগে। যেমন কোনও প্রাণীর খাদ্য অন্বেষণ বৃত্তিতে বাধা পড়িলেই তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় এবং ফলে যুযুৎসা জাগ্রত হয়। যাঁরা অহিংসাবাদী তাঁদের অনেকে হয়ত যুযুৎসা প্রবৃত্তির উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু যে বালক খেলাধূলার সময় নিজ অধিকার লইয়া ঝগড়া করিবার সুযোগ পায় না বা পরাজয়ের গ্লানিতে অপমান বোধ করে না, সে বড় হইয়া দেশের ও দশের ন্যায্য দাবী লইয়াই হয়ত সংগ্রাম করিতে পারে না।

(৩) **কৌতুহল প্রবৃত্তি (Curiosity)** ঃ যখন কোনও নূতন পরিবেশের মধ্যে আমরা পতিত হই এবং তাহার সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন এই প্রবৃত্তিটি জাগরিত হয়। এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই আমরা জগতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই শিশু "কি" এবং "কেন" এই প্রশ্ন লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে জ্বালাতন করে। শিশুর সব "কেন"র উত্তর দেওয়া হয়ত সহজ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই "কি" ও "কেন" প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া শিশুর কৌতুহলে বাধা দেওয়া উচিত নহে; যতদূর সম্ভব তাহার কৌতুহল নিবারণ করাই উচিত।

(৪) **খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Food Seeking)** ঃ ইহা জীবন-প্রয়াসের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনই হইতেছে এই প্রবৃত্তিটির। এই খাদ্য-সংগ্রহ বৃত্তি বা

আহার প্রবৃত্তি শিক্ষার দোষে অনেক সময় বিকৃত হইয়া আমাদের ক্ষতি করে। কর্তব্যবিমুখ শিশুকে আহার্য্যের লোভ দেখাইয়া কাজে লাগান, মিষ্ট দ্রব্য দিয়া তাহার ক্রন্দন শান্ত করা, যখন তখন গুরুজনদের ভোজনের প্রসাদ-কণা দিবার জন্য আহ্বান করা—এই সমস্ত করিয়া অনেক বাড়ীতেই ছেলেদের খাদ্য সম্বন্ধে অসংযমী ও লোভী করিয়া তোলা হয়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র উভয়েরই ক্ষতি করা হয়।

(৫) **ঘৃণাপ্রবৃত্তি (Repulsion)**: আদিতে ইহা হয়ত খাদ্য-সংগ্রহের প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়াছে। কোনও দ্রব্য মুখে পোরা হইল, তাহার দুর্গন্ধ অথবা বিস্বাদ হয়ত আমাদিগকে সেই জিনিষটিকে মুখ হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রেরণা জাগাইল। এইভাবেই এই প্রবৃত্তিটি জন্মলাভ করিয়া পরে উচ্চতর প্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। মিথ্যাচার, হিংসা, জিঘাংসা, পাপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যে ঘৃণা তাহাও হয়ত এই আদিম প্রবৃত্তিটি হইতেই আসিয়াছে।

(৬) **পলায়নী প্রবৃত্তি (Escape)**: এই প্রবৃত্তিটি নানাভাবেই জাগ্রত হইতে পারে। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলাম, হঠাৎ কোন একটা ভীষণ জিনিষ দেখিলাম, কোনো একটা বিস্ময় ও ভয়ের অনুভূতিতে "চাচা আপন বাঁচা" ভাবটি মনে আসিল, তখনই আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে পলায়ন।

(৭) **সংঘ প্রবৃত্তি (Gregariousness)**: নিজের জাতীয় প্রাণীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকিবার চেষ্টা করা প্রায় সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই আছে। অতি শিশু অবস্থাতেও এই প্রবৃত্তিটির অপরিস্ফুট ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও একলা থাকিতে ভালবাসে না। সংঘপ্রিয়তা দশ হইতে পনের বৎসরের বালক-বালিকাদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র হয়। এই প্রবৃত্তিটিকে যথাযথ উৎসাহ দিলে ফল ভালই হয়। যে বালকের সংঘবৃত্তি ভালভাবে বিকশিত হয় না, সে প্রায়ই অসামাজিক অপদার্থ হইয়া উঠে।

(৮) **আত্মবিস্তার বা আস্ফালন প্রবৃত্তি (Self assertion)**: শক্তি-সামর্থ্যহীন প্রাণীর নিকট শক্তির আস্ফালন বা একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ইতরপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তরের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, অর্থ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দেখাইয়া অপরের উপরে যে 'চাল' দেখাইবার চেষ্টা আমাদের অনেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মবিস্তার বা আস্ফালন প্রবৃত্তিরই রূপ-ভেদ মাত্র। ব্যক্তিগত শক্তি, আঘাত-প্রবণতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এই আস্ফালন প্রবৃত্তিটি অযথা পরিচালিত হইলে তাহা উত্তরকালে গুণ্ডামি প্রভৃতির সৃষ্টি করে। সংঘগত ক্রীড়া-কৌশল প্রভৃতির পথে পরিচালিত করিয়া এই বৃত্তিকে উৎকর্ষিত করা যাইতে পারে।

(৯) **আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি** (Submission) : ইহা হইতেছে আস্ফালন বৃত্তিরই বিপরীত দিক। অধিকতর শক্তিমান বা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির নিকট যে সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা, তাহারই মধ্যে এই প্রবৃত্তিটিকে কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আস্ফালন ও আত্মাবমাননা বৃত্তিটি কুকুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের সহিত আর একটি ক্ষীণকায় কুকুরের দেখা হইল। তখন হৃষ্টপুষ্ট কুকুরটি লেজ খাড়া করিয়া বুক ফুলাইয়া ক্ষীণ কুকুরটির সমুখে দাঁড়াইল, ক্ষীণ কুকুরটি তখন নিজের দীনতা বুঝিতে পারিল। তখন সে লেজটিকে পিছনের পা দুইটির ভিতরে গুটাইয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিল। ব্যাপারটি এইখানেই মীমাংসা হইয়া যাইল; কিন্তু ক্ষীণ কুকুরটি এইভাবে দীনতা স্বীকার না করিলেই একটা দ্বন্দ্ব, কামড়া-কামড়ি বাধিয়া যাইত।

(১০) **যৌন-প্রবৃত্তি** (Sex instinct) : ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ এই প্রবৃত্তিটিকে মনস্তত্ত্বের আলোচনায় খুব বড় একটা স্থান দিয়াছেন। ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণের সহিত সকলে এক মত না হইলেও, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, এই প্রবৃত্তিটির ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এইজন্য বোধহয় এই বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া (মূল বা স্থায়ি-ভাব ধরিয়া) যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "আদি রস" বলা হইয়াছে। সেখানেও 'আদি' এই বিশেষণটির দ্বারা এই প্রবৃত্তিটির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করা হইয়াছে। ক্ষুধা বা খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তির মত এই প্রবৃত্তিটিও শারীরিক ক্ষুধা এবং বহির্জগতে ক্ষুধা জাগাইবার জিনিষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। শৈশবের কুশিক্ষা ও

আদরের দোষে অনেক সময় বালক-বালিকাদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিটির বিকৃতি ঘটে। যৌনবোধ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল উপস্থিত হইলে শুচিতা ও সরলতার সহিত তাহার আলোচনা করা উচিত। ছি-ছি করিয়া এই কৌতূহল দমন করিলে বালকেরা চাকরবাকরের নিকট হইতেও বিকৃতভাবে এই জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকে।

(১১) **সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি (Acquisition)**: খাদ্য অথবা গৃহসজ্জার জন্য উপযুক্ত জিনিষ পাইলে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা এবং সেই গৃহীত বস্তুগুলিকে সতর্কভাবে আগলাইয়া রাখার চেষ্টার মধ্যে এই প্রবৃত্তিটি কাজ করে। এই প্রবৃত্তির অসংযত বিকাশে কৃপণতা, চৌর্য্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়, আবার উৎকর্ষণের দ্বারা ডাক টিকিট সংগ্রহ, প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি গুণও বিকশিত হয়।

(১২) **গঠনমূলক প্রবৃত্তি (Construction)**: পাখীদের বাসা বাঁধিবার চেষ্টার মধ্যে, মানব শিশুদের খেলাঘর তৈয়ারী করিবার চেষ্টার মধ্যে এই প্রবৃত্তিটিকে ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখা যায়।

(১৩) **দোহাই পাড়িবার প্রবৃত্তি (Instinct of appeal)**: যখন যুযুৎসা প্রবৃত্তিটি কার্য্যকরী হয় না, তখনই জাতক এই "দোহাই পাড়িবার" প্রবৃত্তিটির দ্বারা সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে।

(১৪) **হাস্য প্রবৃত্তি (Laughter)**: ইহা যে বাস্তবিকই একটি প্রবৃত্তি সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। তবে প্রবৃত্তি হইলেও ইহা শুধু মানব জাতিরই সম্পদ। প্রশ্ন আসিতে পারে, কিসের প্রেরণায় আমাদের হাস্যের উদ্রেক হয়? ম্যাকডুগাল বলেন, আমরা সেই অবস্থাতেই হাসি যে অবস্থায় না হাসিলে কষ্ট বা দুঃখ হয়। ইহা এক দিক দিয়া সমবেদনা, অপর দিক দিয়া ক্রোধের প্রতিশোধক। একজনের দুঃখ দেখিলে আমাদের সমবেদনাজনিত কষ্ট হয়, তখন হাস্য করিয়া আমরা এই কষ্টকে এড়াইয়া চলি; তেমনি যে অবস্থায় আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই অবস্থায় না রাগিয়া হাস্য করিলে আমরা ক্রোধের যন্ত্রণা হইতে রেহাই পাই।

প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আচরণবাদীদের মত ঃ

এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে নান্, রস (Nunn, Ross) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্দের মতবাদ অবলম্বন করিয়া। ইহারা প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গোষ্ঠীগত সংরক্ষণ প্রয়াস, একটা প্রাক্জন্মগত সংস্কারের ছাপ প্রভৃতির কথা আনিয়াছেন। সাধারণ মানুষও প্রবৃত্তি (Instinct) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ভাবেন যে, প্রবৃত্তি (Instinct) প্রকৃতির নির্দ্দেশে প্রাপ্ত একটা সহযোগিতা, যাহার ফলে শিক্ষা-দীক্ষা না পাইয়াও প্রাণীরা তাহাদের জীবনের প্রয়োজনের কাজগুলি প্রায় অভ্রান্ত ভাবেই করিতে পারে। আর পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান বলিয়া প্রকৃতি তাকে সহযোগিতা দান করেন না, তাই মানুষকে বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া বুদ্ধি-পরিচালিত পথে চলিতে হয়। শিশু বয়সে মানুষ অসহায় থাকে এবং প্রকৃতির বিদ্রোহী হয় না বলিয়া এই বয়সটিতে প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করে, অর্থাৎ এই বয়সে শিক্ষাদীক্ষা ব্যতীতই মানুষ প্রবৃত্তির (Instinct) প্রেরণায় খানিকটা কাজ-কর্ম্ম করিতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে একটু অধ্যাত্মবাদ, একটু দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, একটু প্রাক্জন্মগত সংস্কার প্রভৃতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে দার্শনিকতার দৃষ্টিভঙ্গী যতটা আছে, জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ততটা নাই।

যাঁহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রটিকে জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া দেখেন তাঁহারা প্রবৃত্তির (instinct) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জন্মগত ছাপজট্ প্রভৃতির কথা বেশী আমলে আনিতে চাহেন না, নিছক দেহযন্ত্র এবং তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়াই তাঁহারা প্রবৃত্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলিয়াছেন, প্রাণীজগতের বিবর্ত্তনের পথে একটি মাত্র জীবকোষ লইয়া গঠিত প্রাণী (এ্যামিবা) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যত উর্দ্ধদিকে যাওয়া যায়, তাহাদের দেহযন্ত্র ততই জটিল ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। এই দেহযন্ত্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচরণেরও জটিলতা ও সমৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি, তাহা হইতেছে এই দেহযন্ত্রের

বিবর্ত্তনের পথে একটা বিশিষ্ট পরিণতির যুগের একটা "আচরণ-বৈশিষ্ট্য" মাত্র।

প্রাণী-জগতের কার্য্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে—কতকগুলি কার্য্য হইতেছে বৈচিত্র্যবিহীন অপরিবর্ত্তনশীল (Non-variable), আর কতকগুলি হইতেছে বৈচিত্র্যযুক্ত পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ (variable)।

(১) প্রাণী-জগতের কার্য্যগুলি প্রথম পর্য্যায়ে আছে অপরিবর্ত্তনশীল নিছক **জৈব-ক্রিয়া** (physiological actions) যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, খাদ্য জীর্ণ করা, ঘর্ম্ম নিঃসরণ করা প্রভৃতি।

(২) ইহার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আছে "**আভিমুখী-ক্রিয়া**" অর্থাৎ শীতাতপ, আলোক, বাতাস প্রভৃতির জন্য শারীর-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (tropisims)। নিম্ন স্তরের বহু প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই (যাহাকে প্রবৃত্তি বলা হয়) এই tropisims-এর অন্তর্গত। বহ্নিমুখে গমনশীল পতঙ্গের কথা লইয়া কাব্যসাহিত্যে অনেক উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু আলোকের জন্য তাহার যে আকর্ষণ, তাহা রূপ-তৃষ্ণা জাতীয় কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণায় ততটা নহে, যতটা হইতেছে আলোক-রশ্মি-জনিত শারীর-রাসায়নিক আকর্ষণের অনিবার্য্য ফল। একটি উদ্ভিদ শিশুও আলোকের দিকে তাহার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে। ইহার মধ্যেও যেমন প্রবৃত্তির (instinct) লীলা নাই, ইতরপ্রাণীদের অনেক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও তেমন প্রবৃত্তির লীলা নাই। একটি পোকা যে গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা বা পলায়নী প্রবৃত্তি ততটা নাই, যতটা আছে তাহার চারিদিকে যতটা সম্ভব কঠিন পদার্থের সহিত তাহার দেহকে ছুঁয়াইয়া রাখার চেষ্টা। এই আভিমুখী ক্রিয়া বা Tropisimsগুলি প্রায় সর্ব্বতোভাবেই অপরিবর্ত্তনশীল।

(৩) প্রাণীজগতের তৃতীয় পর্য্যায়ে আছে **প্রতিবর্ত্তক** ক্রিয়া (reflexes)। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা বুদ্ধি-সচেতন নহে। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানবহা স্নায়ুপ্রবাহ মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত পৌছিয়াই মেরুদণ্ডের সমবেদন-প্রবণ (Sympathetic) গ্যাঙ্গ্‌লিয়াগুলি হইতেই একটা কর্ম্ম-নির্দ্দেশ লইয়া প্রতিক্রিয়া করে।

এইগুলিকে Spinal reflex বলে। আরও কতকগুলি reflex আছে, তাহাকে brain reflex বলে। এই brain reflex এবং বুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যগুলির পার্থক্য প্রকৃতগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। reflexগুলির মোটামুটি পরিচয় হইতেছে, এগুলি খানিকটা স্বয়ংসিদ্ধ এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। আমাদের চোখে একটা কি পড়িল, অমনি প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া হিসাবে আমি চক্ষু বন্ধ করিলাম, ইহাতে $\frac{২}{১০}$ সেকেণ্ড সময় লাগিল ; পায়ে হয়ত বিছা কিংবা কিছু জড়াইয়া ধরিল, তখনি পা ঝাড়া দিলাম, এজন্য $\frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগিল। এই জাতীয় ক্রিয়া এবং চোখের পলক ফেলা, হাসা-কাঁদা, ভ্রূকুঞ্চিত করা, কাঁপা, মুখ বিকৃত করা, হাঁচা, জিহ্বার রসাস্বাদন করা, ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠা প্রভৃতি কাজগুলি প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া। এই প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়াগুলিও অনেক পরিমাণে অপরিবর্ত্তনশীল।

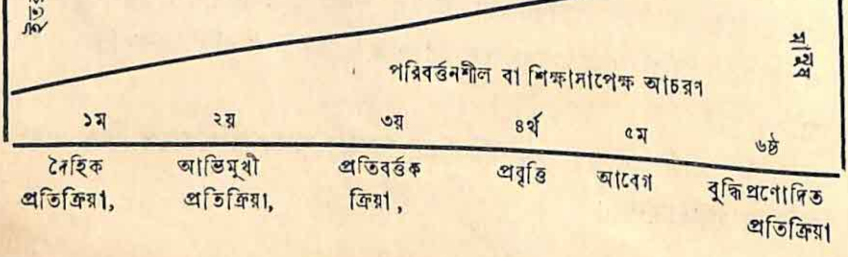
(৪) চতুর্থ পর্য্যায়ের প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) **প্রবৃত্তি** (instinct) নাম দিয়াছেন। এগুলি প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার চেয়ে একটু জটিলতর। প্রাণীদের ক্রিয়াগুলি যে বৈচিত্র্যবিহীন (Non-variable) জৈব-প্রতিক্রিয়া হইতে বিবর্ত্তনের পথে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল বা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য্যে পরিণতি লাভ করে, সেই পরিণতির পথেই বৃত্তিটি হইতেছে প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়ার পরবর্ত্তী অধ্যায়। প্রবৃত্তির ব্যাখ্যার জন্য গোষ্ঠীগত জীবনের "অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ", "প্রকৃতির অভিভাবকত্ব" প্রভৃতি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, জটিলতর এবং সমৃদ্ধতর দেহ-যন্ত্র তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া দিয়াই ইহার ব্যাখ্যা হয়।

(৫) বিবর্ত্তনের পঞ্চম পর্য্যায়ে আছে **আবেগ বা প্রক্ষোভ** (emotion)। এই ক্ষেত্রে প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া আরও জটিল ও বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে এবং আবেগের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির রং লাগিয়া যায়।

(৬) প্রাণী জগতের চরম পরিণতির পর্য্যায়ে আছে **বুদ্ধিপ্রণোদিত এবং অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া**।

মানুষের একক জীবনেই এই বিবর্ত্তনের সমস্ত অধ্যায়গুলিই দৃষ্ট হয়। যখন সে মাতৃগর্ভে তাহার জীবন আরম্ভ করে তখন একটিমাত্র জীব-কোষ লইয়াই তাহার দেহ-যন্ত্র কাজ আরম্ভ করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে সে বর্দ্ধিত হয়, তাহার দেহের জীব-কোষের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, দেহ-যন্ত্র জটিল হইতে জটিলতর হইয়া সমৃদ্ধ হইতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্র, মেরুদণ্ড প্রভৃতি গঠিত হইতে থাকে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রায় শারীরিক পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। 'নিছক জৈব-প্রতিক্রিয়া এবং আভিমুখী (Tropic) প্রতিক্রিয়া তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই Spinal reflexএর দ্বারা সে চোখ বুজিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, বমি করিতে পারে, চিম্‌টি কাটিলে হাত সরাইয়া লইতে পারে, পায়ে সুড়সুড়ি দিলে পা গুটাইয়া লইতে পারে এবং এই কাজগুলি তাহাকে শিখিতে হয় না। পরে উপযুক্ত প্রেরণা পাইলে উত্তেজকের (stimulus) প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে হাঁটিতে পারে, খাদ্য সংগ্রহ করিতে হাত বাড়ায়, কৌতূহল অনুভব করে, ক্রোধান্বিত হইয়া যুযুৎসু হইয়া উঠে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি হইল প্রবৃত্তির পর্য্যায়ের জিনিষ। এক হিসাবে এইগুলিও প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া, তবে ইহা নিছক প্রতিক্রিয়া হইতে একটু বৈচিত্র্যযুক্ত এবং জটিলতর। এই জন্য হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রবৃত্তিগুলিকে মিশ্র প্রতিবর্ত্তক (compound reflex) বলিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতিক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং শীঘ্রই সে উচ্চ-চিন্তাপ্রসূত কার্য্যাবলী করিতে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের ক্রিয়ার বিবর্ত্তন ঃ



প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ ঃ

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইল, ইহা ছাড়া আরও অনেক বিতণ্ডা আছে। প্রবৃত্তির স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জেমস্ (James) বলেন, প্রবৃত্তি হইতেছে মনের এমনই একটা শক্তি, যাহা দ্বারা প্রাণী কোনও বিষয়ে না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পূর্ব্ব হইতে কোনও কিছু শিক্ষা লাভ না করিয়াই একটি বিশেষ রকম ফল পাইবার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে ঃ "Instinct is the faculty of acting in such a way as to produce certain ends without foresight of the ends and without previous education in the performance."

ওয়াট্সন্ (Watson) এই জাতীয় বিশেষ একটা দুর্জ্ঞেয় শক্তির কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন, একটি বুমারাংকে (boomerang) হাত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহা আবার হাতে ফিরিয়া আসে। এই আচরণের জন্য বুমারাংটির মধ্যে কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই, তাহার গঠন-কৌশলের মধ্যে এই আচরণের লীলা রহস্য নিহিত আছে। তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রেই বা প্রবৃত্তি জাতীয় একটা শক্তির কথা কল্পনা করিয়া লাভ কি ? ওয়াট্সন্ (Watson) প্রবৃত্তি বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং তথাকথিত প্রবৃত্তির কাজগুলিকে কর্ম্মস্রোত (activity stream) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আচরণবাদী হইলেও থর্ণডাইক্ (Thorndike) প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে খানিকটা জেমস্-এর পথের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রাণীদের আচরণগুলির মধ্যে প্রবৃত্তি (instinct), ক্ষমতা বা ধারকত্ব (capacity), প্রবণতা (tendency) এবং সম্ভাবনা (potentiality) প্রভৃতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই চার জাতীয় আচরণই প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার (reflex) অন্তর্গত।

থর্ণডাইকের (Throndike) মতে প্রবৃত্তি, প্রবণতা (instinct, capacities) প্রভৃতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রকৃতিগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। তিনি শিশুদের প্রবৃত্তির সংখ্যা-প্রসঙ্গে মাতৃস্তন্য

পান, দংশন করা, চর্ব্বন করা, লেহন করা, মুখভঙ্গী করা, থুথু ফেলা, কোন জিনিষ ধরিতে চেষ্টা করা প্রভৃতি ছাপ্পান্নটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং capacity প্রসঙ্গে নেতৃত্ব, আত্ম-ত্যাগ, সমবেদনা, মুখস্থ করিবার শক্তি, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, আত্ম-নির্ভরতা, মৌলিকতা প্রভৃতি মুখ্য ও গৌণ ভেদে তেইশটি শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়াগুলি খানিকটা বিধিনির্দ্দিষ্টভাবে ঘটিয়া থাকে এবং বুদ্ধিপ্রণোদিত ক্রিয়ার মত তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা থাকে না। এইজন্য যাঁহারা প্রবৃত্তিগুলিকে প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মতের সমালোচনা করিয়া ড্রেভার দেখাইয়াছেন, কৌতূক, ভয় প্রভৃতির ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি একটি বিধিনির্দ্দিষ্টভাবে হয় না। সুতরাং এগুলিকে প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার অন্তর্গত বলা উচিত নহে।

বের্গস (Bergson) প্রাক্‌জন্মগত সংস্কারকে বিশ্বাস করেন। তাঁহার ধারণা একটা জীবন-প্রেরণা (Life-impulse) আমাদের সক্রিয় চেতনার আড়াল হইতেই আমাদের কাজকর্ম্মে অনুপ্রেরণা দেয় ; ইহাই হইল প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদের গহনতা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণভাবে পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তির যে বিশিষ্টতাগুলি স্বীকার করেন, সেগুলি উল্লেখ করা অযৌক্তিক হইবে না। সে বিশেষত্বগুলি এই—

(১) ইহা শিক্ষা বা অভ্যাসসাপেক্ষ দক্ষতা নহে, ইহা সহজাত।

(২) ইহা গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশীল।

(৩) গোষ্ঠীর সকলের উপরই ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইলেও ইহার শক্তি সর্ব্বত্র সমান নহে। যেমন (ক) যুযুৎসা জিনিষটা হয়তো নারীর চেয়ে পুরুষের মধ্যে বেশী ক্রিয়াশীল, আবার অপত্য প্রবৃত্তির ক্রিয়া হয়ত পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যে অধিকতর ক্রিয়াশীল ; (খ) যৌনপ্রবৃত্তি বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে যেমন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যৌবনে ইহা বেশী উদ্দীপ্ত হয় (গ) মস্তিষ্কের সুস্থতার উপর ইহার ক্রিয়া অনেকখানি নির্ভর করে যেমন Dementia জাতীয় মনো-বৈকল্য আসিলে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি ব্যাহত হয়।

(৪) প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। প্রবৃত্তিগুলির সাহায্য না পাইলে পরিবেশের প্রতিকূলতায় প্রাণীগুলিকে হয়ত জীবনের আসর হইতে সরিয়া যাইতে হইত। শীতের আগমনে যে লক্ষ লক্ষ পক্ষী উষ্ণতর দেশে পলায়ন করে, শত্রুকে দেখিয়া দুর্ব্বলতর প্রাণী যে আত্ম-গোপন করে, সন্তান সম্ভাবনায় যে পাখীরা বাসা তৈয়ারী করে, এ সমস্তই জীবন-সংগ্রামের প্রেরণাতেই হইয়া থাকে।

প্রক্ষোভ বা আবেগ (Emotions) :

মানুষের দেহযন্ত্র তথা তাহার আচরণের বিবর্ত্তনের পথে প্রক্ষোভ বা আবেগ জিনিষটিকে স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি প্রবৃত্তির পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের ক্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত, তবে প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য হইতেছে এই : (১) প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার সময় দেহের একটিমাত্র অংশ ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের সময় সমগ্র শরীরেই একটা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। (২) ইহাতে গ্রন্থি সংক্রান্ত (glandular) এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ (visceral) পরিবর্ত্তন হয়। (৩) প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া অথবা প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়ার মত প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সরলতা দৃষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে খানিকটা অযৌক্তিক বিক্ষোভ, তীব্রতা, আকস্মিকতা জাতীয় ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভের ফলে রক্ত-চলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতির গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিত ডারুইন বলেন, প্রক্ষোভের সময় আমাদের মধ্যে যে শরীরগত পরিবর্ত্তন হয়, তাহার কারণ হইতেছে : (১) প্রক্ষোভ প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা যে হাতের মুঠা শক্ত করি, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরি, চক্ষু বিস্ফারিত করি—ইহা হইতেছে অতীত যুগের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ব্যাপার (Principle of serviceable habits)। (২) কখন কখনও প্রক্ষোভের সময় আমরা বিপরীত-ধর্ম্মী ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করি (Principle of antithesis), এইজন্য আদর দেখাইবার সময় আমরা অনেক সময় গাল

টিপিয়া দেই, পিঠে চাপড় মারি, কুকুরেরা তাহাদের শিশুপুত্রদের আদর করিবার সময় কামড়াইয়া দেয়।

ক্যানন (Cannon) প্রভৃতি গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্ (endocrinologists) বলেন, প্রক্ষোভ হইতেছে অ্যাড্রিনেল্ প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্যজনিত শারীরিক পরিবর্ত্তন মাত্র।

ফ্রয়েড্, ইয়্যুঙ্ (Jung) প্রভৃতি মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ বলেন, প্রক্ষোভ ব্যাপারটা একটা অযৌক্তিক বা আকস্মিক মনোবিকার মাত্র নহে, ইহার মধ্যে একটা গোপন ইতিহাস এবং অবদমন জাতীয় রহস্যের ইঙ্গিত আছে।

ওয়াট্‌সন্ প্রভৃতি আচরণবাদী বলেন, ইহা শুধু কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "Albert B" নামক শিশুর উপর ভয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষাটি দ্রষ্টব্য—১৯ পৃঃ)।

অধ্যাপক জেমস্ (James) এবং ল্যাঙ্গ্ (Lange) বলেন, কোনও একটি উত্তেজনায় আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়, এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হই, তখনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

উড্ওয়ার্থ (Woodworth,) ডাউনে (Downey) প্রভৃতি মনে করেন, প্রক্ষোভও আমাদের একটা সহজাত মানসিক সম্পদ এবং ইহাকেও মনস্বিতাংশের (I.Q.) মত পরিমাণ করিবার মাপকাঠি শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক ঃ

ম্যাকডুগাল (Mc. Dougall)-এর বিশ্বাস, প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলেই এক একটি প্রক্ষোভের (আবেগের, emotion) লীলা আছে। যেমন পলায়ন-প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়ের প্রক্ষোভ, যুযুৎসার মূলে আছে ক্রোধ ইত্যাদি। মানুষ প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির সম্পর্কটি খানিকটা বুঝিতে পারা যাইলেও, নিম্নপ্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি ঠিক স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। সেইজন্য অনেকের বিশ্বাস যে, ইতরপ্রাণীর আচরণ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আর উচ্চতর প্রাণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রক্ষোভ প্রভৃতির দ্বারা। যদি প্রশ্ন করা হয় "পিপীলিকারা এইভাবে বাসা

বাঁধে কেন? অথবা মাকড়সা এইভাবে শিকার ধরে কেন?" সাধারণ লোকে তাহার উত্তরে বলিবে—"সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তাহারা এইরূপ করে।" কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে "মানুষটি এভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল কেন?" তাহাতে সাধারণ লোকে উত্তর করিবে "রাগ করিয়াছে বলিয়া সে চীৎকার করিল।" যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "সে ছুটিয়া পলাইল কেন?" উত্তর আসিবে "ভয় পাইয়াছে বলিয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ মাকড়সার শিকার ধরা প্রবৃত্তির (instinct) ব্যাপার, আর মানুষের চীৎকার করা বা পলায়ন করা প্রক্ষোভের (emotion) ব্যাপার।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের প্রেরণার জন্য প্রবৃত্তির রাজ্যে দুইটি পৃথক আইন আছে? নিম্ন প্রাণীদের জন্য প্রবৃত্তির এবং উচ্চতর প্রাণীদের জন্য প্রক্ষোভের প্রেরণা দিয়া প্রকৃতি তাঁহার জীব জগৎকে পরিচালিত করেন? ম্যাকডুগাল বলেন, "না, আইন একটিই আছে—উচ্চ এবং নিম্ন নির্ব্বিশেষে তাহা কাজ করে, প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভকে পৃথক বলিয়া মনে করাটা ঠিক নহে। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ পৃথক নহে, প্রবৃত্তির কাজগুলি করিবার সময় উচ্চতর প্রাণীদের মনের মধ্যে যে একটা আত্ম-সচেতন অনুভূতির রং লাগিয়া যায় তাহাকেই প্রক্ষোভ (আবেগ) বলা হয়।" সুতরাং ম্যাকডুগালের (Mc. Dougall) মতে বৃত্তির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রক্ষোভের কথা বাদ দিলে কিছুতেই চলিবে না। এই জন্যই ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির (instinct) সংজ্ঞা নিরূপণকল্পে বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজাত সংস্কার যাহার জন্য একটি (১) বিশেষ প্রাণী বিশেষ জিনিষকে বিশেষভাবে অনুভব করে, (২) এই অনুভূতির জন্য বিশেষভাবে অভিভূত বা প্রক্ষোভিত হয় এবং (৩) শেষ পর্য্যন্ত সেই জিনিষটি সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আচরণ করে ("An Innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific mode of behaviour in relation to that object.")।

এই ভাবে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ঠিক করিয়া তিনি তাঁহার নির্দ্ধারিত চৌদ্দটি প্রবৃত্তির জন্য চৌদ্দটি প্রক্ষোভেরও নাম করিয়াছেন। যথা—

প্রবৃত্তি	প্রক্ষোভ
পলায়ন (Escape)	ভয় (fear)
যুযুৎসা (Combat)	ক্রোধ (Anger)
ঘৃণা (Repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
অপত্য (Parental)	স্নেহ (Tender emotion)
দোহাই পাড়া (Appeal)	দুঃখ (Distress)
রিরংসা বা যৌনপ্রবৃত্তি (Mating)	কাম (Lust)
কৌতূহল (Curiosity)	আশ্চর্য্যবোধ (Wonder)
বশ্যতা (Submission)	আত্মাবমাননা (Negative self feeling)
আস্ফালন প্রবৃত্তি (Self assertion)	আত্মগৌরব বোধ (Positive self feeling)
যৌথ প্রবৃত্তি (Gregariousness)	একাকীত্ব বোধ (Feeling of loneliness)
খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Food seeking)	ক্ষুধা (Gusto)
সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি (Acquisition)	স্বাধিকার বোধ (Feeling of ownership)
গঠন প্রবৃত্তি Construction)	সৃজনী স্পৃহা (Feeling of creativeness)
হাস্য (Laughter)	আনন্দ (Amusement)

প্রবৃত্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া যে প্রক্ষোভ যুগপৎ কার্য্য করে, তাহাকে প্রাথমিক প্রক্ষোভ (primary emotion) বলা হইয়াছে। দুই একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভের মিশ্রণে যে প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়, তাহাকে গৌণ প্রক্ষোভ (secondary emotion) বলা হয়।

প্রক্ষোভের স্বরূপ :

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই প্রক্ষোভ বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের দিক ছাড়া যে একটা অনুভূতির দিক আছে, যে একটা অভিভূত হইবার দিক আছে, তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা প্রক্ষোভ বলিয়া থাকি। প্রক্ষোভের তীব্রতার সময় আমরা এই অভিভূত হইবার লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। এই সময় মনের তরফ হইতে অভিভূত হওয়া ছাড়া শরীরের তরফ হইতেও একটা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং বিশেষভাবে আচরণ করিবার জন্য একটা প্রেরণাও আমাদের মধ্যে আসে। প্রক্ষোভের সঙ্গে শরীরগত পরিবর্ত্তন এবং কর্ম্মপ্রয়াসের যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা স্টাউট্ বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, একটা বিশেষ রকম প্রক্ষোভের সময় শরীরের মধ্যে বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন আসে। ভয়ের সময় তাড়াতাড়ি পালাইবার জন্য যেন শরীর তৈয়ারী হইয়া উঠে, ক্রোধের সময় দেহযন্ত্র যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় ইত্যাদি। শুধু এই বাহ্যিক পরিবর্ত্তনই নয়, বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় শরীরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনও সাধিত হয়। বর্ত্তমান শরীর-তত্ত্ববিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধের সময় অ্যাড্রিনেলিন্ গ্রন্থি হইতে রস ক্ষরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে রক্ত জমিয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্তক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। এইভাবে অন্যান্য প্রক্ষোভগুলির সময়ও প্রাণীর প্রয়োজন অনুযায়ী শরীরের পরিবর্ত্তন হয়।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক (জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ) :

অধ্যাপক জেমস্ প্রক্ষোভের সহিত শরীরগত পরিবর্ত্তনটির অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একটা অভিজ্ঞতার জন্য তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের শরীরের মধ্যে যে সব পরিবর্ত্তন আসে, সেই পরিবর্ত্তনের চেতনাই হইতেছে "প্রক্ষোভ"; তিনি বলেন—

"সাধারণতঃ বলা হয় আমরা দুর্ভাগ্যে আপতিত হই, দুঃখ পাই এবং কাঁদি; আমরা ভল্লুক দেখি, ভয় পাই এবং ছুটিয়া পলাই; প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা

অবমানিত হই, ক্রুদ্ধ বোধ করি এবং তাহাকে আঘাত করি ইত্যাদি ; কিন্তু আরও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার করিয়া বলিতে হইলে আমাদের বলা উচিত যে, আমরা কাঁদি বলিয়া দুঃখ অনুভব করি, আঘাত করি বলিয়া ক্রুদ্ধ হই, কাঁপি বলিয়া ভীত হই। দুঃখ পাইয়া কাঁদি, ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত করি, ভীত হইয়া কাঁপি—ইহা ঠিক কথা নহে।"

অধ্যাপক জেমস্-এর এই মতবাদটির মধ্যে বিরোধোক্তি অলঙ্কারের আকস্মিকতা যতই থাক না কেন, ইহার মধ্যে খানিকটা সত্যও আছে। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা জানেন ক্রোধ, শোক, প্রেম প্রভৃতির অভিনয় সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে ঐ সমস্ত প্রক্ষোভজনিত দেহ-বিকৃতি নিখুঁতভাবে আনয়ন করিতে পারিলে শুধু যে অভিনয়টিই ভাল হয় তাহা নহে, অভিনীত রসটির অনুভূতিও উৎকৃষ্টতর হয়। অপর পক্ষে যখন ভয়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতির আবেগে আমরা অভিভূত হই, তখন শরীরগত বিকৃতিগুলিকে সংযত করিতে পারিলেই সেই প্রক্ষোভগুলি কাটিয়া যায়। যে ক্রোধে হাত পা কাঁপে না, চক্ষু লাল হয় না, স্বর বিকৃত হয় না, পেশীগুলি স্ফীত হয় না, সেই মানসিক প্রশান্তির অবস্থাটিকে আর যাহাই হউক ক্রোধের অবস্থা বলা যায় না। ভল্লুক দেখিয়া যদি বুক দুর দুর করিয়া না কাঁপে, পলাইতে ইচ্ছা না হয়, জোরে নিশ্বাস না পড়ে, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া দিশাহারা হইতে না হয়, তাহা হইলে ভল্লুক দেখার ব্যাপারটা ভয়ের প্রক্ষোভের ব্যাপার না হইয়া মস্তিষ্কগত নিছক রূপানুভূতির (cold perception) ব্যাপারে নামিয়া আসে।

বর্ত্তমানে শরীরতত্ত্ববিদ্যায় যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে শরীরগত পরিবর্ত্তনের সহিত এক একটি প্রক্ষোভের সম্পর্ক যেন আরও গভীরভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটি প্রক্ষোভের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল এবং বিশেষভাবে নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত প্রক্ষোভগুলির অনুভূতির জন্য একটি বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্নে "থালামি" (Thalami) নামক স্থানে অবস্থিত এবং তাহার সহিত মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা-বাহিত স্নায়ু-তন্ত্রের বিশেষ সম্পর্কও নাই।

এই সমস্ত আবিষ্কারের পূর্ব্বেই জেমস্ এবং ল্যাঙ্গ্ (Lange) সাহেব শরীরগত বিকৃতি ও প্রক্ষোভের সম্পর্কটি নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তাঁহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে। তবে আমরা "পালাই বলিয়া ভয় পাই, ভয় পাই বলিয়া পালাই না" এই জাতীয় কথা না বলিয়া "জেমস্ ল্যাঙ্গ্ মতবাদের" (James Lange theory) গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া ম্যাকডুগাল-এর সহিত এইটুকু অনায়াসেই বলিতে পারি যে, পলায়ন, যুযুৎসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রবৃত্তির সহিত ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি তথা এই সমস্ত প্রক্ষোভের নিবিড় শরীরগত পরিবর্ত্তনের একটি নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও মতামত ঃ

ড্রেভার (Drever) কিন্তু এই বিষয়ে ম্যাক ডুগালের (Mc. Dougall) এর সহিত একমত নহেন। তিনি বলেন, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ঠিক এক জিনিষেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে, একটি আসিলে যে অপরটি আসে তাহা নহে, বরং একটির অতৃপ্ত ও অভাবে অপরটির সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তির কার্য্যগুলি যখন বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রক্ষোভ কাজ করিতে আরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ পলায়ন প্রবৃত্তি ও ভয়ের প্রক্ষোভের কথা বলা যাইতে পারে। পলায়ন কাজটি আমরা যখন বিনা বাধায় করিতে পারি তখন ভয় অনুভূত হয় না। কিন্তু পলায়ন করিতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই ভয়ের আবির্ভাব হয়।

রিভারও (River) ড্রেভার-এর সহিত একমত। তিনি বলেন, বিপদের সময় ছুটিয়া পলায়ন করা, লাফ-ঝাঁপ করা, এ সমস্ত কাজ করিতে হয় সত্য কথা এবং বিপদের সময় এই সমস্ত কাজ আমরা অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত করিতে সমর্থ, এ কথাও সত্য; কিন্তু সেই সমস্ত কাজ তখনই ভালভাবে করিতে পারি যখন প্রক্ষোভজনিত চিত্তবিক্ষোভ আমাদের অভিভূত না করে। সুতরাং সমস্ত প্রবৃত্তির কার্য্যগুলির বিষেশত্বই হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে প্রক্ষোভ বা চিত্ত বিক্ষোভের কোনও অবকাশ নাই। ডাঃ উইলিয়ম ব্রাউন (Dr. William Brown) বলিয়াছেন, ম্যাক্ ডুগাল নিজেও অন্ততঃ

একটি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এই মতবাদের অনুচ্চারিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যৌথপ্রবৃত্তি বা সংঘপ্রবৃত্তির সহকারী প্রক্ষোভ হইতেছে একাকীত্ব বোধ। কিন্তু এই সংঘ প্রবৃত্তিটি যখন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন তাহার সহকারী প্রক্ষোভজনিত একাকীত্ব বোধটি আর থাকে না।

ড্রেভার (Drever) এইটুকু স্বীকার করেন যে, অনেক প্রবৃত্তিরই ক্রিয়াশীল অবস্থায় প্রক্ষোভের অনুরণন থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রক্ষোভ ক্রিয়াটা প্রবৃত্তিরই অনুভূতির (affective) দিক মাত্র নহে। প্রক্ষোভের মূল কথা হইতেছে একটি বিশিষ্ট পরিবেশে পড়িয়া "এই কাজটি করিলে মন্দ হয় না" এই জাতীয় একটা মনোভাব মাত্র (worth whileness); এই ভাবটি যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রক্ষোভজনিত বিকারে পরিণত হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল অবশ্য পরে ড্রেভার-এর এই আলোচনা খানিকটা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তির মূল কথা যে প্রক্ষোভ, এই জেদটুকু তিনি কিছুতেই ছাড়িতে রাজী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ড্রেভার যাহা বলিয়াছেন. তাহা 'ক্রোধ' এই প্রবৃত্তিটি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্য আবেগ সম্বন্ধে নহে।

আবেগ ও প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের পথে প্রাণীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে প্রবৃত্তির সৃষ্টির পূর্ব্বেই এবং এই প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীদিগের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে একদিন আবির্ভাব হইয়াছিল প্রাণীদের জীবন-প্রয়াসের প্রয়োজনে জগতের সহিত কারবার চালাইবার সুবিধার জন্যই। এই জীবন-প্রয়াসের ক্রম-বিকাশের পথেই একদিন প্রক্ষোভগুলিও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রক্ষোভ হইতেছে জগতের সহিত কারবার করিবার ব্যাপারে প্রাণীদের জীবন-প্রেরণায় কর্ম্ম-প্রয়াসের অনুভূতিগত অনুরণন মাত্র।

এই জন্যই নান্ (Nun) বলিয়াছেন, আবেগ হইতেছে "Local differentiations of the feeling that colours all the organism's hormic dealings with the world." তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই যে প্রক্ষোভজনিত বিকার-বিকৃতিগুলি দৃষ্ট হইবেই, তাহা

নাও হইতে পারে এবং তথাকথিত 'worth whileness'ই হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কার্য্যের প্রেরণা হইতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রক্ষোভজনিত অনুভূতির রংটি থাকিয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, "It is true that in solving a scientific problem or in repaying a good turn I am not swept along all the time on a full stream of wonder or gratitude. Nevertheless the 'worth whileness' experienced in such activities does seem in each case to be coloured, so to speak, with the same colour as the emotion". (Education : Data and first Principles pp. 157-158).

শিক্ষাতত্ত্বে সহজাত প্রবৃত্তির প্রয়োগ :

এখন এই আবেগ ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া প্রবৃত্তি-গুলিকে কিভাবে শিক্ষার কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহারও আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা জানি, যে মূলধনগুলি লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে প্রবৃত্তি হইতেছে অন্যতম প্রধান একটা জিনিষ। একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, "The instincts are the raw materials of character" সুতরাং এই 'raw materials'গুলি যে কি ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে, তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই বিচার্য্য।

শৈশবে ও বাল্যে মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এই সময়ে প্রবৃত্তির আবেদন এবং তাহার প্রক্রিয়ার দিক দিয়া মানুষ ও ইতরপ্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ থাকে না। আদর্শবাদ, চরিত্রের দৃঢ়তা, মনের জোর, সংযম প্রভৃতি তখনও সৃষ্ট হয় না। কাজেই এই সময়ে আদর্শ, সংযম প্রভৃতির কথা আনিলে কোন ফল হইবে না। কারণ আদর্শ প্রভৃতি তখনও তৈয়ারী হয় নাই। কাজেই শিশু তখন স্বভাবতঃ যাহা করিতে চায়, সেই পথেই তাহাকে চলিতে দিয়া তাহার খানিকটা অজ্ঞাতসারেই খেলা, আনন্দ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সহজাত প্রবৃত্তির খাত বাহিয়া তাহাকে জ্ঞানের পথে ও শুভ কর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে হইবে। কিভাবে এই কাজটি করিতে হইবে তাহা জানিতে হইলে প্রবৃত্তিগুলির ধর্ম্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলি (attributes) ভাল ভাবে জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

(১) প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, প্রবৃত্তিগুলি সহজাত হইলেও সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিই জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত থাকে না, ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি করিয়া প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। জন্মের সময়েই একটি শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে, কিন্তু তখনও সে কিছু ধরিতে পারে না। তাহার পর কোনও কিছু ধরিতে শিখে, কিন্তু তখনও চলিতে পারে না। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ফুটিতে থাকে। বয়স অনুসারে প্রবৃত্তি বিকাশের এই ক্রমটি শিক্ষককে জানিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না জানিয়া অকালে এক একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ফল হইবে না। একটি দুই মাসের শিশুকে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি উন্মেষ করিবার জন্য তাহাকে "চলি চলি পা পা" করিয়া টানাটানি করিলে সে চলিতে শিখিবে না। বরং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ সে শিখিতে অস্বীকারই করিবে।

এই জন্যই দেখা যায়, জেদী শিক্ষক বা মাতাপিতার শিক্ষা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ-উন্মেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা শিক্ষার ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া শিক্ষার বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর কাছে বিভীষিকার বস্তু করিয়া তুলেন; শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহারা অনেক সময় শিক্ষার বস্তুগুলিকে ধীরে ধীরে ক্রম-কঠিন না করিয়া ছেলেদের একদিনে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া শক্ত শক্ত বিষয় শিখাইতে চেষ্টা করেন। ফলে ছাত্রের অকৃতকার্য্যতার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। প্রথমবারের অকৃতকার্য্যতা দ্বিতীয়বারের সিদ্ধিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে ছাত্রের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়।

অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেকের যে বিমুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা এই ভুল শিক্ষা-প্রণালীর জন্য হইয়া থাকে।

(২) প্রবৃত্তির দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে, প্রবৃত্তিগুলি চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং সময়ে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায়। একটি মোরগ-শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার মাতাকে অনুসরণ করা। এখন এই মোরগ-শিশুটিকে জন্মের পর হইতেই যদি সম্পূর্ণ

নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিটি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই তথ্যটি খুব প্রয়োজনীয়। ইহা আমাদের বুঝাইয়া দেয় যে, প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ সম্বন্ধে শিক্ষকের উৎসাহের বাড়াবাড়ি যেমন ক্ষতিকর, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতাও তেমনি ক্ষতিকর। মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় সকলেই একমত যে, মূক-বধির বালক বালিকাদিগকে যদি ভালভাবে কথা কহিতে শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সাধারণ বালকবালিকাদের মত ৬।৭ বৎসরে স্কুলে পাঠাইলে ভাল কাজ হইবে না। কারণ কথা শিখিবার প্রবৃত্তিটি ছেলেদের মধ্যে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিকশিত হয়। এই বয়সে সে যদি কথা কহিতে না শিখে এবং তিন চার বৎসর নষ্ট করিয়া পরে যদি তাহাকে স্কুলে পাঠান হয়, তাহা হইলে সে ভাল কথা শিখিতে পারিবে না।

প্রবৃত্তির পরিণতির হিসাব করিয়া সময় মত যথাযথ শিক্ষার বিষয় উপস্থাপিত করা শিক্ষাতত্ত্বের একটি বড় কথা। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি দশ বৎসরের বালককে শরীরতত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টা করা নিছক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের কিশোরের কাছে এই শরীর-তত্ত্বটি একটি অত্যন্ত আগ্রহের জিনিষ। কারণ ঐ কৈশোর বয়সে তাহার নিজের শরীরগত পরিবর্ত্তন প্রচুর হইতে থাকে, কাজেই শরীর সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ স্বতঃই তাহার মধ্যে উদিত হইতে থাকে। অতএব এই সময়ে শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দিলে তাহারা প্রচুর আনন্দের সহিত সেই শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৩) প্রবৃত্তির আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, এইগুলি ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয়। কাজেই যে সমস্ত অভ্যাসগুলি ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় হইবে, সেইগুলি শিশুকাল হইতেই গঠন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমরা জানি, এই উৎসাহের অভাবে যে সব বাড়ীর ছেলেরা "পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" বাঁধা থাকিয়া শুধু "ভাল ছেলেই" থাকিয়া যায়, নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার সুবিধা পায় না এবং কর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকে, সেই ছেলেরা উত্তরজীবনে নেতৃত্ব করিতেও পারে না। এই নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির বিকাশের জন্য বালকদিগকে ক্লাসে, খেলার মাঠে এবং সভা-সমিতিতে,

পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতিতে কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অবকাশ দিতে হইবে; তাহারা ভুল ভ্রান্তি করিবে বলিয়া তাহাদের দূরে রাখিলে চলিবে না।

(৪) প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে চতুর্থ কথা হইতেছে এই যে, প্রবৃত্তিগুলি জন্ম হইতেই অভ্রান্তও নহে এবং পূর্ণভাবে পরিপূর্ণও নহে। প্রাচীন পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রবৃত্তি হইতেছে প্রকৃতির নির্দ্দেশে প্রাপ্ত একটা জন্মগত এবং অভ্রান্ত অশিক্ষিত-পটুত্ব। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা গিয়াছে যে, এই অশিক্ষিত-পটুত্বটি একেবারে অভ্রান্তও নহে এবং সম্পূর্ণও নহে। প্রবৃত্তি আমাদের ভ্রান্ত নির্দ্দেশও দিয়া থাকে। তাহার ভ্রান্ত নির্দ্দেশে চলিতে চলিতে লক্ষ লক্ষ পক্ষী মাঝ-সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ডুবিয়া মরে, কুকুর বিড়াল প্রভৃতিও পথ ভুলিয়া যায়, অপত্য-প্রবৃত্তির ভ্রান্ত পরিতৃপ্তিতে খড়-পোরা মরা বাছুরের মূর্ত্তি দেখিয়াও গো-মহিষের মাতৃদুগ্ধ ক্ষরিত হইতে থাকে ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, প্রবৃত্তিগুলি যে জন্ম হইতেই পূর্ণতা লইয়া আসে, তাহা নহে। নবজাত শিশু স্তন্যপান করিবার প্রবৃত্তিটির প্রেরণায় শুধু যে স্তন্যই পান করে, তাহা নহে—তাহার মুখের কাছে হাতের আঙ্গুল ধরিলে তাহাকেও সে চুষিতে চেষ্টা করিবে, আবার তাহার মুখে মুখ দিয়া তাহার বুড়ি ঠাকুমা যদি আদর করিতে যান, তাহা হইলে বৃদ্ধার নাকটিকেও সে পরম তৃপ্তির সহিত চুষিতে থাকিবে।

প্রবৃত্তি যে অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষিত হয়, তাহার বহু প্রমাণই পাওয়া যায়। পাখীর বাসা প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে ভাল হয়, মাকড়সার জাল প্রথম প্রচেষ্টায় যতটা ভাল হয়, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তাহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বটি শিক্ষকদের নিকট খুব প্রয়োজনীয়। কারণ ইহা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের চেষ্টা ও সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে।

(৫) পঞ্চমতঃ মনে রাখা উচিত যে, প্রবৃত্তিগুলিকে বিষয়ান্তরে পরিচালিত বা পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। কিভাবে সেগুলিকে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, কিভাবে সেগুলিকে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহা পরে আলোচিত হইবে। শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া উপস্থিত এই তথ্যটিকে

এইজন্যই খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, অবাঞ্ছনীয় বা অসামাজিক বৃত্তিগুলিকে আমরা সংযত বা সংস্কৃত করিতে পারি।

(৬) ষষ্ঠতঃ প্রবৃত্তিগুলি কিছু-না-কিছু প্রেরণা ও সঙ্কেতের অপেক্ষা রাখে। এই প্রেরণা ও সঙ্কেতটি না পাইলে প্রবৃত্তিগুলি আপনা আপনিই বিকশিত হইতে পারে না। এই তত্ত্বটিও শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষক প্রেরণা ও সঙ্কেতের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ করিতে পারেন, আবার অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির অকাল বোধন যাহাতে না হয়, সেই মত ব্যবস্থা করিবার জন্য সঙ্কেতগুলিকে বিলম্বিত করিতে পারেন।

প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত বা পরিবর্ত্তিত করার উপায় ঃ

(১) **শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা ঃ** এই উপায়টি অন্যান্য উপায়ের তুলনায় খুব কার্য্যকরী না হইলেও, ইহার প্রয়োগ খুব ব্যাপকভাবে হয়। তবে মাত্রার দিক দিয়া বাড়াবাড়ি না করিলে ইহাতে অনেকখানি ফল পাওয়া যাইতে পারে।

(২) **প্রতিক্রিয়ার পরিবর্ত্তন দ্বারা** (change of response) ঃ আমরা একজন বিখ্যাত পালোয়ানের সম্বন্ধে শুনিয়াছি, তিনি যখন খুব ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্রোধে যখন তাঁহার গা ঈশ্‌পিশ্‌ করিত, তখন তিনি চেঁচামেচি মারধোর প্রভৃতি না করিয়া হাজারখানেক ডন্ বৈঠক দিয়া দিতেন। ফলে রাগের মাথায় অন্যায় কাজ করার হাঙ্গামা হইতে তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। এই জাতীয় কাজ আমরাও প্রায়ই করিয়া থাকি। অন্ধকার রাস্তায় একা-একা চলিতে-চলিতে ভূতের ভয়ে শরীর অবসন্ন হইতে থাকিলে আমরা হয়ত জোরে গান ধরি, দুঃখে কান্না পাইলে তাহাকে হাসি দিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং কার্পণ্যের জন্য যে বালকের হাত দিয়া জল গলে না, তাহারই হাত দিয়া ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া, লোভী বালককে দিয়া ভাইবোনের নিকট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করতঃ আমরা ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি।

(৩) **প্রবৃত্তিগুলির উদগতি** (Sublimation) **বা উৎকর্ষণের দ্বারা ঃ** এই উৎকর্ষণ কথাটি মনোবিজ্ঞানের তথা শিক্ষা-বিজ্ঞানের খুব

প্রয়োজনীয় কথা। আমরা জানি প্রবৃত্তিগুলি প্রাণী-জগতের মধ্যে জীবনের প্রেরণাতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা ও প্রয়োজন এবং সমাজগত নীতি বা কল্যাণ অনেক সময়েই একই খাতে প্রবাহিত হয় না। ব্যক্তিগত জীবন-প্রেরণা যাহা চায়, সমাজগত নীতি বা কল্যাণ হয়ত তাহাতে ব্যাহত হয়। উৎকর্ষণের মূল কথাটি হইতেছে, প্রবৃত্তির স্রোতটিকে মানুষের আদিম পশুজীবনের লক্ষ্য হইতে ভিড়াইয়া মোড় ফিরাইয়া সমাজ-কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করান। তাহাতে প্রাণবেগ প্রতিরুদ্ধ হয় না, শুধু তাহার গতি-পথটি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। ফলে "সাব্‌লিমেশন্"-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত প্রতিরোধ নাই, অবদমনজনিত গোপন বিদ্রোহ নাই, ভাবের ঘরে চুরি করার মত একটা ভণ্ডামির অবকাশও নাই। এই "সাব্‌লিমেশন্" কথাটি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে যৌনপ্রবৃত্তি সম্বন্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান বলে, এই "সাব্‌লিমেশন" জিনিষটি যৌনপ্রবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। নারীদের প্রতিবেশীদিগের রান্নাঘর ও আঁতুড় ঘর সম্বন্ধীয় কৌতুহল এবং পুরুষদিগের অহেতুক পরচর্চ্চার কৌতুহলকে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সংক্রান্ত কৌতূহলের খাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে, শারীরিক ভয়ের প্রবৃত্তিকে পাপের প্রতি ভয়, আদর্শচ্যুতির ভয় প্রভৃতির খাতে মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, পশু-জীবনের আদিম সংঘপ্রবৃত্তিকে বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের লোক-লৌকিকতা সামাজিকতার খাতে প্রবাহিত করান যাইতে পারে, আদিম যুযুৎসা ও হিংসাকে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতার কাজে লাগান যাইতে পারে, সঞ্চয়ী-প্রবৃত্তিটাকে একটু মোড় ফিরাইয়া ডাক টিকিট সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত করান যাইতে পারে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, শিক্ষাতত্ত্বের শেষ কথাই হইতেছে জৈব আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া উৎকর্ষিত করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য মনুষ্যত্বের উন্নতি ও পরিপূর্ণতার জন্য নিযুক্ত করা। অবাঞ্ছিত মনে করিয়া প্রবৃত্তিগুলিকে গলা টিপিয়া মারিলে সে কাজ সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, ভাল বা

মন্দের চিরন্তনী মাপকাঠি নাই, অহিংসা ভাল বলিয়া হিংসা বা যুযুৎসাকে বাদ দিলে চলিবে না, তাহা হইলে অহিংসার ছদ্মবেশে কাপুরুষতা আসিয়া পড়িবে ; ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভাল বলিয়া ভোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় আসিবে ; যৌনপ্রবৃত্তি মন্দ বলিয়া তাহাকে উৎখাত করিলে চলিবে না, তাহাতে ক্লীবত্ব আসিবে। কাজেই শিক্ষার বড় কথা হইতেছে প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত না করিয়া তাহাদিগকে উৎকর্ষিত করা। প্রবৃত্তির-"ছাঁটাই"-এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই, তাহার পূর্ণতা, সমন্বয় ও সমাজ-হিতৈষণার মধ্যেই মনুষ্যত্ব।

(৪) **পরিবেশ বা প্রেরণার পরিবর্ত্তনের দ্বারা** (**Change of environment or stimulii**) **ঃ**

"প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরং"—প্রবৃত্তির প্রলোভনের বস্তুকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার চেয়ে প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই ভাল। কবি বলিয়াছেন—

কাজলকী ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে
যুবতী কি সাথ মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া কাম জাগে পর জাগে।

কাজলের ঘরে শুইলে শরীরে কিছু না কিছু কালি লাগিবেই, যুবতীর সঙ্গে শয়ন করিলে কিছু না কিছু কাম জাগিবেই। এই তত্ত্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয় ; ছাত্রের সঙ্গী-নির্ব্বাচনের দিক দিয়া, বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাসের পরিবেশ নির্ব্বাচনের দিক দিয়াও এই তত্ত্বটির খুব উপযোগিতা আছে। বার্ট (Cyril Burt) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, লণ্ডনের খারাপ পাড়ার অথবা যে সমস্ত পাড়ায় সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতির প্রলোভন বেশী, সেই সমস্ত পাড়ার ছেলেদের অপরাধ-প্রবণতা বেশী হয়।

(৫) **প্রতিস্পর্দ্ধী-আকর্ষণের** (**counter attraction**) **ব্যবস্থা দ্বারা ঃ** পরিবেশের পরিবর্ত্তন করা হয়তো অনেক সময়েই অনেকের সাধ্যের অতীত হইতে পারে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্দ্ধী আকর্ষণের

সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার দত্ত যখন চাতরা (শ্রীরামপুর) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের লইয়া নৌকাভ্রমণ এবং নৌকায় গান-বাজনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ছাত্রদের জন্য বিতর্ক-সভা, লাইব্রেরি প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইভাবে উচ্চতর আনন্দের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তাহাদিগকে হীন আনন্দের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(৬) **বিরোচনের (Cathersis) দ্বারা ঃ** এই বিরোচন বা "ক্যাথার-সিস্" জিনিষটা হইতেছে ভোগের ভিতর দিয়া ভোগের কামনাকে জয় করিবার চেষ্টার মত। কামনাকে জোর করিয়া অবদমিত করিলে অতৃপ্ত কামনাজনিত জট্ (complex)* অথবা ভণ্ডামী জাতীয় একটা জিনিষ সৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক সময় ভোগের বস্তুর প্রাচুর্য্য দিয়া ভোগের বাসনাকে তৃপ্তি দিয়া ভোগেচ্ছাকে সংযত করিবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবিক ভোগকে একেবারে অস্বীকার করিয়া ত্যাগের সাধনা অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়। এই জাতীয় ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করিয়াই শেষ প্রশ্নের কমল হরেন্দ্রের আশ্রমে বলিয়াছিল "যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন, যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে। এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরী করতে হয় নি।" যুক্তিটা হয়ত খানিকটা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভোগের জয়গানের ভিতর দিয়াও মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত হয় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণমার্ত্ম ব ভূয়োএবাভিবর্দ্ধতে ॥"

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Complexকে "গূঢ়ৈষা" বলা হইয়াছে। ফ্রয়েডীয় Complex প্রসঙ্গে এই "গূঢ়ৈষা" শব্দটি খুবই সার্থক। কিন্তু engram complex প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই "গূঢ়ৈষা" শব্দটি খানিকটা নিরর্থক বলিয়া আমরা Complex অর্থে জট্ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহা খানিকটা সহজবোধ্য এবং ব্যঞ্জনাময়ও বটে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত শুধু ভোগের দ্বারা কামের সাম্য সম্ভব নয়। এই হেতু ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য বিধান দরকার ; এ দিকটাও শিক্ষকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রবৃত্তিগুলি যতই সহজাত বা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদিগকে সংযত করা যায় এবং প্রবৃত্তির স্রোতকে শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিয়া মনুষ্যত্বকে বিকশিত করা যায়। তবে এই সম্বন্ধে একটি কথা আছে। অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিবার জন্য সাধারণতঃ যে দুইটি পথ অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ (১) তাহাদিগকে জোর করিয়া অবদমিত করা (repression) অথবা (২) তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া খোরাক না দিয়া বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করা, এই দুইটি পথ প্রায়ই ফলপ্রসূ হয় না। কারণ প্রবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া অবদমিত করিলে "ফ্রয়েডীয় জট্" বা গূঢ়ৈষার (Complex) সৃষ্টি হয় এবং তাহাদিগকে খোরাক না দিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করিলে তাহারা উপসী ছারপোকার মত একবার সুযোগ পাইলে বাধ্যতামূলক সংযমের বঞ্চনাকে সুদে আসলে পুষাইয়া লয়। এইজন্য কৃপণ ধনীর ছেলে বাপের সম্পত্তি পাইলেই বেপরোয়া বিলাসে দু'দিনেই সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়া তাহার নাবালক জীবনের বঞ্চনার শোধ লইয়া থাকে, অথবা অতি গোঁড়া, আচারনিষ্ঠ, কড়া বাপের ছেলে বড় হইয়াই ব্যাভিচারী হইয়া উঠে। পিউরিটান্ যুগে ইংলণ্ডের নর-নারীকে জোর করিয়া ধার্ম্মিক করিবার জন্য থিয়েটারের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পার্কের উলঙ্গ মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে চুণ-বালির আস্তরণ দিয়া ভব্য করিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্ত্তী Restoration যুগে নরনারীর (তথা শিল্প সাহিত্যের) মধ্যে ব্যাভিচারের বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন আসিয়াছিল।

এইজন্য অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিলে অথবা তাহাদের অনশনের ব্যবস্থা করিলে ফল ততটা ভাল হয় না। ইহার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হইতেছে প্রবৃত্তিগুলির উদ্গতি বা উৎকর্ষণ করা অথবা প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজ-কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করা। খারাপ প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে শুধু "চুপ্, চুপ"

বা "ছি ছি" নীতি ভাল না; ছেলেদের "কি ও কেন" প্রশ্নগুলিকে শুধু দাবাইয়া দিলেও চলিবে না।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া বৃত্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার ও পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল না। ম্যাক্‌ডুগাল খেলা জিনিষটিকে প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু থর্নডাইক, স্যাণ্ডিফোর্ড, খেলাকেও প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাপারে ক্রীড়া এবং ক্রীড়াচ্ছলে (Play-way in Education) অবদান অনস্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এইগুলি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা হইয়াছে।

এই ক্রীড়াচ্ছল ছাড়া কৌতূহল, ভয়, গঠন-প্রবৃত্তি, সঞ্চয়ী-প্রবৃত্তি, যৌথ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই ক্লাশের পাঠন-ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে।

গ্রীক পুরাণে Pandoraর কৌতূহল লইয়া গল্প আছে এবং সেখানে দেখান হইয়াছে, এই আদিম কৌতূহল মানুষের অনেক ক্ষতিই করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া কথাটা সত্য নহে। কৌতূহলই মানুষকে প্রথম অজানার সন্ধানে প্রেরণা দিয়াছে এবং শিক্ষার সাধনার রুক্ষতাকে সুন্দরের অভিসারের আনন্দ দিয়া মধুরায়িত করিয়া তুলিয়াছে। ক্লাশের পাঠনের এবং ডিসিপ্লিনের শতকরা নব্বই ভাগই সিদ্ধ হইয়া যায়, যদি পাঠনের বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করা যায়।

এইভাবে আস্ফালন প্রবৃত্তি, যৌথপ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সব প্রবৃত্তিগুলিকেই একটু উৎকর্ষিত করিয়া ক্লাসের পাঠন কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া প্রবৃত্তির যে একটি অনুভূতির দিক আছে, সেই অনুভূতির দিকটি অর্থাৎ আবেগ বা প্রক্ষোভ জিনিষটিও শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। শিল্প-কলা সম্বন্ধে আগ্রহ-সৃষ্টি করা, নীতি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা, জাতীয়ত্বের প্রেরণা সৃষ্টি করা—এই সমস্ত ব্যাপারে শুষ্ক যুক্তিবাদের চেয়ে আবেগের আবেদন অনেক বেশী। এই আবেগকে জাগ্রত করিয়াই শিক্ষক তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রদের প্রভাবান্বিত করিতে পারেন।

নোদনা ও প্রেষণা

(Drive & Motivation)

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া বিতণ্ডা নানা প্রকার থাকিলেও, প্রবৃত্তিকে যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই একমত যে—

(১) ইহা একটি সহজাত জিনিষ

(২) ইহা গোষ্ঠীর সকলের উপরই কার্য্যকরী

কিন্তু নাইট (Knight), ডানল্যাপ (Dunlap), ওয়াটসন (Watson), হপকিন্স (Hopkins), বার্ণার্ড (Bernard), উড্ওয়ার্থ (Woodworth), প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকগণ কোনও প্রকার সহজাত বুদ্ধি বা কর্ম্মপটুত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সমস্ত আচরণই অর্জিত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য প্রবৃত্তি (instinct) জিনিষটির অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের অনেকেরই পুস্তকে প্রবৃত্তি (instinct) সম্বন্ধে কোনও পরিচ্ছেদই দৃষ্ট হয় না। আর দুই একটি পুস্তকে যদি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখও থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তিবাদকে খণ্ডন করিবার জন্যই, সমর্থনের জন্য নহে। অথচ প্রাণীদের আচরণের এমন কতকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায় যেগুলিকে নিছক শিক্ষাসাপেক্ষ ক্রিয়া (learned activity) বলা যায় না। এ গুলিকে ইহারা বরং প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (instinctive activity) বলিবেন, তবু প্রবৃত্তি (instinct) বলিবেন না। তাহা হইলে সেকেলে হইয়া যাইতে হইবে। তাহা যেন বড় অপবাদের কথা। কেহ কেহ এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (inherited বা unlearned) ক্রিয়া বলে।

কিন্তু এই প্রকার কথার মারপেঁচ্ করিয়া প্রবৃত্তিবাদের মূল তত্ত্বটিকে অস্বীকার করা যায় না।

যাহাই হউক, যাঁহারা প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তাঁহারা প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং কি ভাবেই বা প্রবৃত্তিবাদকে খণ্ডন করেন তাহা দেখা যাউক।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াবাদ ঃ

কেহ কেহ বলেন, প্রাণীজগতের আচরণের মধ্যে সহজাত (instinct) কর্ম্মপটুতা কিছুই নাই। তাঁহাদের মতে প্রাণীদের সমস্ত আচরণই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া দ্বারা বুঝান যায়। প্রাণীদের সমস্ত আচরণই জন্মোত্তর যুগের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিওনার্দ ব্লুমফীল্ড (Leonard Bloomfield) দেখাইয়াছেন, বিড়াল ও কুকুরের বৈরিতা অহি-নকুলের বৈরিতার মতই সহজাত বলিয়া সুপরিচিত। কিন্তু কুকুর ও বিড়াল শিশুকে একত্র পালন করিলে তাহারা বেশ বন্ধুভাবেই আচরণ করে। সুতরাং কোনও আচরণই সহজাতও নহে, নির্ব্বিকল্পও নহে। ওয়াট্‌সন (Watson) দেখাইয়াছেন, "ভয়" বলিয়া তথাকথিত প্রবৃত্তিটি আদৌ প্রবৃত্তি নহে। ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা সৃষ্ট হয়।

শুধু তাহাই নহে। প্রবৃত্তির (instinct) যাহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সমভাবে ক্রিয়াশীলত্ব, তাহাও সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। দেখা যায় যে, তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক কাজগুলি প্রায়ই পরিবেশ-সাপেক্ষ। এই যুক্তির সমর্থন প্রসঙ্গে তাঁহারা নৃতত্ত্ববিদ্যার (Anthropology) বহু দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। রিভার (H. R. River) দেখাইয়াছেন যে, মারে নামক দ্বীপে অপত্যবৃত্তির প্রেরণায় আত্মজ সন্তান-পালন রীতি নহে। সেখানে পরের পুত্রকে পোষ্যপুত্র হিসাবে পালন করাই রীতি। সেখানে অধিক সংখ্যক পুত্র বা কন্যা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। মীড্ (Mead) লক্ষ্য করিয়াছেন যে, Manees সমাজে পিতাই করে লালন-পালন, মাতা নহে। কোন কোনও এস্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তি নাই, সেখানে কলহের নিষ্পত্তি হয় একটা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া। যে সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি এতটা সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে হয় তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সার্ব্বজনীন নহে। কোন কোনও সমাজে পাহাড়, ঝর্ণা প্রভৃতি জিনিষগুলি পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়, আবার কোন কোনও সমাজে অলঙ্কার-পত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সামান্য দুই একটি জিনিষ ব্যতীত বাকী সব জিনিষকেই আলোবাতাসের মত সর্ব্বসাধারণের জিনিষ বলিয়া ধরা হয়। আমাদের সমাজে

প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিটি একটি সর্ব্বসাধারণ গুণ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু এমন মনুষ্য সমাজও আছে যেখানে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা একেবারেই নিষিদ্ধ জিনিষ। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বা সঞ্চয়ী-বৃত্তির সংঘাতে সভ্য-সমাজে কত হানাহানি, কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়; কিন্তু Kwakiuti Indiansদের মধ্যে এই হানাহানি নাই। স্বার্থের সংঘাতে কলহ যখন অনিবার্য্য হয়, তখন সেই কলহের নিষ্পত্তি হয় একটা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া নহে, একটা ভোজের ব্যবস্থার মধ্য দিয়া।

কাজেই যে প্রবৃত্তিকে একটা প্রাক্জন্মগত এবং অনিবার্য্য ও অপরিবর্ত্তনশীল আচরণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়, সেই প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ইহারা সন্দেহ করেন।

নোদনা (Drive) বাদ ঃ

সেইজন্যই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উডওয়ার্থ প্রভৃতি পণ্ডিত প্রবৃত্তি বলিয়া কোনও জিনিষকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জীবজগতের কর্ম্মের প্রেষণা প্রবৃত্তি নহে—"নোদনা" (drive)। এই নোদনার স্বরূপ কি ? প্রথম প্রথম নোদনা বলিতে বুঝা যাইত ইহা এমন একটা শক্তি যাহা কোনও জিনিষকে গতিবেগ দেয় বা চালিত করে। পরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা প্রভৃতি শারীরিক প্রয়োজনকেই নোদনার স্বরূপ বলিয়া ধরা হইয়াছিল। উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে এই নোদনাই (drive) নাকি জীব-জগতের সমস্ত কর্ম্মের কারণ।

নোদনার শক্তি ও পারস্পরিক প্রভাব লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে। ক্যানন (Cannon), কার্লসন (Carlson) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, অল্প ক্ষুধা প্রাণীদিগের কর্ম্মশক্তি ও মানসিক সতর্কতা বৃদ্ধি করে।

সিওয়াং (Hsiwang) নামে একজন চীনা মনস্তাত্ত্বিক সাদা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যৌন-ক্ষুধার ঋতুর সময় (sexual cycle) স্ত্রী-ইঁদুরগুলির কর্ম্মশক্তি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আমাদের নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের সহিত কর্ম্মশক্তির সম্পর্ক আছে কিনা, এই ব্যাপার লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে

যে, ইঁদুরের সমস্ত পিটুইটারি বা থাইরয়েড্ গ্রন্থি কাটিয়া ফেলা হইলে তাহার কর্ম্ম-চাঞ্চল্য প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন নোদনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, জলের অভাব হইলে ক্ষুধার প্রেরণা কমিয়া যায়, ক্ষুধার তীব্রতা যৌন-কামনাকে হ্রাস করে ইত্যাদি।

ইহাদের শক্তির অনুপাত লইয়াও একটা হিসাব হইয়াছে। প্রত্যেক নোদনারই একটি প্রয়োজক (Incentive) আছে। যেমন খাদ্য হইতেছে প্রয়োজক এবং তাহার নোদনা হইতেছে ক্ষুধা, বৎস হইতেছে প্রয়োজক এবং বাৎসল্য হইতেছে নোদনা ইত্যাদি। দরজাবন্ধ খাঁচার মধ্যের কোনও জন্তুর সম্মুখে কোন্ প্রয়োজককে কতবার রাখিলে সে খাঁচার দ্বার খুলিয়া কতবার বাহির হয় তাহা দেখিয়া নোদনার তীব্রতা মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে কোন্ নোদনার কতটা শক্তি তাহার একটা হিসাব পাওয়া যাইতে পারে—

নোদনা (drive)	প্রয়োজক (incentive)	কতবার দরজা খোলা হইয়াছে (Number of crossing)
অপত্য ...	বৎস ...	২২.৪
তৃষ্ণা ...	জল ...	২০.৪
ক্ষুধা ...	খাদ্য ..	১৮.২
যৌনক্ষুধা ...	দয়িতা বা দয়িতের উপস্থিতি ...	১৩.২
অন্বেষণ চেষ্টা ...	নূতন সংস্থান ...	৬.৮

প্রেষণা (motivation)-বাদ ঃ

কিন্তু মানুষের কার্য্যকলাপ এতই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে নোদনার মত একটা নিছক শারীরিক বা শারীর-রাসায়নিক প্রেরণা দিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আচরণ শারীরিক প্রয়োজন বা শারীরিক প্রেরণা ব্যতীত জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম, অর্থনীতি, কলা, কৃষ্টি, আদর্শ প্রভৃতি নানা কারণেই নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেহগত ক্ষুধা, তৃষ্ণা,

যৌনকামনা, অপত্য-প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়াও মানুষ (অন্ততঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ) তাহার জাতি, ধর্ম্ম, আদর্শ প্রভৃতির জন্য একটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ করিয়া যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার বিজ্ঞান-সাধনা করিয়া যান। যৌনকামনাকে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী তাঁহার সাধন-ভজন চালাইয়া থাকেন, অপত্য প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া ধাত্রীপান্নার মত কত মহীয়সী মাতা প্রভুর কল্যাণের জন্য আত্মজ পুত্রের বলির ব্যবস্থা করেন, রাজভৃত্য বীরবর, দাতাকর্ণ প্রভৃতি আদর্শের জন্য স্বহস্তে পুত্রবধ করিয়াছেন। ইহাদের এই সমস্ত আচরণকে নিছক সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (Stimulus response) বা নোদনা (drive) প্রভৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য মানুষের আচরণের প্রেরণার জন্য একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞার প্রয়োজন। যে সমস্ত শক্তি মানুষকে তাহার এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় আচরণে প্রযুক্ত করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পারিভাষিক নাম দিয়াছেন 'প্রেষণা'।

বিভিন্ন পণ্ডিত এই প্রেষণার স্বরূপ ও প্রসার লইয়া বিভিন্নরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে এই সমস্ত প্রেষণার মধ্যে কাহার শক্তি কতটা অথবা তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই বা কিরূপ, কোন্ প্রেষণা অন্য একটি প্রেষণার সহযোগিতা বা বিরোধিতা করে, তাহা লইয়া গবেষণা ও সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে।

প্রয়োজক (incentive) ঃ

তবে এই সমস্ত প্রেষণার শক্তি অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলেও, কতকগুলি জিনিষের প্রভাবে ইহাদের শক্তির তারতম্য ঘটান যাইতে পারে। শাস্তি, পুরস্কার, স্তুতি, নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করা যাইতে পারে। যে জিনিষগুলি এইভাবে প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদিগকে প্রয়োজক (incentive) বলা হয়।

এই প্রয়োজকগুলি কিভাবে আমাদের প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাহা লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে।

ছোট ছোট বালকেরা অঙ্ক কষিতে ভালবাসে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, চক্‌লেট খণ্ডের লোভ দেখাইলে ছাত্রদের কর্ম্মশক্তি শতকরা ৫২% ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহার উপর আবার সফলতার জন্য প্রশংসা ও উৎসাহ দেওয়ার ফলে এই কর্ম্মনৈপুণ্য প্রায় ৬২% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শাস্তি বা পুরস্কার ইতরপ্রাণীদের নোদনাকেও প্রভাবান্বিত করে। গোলক-ধাঁধা হইতে বাহির হইতে শিক্ষা দিতে হইলে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীকে খাদ্যের প্রলোভন দিতে হয়। সার্কাসের কুকুর, বানর প্রভৃতিকেও খেলা শিখাইবার সময় খাদ্যের প্রলোভন দেখাইতে হয়।

শুধু কি পুরস্কারের লোভেই কর্ম্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়? শাস্তির ভয় দেখাইয়া অথবা সত্যিকারের শাস্তি দিয়া কি কর্ম্মপ্রেরণার বৃদ্ধি সাধন করা যায় না? যায়।

গোলক ধাঁধা ধরণের পরীক্ষায় ইয়ার্কিস (Yearkes) এবং ডডেন (Dodden) দেখাইয়াছেন, সহজসাধ্য কাজের ব্যাপারে খানিকটা মাত্রা পর্য্যন্ত শাস্তির তীব্রতা অনুসারে কাজের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কঠিন ও জটিল কাজগুলির ক্ষেত্রে ঐ নৈপুণ্য শুধু মৃদু শাসনেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কঠোর শাসনে মনোজগতের মধ্যে একটা বিকলতা আসে এবং তাহার ফলে কর্ম্মনৈপুণ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সাধনার সফলতা কিভাবে অগ্রসর হইতেছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অনেক সময় কর্ম্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রশস্তি ও তিরস্কার কিভাবে আমাদের কাজকে প্রভাবান্বিত করে তাহা লইয়া হার্লক (Elizabeth Hurlock) গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে চারিটি ভাগ করিয়াছিলেন। প্রথম দলের ছাত্রদিগকে প্রতিদিন ভাল কাজের জন্য সুখ্যাতি করা হইত। দ্বিতীয় দলের ছাত্রদিগকে প্রতি দিনের মন্দ কার্য্যের জন্য তিরস্কার করা হইত। তৃতীয় দলকে স্তুতি নিন্দা কিছুই করা হইত না, তবে প্রথম দল দুটীর সাধনা ও সিদ্ধির ফলাফলের সংবাদগুলি তাদের জানান হইত। আর চতুর্থ দলটিকে সম্পূর্ণ অবহেলার মধ্যে রাখা হইত। তাহাদের নিজেদের কাজের সফলতা বা

ব্যর্থতার জন্য স্তুতি নিন্দাও করা হইত না এবং প্রথম দল দুইটির সাধনার ফলাফলের কথাও তাহাদের জানান হইত না।

এই ব্যবস্থার প্রথমেই দেখা গেল, প্রথম দলটি শতকরা ৩৫ ভাগ উন্নতি করিল, দ্বিতীয় দলটি ৪০ ভাগ উন্নতি করিল এবং তৃতীয় দলটি ইহাদের অর্দ্ধেক মাত্র উন্নতি করিল।

ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, যে দলটিকে তিরস্কার করা হইত তাহাদের উন্নতির হারও কিছু হ্রাস পাইল। তৃতীয় দলটির উন্নতির হারও কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু যে দলটি সফলতার জন্য প্রশংসিত হইত তাহাদের উন্নতি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শতকরা ৭৯-তে গিয়া পৌঁছাইল। অবহেলিত চতুর্থ দলটি প্রথম হইতেই কিছুই উন্নতি দেখাইতে পারে নাই এবং ইহাদের কর্ম্মশক্তির একটা বেশী রকম অবনতিও দৃষ্ট হয় নাই।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ডাঃ হার্লক (Hurlock) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দু'চারদিন কাজ করিলেই যে সমস্ত সাধনায় সিদ্ধি আয়ত্ত হয় তাহাতে শাস্তি বা পুরস্কার, স্তুতি বা তিরস্কার প্রায় একই ভাবে কাজ করে। কিন্তু অল্প দিনের সাধনায় যে সব কার্য্যের সিদ্ধি অনধিগম্য, অর্থাৎ যে সব কার্য্যের সিদ্ধির জন্য দীর্ঘমিয়াদী কর্ম্ম-সূচীর প্রয়োজন, তাহাতে তিরস্কার বা শাস্তির চেয়ে উৎসাহ ও প্রশংসাই অধিকতর ফলপ্রসূ।

তবে এই স্তুতি বা প্রশংসার আতিশয্য এই কর্ম্মশক্তিকে হ্রাস করিয়া দেয়। প্রশংসার আতিশয্য অনেক সময়েই ছেলেদের মহামানী দুর্য্যোধন করিয়া তুলে। ফলে আত্মাদরের অনুভূতিতে তাহারা সাধনার কঠিন মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত সাধনার উপর সুদ খাটান মহাজনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম করিতে চায়। এই জন্যই অনেক সময় দেখা যায়, উত্তম চরিত্রগুণের (Best conduct) পুরস্কার পাইবার পর ছেলেদের আচরণ যেন অবিনীত হইয়া উঠে এবং ডবল প্রমোশন বা সুলভে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া ছাত্রদের কৃতিত্বের মান নামিয়া যায়।

এই সমস্ত পরীক্ষা ও তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি খুব চমৎকার এবং তথ্যসমৃদ্ধ হইলেও, এই সব সিদ্ধান্ত লইয়া ব্যবহারিক জীবনে কিছু কিছু ভুল করিবার

সম্ভাবনাও আছে। এই পরীক্ষাগুলির অধিকাংশই হইয়াছে ইঁদুর, গিনিপিগ্, খরগোস, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীদের লইয়া এবং কিছু কিছু হইয়াছে ছোট ছোট বালকবালিকাদের লইয়া। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রাণী মনোবিদ্যা (animal psychology) ও শিশু মনোবিদ্যা (child psychology) এবং বয়স্ক মনোবিদ্যা (adult psychology) এক জিনিষ নহে। কাজেই ইঁদুর, গিনিপিগ্ প্রভৃতির পক্ষে যাহা কর্ম্ম-প্রেরণা, মানুষের পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। মানুষ বাল্য-শৈশব ছাড়িয়া যতই সাবালক হইতে থাকে, তাহার আচরণ ততই প্রাণীদের হইতে বিভিন্ন হইতে থাকে। তখন ক্রমশঃই তাহার মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে শাস্তি-পুরস্কার, স্তুতি-নিন্দা এমনকি সিদ্ধি-অসিদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়াই সাধনার পথে চলিতে পারে। গীতায় এই কর্ম্মকৌশল বা কর্ম্মযোগের তত্ত্বটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগের যাহারা সাধক, সেই কর্ম্মযোগীরা লাভ-অলাভকে সমান করিয়া, জয়ে-অজয়ে অবিচলিত থাকিয়া, স্তুতি-নিন্দাকে সমান চক্ষে দেখিয়া কর্ম্মের পথে চলেন। কাজকে তাঁহারা investment বলিয়া মনে করেন না, বা সামান্য ব্যর্থতা ও পরাজয়ে অভিভূত হন না। ইঁহারা সিদ্ধি চিরায়িত হইলে বিচলিত হইয়া কর্ম্ম-পরিত্যাগ করেন না, কর্ম্মের কঠোরতা দেখিয়াও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন না।

এই কর্ম্মযোগ কিভাবে সম্ভব? মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় যাহাকে রস (sentiment) বলে সেই রস হইতে অধিরাজ রস (master sentiment), অধিরাজ রস হইতে আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্রের বিকাশ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর বহিয়া মনের মধ্যে বৈরাগ্যযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের অবস্থা মানুষের পক্ষে আসা সম্ভব। সেই সময়ে কর্ম্মকে শুধু অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য (catigorical imperitive) বলিয়া মনে করিয়াই লোকে তাহা করিয়া যাইতে পারে। সেই অবস্থায় নাম-যশের 'টোপ্'-এর প্রয়োজন হয় না, প্রতিযোগিতার উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না, উৎসাহের মদের নেশার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় কর্ম্মযোগী পথের কাঁটাকে "রক্তমাখা চরণতলে" একলা দলিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হয়। তাহার ডাক শুনিয়া কেহ না আসিলেও সে একলাই সাধনার দুর্গম পথের অভিযাত্রী হয়। এই

জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিশুকে একদিন অঙ্ক কষাইবার জন্য দুইটি চক্‌লেট্ খণ্ডের লোভ দেখাইতে হইয়াছে, বাহাদুরির খোরাক হিসাবে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতে হইয়াছে, উত্তরকালে সেই বালকটীই হয়ত দিনের পর দিন আনন্দভোগের আমন্ত্রণকে অস্বীকার করিয়া নির্জ্জন গবেষণাগারে জটিল গণিত-বিজ্ঞানের সাধনায় দিন কাটাইতেছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহার সাধনা হয়ত ব্যর্থ সাধনা, তাহার সিদ্ধি হয়ত দুরধিগম্য, কিন্তু তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ হয় না। তখন আদর্শই তাহার প্রয়োজক (inncentive) এবং চরিত্রই * তাহার প্রেরণা।

* "চরিত্রের পথে" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বংশগতি ও উত্তরাধিকার

(Heredity*)

কবি বলিয়াছেন—

"এই প্রভাতের প্রসূনের কলি
হ'তে পারি আমি হায়
এই কি আমার শেষ পরিচয় ?
কেমনে মানিব তায় ?
কত অতীতের বরষা-বাদল,
কত মলয়ের পরশ কোমল,
রাঙায়েছে মোর পরাণের দল
কতবার তুলিকায়
বীজ হ'তে ফুলে, ফুল হ'তে বীজে
কত না ঘুরেছি হায় !"

কথাটা শুধু কবির উচ্ছ্বাসমাত্রই নহে ; প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই এই জাতীয় একটা জটিল আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের রহস্য রহিয়াছে। অসংখ্য পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মসংস্কার এবং বহুবিস্মৃত অতীতের পরিবেশের প্রভাব লইয়াই আমাদের প্রত্যেকের আমিত্বটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমার বর্ত্তমানের আমিত্বটুকুকে গঠন করিবার জন্য আমার পরিবেশই বা কতটা দায়ী এবং পূর্ব্বপুরুষাগত উত্তরাধিকারই বা কতটা দায়ী ?

এ প্রশ্নের আলোচনার পূর্ব্বে বংশগত উত্তরাধিকার (heredity) বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহার আলোচনা প্রয়োজনীয়।

বংশগত উত্তরাধিকার (heredity) **কি ?ঃ** সাধারণের মতে উত্তরাধিকার হইতেছে এমন একটি দুর্জ্ঞেয় শক্তি, যাহার দ্বারা মাতা-পিতার

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Heredityকে বংশগতি বলা হইয়াছে।

দোষগুণগুলি সন্তানাদির মধ্যে সংক্রমিত হয়। সাধারণের মতে মাতাপিতার সহিত সন্তানাদির গুণের সমতাই যেন উত্তরাধিকারত্বের কাজ—গুণের বৈষম্যের সহিত যেন ইহার কোনও যোগ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে, পিতৃপুরুষগণের সহিত সাম্য এবং বৈষম্যগত যাহা কিছু বিশিষ্টতা লইয়া জাতক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকেই উত্তরাধিকার বলা হয়; সুতরাং সুস্থ-সবল মাতাপিতার সুস্থ সন্তান হওয়া অথবা গৌরবর্ণ মাতাপিতার গৌরবর্ণ সন্তান হওয়া যতটা উত্তরাধিকারের বিষয়, তেমনি সুস্থ লোকের অসুস্থ সন্তান হওয়া, সুন্দর লোকের কাল ছেলে হওয়া, সৎ লোকের অসাধু ছেলে হওয়াটাও ততটাই উত্তরাধিকারের বিষয়। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—

(১) কি নিয়মেই বা পুত্র পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হয়?

(২) কি নিয়মেই বা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে?

উত্তরাধিকারের নিয়ম : উত্তরাধিকার ব্যাপারটি দুইটি নিয়মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, যথা (১) সমজাতীয় গুণাবলী সমজাতীয় গুণাবলী সৃষ্টি করে, (২) এই সমত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে বৈষম্য ও নূতনত্বের জন্য একটা ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই নিয়মগুলি আসিল কোথা হইতে?

প্রথম নিয়মটি অর্থাৎ সমজাতীয় গুণাবলী সমজাতীয় গুণাবলী সৃষ্টি করে। ইহার হেতু হইতেছে, রেতঃ বা ধাতুর অপরিবর্তনীয়তা ও অমরত্ব। ওয়েইজম্যান (Weisman) বলিয়াছেন, শুক্রের শুক্রকীট বা বীজপঙ্কগুলি (Germ-plasm) শুধু জাতকের দেহ নির্ম্মাণ করিয়াই নিঃশেষিত হয় না, জাতকের দেহ গঠন করিবার পরও কয়েকটি বীজকোষ (Germ cells) অবিকৃত অবস্থায় নরদেহে অবস্থান করিয়া ভবিষ্যতের বংশধরগণের মধ্যে দেহ হইতে দেহাভ্যন্তরে চলিতে থাকে। সুতরাং জাতকের পিতা শুধু তাহার জনকর্ত্তাই নহে, তাহাদের বংশের বীর্য্যধারার ন্যস্ত-সম্পত্তির রক্ষকও বটে। এই জন্যই একটি বিশিষ্ট বংশের বিশিষ্টতাগুলি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে গমন করিতে থাকে। পরিবেশ বা অনুশীলন বংশগত বিশিষ্টতার উপর তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ফলে ভাল লোকের বংশে

ক্রমাগত ভাল লোক এবং মন্দ বংশে ক্রমাগত মন্দ লোকই জন্মগ্রহণ করিবে। গ্যাল্‌টন্, ডাগ্‌ডেল্ (Galton, Dugdale) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরিসংখ্যান (statistics)-এর দ্বারা ইহার প্রমাণও দিয়াছেন। তাঁহারা ভাল ও মন্দ লোকের বংশধারার ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাল বংশে ভাল এবং মন্দ বংশে মন্দ লোক জন্মগ্রহণ করিবেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) এবং বিখ্যাত অপরাধী জুকের (Juke) বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিতে পারি। ডারউইনের বংশে ঠিক তাঁহার মত না হইলেও, বহু কুশাগ্রধী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং জুকের বংশে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নানাজাতীয় অপরাধের কলঙ্কের ইতিহাস পাওয়া যায়।

গডার্ড (H. H. Gaddard)-এর ক্যালিকাক (Kalikak) বংশ সম্বন্ধে গবেষণাটি আরও চমকপ্রদ। ক্যালিকাকের দুইটি স্ত্রী ছিল ; একজন ছিল নির্ব্বোধ ও মুর্খ বংশজাত এবং আর একজন ছিল সুশিক্ষিত অভিজাত বংশজাত। এই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ৪৮০ জন লোকের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে একটি প্রাণীও দেশের গৌরবস্বরূপ হইতে পারে নাই ; অপর পক্ষে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বংশধারার ৪৯৬ জন লোকের মধ্যে বহু সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় লোকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

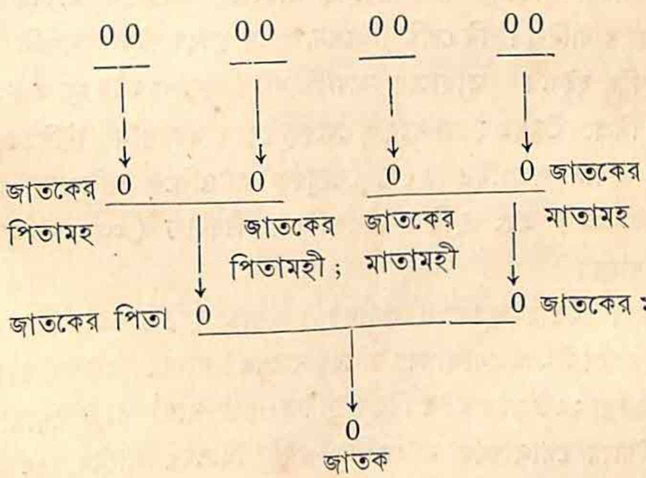
এই সমস্ত ঘটনা আমাদের মন নৈরাশ্য পূর্ণ করিয়া দেয়। মনে হয়, তাহা হইলে কি মন্দ বংশে ভাল লোক জন্মগ্রহণ করিবে না ? গ্যাল্‌টন বলেন, "না, কি করিয়া তাহা হইবে ? আমড়া গাছে কি ন্যাংড়া আম ফলিতে পারে ? পরিবেশ ও অনুশীলন কতটুকু কার্য্য করিতে পারে ? বীর্য্যগত ধারার বিশিষ্টতা প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়। এই অপরিবর্ত্তনীয় ধারার জন্যই দেখা যায় যে, একটি বিশিষ্ট বংশের লোকেরা দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট হয়, অন্য বংশের হয়ত কুঞ্চিত কেশ অথবা প্রশান্ত হনু অথবা কটা চক্ষু হয়।

এই উত্তরাধিকার কি পরিমাণে সংক্রামিত হয় ? গ্যাল্‌টন্ বলেন— জাতক পিতার নিকট হইতে ১/২, পিতা পিতামহের নিকট হইতে

$\frac{১}{৪}$, প্রপিতামহের নিকট হইতে $\frac{১}{৮}$—এইভাবে বিশিষ্টতাগুলি পাইয়া থাকে।

কথাটা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঠিক নয়। নানা জাতীয় জটিল প্রভাব লইয়া জাতকের বর্ত্তমান আমিত্বটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতকের মাতাপিতার দুইজন এবং তাহাদের মাতাপিতার চারজন, একুনে সাতজন—এইভাবে উর্দ্ধতন কুড়ি পুরুষ গণনা করিলে আমরা দশ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক লোকের সন্ধান পাই। বর্ত্তমান জাতকের মধ্যে এই বিরাট জনসঙ্ঘের প্রত্যেকেরই প্রভাব অল্প-বিস্তরভাবে কাজ করিতেছে।

এই উত্তরাধিকারিত্বের স্রোত কিভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।



এখানে উর্দ্ধতন চার পুরুষের উত্তরাধিকারিত্বের স্রোতটি দেখান হইয়াছে। এইভাবে উর্দ্ধতন কুড়ি পুরুষ যাইলে জনসংখ্যা কি বিরাট হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বিরাট জনসংখ্যার প্রত্যেকেই জাতককে কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

ম্যাক্ ব্রাইড্ (Mc. Bride) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বীর্য্যের ধারাবাহিকতায় গ্যালটনের মত স্বীকার করেন বটে, তবে তিনি এ কথা বলেন না যে, একই বীজপঙ্ক (germ plasm) দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। তিনি বলেন, একই বীজপঙ্ক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় না বটে তবে এক জাতীয় জিনিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

মেনডেলীয় মতবাদ ঃ

এই ব্যাপারে মেন্‌ডেল সাহেবের (Mendel) পরীক্ষাটি (১৮৬৫ খৃঃ) আরও তথ্যপূর্ণ। তিনি দুই জাতীয় মটর সুটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এক জাতীয় মটর শুখাইয়া যাইলে কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং আর এক জাতীয় মটর শুখাইয়া যাইলেও ঠিক গোলই থাকে। এই দুই জাতীয় মটরের জোড় কলম বাঁধিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রথম পুরুষে মটর ফসলগুলি সকলই গোলাকৃতি হইল। তাহাদের মধ্যে একটিও কুঞ্চিত মটর হয় নাই। দুই ফসলের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়া সত্বেও, যেহেতু গোল মটরগুলির বিশিষ্টতাগুলিই পরবর্ত্তী ফসলে সংক্রমিত হইল, সেইহেতু এইগুলিকে শক্তিমত্তর বীর্য্যযুক্ত (dominant) এবং কুঞ্চিত মটরগুলিকে ক্ষীণবীর্য্য (recsssive) বলা যাইতে পারে।

এইবার দ্বিতীয় পুরুষদের ফসলের (অর্থাৎ কুঞ্চিত এবং গোলাকার মটরের মিশ্রণে উৎপন্ন গোলাকার মটরের বংশের) পালা। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, শতকরা ২৫টি মটর হইল বিশুদ্ধ কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি গোলাকার। তবে এইবারে গোলাকার মটরগুলির একটু বিশেষত্ব আসিল, ২৫ হইল অবিমিশ্র গোল এবং ৫০টি হইল গোল, তবে মিশ্র প্রকৃতির।

তৃতীয় পুরুষে দেখা যাইল, অবিমিশ্র গোল মটরগুলির সন্ততিগুলি ঠিক গোলই হইল, অবিমিশ্র কুঞ্চিত মটরগুলির সন্ততিও কুঞ্চিত হইল, কিন্তু প্রত্যেকটি মিশ্র প্রকৃতির মটর হইতে শতকরা ২৫টি মাত্র কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি পূর্ব্ববৎ গোল (অর্থাৎ ২৫টি বিশুদ্ধ গোল এবং ৫০টি মিশ্র গোলাকৃতি) মটর হইল। ব্যাপারটা এইভাবে চার্টের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

গোল মটর + কুঞ্চিত মটর
(Dominant) | (Recessive)
↓

১ম পুরুষের ফসল ১০০% গোল
↓

২য় পুরুষের ফসল
২৫% গোল ৫০% মিশ্র ২৫% কুঞ্চিত

৩য় „ „ ১০০% গোল | | | ১০০% কুঞ্চিত
২৫% গোল ৫০% মিশ্র ২৫% কুঞ্চিত

এই পরীক্ষার পর মেণ্ডেল (Mendel) আরও নানা জাতীয় মটর এবং ছোট ছোট জন্তু লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে তিনি যে তিনটি সূত্র পাইয়াছিলেন তাহা এই ঃ

(১) একটি গাছ বা প্রাণীর মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য আছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়াই সে একটি একক (unit) ; কিন্তু প্রজনন ও উত্তরাধিকারের দিক দিয়া প্রত্যেক পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলিই এক একটি একক। আলোচ্য মটরগুলির ক্ষেত্রে তাহাদের গাছের রং, গাছের ঝাড়, ফুলের গঠন, ফুলের কুঞ্চন বা গোলত্ব—এইগুলির মধ্যে গোলত্বই তাহার উত্তরাধিকারের দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অন্যান্য বিশেষত্ব নিরপেক্ষভাবেই এই বৈশিষ্ট্যটিই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইবে।

(২) এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কতকগুলি ক্ষীণবীর্য্য এবং আর কতকগুলি শক্তিমত্তর।

(৩) যখন এই উভয়ের সংমিশ্রণে নূতন বংশের সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম পুরুষের সন্ততিরা হয় মাতার নয়তো পিতার শক্তিমত্তর (dominaut) গুণগুলি পাইবে—উভয়ের মিশ্র গুণগুলি পাইবে না।

এখন এই মেণ্ডেলীয় মতবাদ মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য হইবে? দেখা গিয়াছে মানুষের ক্ষেত্রে চক্ষুতারকার রং, চুলের রং, আঙ্গুলের হ্রস্বতা, ওষ্ঠের স্থূলতা, নৈশান্ধতা প্রভৃতি dominant প্রকৃতির।

উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ 'সমত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে বৈষম্য ও নূতনত্বের জন্য প্রকৃতির যে ব্যগ্রতা' দৃষ্ট হয়, এইবার তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা জানি, পুত্রকন্যা বাপমার মত হইলেও, ঠিক সর্ব্বতোভাবে তাহাদের মত হয় না—কিছু বৈষম্য থাকিয়াই যায়। মাতাপিতা হইতে পুত্রের বৈষম্যের দুইটি কারণ আছে। যথা—

(১) প্রকৃতির খামখেয়ালী ও আকস্মিকতা (Law of change)।

(২) বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সাধারণত্বের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার প্রচেষ্টা (Law of return to average)।

প্রথম নিয়মটি এইভাবে বুঝান যাইতে পারে। যদি ১০,০০০ লোককে উচ্চতা অনুযায়ী দাঁড় করান হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে হয়ত দুই তিন জন ৭ ফুটের অধিক এবং দুই এক জন ৪ ফুটের কম উচ্চ হইবে; আবার হয়ত দশ বার জন ৬ ফুট হইতে ৭ ফুটের মধ্যে এবং দশ বার জন ৪ ফুট হইতে ৫ ফুটের মধ্যে হইবে। এই ১০,০০০এর মধ্যে হয়ত দেখা যাইবে —৮০০০-এর উপর লোক ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির মধ্যে হইবে।

এই ভাবে দেখা যাইবে, এই বিরাট্ জনতার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই অত্যন্ত দীর্ঘ অথবা অত্যন্ত খর্ব্ব। শরীরের অনুপাত হিসাবে এই কথাটি যত সত্য, মানসিক শক্তি বা প্রতিভার প্রখরতার দিক্ দিয়াও ইহা ততখানিই সত্য। হয়ত এক সহস্রের মধ্যে একজন বা দুই-জন অলৌকিক প্রতিভাশালী লোক মিলিবে এবং একজন বা দুইজন একেবারে নির্ব্বোধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে—বাকী সকলেই প্রায় এক ধরণের হইবে। প্রকৃতির মধ্যে অসাধারণত্বের স্থান খুবই অল্প।

দ্বিতীয় নিয়মটি অনেকটা প্রথম নিয়মেরই মত। প্রকৃতি অসাধারণের পক্ষপাতী নয়। তাই দেখা যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ গঠনের মাতাপিতার সন্তানেরা সাধারণ লোকের অপেক্ষা দীর্ঘতর হইলেও এবং মাতাপিতা অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি হইলেও, ঠিক বামন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পিতার সহিত পুত্রের শরীরের অনুপাতের যতটা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে। প্রকৃতির এই সাধারণত্বের

দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের খেয়ালের জন্যই দেখা যায় যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পুত্র হয়ত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে। প্রকৃতি যেন বুদ্ধি প্রভৃতি জিনিষগুলিকে গড়ে ঠিক রাখিতে চায়। তাহা না রাখিলে প্রকৃতির জাতিগত বিভিন্ন ছাঁচগুলি (type) নষ্ট হইয়া যাইত; দীর্ঘ মানুষের দীর্ঘতর পুত্র, সেই দীর্ঘতর পুত্রের আবার দীর্ঘতর পৌত্র, এইভাবে বাড়িয়া যাইলে তাহার বংশটি দৈত্যের বংশে পরিণত হইত; অপর পক্ষে আবার বামনের বংশটি বালখিল্যের বংশে পরিণত হইত। এই জন্যই বোধহয় গড় ঠিক রাখিবার জন্য প্রকৃতির মধ্যে একটা ব্যস্ততা দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই সমের দিকের **প্রত্যাবর্ত্তন-প্রবণতার** (law of return to average) জন্য যদিও পুত্রকন্যা মাতাপিতার গুণাবলী লাভ করে না, তাহা হইলেও এই নিয়মটি প্রাণীদিগের গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য (type) বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

সমজাতীয় প্রাণীদিগের মধ্য হইতে অসমজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হইয়া কি ভাবে নানা প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে **বিবর্ত্তনবাদের** (evolution theory) আশ্রয় লইতে হয়।

বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিত ল্যামার্ক (Lammarck : 1744-1829) বলেন, প্রাণীজগতের মধ্যে একটা **জীবন-প্রেরণা** (inner urge) সব সময়েই কাজ করিতেছে। এই জীবন-প্রেরণা জীবনের প্রয়োজন বুঝিয়া এবং পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য প্রাণীর মধ্যে দেহগত পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পরে সেই পরিবর্ত্তনটি তাহার পুত্রকন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আজ যে জন্তুটিকে আমরা জিরাফ বলিয়া অভিহিত করি, সে হয়ত অতীত যুগে একদিন খাদ্য সন্ধানের জীবন-প্রেরণায় তাহার গলাটিকে বড় করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল এবং ক্রমাগত গলা বাড়াইয়া বাড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টার ফলে হয়ত তাহার গলাটি সত্য সত্যই একটু দীর্ঘতর হইয়াছিল। পরে তাহার বংশধরেরা দীর্ঘতর গলা লইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং ঐ একই জীবন-প্রেরণার বশে আরও দীর্ঘতর গলা লাভ করিয়াছিল। এইভাবে জীবন-প্রেরণাবশে অতীতের জেব্রা জাতীয় একটি প্রাণী বর্ত্তমানের জিরাফে পরিণত হইয়াছে।

ডারউইন-মতবাদ ঃ

বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিত ডারউইন (Darwin : 1809-1828) বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণিগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই দ্বন্দ্বে যে উপযুক্ততম হইতেছে, প্রকৃতি তাহাকেই যেন পছন্দ করিয়া বাছিয়া রাখিতেছেন, আর বাকী সকলকে জীবনের আসর হইতে দূর করিয়া দিতেছেন।

ডারউইনের মতে প্রকৃতি যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন জননীর মত সৃষ্টির আনন্দে শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন, তাহার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে খাদ্য অন্বেষণের প্রয়োজনে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায়, এই সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনগুলি বংশক্রমে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্ত্তন হইতেছে এবং যে শ্রেণীটি বাঁচিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইতেছে, সে-ই টিকিয়া যাইতেছে এবং বাকী সকলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে।

যে জগতে আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া প্রীতির নীড় রচনা করিয়া সুখে পরম নির্ভরশীলতা লইয়া কাজ করিতেছি, সেই জগতটিকে ডারউইন (Darwin) যেন একটি গ্লাডিয়েটারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিষ্করুণা স্পার্টান মাতার মতই প্রকৃতিও যেন অক্ষম পুত্রকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া শুধু শক্তিমান পুত্রগুলি লইয়াই বাহাদুরী করেন। কাজেই জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য তাঁহার সৃষ্ট সন্তানদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলিতেছে, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি ও বঞ্চনা চলিতেছে, বাঁচিবার আঁকুপাকুতে জঘন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

এই মতবাদটি খানিকটা বিজ্ঞানের দিক দিয়া সত্য হইলেও, ইহা আমাদের আদর্শবাদকে আঘাত করে। সেই জন্য বের্গসঁয়ের (Bergson) **সৃজনপ্রবণ অভিব্যক্তি** (Creative Evolution)-বাদের ভিতর দিয়া ল্যামার্কের (Lammarck) সিদ্ধান্তটিই যেন আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদের অন্য একটি ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক হিউগো (Prof. Hugo de Vries: 1900) নামক পণ্ডিত তাঁহার **ব্যতিক্রমবাদ** (Mutation theory) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি সান্ধ্য প্রিম্‌রোজ (Primrose) গাছের আচরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল গাছটি নূতন ধরণের ফুল প্রসব করিল, তাহার পর পরবর্ত্তী বংশধরেরা ফুলের গঠনের দিক দিয়া গাছটির প্রাচীন গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যে ফিরিয়া না যাইয়া নূতন বৈশিষ্ট্যগুলিকেই গ্রহণ করিল। এই ভাবে এক দিনের হঠাৎ-ঘটা খেয়াল বা ব্যতিক্রমটিই উত্তরকালে নূতন এক শ্রেণীর (type) গাছের সৃষ্টি করিল।

প্রাণী জগতের মধ্যে এই ভাবে হঠাৎ-ঘটা পরিবর্ত্তনটি স্থায়ী হইয়া গিয়া নূতন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যালটন (Galton) এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া ইহাকে একটি "পলিগনের" (polygou) উল্টাইয়া যাইয়া নূতন একটি ভূমিতে (base) ভর করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ানর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

শক্তি-গোষ্ঠীর প্রকল্প (Factorial hypothesis):

এই প্রসঙ্গে মরগ্যানের (Morgan) 'Factorial hypotheis'-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারের প্রথম নিয়ম অর্থাৎ "Like tends to begt like"-এর কারণ হিসাবে আমরা ওয়েইজম্যানের (Weisman) বীজপঙ্কের অমরত্ব ও অব্যাহত ধারার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। মেণ্ডেলের মতবাদও পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এক হিসাবে মেণ্ডেলের তত্ত্বটি উত্তরাধিকারের প্রথম নিয়মটিই বুঝাইয়া দেয় না, ইহা দ্বিতীয় নিয়মটিও অর্থাৎ সমজাতীয় জিনিষ হইতে নূতন নূতন শ্রেণী (type) কি ভাবে সৃষ্টি হয়, তাহাও খানিকটা বুঝাইয়া দেয়। প্রজননের ভিতর দিয়া, সৃষ্টির বৈচিত্র্য কিভাবে বাড়িয়া যাইতেছে মরগ্যানের 'Factorial hypothesis' তাহার অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এই প্রকল্প (hypothesis)-টি কি?

মেণ্ডেলীয় (Mendelin) তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিয়াছি, বীজের মধ্যস্থ gametes বা জননকোষই হইতেছে উত্তরাধিকারগত বৈচিত্র্যের কারণ। এই জননকোষগুলির মধ্যে ক্রমোসম (chromosomes) নামে এক প্রকার সূত্রাকার পদার্থ থাকে। প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বীর্য্যকোষের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট সংখ্যক ক্রমোসম থাকে। মানুষের ক্রমোসমের সংখ্যা হইতেছে ৪৮; গোরু, পিঁয়াজ, গম ও গিনিপিগের ১৬; বানরের ৫৬, ইঁদুরের ৪০, আলুর ৩৭, তুলা গাছের ৫৬ ইত্যাদি।

মেণ্ডেলের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল স্ত্রী পুরুষের ক্রমোসমের মিশ্রণ ও গ্রন্থন-বৈচিত্র্যের জন্যই জাতকের দেহ ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়।

মরগ্যান দেখাইয়াছেন, জাতকের চরিত্র বা দেহগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্রমোসমই শেষ কথা নয়, তাহার মধ্যে আরও অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। ক্রমোসমের মধ্যে আবার Gens বা factors নামক আরও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। প্রত্যেক ক্রমোসমের মধ্যে যতগুলি genes বা factors আছে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই, তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মানুষের ক্ষেত্রে পিতার বীর্য্যকোষ (sperm) ও মাতার ডিম্বকোষের (ova) মিশ্রণে যে নূতন কোষটির উদ্ভব হয়, তাহার শক্তির (factor) সংখ্যা, মিশ্রণ-বিন্যাস ও গ্রন্থনের দিক দিয়া দশ লক্ষেরও অধিক প্রকারের বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই বিচিত্রতা হইতেই প্রজননগত সৃষ্টিবৈচিত্র্য ঘটিতে থাকে।

মরগ্যান প্রজননের বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে gene বা factorকে আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তত্ত্বটিকে শক্তি-গোষ্ঠীর প্রকল্প (Factorial hypothesis) বলা হয়।

অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার ঃ

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রজনন সম্বন্ধে দুইটি নিয়মের কারণ না হয় বুঝিলাম; কিন্তু এই প্রজননের ব্যাপারটিকে মানুষ কতখানি প্রভাবান্বিত করিতে পারে? প্রজননগত উত্তরাধিকার কি নিছক প্রকৃতির খেয়াল

অনুসারেই চলে ? অথবা মানুষ তাহার জীবনের সিদ্ধি ও শক্তি অর্জ্জনের সম্ভাবনাটিকেও তাহার ভাবী বংশের জন্য রিদ্ধি হিসাবে রাখিয়া যাইতে পারে ?

এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন আছে। সেটি হইতেছে, পিতৃপুরুষের শক্তি বা প্রতিভার দান যদি আমরা নাও পাই, তাহা হইলে এই ইহ জীবনের চেষ্টায় উন্নতি করিতে পারি কি না ? এই দুইটি প্রশ্নকে অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে (১) অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বা শক্তি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না, এবং (২) পরিবেশ বা শিক্ষা বংশগত উত্তরাধিকার-দৈন্যকে ছাপাইয়া কাজ করিতে পারে কি না ?

এখন প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য (acquired traits) উত্তরাধিকার হিসাবে চলিতে পারে কি না, এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মোটামুটি জানি, কাহারও যদি হাত কাটিয়া যায় অথবা পা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পুত্রও কাটা হাত বা খোঁড়া পা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ওয়েইজম্যানের (Weisman) জননকোষের অমরত্ব ও ধারাবাহিকত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বটি যদি সত্য হয় অর্থাৎ পিতার শুক্রের একটা অংশ যদি পুত্রের দেহ তৈয়ারী করিবার পর আবার সেই পুত্রটির ভাবী বংশসৃষ্টির জন্য পুত্রেরই দেহে অবিকৃত ভাবে রক্ষিত থাকে, তাহা হইলে বয়স্ক জীবনের অর্জ্জিত নূতন কোনও বৈশিষ্ট্য সেই সংরক্ষিত জননকোষকে আর পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সুতরাং অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য পুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হইতেও পারে না। এই সত্যটি পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়েইজম্যান বংশপরম্পরাক্রমে ইঁদুরদের লেজ কাটিয়া লাঙ্গুলবিহীন ইঁদুর সন্ততির সৃষ্টি হয় কি না, পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কোনও লেজকাটা ইঁদুরের লেজকাটা বাচ্চা হইল না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি (acquired traits) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না।

কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ টমসন্ (Thomson) এবং গেড্‌স (Geddes) ওয়েইজম্যানের এই মতবাদে ততটা বিশ্বাস করেন না। ইঁহারা তাঁহাদের 'Evolution' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, কোনও উত্তেজনা (stimulas)

বার বার ঘটিতে থাকিলে প্রতিক্রিয়ার ফলটি স্নায়ুপথ তথা জৈবনিক সেতু (Protoplasmic bridges) পর্য্যন্ত সংপৃক্ত (saturate) করিয়া থাকে। তাহা হইলে অন্ততঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে ইহার ফলটি দেহীর দেহস্থ জননকোষকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, ইহা ভাবিতে বাধা কোথায় ?

ইহা ছাড়া ওয়েইজম্যানের পরীক্ষাটি অন্যদিক দিয়াও সিদ্ধ নহে। লামার্ক বলিয়াছিলেন, অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য জীবন-প্রেরণাবশেই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদকে খণ্ডিত করিবার জন্যই অর্থাৎ অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই ওয়েইজম্যান দেখাইয়াছিলেন যে, লেজ-কাটা ইঁদুরের লেজ-কাটা সন্তান হয় না। কিন্তু এক হিসাবে ওয়েইজম্যানের মতবাদটি লামার্কের বিপরীত সিদ্ধান্তটিই অর্থাৎ জীবন-প্রেরণাবাদকেই প্রমাণ করে। বার্ণাড শ' বলিয়াছেন, ইঁদুররা যে তাহাদের লেজ হারায় নাই তাহার কারণ তাহারা হারাইতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি বলিয়াছেন, "A vital conception of evolution would have taught Weisman that biological problems are not to be solved by assults on mice."

অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইতে পারে কিনা—ইহা লইয়া ওয়েইজম্যানের (Weisman) পরীক্ষাই শেষ কথা নয়।

গ্রিফিথ (Griffith) এবং ম্যাক্‌ডুগাল এই বিষয় লইয়া বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব দেখাইয়াছেন, কতকগুলি ইঁদুরকে বাম দিক হইতে ডান দিকে এবং ডান দিক হইতে বামদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘুরাইবার পর, তাহাদের মাথার দিকে একটি বিশিষ্ট বক্রতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে ঐ ইঁদুরগুলির সন্ততির মধ্যেও ঐ বিশেষত্বগুলি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। অর্জ্জিত বিশেষত্বগুলি যেপুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এই ঘটনাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। তবে এই পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিকতা অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ, যে ইঁদুরগুলি লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ বিকৃতিগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিল কিনা, তাহা দেখিয়া লওয়া হয় নাই।

ম্যাক্‌ডুগাল-এর পরীক্ষাগুলি আরও সুচিন্তিত ছিল। ইঁদুরগুলিকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকটি পথ দিয়া যাইতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্ লাগিত। ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে তাহারা যে পথটিতে যাইলে শক্ লাগে না, সেই পথটি বাছিয়া লইবার কৌশলটি শিখিল এবং পরে ইহাও দেখা গেল যে, তাহাদের এই অর্জ্জিত বুদ্ধিটি সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সংক্রামিত হইল।

মর্‌গ্যান বলেন, ম্যাকডুগাল-এর এ পরীক্ষাও সিদ্ধ নহে। কারণ আমরা জানি, অর্জ্জিত কৌশল-পটুতা কালক্রমে শিথিল হইয়া যায় অথবা অনভ্যাসে অধিকতর ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা হইলে সেই পটুতা যে জন্ম-জন্মান্তরে সংক্রামিত হইল, ইহা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

অপর পক্ষে আবার ব্রাউন (Brown Sequard) দেখাইয়াছেন, কয়েকটি গিনিপিগের মেরুদণ্ডে আঘাত করিয়া তাহাদের মধ্যে যে পক্ষাঘাত আনয়ন করা হইয়াছিল সেই পক্ষাঘাত দোষটি তাহাদের সন্ততির মধ্যেও দৃষ্ট হইয়াছিল—অবশ্য এক ক্ষেত্রেই নহে। আচরণবাদী পণ্ডিত প্যাভলভ-এর পরীক্ষাও একই জাতীয় সিদ্ধান্তকেই নির্দ্দেশ করে। তিনি কতকগুলি কুকুর লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। খাবার দেখিলে কুকুরদের মুখে লালা নির্গত হওয়া একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রত্যেকবার খাবার দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাজান হয় তাহা হইলে পরে ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই কুকুরের মুখে লালা নির্গত হইবে (খাবার না দেখাইলেও)। এই ঘটনাটিকে আমরা "কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া" (conditioned reflex) নাম দিতে পারি। প্যাভলভ দেখাইয়াছেন, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটিও সন্তান-সন্ততিক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে চলিতে থাকে।

এইবার আমরা প্রজনন সম্বন্ধে শেষ প্রশ্নটি আলোচনা করিতে পারি। এই প্রশ্নটি হইতেছে পিতৃপুরুষের শুক্রগত প্রতিভা, সংস্কৃতি বা সম্ভাবনা না লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, শিক্ষার জোরে আমরা উন্নতি করিতে পারি কি না। এই প্রশ্নটিকেই একটু ঘুরাইয়া বলা যাইতে পারে, আমাদের বিকাশের জন্য জন্মের

(heredity) প্রভাব বড়, না শিক্ষা ও পরিবেশের (environment) প্রভাব বড় ?

গ্যালটন বলেন, শিক্ষা ও পরিবেশ শুধু জন্মগত সম্ভাবনাটিকেই ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহার অধিক কিছু করিতে পারে না।

স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি বলেন, মানুষ দুইটি প্রভাবের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। একটি হইতেছে বংশগতি (heredity) এবং আর একটি হইতেছে পরিবেশ (environment)। ইহাদের মধ্যে বংশগতি তাহার সম্ভাবনার সীমাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়, বংশগতি বুঝাইয়া দেয় তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, একটি ছেলেকে ২০ ফিট লম্বা করিতে পারিবে না, দুর্ম্মেধা বালককে পণ্ডিত করিতে পারিবে না, বোবাকে গায়ক করিয়া তুলিতে পারিবে না, ইত্যাদি।

পরিবেশ জাতকের শিক্ষা, সাধনা, অভ্যাস, সুযোগ, সুবিধা প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা বা শক্তিগুলি তাহার জন্মের পর হইতে কার্য্য করে, তাহাদের সম্মিলিত প্রভাবকেই বুঝায়। এই পরিবেশ মানুষের বংশগতি হইতে প্রাপ্ত সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলে। পরিবেশ প্রতিকূল হইলে সেই সম্ভাবনাগুলি ফুটিয়া উঠে না। মাথায় আঘাত পাইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিও জড়বুদ্ধি হইয়া উঠিবে, শারীরিক আঘাত প্রভৃতিতে হয়ত কাহারও পা ছোট হইয়া যাইবে।

লক্ (Locke) বলিয়াছেন, মানুষের যাহা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, তাহা আসে অনুভূতির দ্বার বহিয়া। সুতরাং জন্মের সময় হইতে দুইটি শিশুকে যদি আমরা একই প্রকার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ করি, তাহা হইলে দুইটি শিশুরই শিক্ষা-দীক্ষা একই রকম হইবে।

ফরাসী পণ্ডিত হাল্ভিটিয়ুস (Halvitius) মোটামুটি লক্-এর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের চরিত্রগত, রুচিগত, শক্তি ও সামর্থ্যগত যাহা কিছু বৈচিত্র্য আছে, তাহা হয় শিক্ষা ও পরিবেশের জন্য।

অবশ্য এক দিক দিয়া তিনি লক্-এর মতের অনুবর্ত্তন করেন না। তিনি বলেন, অনুভূতিই যদি শিক্ষার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে জন্ম হইতে যে

বালক শ্রেষ্ঠতর অনুভূতির যন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারই শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর উন্নতি হইবে। তাহা হইলে লক্-এর মতবাদ দিয়াই আবার বংশগতির পক্ষেও ওকালতি করা যাইতে পারে। সেইজন্য হাল্‌ভিটিয়ুস বলিয়াছেন, শুধু অনুভূতির যন্ত্রই আমাদের শিক্ষা দান করে না। আমাদের আগ্রহ বা উৎসাহের দ্বারা আমরা অনুভূতির জিনিষগুলিকে যে ভাবে গ্রহণ করিব তাহারই উপর অনুভূতির প্রভাব নির্ভর করে। এই আগ্রহ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং সর্ব্বসাধারণেরই শিক্ষার দ্বারা বড় হইবার সুযোগ আছে।

মিল্ (J. Mill) বলিয়াছেন, "If education does not perform every thing, there is hardly anything that it does not perform."

হার্বার্ট (J. F. Herbart : ১৭৭৬-১৮৪১) বলেন, মানুষের আত্মা হইতেছে তাহার অর্জ্জিত (শিক্ষালব্ধ) ভাবধারা ছাড়া আর কিছুই নহে। হেওয়ার্ড (Dr. F. H. Hayward) বলিয়াছেন, এখন হার্বার্ট-এর তত্ত্বটি পুরাপুরি ভাবে মানা চলে না বটে এবং এখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ কতকগুলি ভালমন্দ সংস্কার বা সংস্কৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ; তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, এই সমস্ত প্রাক্‌জন্মগত সম্ভাবনার চেয়ে জন্মের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শিক্ষা দীক্ষাগুলির প্রভাবই অধিকতর। ঝুক্ (Juke) বংশের ইতিহাস দেখাইয়া গ্যালটন যে বংশগতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, হেওয়ার্ড তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের জন্য "Barnardo Homes" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপাদান লইয়া শিক্ষার গুণে সেই সমস্ত উপাদান হইতে সভ্য-ভব্য মানুষ তৈয়ারি করে।

'বংশগতি ও পরিবেশ' লইয়া এই সমস্ত দর্শন ও তত্ত্বমূলক আলোচনা বাদ দিয়া যদি আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের সন্ধান করিতে যাই, তবে এই ব্যাপার লইয়া যমজ শিশু এবং অনাথ-আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতি-পালিত শিশুদের যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে, সেইগুলি লক্ষ্য করা উচিত। এই

ব্যাপার লইয়া গ্যালটন, থর্ণডাইক, মেরীম্যান, লওতারব্যাক প্রভৃতি মণীষিগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে, সাধারণ ভ্রাতা-ভগিনীর চেয়ে যমজদের বংশগতির ঐক্য অধিক, সুতরাং বংশগতির প্রভাব যদি বেশী হয় তাহা হইলে অনাথ আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে একজাতীয় শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে বহু মাতাপিতার সন্তান একত্র প্রতিপালিত হয়, তাহাদের উন্নতিও এক জাতীয় হইবে।

সমজাতীয় যমজ (identical twins) লইয়া পরীক্ষা :

যমজদিগকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমজাতীয় (identical) ও অসমজাতীয় (fraternal) এই ভাবে ভাগ করা হয়। সমজাতীয় যমজগুলি একই ডিম্বকোষ (ova) হইতে উদ্ভুত হয়। ইহাদের গায়ের রং, চুল ও চক্ষু তারকার রং, মুখের গঠন, মাথার গঠন, আঙ্গুলের রেখার ছাপ, এমন কি মাথার স্নায়ুতন্ত্রের সংস্থান একই প্রকারের হয়। অসমজাতীয় যমজগুলি একই সময়ে প্রজননের দ্বারা সৃষ্ট হয় বটে, তবে তাহারা একই ডিম্বকোষ ও বীর্য্যকোষ (spermatoza) দ্বারা সৃষ্ট হয় না। ইহাদের মধ্যে দেহগত সাদৃশ্য এতখানি দৃষ্ট হয় না বটে, তবে সাধারণ সহোদব ভাইবোনের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, তাহার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে। বলা বাহুল্য, সমজাতীয় যমজেরা সমলৈঙ্গিক হয় ; অর্থাৎ তাহারা দুইজনেই ভাই বা দুইজনেই বোন হয়। মনোবিদ্যার গবেষণা এই সমজাতীয় যমকদের লইয়াই ভাল হয়।

গ্যাল্‌টন্ ৮০ জোড়া যমজ শিশু লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সমজাতীয় এবং অসমজাতীয় দুই প্রকারেরই যমজ শিশু ছিল। গ্যালটন্ দেখিয়াছিলেন, সমজাতীয় যমজগুলিকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত করিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি যেন অনিবার্য্য ভাবে ফুটিয়া উঠে। বিপরীত পক্ষে বিভিন্ন পিতামাতার যমজ সন্তানগুলি একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও তাহাদের দেহগত বৈশিষ্ট্য ও আচরণ বিপুলভাবে পৃথক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া গ্যালটন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পরিবেশের চেয়ে বংশগতিই বলবত্তর।

ইহার পর ১৯০৫ সালে থর্ণডাইক ৫০ জোড়া যমজ শিশু লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই ৫০ জোড়া যমজ শিশুর সহিত ৫০ জোড়া সহোদর একই পরিবেশে প্রতিপালিত হইল। পরে ইহাদের উপর বুদ্ধি মাপকের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ছয়টি করিয়া প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়া হইল। দেখা যাইল, এই পরীক্ষায় যমজ শিশুগুলির সফলাঙ্কের (score) সাদৃশ্য সাধারণ সহোদরদিগের সফলাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই সকল পরীক্ষা হইতেও এইটুকু সিদ্ধান্ত করা অনায়াসেই যায় যে, বংশগতিই পরিবেশের চেয়ে বলবত্তর।

আরও পরবর্তী যুগে উইংফিল্ড (A. H. Wingfieid) এই ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষায় সমজাতীয় যমজ, অসমজাতীয় যমজ, সহোদর এবং পরস্পর অসম্পর্কিত বালকবালিকা এই সব শ্রেণীর বালক লইয়াই বুদ্ধিমাপকের প্রশ্নগুচ্ছ দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছিল যে বুদ্ধি, স্মৃতি, গণিতে পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি ব্যাপারে পরস্পর অসম্পর্কিত বালক বালিকাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে, জ্ঞাতিদের চেয়ে সাধারণ সহোদরদিগের মধ্যে, সহোদরদিগের চেয়ে অসমজাতীয় যমজদের মধ্যে এবং অসমজাতীয় যমজদের চেয়ে সমজাতীয় যমজদের মধ্যে সাদৃশ্য উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষাতেও বংশগতির শক্তিটাকে বেশী বলিয়া মনে হইয়াছে।

সমজাতীয় যমজদিগকে বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত করিয়া বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নিউম্যান্ (H. Newman) ফ্র্যাঙ্ক্ ফ্রিম্যান্ (Frank N. Freeman) এবং কার্ল হল্‌জিঙ্গার (Karl, Hol. J. Zinger) নামে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক ১৯ জোড়া সমজাতীয় যমজকে একই পরিবেশে এবং পরে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পালিত পুত্র হিসাবে মানুষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাহাদের আকৃতি, ওজন, বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষায় যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

একত্রপালিত যমজদের বৈসাদৃশ্য		অন্যত্র পালিত যমজদের বৈসাদৃশ্য
উচ্চতা	১'৭ সেন্টিমিটার	১'৮ সেন্টিমিটার
ওজন	৪'১ পাউণ্ড	৯'৯ পাউণ্ড
বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)	৫ হইতে ৬ পয়েণ্ট	৮ হইতে ৯ পয়েণ্ট

এই তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশে (অর্থাৎ খাদ্য, পুষ্টি জলবায়ু, ব্যায়াম, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে) দৈহিক ওজনটাকে খানিকটা প্রভাবান্বিত করা যাইলেও, উচ্চতাকে তেমনভাবে প্রভাবান্বিত করা যায় না।

তবে পরিবেশের বিভিন্নতা বুদ্ধ্যঙ্কের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এই ১৯ জোড়া যমজকে লইয়া এক জাতীয় পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতীয় পরিবেশে মানুষ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, এক জাতীয় পরিবেশে তাহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য ৫ হইতে ৬ পয়েণ্টের বেশী হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে এই পার্থক্যটি কখন কখনও ১০ হইতে ১১ পয়েণ্ট পর্যন্ত হইয়াছিল।

শিক্ষা দীক্ষা মানুষের বুদ্ধ্যঙ্ককে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। দুইটি যমজ ভগিনীর মধ্যে একটিকে মূর্খ পরিবারে এবং আর একটিকে শিক্ষিত পরিবারে মানুষ করা হইয়াছিল। মূর্খ পরিবারে প্রতিপালিতা বালিকাটি কোনও দিনই ৯২এর বেশী বুদ্ধ্যঙ্কের পরিচয় দিতে পারে নাই, অথচ তাহারই যমজ ভগিনীটি শিক্ষিত পরিবারে মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়া ১১৬ বুদ্ধ্যঙ্কের পরিচয় দিয়াছিল এবং কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

পালিত শিশু লইয়া পরীক্ষা ঃ

পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য পালিত শিশু (foster children) লইয়াও গবেষণা করা হইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌ফোর্ড (Stanford) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ বারবারা বার্ক (Barbara S. Burke) এই ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা করেন। পালন ও পরিবেশের প্রভাবে পালিত শিশুগুলি কি পালক-পিতার অনুরূপ গুণাবলী প্রাপ্ত হয় অথবা তাহাদের নিজ নিজ জনকের দোষগুণগুলি তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া উঠে—ইহাই ছিল তাঁহার পরীক্ষার বিষয়। তিনি ২১৪টি পালিত শিশু এবং ১০৫টি সাধারণ শিশু (যাহারা

নিজ নিজ মাতা-পিতার নিকট মানুষ হইতেছে) লইয়া গবেষণা করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, অন্যত্র প্রতিপালিত শিশুগুলি তাহাদের পালক-পিতার গুণাবলী খুব কমই গ্রহণ করে; পালক-পিতার পুত্র-কন্যার সহিত একই ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও এবং একই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াও তাহারা যেন অনিবার্য্যভাবে নিজ নিজ মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যগুলিই অর্জ্জন করিতে থাকে। পালিত শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিতেও বংশগতির প্রভাবটাই সমধিক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ বার্ক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যাপারে বংশগতির প্রভাব পরিবেশের প্রভাবের চেয়ে চার পাঁচ গুণ শক্তিশালী।

এই ব্যাপারটিরই অন্য একটি দিক লইয়া চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি ম্যান সাহেব পরীক্ষা করেন। তাঁহার প্রশ্ন ছিল পালন-গৃহ (foster homes) পালিত শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রভাবান্বিত করিতে পারে কি না। বিভিন্ন পালনগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ও পরে তিনি ছেলেদের বুদ্ধ্যঙ্কের পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, চার পাঁচ বৎসর নূতন গৃহ-পরিবেশে অবস্থানের পর বালকগুলির বুদ্ধ্যঙ্ক ৭৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হইয়াছিল তাহাদের মনস্বিতাংশ আবার ১০· পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ফ্রিম্যান সহোদর ভাইবোনকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন গৃহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। পাঁচ বছরের কিছু বেশীদিন এই ভাবে প্রতিপালিত হইবার পর তাহাদের মনস্বিতাংশের পরীক্ষা করা হইল। দেখা যাইল, যে সমস্ত সহোদরগুলি পিতৃ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন সহোদরগুলির বুদ্ধ্যঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলে, ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্তটি ডাঃ বার্কের সিদ্ধান্তের প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়া দাঁড়াইল। বার্ক মনে করিয়াছিলেন, বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাবই বলবত্তর, আর ফ্রিম্যান প্রমাণ পাইলেন যে, ভাল গৃহ পরিবেশ এই বুদ্ধ্যঙ্ককেও অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তবে বার্ক ও ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মূলতঃ দ্বন্দ্ব খুব বেশী নাই। কারণ বার্ক এ কথা বলেন নাই যে, পরিবেশ বুদ্ধ্যঙ্ককে

একেবারেই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, আর ফ্রিম্যান্‌ও বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাবকে একেবারে তুচ্ছ করেন নাই।

বন্য পরিবেশে প্রতিপালিত শিশু লইয়া পরীক্ষা ঃ

পরিবেশের প্রভাব জাতকের আদিম গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কতখানি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে তাহা জঙ্গলের পরিবেশে বন্যজন্তু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বালক বালিকাদের ইতিহাস হইতে অনেকখানি বুঝিতে পারা যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের আবেঁর (Averon) জঙ্গলে একটি বন্যশিশুকে ধরা হয়। জিন ইটার্ড (Gean Itard) তাহাকে সভ্য ও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। বালকটি কিছুতেই মানুষের মত আচরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। "ভিক্টর" এই নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিলে সে শুধু তাহাতে সাড়া দিত, আর দু' চারটি মাত্র শব্দ বুঝিতে ও উচ্চারণ করিতে পারিত।

এই বালকটির ইতিহাস হইতে অবশ্য কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ বালকটি জন্ম হইতে একেবারে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। কাজেই তাহার ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যর্থতা তাহার শৈশব পরিবেশের প্রভাবে হইয়াছিল অথবা তাহার জন্মগত নির্বুদ্ধিতাব জন্য হইয়াছিল তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের এক জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের দ্বারা প্রতিপালিত দুইটি বালিকাকে পাওয়া যায়। পরে ইহাদের নাম দেওয়া হয় অমলা ও কমলা। অমলার বয়স ছিল ২ বৎসর এবং কমলা ছিল প্রায় ৯ বৎসরের। ইহারা বন্যজীবনে চার পায়ে (হাতে ও পায়ে হামা দিয়া) ছুটাছুটি করিত, জিভ দিয়া চাটিয়া পানীয় দ্রব্যাদি পান করিত, থাবা ও দাঁত দিয়া আক্রমণ করিত, বাঘের মতই দন্ত বিকাশ করিয়া গর্জ্জন করিত। ধরা পড়িবার পর অমলা শীঘ্রই মারা যায়, তবে কমলা আরও ৯ বৎসর বাঁচিয়াছিল। সে কাপড় পরিতে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, হাত মুখ ধুইতে ও হাত দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল। তবে তাড়াতাড়ি যাইবার প্রয়োজন হইলে সে হামা দিয়াই ছুট দিত।

ক্রমশঃ সে তাহার বন্য অভ্যাস ত্যাগ করিয়া খানিকটা সভ্য হইয়াছিল। সে প্রায় ১০০টি শব্দ শিখিয়াছিল এবং কিছু কিছু হুকুম তামিল করিতে শিখিয়াছিল। শেষের দিকে সে অন্যান্য ছেলেমেয়ে দেখিলে গর্জ্জন করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত না বরং তাহাদের খেলাধূলায় যোগ দিত।

এই কমলার ইতিহাস হইতেও অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা মনোবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক খুব বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত করা হয় নাই।

সাল্‌ভেডর (salvador) দেশের জঙ্গলে আর একটি বন্যশিশুকে পাওয়া যায়। যখন তাহাকে ধরা হয় তখন সে শুধু "তামাশা" এই কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিত। "তামাশা" শব্দটি ঐ দেশের একটি গ্রামের নাম। মনুষ্য সমাজে প্রতিপালিত হইবার পর সে কাপড়-জামা পরা, স্নান করা ইত্যাদিতে রাজী হইত এবং শব্দ সম্পদও কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিল। তবে মাতা পিতার নাম সে কোনও দিনই স্মরণ করিতে পারে নাই।

বন্য পরিবেশের প্রভাব মানবশিশুকে কতখানি বন্য করিয়া তুলিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঘরের ছেলেদের বনে বাঘ ভাল্লুকদের হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় না। তবে বনের জানোয়ারকে ঘরের ছেলের সঙ্গে প্রতি-পালিত করিয়া মনুষ্য পরিবেশের প্রভাব বন্যদের কতটা সংস্কৃত করিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। কেলগ্ সাহেব (W. N. Kellog) এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গুয়া নামে সাড়ে সাত মাস বয়সের একটি শিম্পাঞ্জীকে তাহার দশ মাস বয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড্ (Donald)-এর সহিত একই ভাবে প্রতিপালিত করিতে লাগিলেন। গুয়া সোজা হইয়া চলিতে ফিরিতে, করমর্দ্দন করিতে, গ্লাস হইতে পানীয় গ্রহণ করিতে, কাঁটা চামচ লইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে, দরজার খিল খুলিতে ও পেন্সিল লইয়া ইজি-বিজি লিখিতে শিখিয়াছিল। অশিক্ষিত লোকদিগের যে ভাবে বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয় সেই জাতীয় পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, গুয়া এবং ডোনাল্ড প্রায় একই প্রকার বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। তবে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দুইজনের মধ্যে পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশী ভাবে প্রকট হইয়াছিল। তাহা হইলেও

ভাষাগত নির্দ্দেশ পালনের ব্যাপারে অর্থাৎ "ওরূপ করিও না" "বাঁশী বাজাও" "লাফ দাও" "বসিয়া পড়" "উঠিয়া দাঁড়াও" "তোমার নাক কোন্‌টি" ইত্যাদি প্রশ্ন বা আদেশে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে গুয়া খুব পিছাইয়া ছিল না। ১৬½ মাস পরে গুয়া ৫৮টি নির্দ্দেশ নিভুর্ল ভাবে পালন করিতে পারিত এবং ডোনাল্ড পারিত ৬৮টি। তবে মানব শিশু ডোনাল্ড বানর শিশু গুয়ার চেয়ে যে কয়েক মাসের বড় ছিল তাহাও মনে রাখিতে হইবে। কেলগের এই পরীক্ষা হইতে মনে হয়, শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবটাই বলবত্তর।

সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ লইয়া পরীক্ষা :

পরিবেশের প্রভাব লইয়া ক্যাটেল্ (Cattel)-এর পরীক্ষাগুলিও এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৯০৬ সালে তিনি তাঁহার গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ১০০০ জন বৈজ্ঞানিকের জীবনের উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল বংশগতির প্রভাবের অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে গ্যাল্‌টন্, পিয়ারসন প্রভৃতি যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নয়। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের জীবন সাফল্যের উপর পরিবেশের প্রভাবই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছিল। পরে ১৯১৫ এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেও তিনি এই একই বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর হইয়াছিল।

আমেরিকার ক্যাটেল্ যেমন বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সেইরূপ গর্ডন (Gordon) নৌকার মাঝি-মাল্লা ও জিপ্‌সি বালকদের লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সমাজ-পরিবেশের দীনতার জন্য এই সমস্ত বালকদিগের মনস্বিতাংশের হার অত্যন্ত কম ছিল। অধিকাংশ বালককেই প্রায় জড় বুদ্ধির সীমারেখায় দেখা গিয়াছিল এবং তাহাদের মনস্বিতাংশের গড় ছিল ৬৯.৬। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছিল। দেখা গিয়াছিল, ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়সে যে-সকল বালকের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ ছিল, তাহাদেরই বুদ্ধ্যঙ্ক ১২ হইতে ২২ বৎসর বয়সে ৬০এ নামিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমস্ত বালক প্রায় সাধারণ

বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই ক্রমশঃ পরিবেশের সুযোগ সুবিধার অভাবে মূর্খ জড়টি হইয়া উঠিয়াছে।

আমারেকার যুক্ত প্রদেশের নির্জ্জন পার্ব্বত্য অঞ্চলের বালক বালিকাদের লইয়াও অনুরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সমস্ত তথ্য হইতে বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি বলবত্তর তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, বরং এইটুকুই বলিতে ইচ্ছা করে, মানুষের বৈশিষ্ট্যের বুননের মধ্যে এই দুইটিই টানা-পোড়েনের কাজ করিয়া ইহাকে পূর্ণতা দান করে। বস্তুতঃ মানসিক পরিণতি শুধু স্বতস্ফূর্ত্ত বিকাশ মাত্র নহে এবং পরিবেশ শুধু আদিম সম্ভবনার বিকাশ বা বিনাশই করে না, ইহার নিজস্ব একটা শক্তিও আছে। ফ্রাঙ্ক ফ্রিম্যান্ (১৯৫১) বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে (nature and nurture) আর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রত্যেকটিরই ব্যঞ্জনা অপরের মধ্যে সীমায়িত।" ইহারা পরস্পর অনুপূরক, প্রত্যেকেই অপরকে লইয়া পূর্ণতা লাভ করে। কাজেই বর্ত্তমান শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতি (বংশগতি) বনাম পরিবেশ, অথবা প্রকৃতি-পরিবেশের দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-পরিবেশের সম্মিলিত ফলটি আলোচনা কয়া উচিত। ইহাদের একটিকে তুচ্ছ করিরা অপরটিকে লইয়া মাতামাতি করিবার কোনও সুযুক্তি বা পরীক্ষিত স্থির সিদ্ধান্ত নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে সার পার্শি নান্ তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁর মতে, নিছক বংশগতির পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া গ্যালটন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা এবং পরিবেশর পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া হার্ব্বার্ট্ ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়—উভয় পক্ষই ভুল করিয়াছেন। একপক্ষ বলিতেছেন, মানুষ যাহা হইবে তাহা তাহার জন্মের পূর্ব্বেই তাহার মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, অপর পক্ষে বলিতেছেন, প্রাক্‌জন্মগত ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যে কোনও অবস্থায় লইয়া যাইতে পারা যায়। নান্ বলেন, একদেশদর্শিতা লইয়া তর্ক করিয়া উভয় মতবাদই মানুষকে খানিকটা জড় পদার্থের পর্য্যায়ে নামাইয়া

আনিয়াছে ; দুইটি মতবাদই মানুষকে কাদার ডেলার মত জিনিস বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ; তবে এই মৃৎপিণ্ডটিকে যে কুম্ভকার গড়িয়া তুলিতেছে, একদল বলিতেছেন, সে হইতেছে বংশগতি—সে জাতকের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মৃৎপাত্রটির গঠন ঠিক করিয়া দিতেছে, এবং অপর দল বলিতেছেন, এই মৃৎকর্ত্তাটি হইতেছে পরিবেশ সে জাতকের জন্মের পর হইতে তাহাকে লইয়া মনোমত গঠন দিতেছে।

কিন্তু মানুষ নিছক মৃৎপিণ্ড নহে, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিযুক্ত প্রাণী, সে একটি শক্তির কেন্দ্র, সে পরিবেশকে হয়ত ঠিক জয় করিতে পারে না, তবে নিজের সম্ভাবনা সুবিধা ও প্রয়োজন মত তাহাকে ব্যবহার করে এবং জন্মগত মূলধন এবং পরিবেশগত সুবিধা—এই উভয়কে লইয়াই তাহার জীবনের কারবার আরম্ভ করিতে-করিতে তাহার চরিত্রের পথে চলিতে থাকে। যাহারা বলেন, বংশগতিই সব, তাঁহারা খানিকটা অদৃষ্টবাদে পরিচালিত হইয়া মানুষকে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের অকল্যাণ করেন, ফলে দৈত্যকুলে যে সমস্ত প্রহ্লাদ তৈয়ারী হইতে পারিত, অথবা গোবরকুলে যে সব পদ্মফুল ফুটিতে পারিত—সে সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায় ; আর যাঁহারা বলেন, পরিবেশই সব, তাঁহারাও অনেক অপাত্রে অথবা জড়-বুদ্ধিযুক্ত পাত্রে অযথা শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রয়োগ করিয়া অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ", শত চেষ্টা করিয়াও বককে শুকের মত পাঠ শিখান যায় না।

এই জন্যই শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে এবং শিক্ষার ব্যাপারে অপচয় নিবারণ করিতে হইলে ছাত্রের সম্ভাবনা কতখানি তাহা মাপিয়া (বুদ্ধির মাপকাঠি নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) লওয়া ভাল।

তবে শুধু বুদ্ধি মাপিলেই চলিবে না। ছাত্রের অন্যান্য বিশেষত্ব, মানসিক গঠন—তাহা অন্তর্মুখী (introvert) অথবা বহির্মুখী (extrovert)—ছাত্র হাতে-কলমে কাজ করিতে ভালবাসে অথবা দার্শনিক আলোচনা ভালবাসে প্রভৃতি আরও অনেক কথাই পূর্ব্ব হইতে জানিয়া লইতে হইবে এবং সেই হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে শিক্ষক হয়ত খানিকটা ভীত হইয়া পড়িতে পারেন। তাঁহার মনে হইতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জটিল জিনিস। শিক্ষার সমস্যা যে জটিল, সে কথা সত্য হইলেও আমাদের মনে রাখা উচিত অধিকাংশ মানুষই সাধারণ; অতি জড় বুদ্ধি অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কোন সমাজেই বেশী নয়, কাজেই তাহাদের কথা বাদ দিয়া সাধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থাও অনেকখানি কাজ করিতে পারে।

জন্মগত দীনতার জন্যও ততটা ভয়ের কারণ নাই। আমরা যদি জীবতত্ত্বগত উত্তরাধিকার ভাল নাও পাই, তাহা হইলেও সমাজগত উত্তরাধিকার (Social heritage) দ্বারা অনেকখানি কাজ করিতে পারি ভাল শিক্ষক, ভাল শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভাল গ্রন্থাগার, ভাল গৃহ-পরিবেশ, সুলিখিত পুস্তকাদি, শান্তিপূর্ণ সমাজ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া, সৎসঙ্গ, উৎসাহ, উপদেশ, আদর্শ প্রভৃতি প্রায় অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম পথিকৃৎ রবার্ট ওয়েন (Robert Owen : ১৭৭১-১৮৫৮) বলেন, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র অথবা ব্যক্তিগত মতবাদ ইহাদের কোনটিকেই নিজে তৈয়ারী করিতে পারে না এবং কখনও পারে নাই, সে পূর্ব্ব-পুরুষাগত ভাবধারা হইতে যাহা পাইয়াছে এবং শিক্ষা ও পরিবেশ হইতে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহারই অনিবার্য্য ফল হিসাবেই তাহার জীবন, দর্শন ও চরিত্র সৃষ্ট হইতে থাকে।

এই মতবাদ সমাজগত উত্তরাধিকারেরই জয়গান করিতেছে। ব্যক্তিগত সাধনা ও সমাজ হিতৈষণার দ্বারা এই সমাজগত উত্তরাধিকারকে আমরা অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিতে পারি।

গণ-মন

হিন্দু পুরাণে 'গণ' শব্দ এবং 'গণেশ' শব্দটির অর্থ যাহাই হউক না কেন, 'গণ' শব্দটিকে যদি আমরা সাধারণ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে গণদেবতা গণেশ ঠাকুরটির সহিত গণ-মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যঞ্জনা দেখিতে পাই। গণেশ ঠাকুরের বিপুল দেহ, দেহে বিষ্ণুর শক্তি—তাঁহার হস্তধৃত শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম সেই বিষ্ণুর শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক; কিন্তু তাঁহার মথাটি হইতেছে একটি হস্তিমূর্খের। কাজেই তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে পারেন না। হয়ত হঠাৎ ক্ষেপিয়া যাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন, হয়ত হঠাৎ মনের আবেগে অদ্ভুত ভাল কাজ করিয়া ফেলেন—এবং যাহাই কিছু করেন, তাহা সবই করেন বিপুল মাত্রায়। কাজেই তিনি ভয়ের বস্তু, সব দেবতার পূজার সময়েই আগে তাঁহাকে পূজা দিতে হয়। তিনি সিদ্ধিদাতা, বাঁকিয়া বসিলে আর রক্ষা নাই। গণ-মনটিও অনেকটা এই জাতীয় জিনিস; ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে, না মানিলে রক্ষা নাই, অথচ গণ-মনটি যে সব সময়েই সুচিন্তিত সুধীজনোচিত কাজ করে, তাহা নহে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই গণ-মনটি কি জিনিস? প্রত্যেক গণ বা দলের মধ্যেই কি গণ-মনের লীলা চলিতে থাকে?

না, প্রত্যেক দলের মধ্যেই গণ-মনের লীলা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কলিকাতার রাস্তা দিয়া অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, যে যাহার নিজের কাজে চঞ্চল, নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। এখানে গণ-মনের কোনও লীলা নাই। কিন্তু হঠাৎ যদি পাশের একটা বস্তিতে আগুন লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পথচারী জনতার মধ্যে গণ-মনের কার্য্য আরম্ভ হইবে, সকলের মধ্যেই তখন একটা আর্ত্তত্রাণের অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে, চীৎকারে উৎসাহে, প্রতিযোগিতায় সকলেই আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিবে, অতি ভীরু কাপুরুষও লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমন বীরত্ব দেখাইবে যে, সেই লোকটি একা একা স্বপ্নে বা উদ্ভট কল্পনাতেও হয়তো তাহা ভাবিতে

পারিত না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মন দিয়া যাহা অসম্ভব, গণ-মনের প্রেরণায় তাহা সহজেই সম্ভব হইল।

এই গণ-মন যে সব সময় মানুষকে উন্নত স্তরেই তুলিয়া ধরিবে, এমন কোনও কথা নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতির সময় এই গণ-মনের প্রভাবেই অতি নিরীহ ভালমানুষ ব্যক্তিও এমন জঘন্য ও নৃশংস কাজ করিয়া বসে যে, সাধারণ সময়ে তাহা কিছুতেই তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না।

এই জাতীয় উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গণ-মন জিনিসটি ব্যক্তিগত মনের সমষ্টিমাত্র নয়, ইহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যেখানে দুইচারজন লোক একত্র হয়, সেইখানেই প্রায়ই একটি নূতন শক্তির লীলা আরম্ভ হয়। এই শক্তিগুলি অবশ্য গণের ব্যক্তির মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু সেই শক্তিগুলিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য একটা গণ-পরিবেশের বা সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন হয়। মনের বিকাশের দিক দিয়া এই সমাজ-পরিবেশের দান সামান্য নহে। এমন কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) আছে, যাহা বিশেষভাবে সমাজ-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আত্মবিস্তার (self-assertion) বা আত্মাবমাননা (self-debasement) প্রবৃত্তিগুলি সমাজ-পরিবেশের মধ্যেই কাজ করিতে থাকে, সমাজ-পরিবেশের বাহিরে এই প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নাই।

সমাজ পরিবেশের মধ্যে এই যে নূতন একটি গণ-মনের লীলা চলিতে থাকে, ইহা কোন্ শক্তির পরিচালনায় হইয়া থাকে? নান্ সাহেব ইহার নাম দিয়েছেন মাইমেসিস্ (Mimesis); ইহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। তবে 'অনুকরণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধরিলে যাহা হয়, 'মাইমেসিস্' অনেকটা সেই জিনিস। ইহার মধ্যে একটা অনুভূতির দিক, একটা বুদ্ধির দিক এবং একটা কর্ম্মের দিক আছে। ইহার অনুভূতির দিকটিকে সহানুভূতি (sympathy), বুদ্ধির দিকটিকে অভিভাবন (suggestion) এবং কর্ম্মের দিকটিকে অনুকরণ (imitation) নাম দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত মূলধন লইয়া মানুষ তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, 'মাইমেসিস্' তাহার মধ্যে অন্যতম। গণ-মনের বিকাশের মূলেও এই 'মাইমেসিস্' বা ব্যাপক-অনুকরণের

লীলা আছে। নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, 'মাইমেসিস্'-এর ক্রিয়া ইতরপ্রাণী হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে চলিতে থাকে।

একটি মোরগ-শিশু যে তাহার মাতার কার্য্য দেখিয়া মাটি হইতে শস্যের কণা খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে, তাহাও 'মাইমেসিস্' এবং জাপান যে আত্মসচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া তাহার সভ্যতাকে ইউরোপীয় ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও 'মাইমেসিস্'; ইহারই প্রভাবে একজনের ভয়-ভাবনা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ইহারই প্রভাবে একজনের আদর্শ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ইহারই প্রভাবে একজনের অনুকরণ করিয়া আর একজন শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। গণ-মনের বিকাশের জন্য অনুকরণের সহানুভূতিগত দিক (sympathy), চিন্তাগত দিক (suggestion) এবং কর্ম্মগত দিক (imitation) এই সবগুলিই কার্য্য করে। কার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা ইহাদের প্রত্যেকটির পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। প্রথমে সহানুভূতির কথাই ধরা যাক।

সহানুভূতি (Sympathy):

সহানুভূতি জিনিসটি হইতেছে অপরের সহিত একই ভাবে অনুভব করা। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একজন যেভাবে অনুভব করিল, অপরে সেইভাবে অনুভব করিবে কেন? এই জিনিসটির ব্যাখ্যার জন্য অনেকে Telepathy বা "দূরানুভূতি"র অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রেডিওর বার্ত্তার মত মানুষের অনুভূতি প্রভৃতিকেও দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। অনুভূতি প্রেরণের এই সূক্ষ্ম অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন না এবং তাঁহারা ম্যাক্‌ড্যুগাল্ সাহেব-বর্ণিত "অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি" (primitive passive sympathy)-কেই সহানুভূতির মূল কারণ বলিয়া মনে করিবেন। ম্যাক্‌ড্যুগল্-এর মতে আমাদের প্রবৃত্তিগুলি (instincts) আমাদের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান করে যে, অপরের মধ্যে তাহার ক্রিয়া দেখিলেই আমাদের মধ্যেও তাহাদের দ্বার খুলিয়া যায়।

সেইজন্যই কাহারও মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিলে আমাদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়, কাহাকেও হাসিতে দেখিলে আমাদেরও হাসি পায়।

ফ্রয়েড্ ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেবের এই অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে গণমনের আদি প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুকরণ জিনিষটা নিছক অনুকরণ বা অন্ধ অনুকরণ নয়; যাহার সহিত আমরা একাত্মতা বা আত্মীয়তা অনুভব করি না, তাহার কার্য্যের অনুকরণও আমরা করি না। যে ইয়ার্কিতে ইতরজনসাধারণ আনন্দ পায়, একজন চালবাজ অভিজাত তাহাতে কৌতুক বোধ করে না। তাহার কারণ, এই চালবাজ অভিজাতটি নিজেকে ইতরজনসাধারণের স্বগোত্রীয় বলিয়া মনে করে না। ফ্রয়েড্ আরও দেখাইয়াছেন যে, ভয়ের বৃত্তিটিতে গণমনের কার্য্য সমধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ভয়ের বৃত্তিটি তখনই প্রবল হইয়া উঠে, যখন সংঘের লোকগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ "গণ" যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু পাঁচজন একত্র হইলেই গণমনের কার্য্য আরম্ভ হয় না, সেই পাঁচজনের মধ্যে একটা একাত্মতা থাকা প্রয়োজন।

ফ্রয়েড্ বলেন, যে জন-সংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া চলে, সেখানে পারিবারিক সম্পর্ক জাতীয় একটা আত্মীয়তা থাকা প্রয়োজন। পরিবারের বালক-বালিকারা তাহাদের পিতামাতাকে কেন্দ্র করিয়া আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মাতাপিতাকেই তাহারা আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে এবং সতীর্থ হিসাবে পরোক্ষভাবে ভ্রাতা ভগিনীরাও পরস্পর পরস্পরকে অনুকরণ করে। দেশাত্মবোধ প্রভৃতির মধ্যে যে গণমনের কার্য্য চলিতে থাকে, তাহাও এই পরিবার-কেন্দ্রিক মনোভাবের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। তবে সে ক্ষেত্রে আদর্শটি কোনও জীবন্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে না, তাহা উঠে নির্ব্যক্তিক দেশমাতৃকা, দেশের চিরাচরিত আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করিয়া।

নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, ফ্রয়েডের এই মতবাদটি স্কুল কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাতা-

পিতার যে স্থান, স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও সেই স্থান; উভয়েই বালক বালিকাদের অনুকরণের পাত্র, উভয়েই তাহাদের স্বাভাবিক নেতা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক নেতা ছাড়া স্কুল কলেজের খেলার ক্যাপ্টেন, মণিটার, রাজনৈতিক উৎসাহী প্রভৃতি অনেক উপনেতাও থাকে। এই উপনেতাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না, এবং শিক্ষকদিগকে বন্ধুভাবেই হউক অথবা শত্রুভাবেই হউক, ইহাদের সম্মুখীন হইতেই হইবে। যে স্কুলে নিয়ম-শৃংখলা ভাল, সেখানেই নেতা ও উপনেতার দ্বন্দ্ব থাকে না, সকলেই একযোগে কাজ করে। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল উপনেতৃত্বকে শক্তির জোরেই দাবাইয়া দিতে হইবে। তবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও হানাহানি কল্যাণকর নহে এবং যে স্কুলে ছাত্রনেতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে, সেখানেও ভাল ফল আশা করিতে পারা যায় না।

তাহা হইলে স্কুলের মধ্যে নেতা-উপনেতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া চলিবার উপায় কি? উপায় হইতেছে ছাত্রদের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখে সহানুভূতিশীল হইয়া তাহাদের দলের সত্যিকারের সর্ব্বাধিনায়ক হইয়া শিক্ষকদের কাজ করা। শিক্ষকরা যদি এই সর্ব্বাধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে নেতা-উপনেতার দ্বন্দ্ব থাকে না। শিক্ষক যতই বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ হউক না কেন, তাঁহার কেশে যতই পাক ধরুক না কেন, মনের দিক দিয়া, সহাভুতির দিক দিয়া স্কুলের যত "নবীন এবং কাঁচা" যত "সবুজ এবং অবুঝ" যত দুরন্ত, যত জীবন্ত সকল ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহাকে নিজেকে "এক বয়সী" বলিয়া মনে করিয়া চলিতে হইবে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে অতি উৎসাহে সুলভে ছাত্রনেতা হইবার জন্য অন্যায়ভাবে ছাত্র-তোষণের চেষ্টা করেন, কখন কখনও হয়ত প্রধান শিক্ষকের আইন-শৃংখলার প্রতি ছাত্রদের উত্তেজিত করিয়া তাহাদের প্রিয় হইবার চেষ্টা করেন, ইহাও ঠিক নহে। ছাত্র-তোষণ ও ছাত্র-নেতৃত্ব এক জিনিস নয়। যিনি প্রকৃত

ছাত্রনেতা, তিনি নিজে সর্ব্বস্ব হারাইয়া ছাত্রদের দলে নামিয়া আসিবেন না, তিনি ভালবাসিয়া তাহাদের সহিত মিশিবেন এবং তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞান, বুদ্ধি এবং সংহত চরিত্র-বলের দ্বারা ছাত্রদের উচ্চস্তরে টানিয়া তুলিবেন শুভ কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া, আনন্দ সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সহযোগিতার মধ্য দিয়া।

অভিভাবন (Suggestion) : নির্দেশনা (?)

মাইমেসিস-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা অনুকরণের অনুভূতিগত, চিন্তাগত এবং কর্ম্মগত দিকের কথা বলিয়াছি। এইগুলিকে যথাক্রমে অনুভাবন (sympathy), অভিভাবন (suggestion) এবং অনুকরণ (imitation) বলা হয়। এখন এই অভিভাবন শব্দটির দ্বারা আমরা কি বুঝি ?

পাঁচজনের সঙ্গে একত্র থাকিতে হইলে পরস্পরের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতির কষ যেমন আমাদের মধ্যে লাগিয়া যায়, তেমনই পরস্পরের চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতিও আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। চিন্তাগত এই সংক্রমণটিকেই সাধারণতঃ অভিভাবন বলা হয়। ম্যাক্ ডুগাল্ সাহেব অভিভাবনের সংজ্ঞা দিয়াছেন "a process of communication resulting in the acceptance with conviction of the communicated proposition in the absence of logically adequate grounds for its acceptance."

অভিভাবনের দ্বারা একজনের চিন্তা যখন অপরের মধ্যে সংক্রমিত হয় তখন সে বুঝিতেও পারে না যে, এই নবাগত চিন্তাটি তাহার নিজস্ব জিনিষ অথবা অন্য কিছু। এই অভিভাবনের উদাহরণ হিসাবে রস্ সাহেব সেক্ষপীয়ারের ওথেলো নাটকের আয়াগো চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াগো ওথেলোর নিকট ডেস্‌ডিমোনার চরিত্র সমর্থন প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে এমন সব কথা বলিয়াছিলেন, যাহার অভিভাবনের ফলে ওথেলোর মন সন্দেহে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল, অথচ ওথেলো বুঝিতেও পারে নাই যে, এই সন্দেহ জিনিসটি তাহার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ফল অথবা অপরের দেওয়া জিনিস।

অভিভাবনের শক্তি সম্মোহনের বিস্তার (hypnotism) প্রসঙ্গে প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। সম্মোহন ফলে কৃত্রিম নিদ্রার সময় সম্মোহিত ব্যক্তি

সম্মোহনকারীর অভিভাবন সহজেই গ্রহণ করে। জাগ্রদবস্থায় একজনকে যদি বলা হয় "তুমি ইন্দুর হইয়া গিয়াছ" তাহা হইলে সে কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু সম্মোহিত কোনও ব্যক্তিকে যদি ঐ কথা বলা হয়, তাহা হইলে সে সহজেই তাহা মানিয়া লইবে এবং নিজেকে সত্য সত্যই ইঁদুর বলিয়া মনে করিয়া হয়ত ইঁদুরের মতই ঘরের কোণ দিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিবে।

শুধু সম্মোহিত অবস্থাতেই যে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে। সম্মোহিত অবস্থায় সম্মোহক সম্মোহিত ব্যক্তিকে যে সব অভিভাব দিয়া থাকেন, অনেক সময় সম্মোহনের পরেও তাহার ফল বর্ত্তমান থাকিয়া যায়। ফলে সম্মোহিত অবস্থায় একজনকে যদি বলা হয়, "তুমি মদ খাইয়াছ" তাহা হইলে হয়ত সে সম্মোহনের পরেও মাতালের মত ঢুলিতে থাকিবে। যে অভিভাবনের ফলে এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তাহাকে উত্তর-সম্মোহক অভিভাবন (post-hypnotic suggestion) বলা হয়। এই অভিভাবনের কাজটি শুধু যে সম্মোহিত অবস্থাতেই ক্রিয়াশীল থাকে তাহা নহে, আমাদের জাগ্রদবস্থাতেও আমরা প্রায় সকলে এই অভিভাবন শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হই। নান্ সাহেব এই অভিভাবনের শক্তির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি কতকগুলি ছেলেমেয়েকে একটি নৌকার (Yacht) ফটো দেখাইলেন। প্রত্যেকেই ৩০ সেকেণ্ড ধরিয়া ছবিখানি দেখিল। তাহার পর নান্ তাহাদের এই ছবিটি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল "আচ্ছা বলত দেখি ষ্টীমারটি নৌকার সহিত একই দিকে যাইতেছিল, না, পরস্পর বিপরীত দিকে যাইতেছিল ?"

এই প্রশ্নে কুড়িটি বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র দুইজন জোর করিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহারা শুধু নৌকাই দেখিয়াছে, ষ্টীমার আদৌ দেখে নাই। বাকী সকলের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির স্বল্পতার জন্য লজ্জায় পড়িল, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ করিয়া এদিকে বা ওদিকে উত্তর করিল, অনেকে আবার দৃঢ়তার সহিতই উত্তর করিল, ষ্টীমারটী নৌকার দিকে যাইতেছে অথবা বিপরীত দিকে যাইতেছে।

এই অভিভাবনের শক্তি শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায় অথবা বালক-বালিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যেও ইহার প্রভাব সামান্য নহে। গুজব রটনার মধ্যে এই অভিভাবনের শক্তি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। দেশের মধ্যে হয়ত দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। একজন অখ্যাত লোক বাহাদুরী করিয়া বলিল, পাশের গ্রামটিতে একশত লোক হতাহত হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস্য না হইলেও, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না, গল্পটী আমিও অপরের কাছে বলিলাম, সেও তাহা অন্যান্য অনেকের নিকট বলিল, ফলে শীঘ্রই গুজবটি দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। দাঙ্গাহাঙ্গামা, আকস্মিক বিপৎপাত, যুদ্ধ প্রভৃতির সময়, রাজনৈতিক বক্তৃতা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচার প্রভৃতির মধ্যে এই অভিভাবনজনিত গণমনের ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই।

এই অভিভাবনের কারণটি কি ? মনের সম্মোহিত অবস্থায় অথবা অত্যন্ত উত্তেজনার সময় আমরা সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হই। অসুস্থ অবস্থাতেও আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হই। সুস্থ অবস্থাতেও যে আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হই না, তাহা নহে। আমাদের মধ্যে যে দীনতার বৃত্তি আছে, (Instinct of submission) তাহারই ফলে এই জিনিসটি ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই সুস্থ অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট হইতেই অভিভাব গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। শিশু এবং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অভিভাবন ক্রিয়াটি যে সমধিক দৃষ্ট হয় তাহার কারণই হইতেছে তাহাদের দীনতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতির জন্য অপরকে শ্রদ্ধা করা বা তাহাদের অভিভাব গ্রহণ করা শিশু বা অশিক্ষিত মনের নিকট খানিকটা সহজসাধ্য।

নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই অভিভাব জিনিষটি মনুষ্য চরিত্রের একটি অনুশোচনীয় দুর্ব্বলতা মাত্র নহে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের পরিপুষ্টির জন্য ইহা খুবই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। বুদ্ধির সাহায্যে একটি সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া এবং তাহার পর আমাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা, ইহা একটী জটিল এবং সময়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমাদের চেয়ে

যাহাদের অভিজ্ঞতা আরও বেশি তাহাদের নিকট হইতে অভিভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের সক্রিয় বুদ্ধির অগোচরেই পরিপক্ক অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্তগুলি লইয়া জীবনের পথে চলিলে কাজের স্থবিধাই হইবে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-তত্ত্বের একটি জটিল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এই অভিভাবনের প্রভাব শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদান করিবেন, অথবা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পড়াইয়া যাইবেন? এ সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে এই যে, আমরা যখন কাহারও সহিত মেলামেশা করি, তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ অপরের উপর লাগিবেই, ফলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত করিবই। কাজেই সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিক্ষা দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, অভিভাবন জিনিসটা আমাদের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বা কল্পনাশক্তির বিকাশের পরিপন্থী নয়।

স্থতরাং ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মতবাদকে সঙ্কুচিত করিয়া, নিছক নির্জ্জলা পাঠ্যপুস্তক লইয়াই শিক্ষকের কারবার করিবার প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিগত চরিত্রের অভিভাবনের দ্বারা তিনি ছাত্র-দিগকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন। তবে এই অভিভাবটা যতটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। অধিকারী ভেদে ছেলেরা যার যেমন প্রয়োজন, যার যেমন ক্ষমতা সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবে। শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বসংস্কারবিমুক্ত একটা সত্যদৃষ্টির ক্ষমতা স্থষ্টি করা, বিশুদ্ধ বিচার ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সহায়তা করা।

ছাত্রদের সহিত শিক্ষকদের এমনই একটা সম্পর্ক যে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, শিক্ষকের মনের কষ ছাত্রদের মনে সংক্রমিত হইবেই। সে ক্ষেত্রে শিক্ষককে একটু সাবধানে চলা উচিত। তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক মতবাদ লইয়া ছাত্রদের বিভ্রান্ত করা তাঁহার উচিত নয়। তাহা হইলে কি রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তিনি একেবারেই চুপ করিয়া থাকিবেন? এ সম্বন্ধে নিজের কথা কিছুই বলিবেন না? অনেকের মত তাহাই। কিন্তু ইহাতে বিপদ হইতেছে এই যে, শিক্ষকরা এই সম্বন্ধে নীরব থাকিলে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ছাত্ররা অযোগ্য

নেতা অথবা অযোগ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ফলে তাহাতে রাষ্ট্রের ক্ষতিই হইবে। কাজেই যে রাজনীতি দেশের অধিকাংশ মনীষীদের অনুমোদিত এবং যে ধর্ম্মনীতি "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ নিত্যমদ্বেশরাগিভিঃ", সেই নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধির অংশ হইতে ছাত্রদের বঞ্চিত করা শিক্ষকদের উচিত নয়। তবে রাজনৈতিক দল বা উপদলের মুখপাত্র হইয়া স্কুলের শ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক চক্রান্তের আখড়া করিয়া তুলাও শিক্ষকদের কর্ত্তব্য নয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কারমুক্ত সত্যদৃষ্টির এবং সত্য সিদ্ধান্তের ক্ষমতা সৃষ্টিই হইতেছে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষকদের উচিত উপযুক্ত অভিভাবের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে এই জিনিসটিই তৈয়ারী করিয়া তোলা। এজন্য আমাদের মনে হয়, শিক্ষকদের কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। কারণ একটা রাজনৈতিক দলের সভ্য হইলেই সেই দলের মতবাদের গোঁড়ামি তাঁহাদের মধ্যেও একটু আধটু আসিতে পারে এবং তাঁহাদের মারফৎ সেই গোঁড়ামি ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রমিত হইতে পারে।

গোঁড়ামি সব সময়েই মানুষকে আপেক্ষিক অন্ধতা প্রদান করে। কাজেই ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকর। সুতরাং শিক্ষকদের উচিত সমস্ত গোঁড়ামির উর্দ্ধে থাকিয়া সমস্ত উপদলীয় সংঘের স্বার্থের বাহিরে থাকিয়া শিক্ষাদান করা এবং তাঁহার পরিশুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়া। "ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই বলিব না, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই শিক্ষা দান করিব" ইহা ঠিক কথা নহে। কারণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানপরিবেশন নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ভাল পুস্তক এবং ভাল পুস্তকাগার দিয়াই শিক্ষার কার্য্য শেষ করা যাইত। কাজেই ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ দিয়া ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেই হইবে এবং শিক্ষার্থীকে নিছক জ্ঞান বিজ্ঞানের জীবন্ত অভিধান মাত্র না করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ লাগাইব অথচ ব্যক্তিগত মতবাদ বা গোঁড়ামির ছোঁয়াচ লাগাইব না, ইহা খুব সোজা কাজ নয়। শিক্ষকের মতবাদ ছাত্রদের মধ্যে

খানিকটা সংক্রমিত হইবেই। কাজেই এই ব্যাপারে রাষ্ট্র (State) শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। রাষ্ট্র যদি শিক্ষকদিগকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পড়াইবার নির্দ্দেশ দেন, তাহা হইলে ছাত্রেরা শিক্ষকদিগের পরিপক্ক জ্ঞানের অনেকখানি হইতে বঞ্চিত হইবে। আবার রাষ্ট্র যদি নিজের নিরাপত্তার জন্য একটা বিশিষ্ট উপদলীয় মতবাদ প্রচার করিবার জন্য শিক্ষকদের নির্দ্দেশ দেন, তাহা হইলে ছাত্রসমাজ সত্যদৃষ্টির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে একটি বিশিষ্ট উপদলের সাময়িক সুবিধা হইলেও, রাষ্ট্রের পরিণামে ক্ষতিই হইবে, এবং যে সত্যকে কুযুক্তি দিয়া চাপা দেওয়া হইল, পরিণামে হয়ত সশস্ত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়া তাহা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। এইজন্য বুভুক্ষিত অসন্তুষ্ট শিক্ষকসমাজের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহাদের অক্ষম এবং অপরিস্ফুট অসন্তোষই হয়ত ছাত্রসমাজের তথা ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে সক্রিয় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাদের নৈরাশ্য ও জীবন-সংগ্রামে পরাজয় হয়ত ছাত্রদের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ, অক্ষমতা ক্লৈব্যের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাতে জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িতে পারে; এই পঙ্গুত্বের লক্ষণ আজ বাংলা দেশে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই দৃষ্ট হইতেছে।

শিক্ষকদিগের ব্যক্তিত্বের অভিভাবন না পাইলে ছাত্রসমাজ মানুষ হইবে না, কাজেই তাঁহাদের মতবাদ যাহাতে তাঁহারা অবাধে ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত করিতে পারেন, এইরূপ স্বাধীনতা তাঁহাদের দেওয়া উচিত। আবার এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইলে শিক্ষকরাই লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপে চুপে ছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন।

এ অবস্থায় প্রতিকার কি? নান্ বলিয়াছেন, ছাত্রদের উপদলীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে রাখিবার জন্য গোঁড়ামির প্রতিশেধক হিসাবে বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, ছাত্ররা বিতর্ক সভার আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদের যুক্তি লইয়া তর্ক করিবে এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে উপদলীয় মতবাদের ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই বিতর্ক সভাও অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিবে না। কারণ এই বিতর্ক সভায় কি সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা অনেকখানি

পরিমাণে নির্ভর করিবে তাঁহার উপর, যিনি সভাপতি হিসাবে এই বিতর্ক-সভাকে পরিচালিত করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যুক্তির অপকৌশলে এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে ছাত্রদের যুক্তিকে ধাঁধাইয়া দিয়া নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রদের পরোক্ষভাবে নিজের মতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

কাজেই শিক্ষকদিগের অভিভাবনের শক্তিকে তাঁহারা কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাতত্ত্বের জটিলতম সমস্যাই হইয়া রহিয়াছে। ইহার সমাধান সহজ নহে। প্রাচীনকালের শিক্ষার ব্যবস্থায় এই সমস্যাটি ছিল না। কারণ প্রাচীনকালের তপোবনচারী শিক্ষাগুরুগণ রাষ্ট্রীয় দল, উপদলের সহিত নিজেদের জড়িত হইতে দিতেন না। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না বলিয়া কোনও রাষ্ট্রীয় উপদলের মুখপাত্র হইবার প্রয়োজনও তাঁহাদের ছিল না, আর রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হইবার প্রয়োজন তাঁ:াদের ছিল না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ, অন্নসমস্যাবিমুক্ত স্বাধীনচেতা, শুদ্ধ-চরিত্র-বিশিষ্ট শিক্ষক-সমাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

অনুকরণ ঃ

গণমনের বিকাশের জন্য সহানুভূতি এবং অভিভাবনের প্রয়োজনের কথা ইতোপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার অনুকরণের কথা আলোচিত হইবে। এক হিসাবে এই তিনটি একই কারণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি—একই মাইমেসিস্-এর হৃদয়গত দিক হইতেছে সহানুভূতি, বুদ্ধিগত দিক হইতেছে অভিভাবন এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টাগত দিক হইতেছে অনুকরণ।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে 'অনুকরণ' ক্রিয়াটি কি? কাহাকেও কোনও একটা কিছু করিতে দেখিলাম এবং তাহার পর আমিও তাহাই করিতে চেষ্টা করিলাম—ইহাই হইল অনুকরণের মূল কথা। পাচজন লোক এক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের অনুভূতি এবং তাহাদের কার্য্য সবই প্রায় পরস্পরের প্রভাবে এক রকম হইয়া যাইতে থাকে। কর্ম্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়া যখন সংঘগত একজন লোক অপরের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, তখন তাহাকেই অনুকরণ বলা হয়।

এই অনুকরণ কাজটি যদিও আমরা সকলেই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও ইহাকে ঠিক সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রবৃত্তির মধ্যে যে বিশেষ একটি উদ্দীপক (stimulus) এবং বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া (response) দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে তাহা নাই।

তাহা হইলে অনুকরণ ব্যাপারটার মনস্তত্ত্ব কি ? ইহা হইতেছে আমাদের সংঘবৃত্তির (gregarious instinct) সক্রিয় অবস্থা (doing aspect); ইহার জন্য সংঘগত সমস্ত প্রাণীই একভাবে কার্য্য করে, ইহা কখনওবা আত্মসচেতন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আবার কখনওবা আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনুষ্ঠিত হয়।

মানুষের মধ্যে আত্মসচেতন এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই দুই জাতীয় অনুকরণেরই লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। নান্ দেখাইয়াছেন, ক্লাশের পড়াশুনা শেষ হইল, বালিকাদের দল ক্লাশ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের ছুটাছুটি দেখিয়া ছোট্ট আর একটি বালিকাও ছুটিতে আরম্ভ করিল। এ ক্ষেত্রে চিন্তা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির কোনও লীলা নাই। একটি কুকুর-শিশুও তাহার সঙ্গীদের এইরূপ ছুটাছুটি করিতে দেখিলে হয়ত এই ভাবেই তাহাদের ছুটাছুটি অনুকরণ করিবে। ইহার পর ঐ বালিকাটি যদি দেখে তাহার সঙ্গীরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তাহা হইলে ঐ শিশুটিও নৃত্যের চেষ্টা করিবে এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, প্রাথমিক অভ্যাসের অনিপুণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সেও নাচিতে আরম্ভ করিবে। এই ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিবেচনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর একটু বড় হইলে সে যখন বন্ধুদের "স্কিপিং" করিতে দেখিবে, সেও তখন তাহার অনুকরণ করিবে। এ ক্ষেত্রে "স্কিপিং"-এর কৌশল, পদচালনা প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য তাহাকে অধিকতর বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে। এইভাবে অন্ধ জৈবিক অনুকরণ ক্রমশঃ আত্মসচেতন বুদ্ধি-সিদ্ধান্ত-প্রণোদিত অনুকরণে পরিণত হইতে থাকে এবং যে বালিকাটি প্রথমে শিশুসুলভ লাফালাফি করিতেও ভালভাবে সমর্থ হয় নাই, সে অনুকরণের দ্বারা একটা জটিল "ভাবনৃত্যের" লীলায়িত ভঙ্গীও আয়ত্ত করিতে পারিবে। অনুকরণের এই প্রকারভেদ

দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নিছক সংরক্ষণ-প্রয়াস (mneme) যেমন ক্রমশঃ স্মৃতিতে পরিণত হয়, অন্ধ জীবন-প্রয়াস (Horme) যেমন কর্ম্মপ্রয়াসে (Conation) পরিণত হয়, সেইরূপ অন্ধ জৈবিক অনুকরণ (Mimesis) আত্মসচেতন অনুকরণে (imitation) পরিণত হইয়া থাকে।

এখন এই অনুকরণের সহিত আমাদের দেহযন্ত্র (endowment) এবং অনুকৃত বস্তুটির কি সম্পর্ক, তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাহাকে আমরা নিছক 'অন্ধ জৈবিক অনুকরণ' বলিয়াছি, সেই ক্ষেত্রে অনুকৃত কার্য্যটি উদ্দীপকের (Stimulus) কার্য্য করে এবং এই উদ্দীপকটি তাহার অনুকরণকারীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া (Response) হিসাবে কতকগুলি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ছাপজটের* (engram-complex) চাবি খুলিয়া দেয়। মুরগীর শাবক যে তাহার মাতাকে খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে দেখিয়া খুঁটিয়া খাইতে অনুকরণ করে, অথবা শিশু বালিকাটি যে তাহার সঙ্গীদের দেখিয়া ছুটাছুটি লাফালাফি করিতে আরম্ভ করে, ইহা তাহারা করিত না, যদি সহজাত ছাপজট হিসাবে খুঁটিয়া খাইবার অথবা ছুটাছুটি লাফালাফি করিবার সংস্কার তাহাদের মধ্যে থাকিয়া না যাইত। একটি পাখীকে উড়িতে দেখিয়া মানব শিশু উড়িবার চেষ্টা করে না, কারণ উড়িবার সংস্কার বা দেহযন্ত্র তাহার নাই।

এই অন্ধ অনুকরণ (mimesis) ক্রমশঃ আত্মসচেতন অনুকরণে (imitation) পরিণত হয়। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটিতে থাকে। একজনের 'স্কিপিং' দেখিয়া শিশু বালিকাটি যখন 'স্কিপিং' করিতে আরম্ভ করে তখন সে দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া হিসাবেই তাহা করিতে পারে না, ইহা তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়। সহচরীর স্কিপিং দেখিয়া তাহাকে আত্ম-বিস্তারের উপায় হিসাবে সে ইহা গ্রহণ করে, তাহার পর চেষ্টা ও ভ্রান্তির (trial and error) ভিতর দিয়া সে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকে

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Complex-এর প্রতিশব্দ "গূঢ়ৈষণা" করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য এই Engram Complex-এর ক্ষেত্রে ঐ প্রতিশব্দটি সার্থক হইবে না।

এবং শেষ পর্য্যন্ত সার্থক প্রচেষ্টাকে অন্তঃপূর্ত্তির (Consolidation) সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া লয়। তখন স্কিপিং-এর কাজটি তাহার নিকট যান্ত্রিক ব্যাপারের মতই সুখসাধ্য হইয়া উঠে। তখন সে স্কিপিং জিনিসটিকে আরও জটিলতর করিয়া নৃত্যকলার মত একটা শিল্পের বস্তু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অনুকরণ ব্যাপারটা কি আমাদের কল্পনা ও সৃজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর ; বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, অনুকরণ আমাদের সৃজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। যাঁহাদিগকে আমরা মৌলিক সৃজনীশক্তির জন্য প্রশস্তি করি, তাঁহারাও তাঁহাদের পূর্ব্বসূরীদিগের চক্রনেমী-খিন্ন পথে তাহাদের সাধনার রথকে অনুগত শিষ্যের মতই চালাইয়া গিয়াছেন। সেক্ষপীয়ারের প্রথম দিকের রচনাবলীর মধ্যে আমরা এলিজাবেথীয় নাট্যকারদিগের অনুসরণ পাই, রবীন্দ্র-কাব্যের গোমুখীপ্রবাহ উজান ঠেলিয়া দেখিলে আমরা বিহারীলাল প্রভৃতি অনেকেরই অনুকরণ দেখিতে পাই। জৈবিক অন্ধ অনুকরণ ক্রমশঃ আত্মসচেতন অনুকরণে পরিণত হয় এবং তাহাই শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যত প্রকারের অনুকরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব ততখানিই সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই সত্য অনুসারে শিক্ষা-বিজ্ঞানের কয়েকটি কথা আসিয়া পড়ে। অনেকের ধারণা, ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য ; সুতরাং ক্লাশটি যত অল্পসংখ্যক ছাত্রযুক্ত হয়, ততই ভাল। এ ধারণাটি এক হিসাবে ভুল। শিশু যত বেশী সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশা করিতে পারিবে, অনুকরণ করিবার যত বিস্তৃত ক্ষেত্র পাইবে, প্রতিযোগিতার যত তীব্রতা পাইবে, ততই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। অবশ্য এই অনুকরণ শিক্ষকের বেতের ভয়ে করাইলে চলিবে না, তাহা হইলে অনুকরণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক সঙ্গী না থাকায় ছাত্রদের কল্পনাশক্তির দ্বার খুলিবার সুবিধা নাই, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুস্তকাদির দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

অনুকরণের নাম শুনিয়াই কাণে আঙ্গুল দিয়া ছি-ছি করিবার প্রয়োজন নাই। সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত 'অনুকরণ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, অনুকরণ মাত্রই দুষ্য নহে। অনুকরণ করিতে করিতেই ছোট শিশু কথা কহিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সভ্যতর জাতির অনুকরণ করিতে করিতেই বড় হইয়া উঠে, গ্রীক্ সভ্যতার অনুকরণ করিয়াই রোমক সভ্যতা বড় হইয়াছে, রোমক সভ্যতার অনুকরণ করিয়াই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা বড় হইয়া উঠিয়াছে। পোপ্ ড্রাইডেনের অনুকরণ করিয়াছেন, জন্সন্ পোপের অনুকরণ করিয়াছেন, ভার্জিল হোমারের অনুকরণ করিয়াছেন, সারা রোমক সাহিত্য গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছে। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য মহাভারত আর একটি মহাকাব্য রামায়ণের অনুকরণ মাত্র।* মহাভারতের যুধিষ্ঠির রামায়ণের রামের অনুরূপ, অর্জ্জুন লক্ষ্মণের অনুরূপ, নকুল-সহদেব ভরতের অনুরূপ। ভীমের কথা স্বতন্ত্র, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কুম্ভকর্ণের ছায়া আছে। রামায়ণের বিভীষণ মহাভারতে বিদুর হইয়াছে। দুইটি মহাকাব্যের নায়কই সিংহাসন পাইবার প্রাক্কালে পত্নীসহ দীর্ঘকালের জন্য বনবাস বরণ করিয়াছেন, উভয়ের প্লট্ প্রায় একরূপ, রামায়ণের লব-কুশের কাজ মহাভারতে মণিপুরে বভ্রুবাহন করিয়াছে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সহিত মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের বহু সাদৃশ্য আছে। এই সব সত্বেও, মহাভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। ইহাতে এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা রামায়ণেও নাই। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, কর্ণ, সুভদ্রা, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয়।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, সমাজ সভ্যতা কলা-কৃষ্টি সর্ব্বত্রই অনুকরণ মৌলিকত্বের জননীর কাজ করিয়াছে। ইউরোপের ব্যবস্থা-শাস্ত্র, ইউরোপের শাসনপ্রণালী রোম হইতে অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপের স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্রবিদ্যা গ্রীক ও রোমক অনুকরণ হইতে উদ্ভুত। অনুকরণ করিতে করিতে

---

* রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর রচনা তাহা লইয়া পণ্ডিতদের তর্ক ও মতভেদ আছে। তবে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

যখন দক্ষতা অর্জ্জিত হয়, তখন মৌলিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় অনেক প্রতিভাবান্ শিষ্যই গুরুকে ছাড়াইয়া যায়।

(১) সহানুভূতির সাহায্যে অপরের ভয় ভাবনা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে অনুভব করা, (২) অভিভাবনের সাহায্যে অপরের চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করা এবং (৩) অনুকরণের সাহায্যে অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া পুনরাবৃত্তি করা—ইহাই হইতেছে গণমনের বা সংঘচেতনার মূল কথা। লা-বঁ (Le-Bon) নামক পণ্ডিত এই তিনটি ছাড়া আর একটি শক্তির কথা বলিয়াছেন—তাহা হইতেছে (৪) সংঘজাত শক্তির অনুভূতি। তিনি বলেন, জনসংঘস্থ ব্যক্তি জনতার অংশ হিসাবে শুধু সংখ্যা সম্বন্ধে সচেতন বলিয়াই একটা নূতন শক্তিতে স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া উঠে। ফলে একাকী থাকিলে যে কাজটি সে করিতে পারে না, জনতার মধ্যে থাকিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারে। জনতার স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই ভাবে তাহার কাজের জন্য তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কিছুই নাই। ফলে দলগতভাবে এমন গোঁয়ার্ত্তুমির কাজ সে করিতে পারে, যাহা ব্যক্তিগতভাবে সে কিছুতেই করিতে পারে না। যে নিয়মের জন্য একটি জনতা এই মূর্খজনোচিত কার্য্য করে, তাহাকে লা-বঁ "মিশ্রণ ও বাধার নিয়ম" (The law of fusion and arrest) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জনতার মধ্যে যে গুণটি সাধারণ, তাহা মিশ্রণ হইয়া এক হইয়া যায় এবং যে গুণটি ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন প্রকারের তাহা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া পরস্পরকে বাধা দিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে সাধারণের আগ্রহ আছে এমন একটা মূর্খের দল যাহা সিদ্ধান্ত করে, পণ্ডিতের দল ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। কবির কাব্যের ব্যঞ্জনা বদলাইয়া এ ক্ষেত্রে এই নিয়মটি সম্বন্ধে বলিতে পারি "ব্যক্তি ডুবে যায় দলে" এবং দলের অধিকাংশের সাধারণ সিদ্ধান্তই জয়ী হয় এবং 'জৈবিক অনুকরণের' নিম্নতম প্রেরণার অন্ধ অনুকরণে পরিচালিত হইয়া ভদ্র-অভদ্র সকলেই হয়ত ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না।

জনসংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে মনে

হইতে পারে যে, গণমনের কাজই হইতেছে ব্যক্তিগত আচরণকে নিম্নস্তরে লইয়া আসা। কিন্তু একথা সর্ব্বথা প্রযোজ্য নহে। কারণ জনসংঘের সবগুলির কার্য্যই এক জাতীয় নহে এবং ইহার বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগও করা যাইতে পারে। ড্রেভার সাহেব জনসংঘের ক্রিয়াকলাপকে এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ঃ

(১) **জনতা জাতীয় গণসংঘ ঃ** ইহার মধ্যে একটা স্থায়ী বন্ধন কিছুই নাই, ইহার মধ্যস্থিত লোকগুলি সাময়িকভাবে মিলিত হয় আবার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়, অতীতের কোনও সংস্কার বা ঐতিহ্য অথবা ভবিষ্যতের কোনও ভাবনা বা আদর্শ ইহার কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না। ইহার কার্য্যকলাপ সমস্তই বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং শিশু বা ইতর-প্রাণীদের মত সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কার্য্যকলাপের উত্তেজক।

(২) **ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় জনসংঘ ঃ** ইহার মধ্যে জনতার বর্ত্তমান-সর্ব্বস্বতা নাই; প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধ এরূপ জনসংঘের সভ্যদিগের কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থায়িত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে।

(৩) **জাতিগত জনসংঘ ঃ** একটা সাধারণ ঐতিহ্য, সাধারণ কৃষ্টি, সাধারণ গৌরব-বোধ এই জাতিগত জনসংঘের জনসাধারণকে একত্র বন্ধন করিয়া রাখে; ফলে জাতিগত গণমনের প্রেরণায় জাতির গৌরবের জন্য স্বার্থত্যাগ, জীবন-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দুঃখ বরণ, প্রাণান্তকর বীরত্ব প্রভৃতির উদাহরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হইয়া আছে।

জনতার মধ্যে পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কার, আদর্শ, ঐতিহ্য, উদ্দেশ্যমূলক শক্তি প্রভৃতি কিছুই নাই, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে ইহা কিছু কিছু মিলে এবং সমাজ বা জাতিগত জনসংঘের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। জাতীয়ত্ব বোধের মধ্যে এই গণমনের ক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই জাতির আদর্শ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক শত নির্য্যাতন বরণ করিতে পারে, অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, নিষ্ঠা

ও আত্মত্যাগের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। গণমনের এই দিকটি হইতেছে একটি স্পৃহনীয় ও গৌরবময় দিক।

নিছক জনতার মধ্যে যে গণমনের কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও কখনও যে মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করায় না, তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মানুষকে মূর্খ সিদ্ধান্ত ও অন্যায় দুঃসাহসিকতায় প্রেরণা দেয়। আর তাহা ছাড়া জনতার গণমন সম্বন্ধে একটা স্থায়ী রূপের কল্পনা করা যায় না। ইহা মানুষকে হিতাহিতবোধশূন্য করিয়া বর্ত্তমান-সর্ব্বস্ব ভাব-মত্ততায় অনুপ্রাণিত করে মাত্র। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা সমাজগত জনসংঘের মধ্যে যে গণমনের কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা সংঘগত মানুষদের কার্য্যকলাপে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের সংঘের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন, ত্যাগ-স্বীকার প্রভৃতি কার্য্যে প্রেরণা দেয়। কাজেই গণমনের এই দিকটির অনুশীলন স্কুল কলেজে খুব বাঞ্ছনীয়।

স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গণমনের বিকাশ ও অনুশীলনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে:

প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানগত সভ্যদের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতার স্রোত থাকা প্রয়োজন। এই অবিচ্ছিন্নতা নানাভাবে থাকিতে পারে, যথা (ক) একই লোককে বহু বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত রাখিবার ব্যবস্থা করা, (খ) যতই নূতন লোকের স্রোত আসিতে থাকুক না কেন, পুরাতন ভাবধারা বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত পুরাতন সভ্যকে হঠাৎ বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা না করা, (গ) প্রতিষ্ঠানের আইন, কানুন, কর্তৃত্ব, পরিচালনা প্রভৃতির জন্য একটা স্থায়ী নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করা। স্কুল কলেজে এই সমস্ত উপায়গুলিই কার্য্যকরী করা যায়; তবে এই বিষয়ে সাধারণ স্কুল অপেক্ষা আবাসিক স্কুলের সুবিধা অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠানগত প্রত্যেক সভ্যের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা মমত্ববোধ, একটা সংঘ-চেতনা থাকা প্রয়োজন। এই সংঘ-চেতনার জন্য আবশ্যক হইতেছে সংঘের কার্য্যাবলীর সহিত মনে প্রাণে ঐক্যবোধ। নিছক দেহগত উপস্থিতি অথবা অর্থগত সাহায্যদান—এইটুকুই সংঘ-চেতনার সৃষ্টি করিতে

পারে না। ক্লাশে যখন পড়াশুনা চলিতেছে, তখন যে বালক পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় না, সে পাঠনের সময় যে সংঘ-চেতনার সৃষ্টি হয় তাহাতে মোটেই সাহায্য করে না, বরং গণ-মনের পুষ্টিতে ব্যাঘাতই আনয়ন করে।

তৃতীয়তঃ একটি সংঘের সহিত অন্য সংঘের প্রতিযোগিতা এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিযোগিতা সংঘস্থ জনসাধারণকে সংঘ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। সংঘের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য, সংঘের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণা দান করে।

চতুর্থতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা যুগলালিত আচার ও ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন। এই ঐতিহ্যকে রস্ সাহেব 'Group Mneme' নাম দিয়াছেন। এই ঐতিহ্য সংঘগত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া প্রত্যেককেই একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পরিচালিত করে। অবশ্য এই প্রাচীনপন্থী মনোভাব অনেক সময় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া গতানুগতিকতার চক্রাবর্ত্তে আমাদের পরিচালিত করিতে পারে এবং জীবনের নূতন সার্থকতার অভিযান হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়াও তুলিতে পারে। তাহা হইলেও অতীতের আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে আমাদের সভ্যতা ও সাধনা দানা বাঁধিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই অতীতের রীতিনীতি, সংস্কার প্রভৃতিকে—এমন কি যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়াও মনে হয়, সেই সমস্তকেও খুব নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলা এবং বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে তাহাদের রক্ষা করা উচিত। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন, প্রাক্তন সভ্য-সম্মেলন প্রভৃতির দ্বারা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসূত্র বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা সুপরিচালিত এবং সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মতন্ত্রকে প্রেরণা দিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে। সংঘগত এই প্রেরণাকে রস্ সাহেব 'Group horme' নাম দিয়াছেন। মানুষের জীবনে যেমন সংরক্ষণ-প্রয়াস এবং কর্ম্ম-প্রয়াসের প্রয়োজন আছে, সংঘজীবনেও সেই প্রকার তাহাদের

প্রয়োজন আছে। সংঘ-নেতৃত্ব এই সংরক্ষণ-প্রয়াস ও কর্ম্ম-প্রয়াসকে পরিচালিত করে। এই জন্য সংঘ-জীবনের গৌরবের জন্য মহাপুরুষদের নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা জানি, জনতার মধ্যে যে জনসংঘের সৃষ্টি হয়, তাহাতে অযোগ্য নেতার নেতৃত্বে জনতার লোকেরা এমন সমস্ত কার্য্য করে যাহার জন্য পরে লজ্জা পাইতে হয়। প্রতিষ্ঠান-নেতার পক্ষেও এই জাতীয় কাজ করা সম্ভব। কিন্তু তিনি যদি সত্যকারের মহৎ ব্যক্তি হন তাহা হইলে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শের গুণে সংঘের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধে টানিয়া তুলিতে পারেন। এইভাবে যোগ্য নেতার পরিচালনায় একটা প্রতিষ্ঠান বা জাতির ইতিহাস একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে। কার্লাইল বলিয়াছেন, "একটা জাতির ইতিহাস হইতেছে সেই জাতির মহাপুরুষদের ইতিহাস"—কথাটা এই দিক দিয়া খুবই সত্য। এই মহাপুরুষদের আবির্ভাব না হইলে জাতির সাধারণ লোক সাধারণই থাকিয়া যায়; কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকিলে এই সাধারণ লোক দিয়াই অসাধারণ বীরত্ব, অসাধারণ ত্যাগ প্রভৃতির কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়।

স্কুল কলেজে এই যোগ্য নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান কিরূপে সম্ভব? একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা অনেক স্বাভাবিক নেতার সন্ধান পাই। এই নেতা কাহারা? যাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে ভাল? আচার আচরণে সৎ? না। অনেক সময়েই সেই সমস্ত বালকেরাই স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়, যাহারা শারীরিক শক্তিতে শক্তিমান, খেলাধূলায় দক্ষ এবং দুষ্টামির নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কারে ওস্তাদ। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহাদের নেতা বলিয়া মনে হয়, সেই দুর্দ্দান্ত ডাকাবুকো বেপরোয়া ছেলেটিকে আড়াল হইতে পরিচালিত করিতেছে একজন কুচক্রী বুদ্ধিমান বালক। উপর হইতে তাহাকে চেনা যায় না, অথচ এই অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির বালকটিই হয়ত সমস্ত দুষ্টামির উৎস।

স্কুলের স্বাভাবিক নেতা এই ডাকাবুকো ছেলেটিই হউক, অথবা কুচক্রী সয়তানটিই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, স্বাভাবিক নেতাদের দল সব সময়েই তাহাদের সহচরদের কল্যাণের

পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য শিক্ষকদের উচিত এই নেতৃত্বের অধিকার গ্রহণ করা। কিন্তু তাহা কিভাবে সম্ভব হইবে? অনেকে বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের খেলাধূলার সঙ্গী হইয়া এই কাজ করা সম্ভব। পরিহাস-রসিক ক্রীড়া-নিপুণ অমায়িক প্রকৃতির অল্পবয়স্ক শিক্ষকদের পক্ষে এই কাজটি খানিকটা সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও, শিক্ষা দীক্ষা, বয়স এবং প্রবণতার দিক দিয়া শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা বিভেদ থাকিয়া যাইবেই এবং এই বিভেদটি শিক্ষকের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিবে। কাজেই শিক্ষকরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, ছাত্রদল তাঁহাদিগকে মনেপ্রাণে নিজেদের দলের বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না।

কাজেই স্কুল কলেজ পরিচালনার শ্রেষ্ঠতর উপায় হইতেছে ছাত্রদের মধ্য হইতেই উপযুক্ত স্বাভাবিক নেতার সন্ধান করিয়া লইয়া সেই নেতাদের কার্য্যের উপর নেতৃত্ব করা এবং তাহাদের মারফৎ সমস্ত ছাত্রদিগকে আইন, শৃঙ্খলা ও কল্যাণের পথে সুপরিচালিত করা। পূর্ব্বেকার যুগে "সর্দ্দার পোড়ো"দের দিয়া এই জাতীয় কাজ করা হইত। বর্ত্তমানে 'প্রিফেক্ট' প্রভৃতির দ্বারাও এইরূপ কাজ করানো সম্ভব। উপযুক্ত নেতার নির্ব্বাচন হইলে এবং সেই নেতাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে "ছাত্র-শাসনতন্ত্রের" দ্বারা, "ছাত্র পঞ্চায়েৎ" জাতীয় প্রথার দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এই সুযোগ্য ছাত্রনেতাদের উপর শিক্ষক যে ভার অর্পণ করেন, তাহারা প্রায়ই তাহার অমর্য্যাদা করে না।

গণমনের আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণীয়। তাহা হইতেছে, বিদ্যালয়ে পঠনের সময় ছাত্রদের ব্যক্তিগত মনের উপর অথবা গণমনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে? অর্থাৎ "পাঠন কার্য্য ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে হইলে ফল ভাল হইবে?'

অনেকের কাছে এই প্রশ্নটি একেবারে নিরর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া যে খুবই প্রয়োজন, বহু সংখ্যক ছাত্রবিশিষ্ট 'হরি ঘোষের গোয়ালে'র চেয়ে ছোট ছোট ক্লাশে যে কাজ ভাল হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে পাঠনের দিক দিয়া

ছোট ক্লাশ ভাল, না বড় ক্লাশ ভাল—এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন?

যে সব ব্যাপারে বুদ্ধির কাজ বেশী, সেই সমস্ত বিষয় পাঠনের সময় ছোট ক্লাশে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিলে ফল ভাল হয়। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যাহাতে মস্তিষ্কগত বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়গত আবেগ, অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন বেশী। এই সব ক্ষেত্রে ছোট ক্লাশের চেয়ে বড় ক্লাশে ফল ভাল হয়। ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। ইতোপূর্ব্বে আমরা যে অভিভাবন, অনুকরণ ও সহানুভূতির কথা বলিয়াছি, তাহা সংঘজীবনেই বিশেষভাবে ক্রীয়াশীল হয়। ফলে সংঘটি যত বৃহৎ হইবে, পরস্পরের মনের রঙে পরস্পর অনুরঞ্জিত হওয়া, পরস্পরের সহানুভূতিতে হৃদয়াবেগে অভিভূত হওয়া, এইগুলি ততই বিশেষভাবে ঘটিতে থাকিবে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে কোনও শোকের দৃশ্য দেখিয়া দুই একজন যখন রুমাল লইয়া চক্ষের জল মুছিতে আরম্ভ করিল অমনি চারিদিক হইতে ফোঁস ফোঁস ফুঁপাইয়া কান্নার রেষারেষি আরম্ভ হইয়া গেল, সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা জমাট কান্নার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। ক্লাশের মধ্যেও এই ব্যাপারটি হয়। কবিতা পাঠনের সময় অথবা যে সমস্ত পাঠ্য পাঠনের মধ্যে ছাত্রদের হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির কাজ করিতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে বৃহৎ ক্লাশের জমাট গম্‌গমে নিস্তব্ধতার মধ্যে পাঠন যত হৃদয়গ্রাহী হয়, ছোট ক্লাশের দু' চারটি ছাত্রের মধ্যে ততটা হয় না।

যাঁহারা বড় বড় সভা-সমিতিতে ভাষণ দেন তাঁহারাও জানেন, সভায় উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতা না থাকিলে ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায় না। যাত্রা থিয়েটারের অভিনেতারাও ফাঁকা আসরে ভাল অভিনয় করিতে পারেন না।

কাজেই বড় ক্লাশ হইলে শিক্ষকদের হতাশ হইবার বা ভয় পাইবার কিছুই নাই। তাঁহাদের যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগকে অপরের হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা থাকে, ক্লাশের বিভিন্নমুখী আগ্রহকে একমুখী করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিযুক্ত করাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বড় ক্লাশ তাঁহাদের পক্ষে সুবিধারই কারণ হইবে।

উৎসাহ, অনুপ্রেরণা প্রভৃতি সঞ্চারের জন্য স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে মধ্যে

সমাবেশ (assembly) করিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে তাহাদের নিকট ভাষণ দিতে পারেন এবং নানা প্রকার উৎসব আয়োজন করিয়া স্কুলের মধ্যে সামাজিক জীবনকে সুস্থ ও সবলতর করিয়া তুলিতে পারেন। স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা, বাৎসরিক স্পোর্টস্, সাহিত্য-সভা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নববর্ষ, মাঘোৎসব, বর্ষা-উৎসব প্রভৃতি এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য অনেকের মধ্যে যে একটা বাতিক দৃষ্ট হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরর্থক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য আগেকার দিনে বড়লোকেরা তাঁহাদের ছেলেদের গৃহ-শিক্ষক, গভর্ণেস্ প্রভৃতির দ্বারা পড়াইয়া সাধারণ বালকদের সংশ্রব বাঁচাইয়া আভিজাত্যের বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে মানুষ করিবার চেষ্টা রতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে যে, সেই সব ছেলেদের বেশীর ভাগই এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অনুকরণ, অনুভাবন, সহানুভূতি প্রভৃতির সাহায্যে গণমন বিকাশের সুবিধা হয় নাই বলিয়া তাহারা প্রায়ই অপরিণত-বুদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, সঙ্ঘকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি প্রভৃতি যে বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়, সেগুলি না হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা অভিমানী, অতিমানী, স্বার্থপর, অসমাজিক, আত্মকেন্দ্রিক ও আদুরে দুলাল প্রকৃতির হইয়া পড়ে। শিক্ষা দ্বারা যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তেমনই তাহার সামাজিক সত্বাকেও বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসামাজিক মানুষ মানুষই নয়, সে যত বিদ্বান, যত বুদ্ধিমানই হউক না কেন। শুধু তাই নয়, নিছক ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হইলেও মানুষকে মানুষের কাছাকাছি আসিতে হয়, পরস্পরকে বুঝিতে হয়, পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, পরস্পরের সুবিধা, সম্মান ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই ব্যক্তিগত মনের বিকাশের চেয়ে গণমনের বিকাশের চেষ্টা শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেশী প্রয়োজন।

তবে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সাহায্য বা দান

প্রভৃতির উপযোগিতাকে আমরা অস্বীকার করিতেছি না। সকলকার শক্তি সমান নয়। কাজেই সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সকলেই উপকৃত নাও হইতে পারে। এইজন্য দুর্মেধা বালকদের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্য প্রভৃতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তেমনই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী বালকদের জন্যও ব্যক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া বুদ্ধিগত বিষয়ের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু বুদ্ধিই মানুষের সব কিছু নহে। হৃদয়হীন বুদ্ধি অনেক সময় মানুষের অকল্যাণই সাধন করে। বুদ্ধির শক্তিকে "গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" প্রযুক্ত করিতে হইলে প্রেম-প্রীতি ত্যাগ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির প্রয়োজন। এই হৃদয়-ধর্ম্মের বিকাশ সঙ্ঘজীবনেই বিশেষভাবে সম্ভব। গণমনের সহানুভূতি, অভিভাবন, অনুকরণ প্রভৃতির কার্য্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক জীবনে সম্ভব নহে। ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ করিয়া তোলা যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিকেই শুধু উদ্বুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাহার হৃদয়কেও বিকশিত করিতে হইবে। এই হৃদয়ের প্রেরণায় নীতির পথে চলা যতটা সহজ, শুষ্ক বুদ্ধির প্রেরণায় ততটা সহজ নহে। কাজেই হৃদয়ের প্রেরণাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য গণমনকে যতটা কাজে লাগান যায় ততই ভাল। এই জন্যই রস বলিয়াছেন "আমরা যদি নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি তাহা হইলে খুবই ভুল করিব। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, বুদ্ধিগত ব্যাপারে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং নীতি, ধর্ম্ম, আবেগ, দেশপ্রেম প্রভৃতি জাগাইবার ব্যাপারে সঙ্ঘগত শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠতম উপায়।"

বড় ক্লাশ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। কারণ বড় ক্লাশের বিরুদ্ধে অনেক অভিভাবক এমন কি অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও আপত্তি আছে। অনেক শিক্ষককে বলিতে শুনা যায় 'একটি পিরিয়ডে ৪০ মিনিট সময়, আর ক্লাশে ৫০টি ছাত্র, পড়াইব কি করিয়া? ইহাতে ব্যক্তিগত ছাত্রের প্রতি গড়ে এক মিনিটও সময় দেওয়া যায় না'—এ অনুযোগ সত্য নহে। এই ক্লাশটিতে মাত্র কুড়িজন ছাত্র থাকিলেও ছাত্র প্রতি গড়ে দুই মিনিটের বেশী সময়

দেওয়া যাইত না। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, দুই মিনিট সময়েও কোন ছাত্রেরই প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় হইতেছে পাঠন ও প্রশ্ন করিবার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা। ছোট ছোট প্রশ্ন তৈয়ারী করিতে হইবে, একটি ছাত্রকে যখন প্রশ্ন করা হইল তখন সমস্ত ক্লাশকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার দায়িত্ব শুধু ব্যক্তিগত নয়, তাহা সমগ্র ক্লাশেরই। তেমনি একজন ছাত্রকে যদি কিছু বুঝাইতে হয়, তখন তাহা শুনিবার দায়িত্বও সমগ্র ক্লাশের। ক্লাশে পড়াইবার সময় একজনের পর আর একজনের পাঠ-দেওয়া শুনিয়া অপর একজনের পাঠ তৈয়ারী হইয়া যায়, আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া অধীত বিদ্যা মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে গাঁথিয়া যায়। কাজেই বড় ক্লাশে ছাত্রপ্রতি গড়ে খুব বেশী সময় না পাইলেও ক্ষতি হয় না, এবং একজনের উপকার অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বড় ক্লাশে সমগ্রভাবে গণমনটিকে একাগ্র করিতে পারিলে যত কাজ হয়, ব্যক্তিগত একাগ্রতায় সেই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। বড় ক্লাশের মনোযোগ ঠিক রাখিবার জন্য শিক্ষককে আকস্মিকভাবে ক্লাশের নানাস্থানে ছড়াইয়া ছড়াইয়া প্রশ্নগুলিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং ক্লাশের গণমনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ব্যক্তিগত অমনোযোগকে যেমন করিয়াই হোক দমন করিতেই হইবে, ক্রীড়াচ্ছলে (Play Way) প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা গণমনের উত্তেজনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া আবেগ উৎসাহ প্রভৃতি হৃদয়-ধর্ম্মের সাহায্যে বুদ্ধির কাজকে সহজতর করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাতেও যাহাদের কাজ হইবে না, তাহাদের একান্তে লইয়া "টিউটোরিয়াল্" প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সাহায্যে ভাল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, নেতাজীর ব্যবহৃত ফুলের মালা বারো লক্ষ টাকায় নিলাম হইয়াছিল। গণমনের উত্তেজনা ব্যতীত এই জাতীয় ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব হয় না। স্বামীজী বলিয়াছেন, "দশ হাজার লোকের বাহবার সাম্নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়"—ইহাই হইল গণমনের লীলা। কাজেই এই গণমনের উত্তেজনার সুযোগ শিক্ষকের নিকট হেলার বস্তু নহে। ইহাকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়।

স্থিতিবাদ

এখন হইতেছে গতিবাদের যুগ। প্রগতি এখন উদ্ধত-পরিক্রমায় নব-নব অভিযানে চলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কেহ যদি কিছু বলে, তাহা হইলে তাহাকে গোঁড়ামির অপবাদ দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমান যুগে বোধহয় গোঁড়ামির চেয়ে বড় অপবাদ আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান সমাজে কালোবাজারে দোষ নাই, মিথ্যাচারে লজ্জা নাই, দম্ভ ও আত্মপ্রচারে দুর্নাম নাই, কিন্তু গোঁড়ামির অপবাদ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকারই ভয়ের বস্তু। কাজেই এই যুগে গতিবাদের বিরুদ্ধে এবং স্থিতিবাদ সম্বন্ধে ওকালতি করিতে ভয় হয়—পাছে কেহ আমাদের গোঁড়ামির অপবাদ দিয়া বসেন।

কিন্তু জীবনের পরিক্রমা নিছক গতিবাদেরই নামান্তর মাত্র নহে। গতি এবং স্থিতি এই উভয়কে লইয়াই জীবনের কারবার। আমরা যাহা কিছু করি তাহা গতিবাদ অথবা স্থিতিবাদেরই অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ স্থিতিবাদ মরা নদীর বদ্ধ জলস্রোতের মত জরা ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্রই নহে। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, স্থিতিবাদ আমাদের জীবনের অধিকাংশ কার্য্যকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিকাংশ মানুষই প্রগতির দিক্‌চিহ্নহীন অনিশ্চিত অভিযানের চেয়ে গতানুগতিকতার নেমি-ক্ষিপ্র বাঁধা পথেই চলা-ফেরা করিতে পছন্দ করে বেশী।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কার্য্যকলাপের মধ্যে এই স্থিতিবাদেরই একচ্ছত্র প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাহারা সহজে "রুটিন্" ভাঙ্গিতে চায় না। তাহারা যে ভাবে খাইতে পরিতে শুইতে খেলা করিতে অভ্যস্ত, তাহার ব্যতিক্রম তাহারা সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় বাড়ীতে নূতন দাসী আসিলে অথবা বিপত্নীক গৃহকর্ত্তা নূতন স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে সেই নবাগতার সহিত বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের যে সংঘর্ষ হয়, তাহার কারণ হইতেছে এই নবাগতারা বাড়ীর ঐতিহ্যের সহিত ঠিক পরিচিত নয় বলিয়া নূতন ব্যবস্থার

প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহার ফলে শিশু-মহলে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে।

শিশুদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন-বিরোধিতার কারণ কি? পুরাতনের আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে আনন্দ আছে, যে দক্ষতা-অর্জ্জন ও আত্ম-বিস্তারের সুযোগ আছে, সেই আনন্দ ও সুযোগের প্রেরণাই হইতেছে ইহার কারণ। এই পরিবর্ত্তন-বিরোধিতা ও পুনরাবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের দক্ষতা দানা বাঁধিয়া উঠে।

ছন্দের আনন্দও এই পুনরাবৃত্তির আনন্দের সহিত জড়িত। ছন্দের আনন্দ মানুষের জীবনের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত। ছন্দের তালে-তালে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি, ছন্দের তালে-তালে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়, ছন্দের ভিতর দিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঙ্গবিক্ষেপ নৃত্যকলায় পরিণত হয়, ছন্দের ভিতর দিয়াই ছড়া গান, লাচাড়ী, পয়ার প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং ছন্দের ভিতর দিয়াই চিত্রবিদ্যার অনুপাত জ্ঞান ও সামঞ্জস্য বোধ প্রভৃতির আরম্ভ হয়। এই ছন্দপ্রীতি ও পুনরাবৃত্তির আনন্দই পরিপক্ক হইয়া আমাদের মধ্যে যে স্থিতিবাদ ও রক্ষণশীলতার সৃষ্টি করে, তাহাই উত্তরকালে নীতিধর্ম্মের প্রতি আনুগত্য ও আদর্শবাদ প্রভৃতিতে পরিণত হয়।

এই রক্ষণশীলতাকে গোঁড়ামির অপবাদ দিয়া অনেক সময় ছোট করিয়া দেখান হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে যতটা নিন্দা করা হয়, ইহা ততটা নিন্দনীয় নহে। অধ্যাপক গ্রাহাম ওয়ালেস্ (Graham Wallas) দেখাইয়াছেন, স্কুল-কলেজে "ডিসিপ্লিনের" অর্দ্ধেকের উপর নির্ভর করে রক্ষণশীলতা ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার উপর। পূর্ব্ববর্ত্তীরা যে ভাবে কাজ করিয়াছে, সেই ভাবেই কাজ করিয়া যাইতে হইবে—এই বিশ্বাসই হইতেছে শৃঙ্খলার মূল কথা। যেখানে এই জিনিসটি নাই, যেখানে প্রধান শিক্ষক নিত্য নূতন আইন ও 'অর্ডিনান্স' জারি করেন, যেখানে কোনও "ট্রাডিশন" দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে শৃঙ্খলার আশা করা নিরর্থক। একটি নিয়ম যদি যুক্তিযুক্ত নাও হয়; তাহা হইলেও তাহার পশ্চাতে যদি "ট্রাডিশন" থাকে, একটা সুপ্রাচীনত্বের মর্য্যাদা থাকে, তাহা হইলে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন না করিয়া

প্রাচীন নিয়মকেই সহ্য করিয়া চলা উচিত, কারণ সেই খারাপ প্রাচীন আইনটি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যতটা কার্য্যকরী হইবে, নব-প্রবর্ত্তিত ভাল আইনটি ততটা কার্য্যকরী হইবে না। তাহা ছাড়া প্রাচীন আইন অমান্য করার মধ্যে যে বিদ্রোহ জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই বিদ্রোহ নূতন আইনটিকেও স্পর্দ্ধার চোখে দেখে। গীতায় যে বলা হইয়াছে "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (৩।৩৫), তাহার ব্যঞ্জনাও অনেকটা এইরূপ। ধর্ম্মান্ধতার গোঁড়ামিতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেন নাই। স্বধর্ম্মের প্রতি আমাদের যে একটা 'ট্রাডিশনে'র আনুগত্য আছে, সেই আনুগত্যই আমাদিগকে স্বধর্ম্মের বিধি-নিষেধকে মানিয়া চলিতে সাহায্য করে এবং এই আনুগত্যের জন্যই আমরা স্বধর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা, ত্যাগ, দুঃখবরণ প্রভৃতি করিতে সমর্থ হই। পরধর্ম্মে এই সুবিধা নাই।

প্রতিষ্ঠান ও সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। তাহার আইন-শৃঙ্খলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমন কি 'নূতন কিছু করা', 'সংস্কার সাধন' প্রভৃতির অজুহাতেও নয়। প্রতিষ্ঠান ও সমাজের রীতি-নীতির সম্বন্ধে একটা রক্ষণশীল মনোভাব এই জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্য যাহারা লঘুচিত্ততা বা অসংযমের জন্য এই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। স্কুলের দুষ্ট বালক যখন এইরূপ কিছু করিবে, তখন প্রধান শিক্ষক তাহাকে দণ্ড দিবেন তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বকে সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া ততটা নহে, যতটা হইতেছে সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র বিধি-নিষেধকে সে অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া। স্কুল-জীবনেই হউক, আর সমাজ-জীবনেই হউক, সর্ব্ব ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু পরিবর্ত্তন-বিলাস ও প্রগতিবাদের চেয়ে স্থিতিবাদই তাহার ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে ধরিয়া রাখে এবং কল-কারখানার গুরুভার "ফ্লাই হুইলের" মত তাহার সুনির্দ্দিষ্ট গতিপথে আবর্ত্তন করিয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালু অবস্থায় রাখে।

আমরা শিশু-জীবনের রক্ষণশীলতার কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই রক্ষণশীলতা বার্দ্ধক্যেরও একটা ধর্ম্ম। তবে বার্দ্ধক্যের রক্ষণশীলতা আর শৈশবের রক্ষণশীলতা এক জিনিস নয়। বার্দ্ধক্যের রক্ষণশীলতা আত্ম-

সঙ্কোচনের অভিব্যক্তি মাত্র ; নূতন পথে চলিবার এবং অনিশ্চিত অভিযানে শক্তির অপব্যয়ের ভয়েই এই রক্ষণশীলতা আসে। আর শৈশবের রক্ষণশীলতা হইতেছে আত্ম-বিস্তারের উপায় মাত্র ; এই রক্ষণশীলতার ভিতর দিয়া, শিশু পুরাণ কাজের পুনরাবৃত্তি করে এবং ক্রমশঃ কাজে দক্ষতা অর্জ্জন করে।

এই রক্ষণশীলতা ও পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টাগুলিকে অনেক শিক্ষাতাত্ত্বিক আজকাল ভাল চক্ষে দেখেন না। "ইহার মধ্যে বুদ্ধির লীলা নাই, ইহা যান্ত্রিক আবৃত্তি মাত্র" এই জাতীয় অপবাদ দিয়া আবৃত্তিমূলক নামতা পড়া, ধারাপাত পড়া, আর্য্যা, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি মুখস্থ করা প্রভৃতিকে "সেকেলে জিনিস" বলিয়া বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা খুবই ভুল কাজ ; আবৃত্তির আনন্দ বালক-বালিকাদের অস্থিমজ্জাগত ; আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াই তাহারা নিজেদের খুঁজিয়া পায় এবং এই আবৃত্তিই তাহাদের বুদ্ধি, দক্ষতা ও সৃজনীশক্তির দ্বার খুলিয়া দেয়।

গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সময় এই সত্যটি মনে রাখা উচিত। শিশুকে হয়ত এক জাতীয় অঙ্ক শেখান হইল। তখন তাহাকে সেই জাতীয় শক্ত অঙ্ক তাড়াতাড়ি না দিয়া সহজ সহজ অঙ্কই বহু বার করাইতে হয়। তাহার ফলে কৃতকার্য্যতার আনন্দ ও পুনরাবৃত্তির দক্ষতা শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও আত্ম-প্রত্যয় বাড়াইয়া দেয় এবং তাহার বুদ্ধি-বিকাশে সাহায্য করে। ইহা না করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি কঠিন অঙ্ক দিলে প্রত্যেক বারের অকৃতকার্য্যতা তাহার শক্তিকে কমাইয়া দিবে।

অনেক প্রগতিবাদী শিক্ষকদের ধারণা আছে যে, একটা পদ্ধতি শিখাইবার পর সময় নষ্ট না করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতি শিখাইতে হয়—এই ধারণাটি ঠিক নহে। একটি কাজ শিক্ষা করিবার পর সেই কাজটিকে বহুবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তাহা না হইলে সেই কাজটিকে সুন্দর করিয়া করা যায় না। ছবি, গান, নৃত্য, সূচী-বিদ্যা, কারিগরী, শিল্পকলা সব কিছুই আবৃত্তির ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং আবৃত্তির অভাবেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বস্তুতঃ আবৃত্তিবাদ প্রগতির পরিপন্থী নহে।

আবৃত্তির বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই অভাবনীয়ের গোপন দরজা হঠাৎ এদিকে ওদিকে খুলিয়া যায় এবং তখনই নূতন শিল্পকলার জন্ম হয়।

কথাটা অনেকের কাছেই নূতন লাগিতে পারে। রক্ষণশীলতার পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া নূতন শিল্পকলার স্থষ্টি কি করিয়া সম্ভব হয়? রক্ষণশীলতাকে ত স্থষ্টির পরিপন্থী বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে; রক্ষণশীলতা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পকলার জননীর কার্য্য করে। কথাটা একটু উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে। মৃৎশিল্পের কথাটাই ধরা যাউক। প্রাচীন মৃৎশিল্পী হয়ত নিছক প্রয়োজনের খাতিরে মৃতপাত্র গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ যে সমস্ত মৃৎপাত্র স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা হয়ত স্থগঠিত স্থন্দর জিনিস তৈয়ারী হয় নাই। তাহার পর আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া তাহার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা বাড়িতে লাগিল এবং বাড়্তি সময় ও দক্ষতা দিয়া সে প্রয়োজনের ঘরোয়া জিনিসটিকে শিল্পের স্থন্দর জিনিস করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইল। এইভাবে প্রয়োজনের চাহিদায় যাহার উদ্ভব হইল, শিল্পের স্থষমায় তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। এইভাবেই পুনরাবৃত্তির সঞ্চিত দক্ষতার ভিতর দিয়া শিল্পের জন্ম হয়। কিন্তু এই মৃৎশিল্পটি যদি তাহার প্রথম মৃৎপাত্র স্থষ্টির পরেই সেই পুরান গঠনের পাত্র নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়তই নূতন নূতন গঠনের দিকে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার দক্ষতা সহজে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না।

দক্ষতা অর্জ্জনের জন্য যেমন পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন, তাহার রক্ষণের জন্যও তাহার তেমনই প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি, বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, সেতারী, গায়ক প্রভৃতিকে প্রতিদিন ৫।৬ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের অধীত বিদ্যার আবৃত্তি করিতে হয়। এই আবৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অর্জ্জিত দক্ষতাকে বজায় রাখেন এবং ইহারই ভিতর দিয়া তাঁহারা নূতন স্থষ্টিরও সন্ধান পান।

মানুষের রক্ষণশীলতার এই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দিক। পৃথিবীর সমস্ত জাতির

মধ্যেই এই অনুষ্ঠানপ্রিয়তা দৃষ্ট হয়। রাজার অভিষেক উৎসব, ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন, বিবাহ, জয়ন্তী, মৃত্যু-বার্ষিকী প্রভৃতি এই পর্য্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে আসল অনুষ্ঠানটি তত বড় জিনিস নয়, যতটা হইতেছে এই অনুষ্ঠানগুলির ব্যঞ্জনা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে হয়ত বর্ব্বর যুগের অতি সাধারণ ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই সমস্ত অতি সাধারণ জিনিসগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সভ্য সমাজের বড় বড় ব্রত-পার্ব্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

'মানুষের সভ্যতা ও ধর্ম্ম-জীবনের সব কিছুই এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান হইতে জন্মলাভ করিয়াছে অথবা ইহাদের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে'—এ কথা বলিলে হয়ত একটু বেশী বলা হইবে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, একটা জাতির জাতীয় জীবনে এই সব অনুষ্ঠান ব্রত-পার্ব্বণ প্রভৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে এবং এগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত পালন করিলে জাতির কল্যাণই হইবে। যে জাতি নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে সম্মান করে না, সে জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া লঘুচিত্ত ও পরানুকরণ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে শুধু কবি হিসাবেই ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাতাত্ত্বিক হিসাবেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। জাতীয়-জীবনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রয়োজন তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শিক্ষায়তনে মাঘোৎসব, বর্ষা-মঙ্গল, নববর্ষ, শারদোৎসব, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে তিনি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের মেলা, বারোয়ারী, যাত্রা গান, কথকতা প্রভৃতির সংস্কার করিতে পারিলে যতটা কাজ হয়, বিলাতী কায়দায় সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিতে ততটা হয় না—এই জাতীয় কথাও তিনি বলিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার একাধিক রচনায় এই প্রকার কথা বলিয়াছেন।

একটা জাতির সংস্কৃতি অনেকখানি পরিমাণ রূপায়িত হইয়া উঠে তাহার উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। কাজেই স্কুল-কলেজেও এইগুলির একটি

বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত। রাষ্ট্রের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি অজুহাতেও এগুলিকে গলা-ধাক্কা দিয়া বিদায় করা উচিত নহে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আমরা যদি খাঁটি স্বদেশী মানুষ হইতে পারি, তাহা হইলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আজকাল যে আমাদের ছাত্র-সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে একটা লঘুচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে নূতনত্ব-বিলাস ও উগ্র প্রগতিবাদের প্রেরণায় আমরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতেছি না, ফলে জাতীয়ত্বের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়া আমাদের ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং উৎকেন্দ্রিক আকর্ষণে আমরা কক্ষচ্যুত হইয়া অসংযত যাযাবরত্বে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছি ও ব্যর্থ কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছি এবং নিষ্ঠাকে গোঁড়ামি বলিয়া, 'ট্রাডিশন্'কে কুসংস্কার বলিয়া, আদর্শবাদকে মূর্খতা বলিয়া পরিহার করিয়া লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত 'ফ্যাসনে'র রঙিন মরশুমী ফুলের আশ-পাশে ঘুরিতেছি।

ক্রীড়া

মানস-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রীড়ার কথা উত্থাপন করা অনেকে হয়ত 'ধান ভানিতে শিবের গীত' জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু মানস-বিজ্ঞানে ইহা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ যে সমস্ত মূলধন লইয়া মানুষ তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, ক্রীড়া তাহার মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ছাড়া আরও কতকগুলি সহজাত গুণ আমাদের থাকে, যাহার ফলে আমাদের কার্য্যাবলী একটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় এবং আমরা মনুষ্যত্বের পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। এইগুলি হইতেছে : (১) অনুকরণ (২) অনুমনন (৩) অভিভাবন (৪) পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা (routine) (৫) ক্রীড়া (৬) অভ্যাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি "গণমন" পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, চতুর্থটি "স্থিতিবাদ" প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। উপস্থিত আমরা ক্রীড়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ক্রীড়া জিনিসটিকে আমরা অনেক সময় কার্য্যের বিপরীত ধর্ম্মী জিনিস বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু কথাটা যতটা হাল্কা ভাবে ভাবা হইয়া থাকে, ক্রীড়া জিনিসটা ততটা হাল্কা জিনিস নয়। বস্তুতঃ ইহা কখনও অতিরিক্ত উৎসাহ উদ্যমের পরিবাহ, কখনওবা কাজের জন্য প্রস্তুতি, কখনওবা কাজের পরিশ্রমের অবসর, কখনওবা সৃজনী শক্তির সহায়ক ; কখনওবা ইহা দক্ষতা অর্জ্জনের উপায়, কখনওবা ভাবী জীবন-সংগ্রামের জন্য শক্তি-সঞ্চয়, কখনও বা জাতির অতীত ইতিহাসের অনুবৃত্তি অথবা বর্ব্বরতার উৎকর্ষণ ; আবার কখনও কখনও ইহা জীবনের রুক্ষতা হইতে পলায়নের আশ্রয়, কখনওবা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির উপায়। ইহার রূপ অসংখ্য ও বিচিত্র এবং ইহার প্রয়োজন জীবনের সকল অবস্থাতেই সমানভাবে দৃষ্ট হয়। তবে ক্রীড়ার লীলা-খেলা শৈশব এবং বাল্যেই সমধিক দৃষ্ট হয়।

পরীবাহবাদ ঃ

শীলার (Schiller,) স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় আমরা জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্যে ভরপুর থাকি এবং আমাদের উৎসাহ উদ্যমের প্রাচুর্য্য অনেক সময় হয়ত আত্মঘাতী হইয়া আমাদের ক্ষতিও করিতে পারে। ক্রীড়া জিনিসটা এই অতিরিক্ত উদ্যমের পরীবাহ হইয়া আমাদের শরীর-মনের সমতা রক্ষা করে। ইঞ্জিনের 'বয়লার'-এ বাষ্প বেশী হইলে 'সেফ্‌টি ভ্যাল্ব্‌' দিয়া তাহা যদি সময় সময় বাহির হইয়া না যায়, তাহা হইলে তাহা 'বয়লার'-কে ফাটাইয়া দিতে পারে। "সেফ্‌টি ভ্যাল্ব্‌' দিয়া মাঝে মাঝে বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া যেমন 'বয়লার'-এর নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজন, খেলা-ধূলার 'সেফ্‌টি ভ্যাল্ব্‌'-এর ভিতর দিয়া আমাদের অতিরিক্ত শক্তির পরীবাহের ব্যবস্থা করাও তেমনই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। শিশুর অকারণে হস্ত পদাদির উৎক্ষেপ-নিক্ষেপ করা, বালকদের অকারণে লাফালাফি দাপাদাপি করা, এই সমস্ত নাকি এই পরীবাহেরই ক্রিয়া।

কিন্তু 'বয়লার'-এর অতিরিক্ত বাষ্পের পরীবাহের তুলনাটি মানুষের খেলা-ধূলার শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে পুরাপুরি খাটে না। কারণ, শিশু যখন লাফালাফি করিয়া শক্তি ক্ষয় করে, তখন সে শুধু বাড়তি শক্তি খরচ করিয়া দেহের ক্ষমতা রক্ষাই করে না, এই লাফালাফি অঙ্গচালনা প্রভৃতি করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি এবং অঙ্গসঞ্চালনের অধিকতর দক্ষতা অর্জ্জনও করিয়া থাকে। সুতরাং খেলাধূলায় শক্তির যে অপচয় হয়, তাহা পরোক্ষ ভাবে নবতর শক্তি সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্রীড়া জিনিসটি যে শক্তির পরীবাহ মাত্র, এ কথা পুরাপুরি সত্য নহে।

প্রস্তুতিবাদ ঃ

কেহ কেহ বলেন, খেলাধূলা আমাদের বাড়্‌তি উদ্যমের খরচের উপায়

মাত্র নহে, ইহা হইতেছে আমাদের ভাবী-কালের জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। ইহা আমাদের জীবনধারণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপায়।

খেলার এই দেহতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটি প্রথমতঃ মেলব্রান্স্ (Malebrance) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন, তবে কার্ল গ্রুস্ (Karl Croos) সাহেবই ইহাকে তত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, খেলাধূলা জিনিসটা সেই সমস্ত জীব-জন্তুর মধ্যেই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা জন্মাইবার সময় অত্যন্ত অসহায় থাকে এবং মাতাপিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারে না। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি শিশু বয়সে খেলা করিতে খুব ভালবাসে। ইহারা জন্মের সময় অন্ধ ও অসহায় হইয়া পৃথিবীতে আসে।

ইহারা শিশু বয়সে যে সমস্ত খেলা-ধূলা করে, সেই সব খেলা-ধূলার মধ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কাজে লাগিবে এইরূপ ক্রিয়া-কলাপেরই মহড়া দেওয়া হইয়া থাকে। বিড়লা-শিশু পশমের বল লইয়া যে ভাবে খেলা করে, তাহা তাহার ভাবী জীবনে মুষিক শিকারেরই অনুরূপ ভঙ্গীতে করে। কুকুর-শিশুর খেলাও ভাবী শিকারকে আক্রমণ, শত্রু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতিরই অনুরূপ।

মানব শিশুর ক্ষেত্রেও এই জাতীয় খেলা আছে। ছোট ছোট মেয়েরা যে ভাবে 'বৌ-পাতি' খেলা খেলে, পুতুল-ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়, আদর যত্ন করে, বিবাহ দেয়, ঘর-কন্যা সাজায়—সে সমস্তও তাহার ভাবী গৃহিণী-জীবনের ঘর-সংসারের কাজের মহড়া মাত্র।

পুনরাবৃত্তিবাদ ঃ

স্ট্যানলী হল্ (Stanly Hall) বলেন, শিশুর ক্রীড়া জিনিসটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নহে, ইহা তাহার অতীত জীবনের কার্য্যকলাপের পুনরাবৃত্তি মাত্র। মানুষের অতীত জীবনের ইতিহাস হইতেছে বর্ব্বরতার ইতিহাস। সেই অতীত যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত সভ্য মানুষ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারে না। তাই শিশু অবস্থায় সে ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর দিয়া সেই ক্রুর জীবনের অভিনয় করিতে চায়। শিশু-বীর-পুরুষের নকল যুদ্ধের অভিযান হইতেছে সেই অতীত ইতিহাসের ক্রোড় অঙ্ক।

প্রশ্ন আসিতে পারে, খেলা-ধূলার ভিতর দিয়া শিশু অতীতের বর্ব্বর যুগের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তি করিবে কেন? ইহাতে প্রকৃতি কোন্ শিবের সাধনা করিতেছে? তাহার উত্তর হইতেছে, অতীতের বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা বর্ব্বরতার উৎকর্ষণ করি. অর্থাৎ নকল বর্ব্বরতার অভিনয় করিয়া আসল বর্ব্বরতা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করি।

ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুনরাবৃত্তিবাদ এবং গ্রুস্-এর প্রস্তুতিবাদ, এই দুইটি মত পরস্পরবিরোধী মত নহে, ইহারা পরস্পর অনুপূরক। ক্রীড়া একদিক দিয়া যেমন ভাবী বয়সের কর্ম্মপদ্ধতির মহড়া দিয়া আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, অন্য দিক দিয়া তেমনি অতীত যুগের বর্ব্বর কর্ম্মপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্ব্বরতার উৎকর্ষণ (Sublimation) করিয়া সেই দোষ হইতে আমাদের মুক্ত করে। নান্ বলিয়াছেন, ইহা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রীড়াগুলি অতীত যুগের বয়স্থ জীবনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে প্রেরণা পায়, তেমনি হয়ত ইহাও সত্য হইতে পারে যে, আমাদের গোষ্ঠীগত স্মৃতি এই সমস্ত কাজ করিবার জন্য যুগে যুগে বার বার আমাদের প্রবুদ্ধ করে; কারণ বর্ত্তমান জীবনেও ঐ জাতীয় কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে। অথবা এই কথাটি অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, শিশুর ক্রীড়ার মধ্য দিয়া যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা রূপ পায়, তাহার মূলে রহিয়াছে অতীতের সংরক্ষণশীলতার প্রেরণা এবং এই সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে যে উৎসাহ ও শক্তির ব্যয় হয়, তাহার ভিতর রহিয়াছে সেই অতীতের অবাঞ্ছনীয় বিশেষত্বগুলি ক্ষয় করিয়া ফেলার কৌশল: "The atavistic factors are the mnemic basis from which the child's forward directed horme proceeds while the "cathartic" action of the play is the sublimation of the energies associated with them." (Eduction : its data and first principles p. p. 83-84 : Nunn)।

সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, লাফালাফি, দাপাদাপি, হট্টগোল প্রভৃতি করিয়া শরীরের উৎসাহ ও শক্তি ক্ষয় করিয়া আমরা যে সব খেলাধূলা করি তাহার প্রেরণা হইতেছে স্ট্যান্লী হল্ বর্ণিত পুনরাবৃত্তি ও উৎকর্ষণ

এবং যে সমস্ত খেলা-ধূলার মধ্যে শারীরিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধি, কল্পনা প্রভৃতির লীলা বেশী আছে, তাহার ব্যাখ্যা হইতেছে কার্ল গ্রুস্-এর প্রস্তুতিবাদ।

আনন্দাভিযানবাদ ঃ

কিন্তু সব খেলাকেই প্রস্তুতি বা পুনরাবৃত্তি অথবা অতিরিক্ত উৎসাহের পরীবাহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সারাদিনের স্কুলের পরিশ্রমে ক্লান্ত বালক যখন মচকান পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া মাইল দুই হাঁটিয়া বল খেলিতে যায়, অথবা সারাদিনের অফিসের পরিশ্রমের পর কেরাণী যুবক যখন বিজলী বাতি জ্বালাইয়া ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলায় মাতামাতি করে, তখন সেই কাজটিকে বাড়তি উৎসাহের খরচ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ লোকেরা এই জাতীয় ক্রীড়াকে 'রিক্রিয়েশন' বা জীবনের একঘেয়েমিত্ব হইতে অব্যাহতির উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। তাঁহারা বলেন, কাজের রুটিন পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এইভাবে দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের শুষ্কতা ও একঘেয়েমি হইতে পলায়ন করিয়া আনন্দের অভিযানের মধ্যে আমরা মুক্তির আস্বাদ অনুভব করি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদ ঃ

ম্যাক্ ডুগাল্ বলেন, আমাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবৃত্তি (instinct of rivalry) আছে, তাহাই হইতেছে খেলা-ধূলার মূল প্রেরণা। এই বৃত্তিটি যোধন প্রবৃত্তি হইতে পৃথক, কারণ যোধন প্রবৃত্তির ফলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিতে চাই, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবৃত্তিতে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুধু হারাইয়া দিয়া জয়ী হইতে চাই।

ক্রীড়ার মূল কারণ হিসাবে ম্যাক্ ডুগাল সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত সত্য। যে কেরাণী অফিসে পদে পদে শুধু বড়বাবুর ভর্ৎসনাই পায় এবং আত্মবিস্তারের কোনও সুযোগই পায় না, তাহার পক্ষে 'ব্যাড্‌মিণ্টন্", "অক্‌সন্ ব্রিজ্" প্রভৃতি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরোক্ষ ভাবে আত্মবিস্তারের সুযোগটা কম আকর্ষণের বস্তু নয়। কিন্তু এমন

অনেক খেলাই আছে, যেখানে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নাই। সে সকল ক্ষেত্রে ম্যাক্ ডুগালের এই মতবাদ প্রযোজ্য হয় না।

আচরণবাদ, উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া ঃ

উড-ওয়ার্থ প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, খেলার মধ্যে "বায়োলজির" ইঙ্গিত কিছুই নাই ; ইহা জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতিও না, অতীত সংগ্রামের পুনরাবৃত্তিও নয়, শুধু "উত্তেজনা আর তাহার প্রতিক্রিয়া" —এই ভাবেই খেলার তত্ত্বটি বুঝান যায়। খেলার জিনিসগুলি শুধু উত্তেজক এবং খেলা এই কাজটা হইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া।

সমানুভূতিবাদ ঃ

লিপ্‌ সাহেব খেলার অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, খেলার মূল প্রেরণা হইতেছে সমানুভূতি (Empathy) অর্থাৎ কোনও একটি জিনিসের সহিত একাত্মতাবোধ। তিনি এই তত্ত্বটি ছেলেদের ঘুড়ি উড়াইবার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। ছেলেটি ঘুড়ি উড়াইবার সময় ঘুড়ির সহিত নিজের একাত্মতা কল্পনা করিয়া ঘুড়ির আকাশে উড়িবার ক্ষমতার বাহাদুরিটা খানিকটা নিজের জিনিস মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং খেলার বস্তুর ভিতর দিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতায় আনন্দলাভ করে।

ক্ষমতালিপ্সাবাদ ঃ

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, খেলা-ধূলার মধ্যে—বিশেষতঃ সেই সমস্ত খেলা-ধূলা, যাহাতে সজ্ঘবৃত্তির লীলা নাই—সেখানে বালকবালিকারা অনেক সময়েই বড়দের কাজকর্ম্মের অনুকরণ করে। এই অনুকরণটি ভাবীকালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নহে। ইহা হইতেছে ক্ষমতা অধিকারের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি (will to power)। তাহার শরীর-মনের বৃদ্ধি হইতেছে, সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার শক্তি ও পটুতা বাড়িতেছে না, তাই খেলার ভিতর দিয়া বড়দের কাজকর্ম্মের

অনুকরণ করিয়া যে সব কাজ সে করিতে ইচ্ছা করে অথচ পারে না, সেই সব কাজের অভিনয় করে।

অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তিবাদ (Repetition compulsion) :

ফ্রয়েড বলেন, সাধারণ লোকে যে মনে করে খেলা জিনিসটা শুধু আনন্দের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তাহা ঠিক নহে। একটি বালকের খেলিবার ধারা দেখিয়া তিনি এই জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বালকটি মায়ের একমাত্র পুত্র এবং মায়ের খুব অনুরক্ত। অন্যান্য দিক দিয়া ছেলেটি শান্তশিষ্ট এবং সুশীল। কিন্তু তাহার একটি অদ্ভুত খেলা ছিল; তাহা এইরূপ—ছেলেটি তাহার প্রিয় খেল্‌নাগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত এবং বলিত "চলে যাও"—এই খেলাটি সে প্রায়ই খেলিত। ফ্রয়েড্ এই খেলাটির মধ্যে একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, এই খেলার ভিতর দিয়া বালকটি তাহার দুঃখের সহিত একটা সন্ধি করিতেছে। তাহার মাতা তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং মাতৃ-বিরহ তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কিন্তু মাতার বাহিরের কাজকর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনযাত্রার জন্য তাহাকে প্রায়ই মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত। তাই শিশুটি খেলার ভিতর দিয়া এই বিচ্ছেদকে অভ্যাস করিয়া লইত। সেইজন্য শিশুটি তাহার প্রিয়বস্তু খেল্‌নাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া প্রিয়-বিরহ সহ্য করিয়া লইত।

গত মহাযুদ্ধের সময় একটী বালক তাহার মাতাপিতাকে বোমার আঘাতে মারা যাইতে দেখিয়াছিল। এই ঘটনাটি তাহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। এই দুঃখকে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া সহ্য করিয়া লইবার জন্য বালকটি একটি অদ্ভুত খেলা করিত। সে দুইটি পুতুলকে একটি বালির খেলা-ঘরের মধ্যে রাখিত, তাহার পর জোরে আঘাত করিয়া পুতুল দুইটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। এই ভাবে যে ঘটনার স্মৃতি তাহার নিকট গভীরতম মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার, সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া (অথবা পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া) খেলার ছদ্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই সেই দুঃখের ঘটনাটিকে

সহ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করিত। ফ্রয়েডীয় মতে অনেক খেলার মধ্যেই এই জাতীয় দুঃখের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা 'অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি'র লীলা আছে।

কল্পনা বিলাসবাদ ঃ

ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে 'Make believe' সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই 'Make believe' শব্দটী কেহ কেহ "মনবুঝ দেওয়া" এইরূপ বাংলা করিয়াছেন। একটু সংস্কৃত ভাবে এই শব্দটিকে আমরা "কল্পনা-বিলাস"—এই ভাবে নামকরণ করিতে পারি।

বয়স্ক লোকের কাছে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার জগতের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু শিশু বা বালকের নিকট এই পার্থক্যটা ততটা সুস্পষ্ট নহে। অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তবে সে ধীরে ধীরে কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্যটা বুঝিতে শিক্ষা করে। তাহাদের মনোরাজ্যে কল্পনা ও বাস্তব জড়াজড়ি করিয়া মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলায় পুরাণো আমলের অব্যবহৃত পাল্‌কির ভিতর বসিয়া যে রকম কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাহার একটী চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন ঃ "চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্‌কি, হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো আমারই মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই মনের খেয়ালে .. কখনো বা তার পথটা ঢুলে পড়ে মন-বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্ ছম্......তারপর পাল্‌কীর চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে উটে ময়ুরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা যায় না দেখা।" এই যে বাস্তবের সামান্য একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া বাস্তব জগৎকে ছাড়াইয়া স্বপ্নের কল্পলোকে বিচরণ, ইহা শিশুমনের একটা অলস বিলাস মাত্র নয়, ইহা তাহার একটা বিশিষ্ট সম্পদও বটে। যে ছেলে কল্পনায় এই সব খেলা খেলিতে জানে না, সে যে জীবনের একটী বিশিষ্ট আনন্দ হইতেই শুধু বঞ্চিত তাহা নহে, তাহার ভবিষ্যৎও ভাল হয় না, জীবনের অনেক সৃষ্টির সম্ভাবনা হইতেও সে বঞ্চিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এইতো ছিল পাল্‌কীর

ভিতর আমার সফর, পাল্‌কীর বাইরে এক এক দিন ছিল আমার মাষ্টারি,—রেলিংগুলো আমার ছাত্র, ভয়ে থাকতো চুপ। এক একটা ছিল ভারী দুষ্ট, পড়াশুনায় কিছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড় হলে কুলীগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড় গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেন না, থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়।" এইখানেই হইতেছে সাধারণ শিশুর কল্পনার কল্পলোক। এই কল্পলোক হইতে তাহাকে টানিয়া আনিলে সব সময়েই তাহার মঙ্গল করা হয় না। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, এইরূপ কল্পনার জগতেও পাগল বা মাতাল লোকেরাও বাস করে, তাহাতে তাহাদের কি মঙ্গল হয়? ইহার উত্তর হইতেছে, বালকের কল্পনা-বিলাস আর পাগলের কল্পনা-বিলাস এক জিনিষ নহে। পাগল কঠিন বাস্তবকে জয় করিতে পারে না বলিয়াই পলায়নী বৃত্তি লইয়া কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় লয়। সেই জন্যই অনেক সময় ঘুঁটে কুড়ুনির মা-ও হয়ত নিজেকে রাজরাণী বলিয়া ভাবে এবং "নির্ম্মম ক্রূর সত্যের চেয়ে মিথ্যা আমার ঢের ভাল; আঁধারও চাই, চাইনা তবু ঝল্‌সায় চোখ্ যেই আলো"—এই জাতীয় একটা অপরিস্ফুট মনোবৃত্তির মধ্যে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুর কল্পনা-বিলাস এই পলায়নী-প্রবৃত্তি প্রসূত নহে, ইহা তাহার আত্মবিস্তারের সহায়ক।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ আলোচনা করা হইল, আমাদের মনে হয় তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে এবং এই মতগুলি পরস্পর বিরোধী নহে, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

খেলা ও কাজ:

খেলা জিনিসটাকে অনেক কাজের লোকই সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ভাবেন যে এটা কাজের বিপরীত ধর্ম্মী ও কাজের বিঘ্নকর জিনিস। সাধারণের ধারণা খেলা হইতেছে এমনই একটা জিনিস, যেটা খুসীর খেয়ালেই চলে; তার মধ্যে কোনও লাভের হিসাব নাই। কাজ জিনিসটা হইতেছে ঠিক তাহার বিপরীত। একটা লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই লোকে কাজ করে।

অবশ্য প্রশ্ন আসিতে পারে, খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য থাকে ত? কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা সেখানে পরোক্ষভাবে কাজ করে। বল খেলিলে পায়ের পেশী দৃঢ় হইবে, এটা হইতেছে বল খেলার পরোক্ষ ফল; কিন্তু সাধারণ খেলোয়াড়রা খেলার জন্যই খেলে, এমন কি জয়লাভের জন্যও নহে – জয়লাভের আনন্দটা অনেক ক্ষেত্রেই হইতেছে একটা উপরি পাওনা।

যাঁহারা অভিনয় করেন, কি ভাল যন্ত্র-সঙ্গীত করিতে পারেন, ইংরাজীতে তাঁহাদের Player বলা হয়। এই কথাটির মধ্যে একটা ব্যঞ্জনা আছে। শিল্প সাধনার চরম অবস্থায় খেলার আনন্দের একটা স্বগোত্রীয় আনন্দ আছে।

খেলার একটি বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ইহা কাহারও দ্বারা ঘাড়ে চাপানো জিনিস নহে। ফুটবল খেলাকে আমরা খেলা বলিয়াই জানি। কিন্তু যখন ঐ ফুটবল খেলাটি স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ছাত্রদের খেলিতে হয় এবং না খেলিলে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তখন খেলা জিনিসটা তাহাদের নিকট আর খেলা ততটা থাকে না, যতটা হয় কাজ।

যে নৃত্যগীত আমাদের এত আনন্দের জিনিস, তাহাও যদি পরের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্য হিসাবে করিতে হয়, তাহাও আমাদের কাছে কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে আমরা যে নাচ-গান করি তাহা খেলার পর্য্যায়ে পড়ে। যাত্রাদলের কচি বালক যখন অধিকারী মহাশয়ের বেত খাইয়া গান শিখে, কিংবা সার্কাসের ছোট ছেলে ম্যানেজারের ধমকানি খাইয়া তারের উপর নৃত্য শিখে, তাহা খেলা ততটা নয়—যতটা হইতেছে কাজ।

আবার যে কাজ আমরা খুব দক্ষভাবে করিতে পারি, এবং যে দক্ষতা আমাদের আত্মবিস্তার-বৃত্তি পোষকতা করের এবং পাঁচজনের নিকট আমাদের প্রশংসার দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহা যত কঠিন কাজই হউক না কেন, তাহা আমাদের কাছে খেলার পর্য্যায়ে পড়িবে। এই হিসাবে নৃত্যগীতের ভাল ভাল শিল্পীদের Player বলা খুব সার্থক। কারণ তাহাদের সাধনা তখন সিদ্ধির স্পর্শ পাইয়া বিশুষ্ক কর্ত্তব্য পালনের স্তর অতিক্রম করিয়া শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের উৎস হইয়া উঠিয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বড় বড় সাধকদের কাছে খেলা ও কাজ একই জিনিষ। সিদ্ধির চরম অবস্থাতে খেলা ও কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কারণ সেই সাধনার মধ্যেই আছে সহজ স্ফূর্ত্তি ও সৃষ্টির আনন্দ।)

মহামানুষেরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধনা করিতে পারেন, দীর্ঘ সময় একটানা ভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহার একটা রহস্য এখানে পাওয়া গেল। কাজ তাঁহাদের কাছে ভয় বা দুঃখের বস্তু নহে। তাই কাজে তাহাদের মাথাও ধরে না, বিরক্তিও আসে না। খেলোয়াড়রা খেলার আনন্দে যেমন খেলিয়া যায়, তাঁহারাও তেমনি কাজের আনন্দে ও কাজের নেশায় কাজ করিয়া যান। ফলে সাধারণ লোকে টেনিস্ খেলিয়া বা সিনেমা দেখিয়া যতটা আনন্দ পায়, একজন গণিত-সাধকও হয়ত অঙ্ক কষিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করেন।

আর একটি রহস্য এই ক্রীডাতত্ত্বের মধ্যে উদ্ঘাটিত হইল—কর্ম্মমার্গের সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে কাজকে নিছক কর্ত্তব্যের বেগার বলিয়া মনে না করিয়া খেলার মত আনন্দ ও আকর্ষণের জিনিস বলিয়া মনে করা। তাহা হইলেই কর্ত্তব্যের গুরুভার আমাদের কাছে আনন্দের স্বর্ণসোপান হইয়া উঠিবে। সেই সোপান বাহিয়া আমরা যতই উঠিতে থাকিব, আমাদের আনন্দ ততই অধিক হইবে এবং সোপানের শেষপ্রান্তে সিদ্ধির মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিব কর্ম্মযোগীর রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ভিতর হইতেই বাণীর আনন্দ-সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। বস্তুতঃ খেলাকে যে ব্যক্তি কাজের মত নিষ্ঠার জিনিস বলিয়া মনে করে এবং কাজকে খেলার মত আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে, সেই-ই প্রকৃত কর্ম্মযোগী।

কবি বলিয়াছেন—

"কর্ত্তব্য সে হোক্ সুকঠিন, করা তারে চাই হাস্য মুখে
নতুন তাহার পৃথুল সে ভার, দলিবে তোমার সকল সুখে॥"

এ কথা শুধু ধর্ম্মতত্ত্বের আদর্শবাদিতার বাণীমাত্র নয়, ইহা মনস্তত্ত্বের ব্যবহারিক উপদেশও বটে। কর্ত্তব্যকে ব্যাগার বলিয়া মুখভার না করিয়া

যদি কাজ হাসিমুখে করিয়া যাইতে শিখি, তাহা হইলে কাজে দক্ষতা ও সিদ্ধি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, কর্ত্তব্য ততই সুমধুর আনন্দ-প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিবে। প্রেমের সহিত সমাজনীতির, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত আনন্দের, ভোগের সহিত ত্যাগের সংঘাত লইয়া অনেক বেদনার ইতিহাস শুনা গিয়াছে ; সেই জন্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Serene will be our days and bright
And happy will our nature be
When love is an unerring light
And joy its own security"

কিন্তু কর্ম্মযোগীর নিকট এই সংঘাতের বিক্ষোভ নাই ; তাহার মন যাহা চায়, কর্ত্তব্যও সেই পথকেই নির্দ্দেশ করে, খেলার যে আনন্দ, কর্ত্তব্য পালনেরও সেই আনন্দ, খেলার আকর্ষণ তাহার মনকে কাজের সাধনক্ষেত্র হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায় না—কারণ, খেলা এবং সাধনা তাহার কাছে একই বিষয় ; তাহার মনের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী শক্তির টানাটানি হানাহানি নাই, প্রলোভনের বিভীষিকা নাই, অনুশোচনার অনুতাপ নাই, চিত্তের বিক্ষোভ নাই। তিনি প্রকৃত সুখী, এই দুঃখের জগতে কাজের স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া তিনিই তাহার মধ্যে নিজের গৌরবে, আনন্দের কল্পলোকে দেবতার মত বিরাজ করেন।

বিঃ দ্রঃ—ক্রীড়াকে কি ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী "ক্রীড়াচ্ছল" নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জীবন-পরিক্রমা

মাতৃগর্ভের নিরাপদ নিরালা এবং নিবিড় আশ্রয়টি হইতে চ্যুত হইয়া জাতক যেদিন এই "দৃশ্য গন্ধ গানে" ভরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাহার অপরিচিত জগতের অসংখ্য আবেদন তাহার অনভ্যস্ত অনুভূতিকে যুগপৎভাবে এমনই বিব্রত করিয়া তুলে যে, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, কৌতুক প্রভৃতির মিশ্র অনুভূতিতে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় আরম্ভ হয় এবং সে ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু তাহার এই জীবন-পরিক্রমা একটানা ছন্দোহীন বৈচিত্র্যহীনভাবেই চলিতে থাকে না। তাহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম লীলা আছে, এ যেন একটি নাটকের বিভিন্ন অঙ্কের ব্যাপার। আমাদের জীবন-নাটক মোটামুটি চার অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে আছে শৈশব—জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় অঙ্ক বাল্য—ছয় হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত; তৃতীয় অঙ্ক কৈশোর—বারো হইতে আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত এবং চতুর্থ যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। বার্দ্ধক্যকে আর একটি অঙ্ক ধরিলে জীবনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত পঞ্চাঙ্কই হইয়া পড়ে।

জীবন-পরিক্রমায় এই যে বিভিন্ন অধ্যায়, এই সম্বন্ধে ডাঃ আর্ণেস্ট জোন্স্ (Dr. Earnest Jones) অনেকগুলি নূতন তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক হিসাবে আমরা সকলেই দ্বিজ; সকলেই দুইবার করিয়া জন্মগ্রহণ করি, সকলেই যৌবনের প্রারম্ভে আর একবার ছেলেমানুষ হইয়া পড়ি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কৈশোর এবং যৌবন হইতেছে শৈশব ও বাল্যলীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

শৈশবের বিশেষত্ব হইতেছে নিছক সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে চলা। এইখানেই তাহার সঙ্গে একজন প্রৌঢ়ের তফাৎ। একজন প্রৌঢ় তাহার

কামনা বাসনাগুলিকে সমাজ-বুদ্ধি, নীতি, লোকাচার প্রভৃতির অনুশাসনে সংযত করিয়া চলে, কিন্তু একটি শিশু এ বিষয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ। কোন কিছুর আবেদন তাহার অনুভূতিতে যেমনই সাড়া জাগাইল অমনই সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তাহার মনে আরম্ভ হইল এবং সেই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া চলিল। শিশু প্রবৃত্তির সংযম মানেও না, জানেও না। অভিজ্ঞতার অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত, অনেক শিক্ষা পাইয়া ক্রমশঃ সে প্রকৃতির মুখে লাগাম পরাইয়া চলিতে শিখে। আগুনের দীপ্তি দেখিয়া সে হাত বাড়াইতে চাহিয়াছে, হাত পুড়িবার তিক্ত অভিজ্ঞতাই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে শিখাইয়াছে যে সব কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে নাই।

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে আত্মকেন্দ্রিক পর-নির্ভরতা; সে চায় দুনিয়ার মনোযোগ তাহারই উপর নিবদ্ধ হউক, দুনিয়ার সকলেই তাহার সুখের জন্য আকাশ পাতাল তোলপাড় করুক। সে যেন শুধু সকলের নিকট হইতে আদর যত্ন পাইবার জন্য অধিকারের রাজটীকা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভালবাসা পাওয়াই যেন তাহার ন্যায্য অধিকার, ভালবাসা দিবার, ভালবাসার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিবার দায়িত্ব যেন তাহার কিছুই নাই।

শৈশবের এই আত্মকেন্দ্রিকতার ও এই স্বার্থপরতার রেশ সারা জীবনই আমাদের মধ্যে কিছুটা থাকিয়া যায়। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন খানিকটা বহির্মুখী বা বহির্বৃত্ত (extrovert) হইয়া পড়ে। তখন আমরা হয়ত ভালবাসা পাইবার চেয়ে ভালবাসা দিবার মধ্যে আনন্দ বেশী পাই, অপরকে বঞ্চিত করিয়া ভোগ করার চেয়ে প্রেমাস্পদ বা স্নেহাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপে বেশী তৃপ্তি পাই।

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে তাহার কল্পনা-বিলাস। এই কল্পনা-বিলাসের মধ্য দিয়া সে তাহার জীবনের তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করে এবং কল্পনার মধ্য দিয়া নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই তাহার আত্মবিস্তারের (self assertion) কাজ আরম্ভ হয়। ফ্রয়েড বলেন, এই সময়েই সে তাহার

পরিবেশের পরিচিত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সে তাহার অপরিতৃপ্ত প্রভুত্ব-শক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। যে সব লোককে সে শ্রদ্ধা করে অথবা ভয় করে, কল্পনার আতিশয্যে অনেক সময় সে তাহাদের ভূমিকার অভিনয় করে, কখনওবা তাহার ভয়ের বস্তুর প্রতিনায়কের ভূমিকাও গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের "শিশু"র 'বীরপুরুষ' কবিতার খোকাটি সেই জন্যই কল্পনায় দেখিয়াছিল, তার মা "দরজা দুটো একটু ফাঁক করে পাল্‌কীতে চড়িয়া চলিয়াছেন আর সে টক্‌বগিয়ে" তাঁর পাশে পাশে "রাঙা ঘোড়ার পরে" চলিতেছে। তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, বাতাস থম্‌থম্ হইয়া উঠিল, এমন সময় দীঘির ধারে কিসের আলো দেখা যাইল, "হ্যাঁরে রে রে রে রেরে" শব্দ করিতে করিতে "হাতে লাঠি মাথায় ঝাক্‌ড়া চুল ডাকাতের দল তাহাদের আক্রমণ করিল। খোকা তখন বীরদাপে অগ্রসর হইল, ঢাল তরোয়াল "ঝন্‌ঝনিয়ে" বাজিয়া উঠিল, খোকার বীরত্বে "কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে কত লোকের মাথা পড়ল কাটা!" কিন্তু এত বীরত্বের ভিতরও খোকার আদর খাইবার লোভটি ঠিক আছে। তাই কল্পনায় সে বলিতেছে —

"লড়াই গেছে থেমে তুমি শুনে পালকী থেকে নেমে
চুমা খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে"

এই ভাবেই সে জীবনের পথে চলিতে থাকে; কখনও উঠিয়া, কখনো নামিয়া, কখনও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আবার কখনও বা সাহসে স্ফীত হইয়া, কাল্পনিক বীরত্বে উৎফুল্ল হইয়া একটি স্বাভাবিক ছন্দের লীলায় শিশু তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে।

এই ছন্দটি, এই দীনতা ও দম্ভের ক্রমিক অভিনয়টি, শিশুর মনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা তাহার শিশু-জীবনের তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতিটি যদি ভূতের মত তাহার উপর ভর করিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। শিশুদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় মাতা পিতা ও শিক্ষকদের এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়,

ভৃত্য রাইচরণকে মল্ল সাজিয়া শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত, আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। রাইচরণ স্নেহের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের মতই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মাঝে মাঝে শিশুকে বাহবার খোরাক না দিলে তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এই সত্যটি মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বগামী মনস্তাত্ত্বিকগণের ধারণা ছিল যে, যৌনক্ষুধা ও যৌনলালসা ব্যাপারটা যৌবনেরই বিশেষত্ব, শিশুদের এ বৃত্তি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকগণ, বিশেষভাবে ফ্রয়েড প্রভৃতি বলেন যে, এই যৌন-বৃত্তিটি শিশুদিগের মধ্যেও আছে এবং তাহাও বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ ও বহুরূপে অভিব্যক্ত। শৈশবের যুগে শিশুর যৌনবৃত্তি নিজেকে লইয়াই আরম্ভ হয়; নিজের দেহটিকে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগে এবং তাহার সহিতই সে যেন প্রেমে পড়িয়া যায়। এই অবস্থাটিকে ফ্রয়েড **"নার্শিশিজম্"** নাম দিয়াছেন। এই কথাটি আসিয়াছে গ্রীক পুরাণের "নার্শিশাস্"-এর নাম হইতে। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর যুবক; জলের মধ্যে নিজের প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া এমন ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া এই ছায়া-নায়কের বিরহ দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইল।

ইহার পরের অবস্থায় শিশু নিজেকে ছাড়া আশেপাশের বাহিরের জিনিস দেখিতে আরম্ভ করে এবং প্রথমেই তাহার লক্ষ্যের বস্তু হয় তাহার মাতা। নিজের দেহকে ভালবাসিতে-বাসিতে সেই দেহের যত্নকারিণীকেও সে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ সে যেন মাতাকে নিজের দেহেরই রূপান্তরিত অভিব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ করে। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকগণ এই ভালবাসার মধ্যেও যৌন-তত্ত্বের লীলা দেখিতে পান। মাতার প্রতি শিশুর এই অনুরক্তিকে তাহারা **"ইডিপাস্ জট্"** (Oedipus Complex) এই আখ্যা দিয়াছেন। ঘটনার চক্রান্তে "ইডিপাস্" নিজের পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই মাতার প্রতি শিশুর এই অনুরক্তির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ফ্রয়েড বলেন, মাতার প্রতি এই অনুরক্তির তীব্রতার জন্য শিশু অনেক সময় পিতাকে ঘৃণা করে।

ফ্রয়েডীয় মতবাদে সকলে যে বিশ্বাস করে তাহা নহে। তবে পিতা অনেক সময়েই শিশু ও তাহার মাতার মধ্যে আসিয়া মায়ের সান্নিধ্য ও অধিকার হইতে শিশুকে বঞ্চিত করে, অনেক সময়েই তাহাকে তাড়ন ভর্ৎসন প্রভৃতি করেন ; এইজন্য শিশু অনেক সময়েই পিতাকে ঠিক ঘৃণা বা ভয় না করিলেও, তাঁহার প্রতি বিমুখ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই বিমুখতা প্রায়ই অহেতুক অবাধ্যতার সৃষ্টি করে। বাল্যজীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেক সময় পিতার স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসন তাড়ন করেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও বালক প্রায়ই বিমুখ হইয়া উঠে।

ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ বলেন, বালকদের মধ্যে যেমন "ইডিপাস জট্" আছে বালিকাদের মধ্যে তেমনই **"ইলেক্ট্রা জট্"** (Electra Complex) আসিয়া থাকে। ইলেক্ট্রা গ্রীক পুরাণের একজন নায়িকা। তিনি পিতা 'অ্যাগমেম্নন্'কে ভালবাসিতেন বলিয়া নিজের ভাইকে দিয়া নিজের মাতাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

শিশু বালক যে কারণে মাতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, শিশু বালিকার ক্ষেত্রেও সেই একই কারণ কাজ করে। সুতরাং বালিকা কেন যে মাতার প্রতি বিরূপ হইবে, এই সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

ফ্রয়েডের এই সমস্ত জট এবং ব্যাখ্যা আমাদের যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কোনই কথা নাই, তবে তাহার ব্যাখ্যা হইতে আমরা কতগুলি সত্যের সন্ধান পাই এবং সেগুলিকে কাজে লাগাইতে পারিলে ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা হয়।

শিশুর জীবন-পরিক্রমায় তাহার যৌন-তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া এইবার আমরা তাহার অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শিশুর দেহ ও মনের দিক দিয়া বৃদ্ধিটা একটানা ভাবে হয় না। ইহা যেন তরঙ্গে তরঙ্গে চলিতে থাকে, ইহার গতিবেগ কখনও তীব্র কখনও বা মন্দ হয়। প্রথম তিন বৎসর শিশু অত্যন্ত দ্রুতভাবে বাড়িতে থাকে, তারপর আসে একটা অন্তপূর্তির (consolidation) সময়। ছয় বৎসরের পর হইতে তাহার জীবনে আবার

একটা বৃদ্ধির সময় আসে, তাহার পর আবার একটা স্থির ভাব, একটা গতিমান্দ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাল্যের বিশেষত্বঃ

শৈশব অতিক্রম করিয়া জাতক যখন বাল্যে পদার্পণ করে তখন তাহার মধ্যে কতকগুলি নূতন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। একটি বিশেষত্ব হইতেছে সংঘ-চেতনার বিকাশ। অবশ্য শৈশবে শিশু যে সব সময়েই একা থাকিতে ভালবাসে তাহা নহে। তবে সে যুগে সে যে লোকজন চাহিত তাহা সেবা-যত্ন পাইবার জন্য ; কিন্তু বাল্যে সে সঙ্গী চায় অন্য কারণে। এখন যে সে সঙ্গী চায় তাহার কারণ হইতেছে সঙ্গীদের সাহায্য না পাইলে তাহার আত্মবিস্তারের (self assertion) ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সেইজন্যই এই সময়ে সে মার কাছাকাছি তাঁর আঁচলে-বাঁধা ভাল ছেলেটি হইয়া ঘুরিতে চাহে না ; তখন সে মাকে ছাড়িয়া সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলায় মাতিয়া থাকিতে ভালবাসে। সংঘ-চেতনার ফলে পরার্থে আত্মত্যাগ, দুঃখ বরণ প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি যৌবনের পরে বিকশিত হইয়া উঠে ; তাহা এখনও ফুটিয়া উঠে না, তবে সংঘকে সে নিজের বাহাদুরী প্রকাশের একটা যন্ত্র হিসাবে মনে করে বলিয়াই সে সংঘকে এবং সঙ্গীকে চায়। এই সময়ে নীতিজ্ঞান, ভাল-মন্দবোধ প্রভৃতি এই সংঘের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সংঘ বা দলের নিকট হইতে বাহাদুরী পাইবার জন্য সে পরের বাগানে ফল-ফুল চুরি করিতে, ফেরিওয়ালাকে ঠকাইতে বা শিক্ষকের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে বা দম্ভ প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করে না। ইহা হয়ত ভাল কথা নয়, কিন্তু ইহাই যখন প্রকৃতির অপ্রতিবিধেয় বিধান, তখন ইহাকে মানিয়া লইয়াই শিক্ষক ও অভিভাবকদের ইহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় শিক্ষককে ছাত্রদের বুঝাইয়া দিতে হইবে তিনিও বালকদের সংঘের একজন সভ্য, তিনি অন্য দলের বা শত্রু দলের কেহ নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত ছাত্রদের বিরোধ থাকিবার কথা নাই, সুতরাং ছাত্রদের সংঘের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার স্তুতি নিন্দার মূল্য ছাত্রদের নিকট থাকা উচিত।

এই সংঘ-চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে একটা বহির্মুখী বৃত্তিরও বিকাশ হয়। এই বহির্মুখী (extrovert) চেতনার জন্যই সে বাহিরের সঙ্গে একটা পরিচয় লাভের চেষ্টা করে, ফলে তাহাদের মনে 'কি' 'কেন' 'কবে' এই জাতীয় প্রশ্ন প্রতিনিয়তই জাগিতে থাকে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের তরফ হইতে এই সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দানের চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্পর্কটিও নিবিড় হইয়া উঠে এবং বালকদের অনুসন্ধিৎসাও উৎসাহ পাইতে থাকে, জগৎকে এবং পরিবেশকে ভালভাবে চিনিবার সুযোগও পাইতে-পাইতে তাহারা ভাবী-কালের জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হইতে থাকে।

কৈশোরের বিশেষত্ব :

বাল্যের পর কৈশোর। কৈশোরকে আমরা এক হিসাবে শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলিতে পারি। বাল্যের আত্মনির্ভরতা, কর্ম্মনিপুণতা প্রভৃতি এখন আর থাকে না। এখন যেন তাহার জগতের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, এখন যেন পুরাতন অভিজ্ঞতা দিয়া আর কাজ হয় না। ফলে সে যেন দিশেহারা হইয়া পড়ে। সে ভাবে, দুনিয়ার সমস্ত লোকই যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সে যাহা করিতেছে সকলেই যেন তাহা দেখিতেছে, ফলে সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সময়েই তাহার ভাবপ্রণতা বাড়িয়া উঠে, কখনওবা গভীর বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে কখনওবা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। এই সময়ে শৈশবের কল্পনাপ্রবণতা আবার ফিরিয়া আসে। শৈশবে যেমন অসহায়তা ও শক্তি-দৈন্যের মধ্যে মনের স্বাস্থ্যের জন্য সে মনে মনে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিত, এখন সে সেইরূপ করে। ফলে বাল্যের বহির্বৃত্ত (extrovert) মন তাহার চলিয়া যায় এবং আবার সে শিশুর মত আত্মকেন্দ্রিক বা অন্তর্বৃত্ত (introvert) মন বিশিষ্ট হইয়া উঠে।

শৈশবের মত যৌন-চেতনাও এই সময়ে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। বাল্যে খেলাধূলার ব্যস্ততায় এবং বহির্বৃত্ত মনের বিভিন্ন আবেদনে এই

চেতনাটি খানিকটা স্তিমিত থাকিত, এখন আবার তাহা নূতন বিক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথমে শৈশবের মত একটা 'নার্শিশিসম্ (Narcissism)-এর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বর্ণিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিতে এই "নার্শিশিসম্"-এর ভাবটি স্থন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীরাধা যেন নিজের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজেই নিজের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন ঃ

"খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই ॥
খনে খনে দশনক ছটা ছট হাস
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥
চঁওকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর
খনে আঁচর দেই খনে হয় ভোর ॥"

ইহার পরেই এই আত্মকেন্দ্রিক প্রেমটি ক্রমশঃ হিমুখী হইয়া বন্ধু-গণের দিকে প্রসারিত হইতে থাকে—প্রথমতঃ একটা অস্ফুট সমকামত্বমূলক (homo sexual) আকর্ষণে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ বয়সে শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে (অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের এই ভাবে) ফুটিয়া উঠে।

কৈশোরের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা কঠিনতম সমস্যা হইতেছে তাহার নব সঞ্জীবিত যৌন-চেতনাকে কি ভাবে সংযত করা যায়। অনেকের বিশ্বাস প্রচুর খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ছেলেদের ব্যস্ত রাখিতে পারিলে এ সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়। অবশ্য এই ভাবে সমস্যার যে সমাধান হয় না, তাহা নহে। তবে সমাধান সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নয়। কারণ যৌনবোধটা নিছক শারীরিক বৃত্তি নয়। ইহার মধ্যে মনের লীলাও আছে। কাজেই যৌনবোধকে স্থসংযত করিতে হইলে এই বৃত্তিটির উপযুক্ত উৎকর্ষণ বা উদ্গতির (sublimation) প্রয়োজন হয়। শিল্প-কলা আনন্দ ও স্বষ্টিমূলক কর্ম্মপদ্ধতির খাতে আমাদের কর্ম্মপ্রেরণাকে বহাইতে পারিলে এই

সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান হয়। প্রাচীনকালে ছাত্রদিগের ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া এই জাতীয় একটা সমাধানের চেষ্টা হইত।

কাহারও কাহারও মতে এই সময়ে কিছু কিছু যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও মন্দ নয়। যৌন-শিক্ষা সম্বন্ধে যে নানা তরফ হইতে চুপ্-চুপ্ ভাবটি আছে, তাহার জন্য ইহা যেন আরও প্রলোভন ও পাপের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষাটি সুস্থ সরল পবিত্র ভাবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দান করা উচিত এবং যে শিক্ষক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র, তিনি ছাড়া অন্য কেহ এই শিক্ষাদানের অধিকারীও নহেন।

কৈশোরের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাই কমিয়া যাইতে পারে যদি এই সময়ে তাহাদের প্রতি আমাদের আচরণ সহানুভূতিমূলক হয়। বয়ঃসন্ধির যুগে শরীর মনের দিক দিয়া যে সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলি আসিতে থাকে, নূতন নূতন অনুভূতি, নূতন নূতন কামনা অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তাহাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনেকেই যেন দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভাবিতে থাকে সে বুঝি পথভ্রষ্ট হইয়া পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহার আর বুঝি আশা-ভরসা নাই ইত্যাদি। এই অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ সহানুভূতি ব্যবহার ও দরদী আত্মীয়তা

শিক্ষক প্রভৃতির তরফ হইতে এই আত্মীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ শৈশবের মত কৈশোরের বয়ঃসন্ধির যুগেও মানুষ যেন খানিকটা পরমুখাপেক্ষী ও পরসাহায্যপ্রত্যাশী হইয়া উঠে। এইজন্যই এই যুগে সে এমন একটি আদর্শ খুঁজিয়া লইতে চায়, যাহাকে দেখিয়া সে নিজের জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। এইজন্য এই যুগটিতে আদর্শ চরিত্রের মহাপুরুষদিগের সংস্পর্শে যদি তাহারা আসিতে না পারে, অথবা পুস্তকাদি হইতে উপযুক্ত আদর্শের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে সিনেমা-থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতা বা খেলার মাঠের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় প্রভৃতির মধ্য হইতে তাহাদের আদর্শ বাছিয়া লয় এবং তাহার ফলে তাহার জীবনের বৃহত্তম সম্ভাবনাগুলির ক্ষতি করে।

এই সময়ের পরিনির্ভরতার জন্যই কিশোরদের মন অনেক সময় ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; এই সময়ে তাহারা যেন—

"দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধ মতি"

হইয়া মাটির শরীরের সহিত দেবের বাসনার সামঞ্জস্য করিতে পারে না। তখন অনেকেই ঈশ্বরের নিকট শক্তিভিক্ষার জন্য চেষ্টা করে এবং ধর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহাদের সমস্যার সমাধান খুঁজিতে চেষ্টা করে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্মশাস্ত্র এ সমাধান দিতে পারে না, ফলে ব্যর্থ হইয়া অনেকেই হয়ত অবিশ্বাসী ও জড়বাদী হইয়া উঠে, কেহ কেহ হয়ত ধর্ম্ম হইতে দর্শনতত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কেহ কেহ আবার বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির সাধনার মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজিতে চেষ্টা করে।

যাহাই হউক, ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ের ফেনিলতা, উচ্ছ্বলতা মন্দীভূত হইয়া আসে, কল্পনার রাজ্য হইতে তাহার মন ক্রমশঃ বাস্তব জগতের দিকে ফিরিতে থাকে, তাহার সংঘ-চেতনা ক্রমশঃ উৎকর্ষণ লাভ করিতে-করিতে সে জীবন-পরিক্রমায় পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শৈশবের আত্মম্ভরিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, বাল্যের আত্মোৎসর্গের বৃত্তি প্রভৃতি ক্রমশঃই "গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" আত্মত্যাগ ও পরার্থে আত্মবিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ব্যক্তিগত কাজকর্ম্মের মধ্যে সে সাধারণের হাততালির বাহবা লইবার চেষ্টা ছাড়িয়া আদর্শগত নিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে, আদর্শের জন্য শহীদ হইবার প্রেরণা অনুভব করিতে থাকে, ভালবাসা পাইবার চেয়ে ভালবাসা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তাহার মনে যে সমস্ত সম্পদ কুঁড়ির মধ্যে পাপড়ির আড়ালে অবরুদ্ধ সৌরভের মত একান্তভাবে আত্মগত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহা এখন হইতে বিকশিত হইয়া বিশ্বের সেবার জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু এই পূর্ণতা অনায়াসলভ্যও নহে, সহজলভ্যও নহে। জীবন-পরিক্রমায় জাতক যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা প্রত্যেক অবস্থাতেই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অপেক্ষা রাখে। সেই জন্য যথাযথ

শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। শরীর ও মনের দিক দিয়া বিভিন্ন বয়সে জাতকের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার প্রেরণা ও বিশেষত্ব ক্রিয়া করিতে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীকে পরিচালিত করিতে হইবে। অনেকের গৃহের পরিবেশ মনের বিকাশের অনুকূল নহে, এইজন্য উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহাদের মানুষ করিবার জন্য পাঁচ বৎসরের নিম্নতর বয়স্ক শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুলের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার পর পাঁচ হইতে সাত বৎসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য শিশু-মনস্তত্ত্বসম্মত অন্য প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার পর আসিবে তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাথমিক শিক্ষার পর একাদশোত্তর বয়সে শিক্ষার সুযোগ অনেকেই পায় না। ফলে জীবনের এই কঠিনতম সমস্যার যুগে ষড়রিপুর আবর্ত্তে বিক্ষুব্ধ কৈশোরের এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার যুগে অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে কর্ণধারহীন তরণীর মত অন্ধ ভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ইহাতে জাতির কল্যাণে ব্যাহত হয়। কাজেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীদের যাহাতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্র হইতে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। হয় প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়াইতে হইবে অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত সাধারণের অধিগম্য করিতে হইবে। মোট কথা, কৈশোরের প্রথম অবস্থাটিতে জীবনের জটিলতম সমস্যার যুগটিতে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঞ্চিত হইয়া ছাত্ররা যাহাতে দিশেহারা হইয়া পথে বিপথে ঘুরিয়া না বেড়ায় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব

জাতক তাহার জন্মের পর হইতে শৈশব, বাল্য, কৈশোরের বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংশয়-দ্বন্দ্ব, প্রশ্ন-সমাধানের মধ্য দিয়া তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃই তাহার ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি কাটাইয়া উঠিয়া শরীর-মনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এই পূর্ণতা সকল ক্ষেত্রেই একটানা এবং একমুখী সরল রেখায় অগ্রসর হয় না, তাহার মধ্যে উত্থান-পতন, অগ্রগতি-পশ্চাদগতি ঘূর্ণীর মধ্যে একই স্থানে আবর্ত্তন, গতি-মান্দ্য, গতি-তীব্রতা প্রভৃতি নানা জাতীয় জিনিস দৃষ্ট হয়।

মনের যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তাহার গতি ব্যাহত হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকগণ বিশেষ খবর রাখিতেন না। ফ্রয়েড্ এই সম্বন্ধে অনেক নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। নির্ভীক এবং খানিকটা নির্লজ্জ যৌনতত্ত্বের জন্যই ফ্রয়েড্ সাধারণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার সেই সমস্ত মতবাদ অনেক মনস্তাত্ত্বিকই স্বীকার করেন না। কিন্তু এই যৌন-তত্ত্ব ছাড়াও ফ্রয়েড্ আরও অনেক কথাই বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিস্পর্দ্ধী পণ্ডিতগণও সহজে অস্বীকার করিতে পারেন না। মানুষের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে, মানুষের মনের **ইদ্** (id), **অহম্** (ego), **অধিশাস্তা** (super-ego) প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ যাহা বলিয়াছেন, অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন তাহা স্বীকার করেন। এখন অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, আমাদের নির্জ্ঞান মন সক্রিয়ভাবেই আমাদের জীবনের গতিপথকে পরিচালিত অথবা প্রভাবান্বিত করে।

অধ্যাপক নান্ জড়বাদী পণ্ডিতদের মত মনের সমস্ত ক্রিয়াকে দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বুঝিতে চাহেন না অথবা অধ্যাত্মবাদীদের মত দেহ-নিরপেক্ষ মনের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। তবুও তিনি একটা সক্রিয় নির্জ্ঞান মনের কথা পাকে-প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনের দুইটি গুণ আছে, একটি হইতেছে তাহার **সংরক্ষণ প্রয়াস** এবং আর একটি হইতেছে তাহার **কর্ম্মপ্রয়াস**। প্রথম গুণটি দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত

হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আমরা সজ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করি।

আমাদের জন্মের সময় আমরা একেবারে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত অলিখিত পুঁথির মত হইয়া জগতে আসি না। আমাদের জাতি বা বংশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমাদের বংশের অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের মনের মধ্যে যেন কতকগুলি **ছাপ** (engrams) রাখিয়া যায়। অচেতন অথচ সক্রিয় স্মৃতির মত হইয়া এগুলি যেন আমাদের সহজাত সংস্কারকে অথবা স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবান্বিত করে। তাহার পর আমাদের জীবন-পরিবেশের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের অনুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে পরিচালিত করিয়া অভ্যাসের মধ্য দিয়া, কতকগুলি বিশেষ রকম ঝোঁক, বিশেষ রকম **রসবোধ** বা ভাল-লাগা মন্দ-লাগা (sentiment)* সৃষ্টি করে। এই জিনিসটি আবার ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে, আমাদের ব্যক্তিত্ব একটা বিশেষভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে।

কিন্তু আমাদের নির্জ্জান মনের মধ্যে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাপ পড়িয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যদি অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকে, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক পরিণতিটি স্বাভাবিক ভাবে ঘটিতে থাকে। কিন্তু নির্জ্জান মনের ছাপগুলি অনেক সময়েই যে একটি বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ একক হইয়া জমিতে থাকে তাহা নহে। ফলে নির্জ্জান মনের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শক্তিশালী দলটি যদি পূর্ণভাবে দমন করিয়া নিজের পথে চলিতে না পারে, তাহা হইলেই আমাদের চরিত্রের ও বাক্-ব্যবহারের মধ্যে আসিয়া পড়ে একটা অস্বাভাবিকতা।

মনের মধ্যের এই বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আমরা অনেকেই নিজেদের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। করুণার সহিত ক্রোধের, লোভের সহিত ত্যাগের, ভয়ের সহিত অনুসন্ধিৎসার দ্বন্দ্ব আমাদের সকলেরই জানা আছে। ফ্রয়েড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছেন,

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Sentiment শব্দটির প্রতিশব্দ "রস" করা হইয়াছে।

তাহা এই সর্ব্বজনপরিচিত দ্বন্দ্বের কথা নহে। আমাদের অনুভূতির অগোচরে, আমাদের মনের সমর-ক্ষেত্রে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার দলগত দাবীর যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিনিয়তই চলিতেছে, সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আমাদের ব্যবহার যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই বিভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং কখনওবা আপাতঃ প্রতীয়মান অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ব্যাখ্যাই হইতেছে মনোবিজ্ঞান-জগতে ফ্রয়েডীয় দলের শ্রেষ্ঠ দান।

আমাদের সজ্ঞান মনে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন আমরা কিরূপ বিক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হইয়া উঠি তাহা অনেকেরই জানা আছে। আমাদের নির্জ্ঞান মনেও যখন এইরূপ কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনও আমরা সেইরূপই ক্লান্ত হইয়া উঠি—যেন গৃহযুদ্ধের অকারণ এবং অনিবার্য্য হানাহানিতে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে, অন্তর্বিপ্লবে ক্ষত-বিক্ষত মনরাষ্ট্র যেন তাহার বৈদেশিক নীতিও সামলাইতে পারে না আর তাহার নিজের শাসন ব্যবস্থাতেও যেন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই অন্তর্বিপ্লবজনিত অচল অবস্থা নিবারণ করিবার জন্য প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে এবং এই উপায়গুলির দ্বারা মনের গৃহ-বিবাদ শান্ত হয় ও বিবাদমান দাবীগুলির মধ্যে একটা সন্ধিও স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই সন্ধির কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয় না। মনের অন্তঃস্থলে যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি কাজ করিতেছে, এই খবরটি যদি সজ্ঞান মনের জানা থাকে, তবেই সন্ধির প্রসঙ্গ আসিতে পারে। কিন্তু সে খবরটি জানা না থাকিলে মন সেই সন্ধির প্রয়োজনও অনুভব করিবে না এবং নিজেও সাবধান হইবে না। ফলে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গোপন শত্রু অতর্কিত-বিরোধিতায় এবং গোপন আক্রমণে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। গোপন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিকার যেমন সহজে হয় না, সেইরূপ নির্জ্ঞান মনের বিরুদ্ধে কামনার বিদ্রোহও মনের পক্ষে দমন করা সহজ হয় না। এইজন্য নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ার কার্য্যই হইতেছে নির্জ্ঞান মনের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সজ্ঞান মনকে সচেতন করিয়া দেওয়া। মনোবিকলনের

দ্বারা, স্বপ্নবিকলনের দ্বারা, শব্দের অনুষঙ্গ (word association) বিচারের দ্বারা মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ রোগীকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার মনের তলে তলে এই সমস্ত নিষিদ্ধ কামনার অভিযান চলিতেছে। রোগী তখন নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা সংযত করিয়া তাহাকে মনের কেন্দ্রীয় শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

কিন্তু কখন কখনও নির্জ্ঞান মনের প্রতিপক্ষ দলটি এত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তাহাকে সহজে বশ্যতা স্বীকার করান যায় না, তখন শক্তিশালী বিদ্রোহী সামন্তরাজকে সম্রাট যেমন কখন কখন স্বাধীন রাজা হিসাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হন, মনকেও সেইরূপ একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। তখন আমাদের মধ্যে একটা দ্বৈত শাসন অথবা **দ্বৈত ব্যক্তিত্বের** অবস্থা আসে, তখন মনোরাজ্যের মধ্যে দুইটি শাসক শক্তির পালাক্রমে আধিপত্য চলিতে থাকে। ইহা মনের মধ্যে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের ব্যাপার নহে, ইহা যেন একই ডোমিনিয়নের কখনওবা হিন্দু কখনওবা অহিন্দুরা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের মালিক হইয়া উঠে। মন এই দুই শক্তির সম্বন্ধে যেন ঠিক পরিচয় জানে না, নিজের অজ্ঞাতসারেই কখনও সে প্রথম শক্তি কখনওবা দ্বিতীয় শক্তিটির নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে থাকে, ফলে কখনওবা সে মহাপুরুষের মত কার্য্যকলাপ করিতে থাকে, কখনওবা হয়ত নরাধমের মত ব্যবহার করিতে থাকে। অথচ কেন যে তাহার এইরূপ মতিভ্রম হয়, তাহার খবরও সে রাখিতে পারে না—প্রতিকারও করিতে পারে না।

অনেক সময় এই বিরুদ্ধ দলটি তেমন শক্তিশালী থাকে না এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ খাড়া করাইতে পারে না বলিয়া "দ্বৈত ব্যক্তিত্ব" প্রভৃতি উপায়ে তাহাদের তোষণ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে জোর করিয়া দাবাইয়া দেওয়া হয়। তখন সেই সমস্ত অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞান মনোরাজ্যে জট্ পাকাইয়া অবস্থান করে এবং সুযোগ পাইলেই ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া তাহাদের অতৃপ্ত কামনাগুলিকে পূর্ণ করিয়া লয়।

ফ্রয়েড এই ব্যাপারটিকে একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নির্জ্ঞান মনটির মধ্যে যে সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দল ভিড় করিয়া আছে, তাহারা যে কক্ষে অবস্থান করে তাহারই পাশের কক্ষটিতে আছে সজ্ঞান মনের গৃহ। এই অতৃপ্ত অকাঙ্ক্ষাগুলি প্রতিনিয়তই সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই দরবার কক্ষের দ্বারদেশে বসিয়া আছে প্রহরী। যে-সমস্ত কামনাকে সে অনীতিমূলক বা তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থীমূলক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে সে সহজে সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার দিতে চাহে না। ফলে সেই সমস্ত চিন্তাগুলি বার বার সজ্ঞান মনের দরজায় আসিয়া প্রহরী মহাশয়ের তাড়া খাইয়া ফিরিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজেদের স্বরূপ মূর্ত্তিতে আসিলে প্রহরী মহাশয় তাহাদের চিনিয়া ফেলিবেন বলিয়া তাহারা ছদ্মবেশের আশ্রয় লয়। প্রহরী তখন তাহাদের চিনিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দরবারে প্রবেশ করিতে দেন। ফলে ছদ্মবেশে সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়া অতৃপ্ত কামনাগুলি দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া খানিকটা তৃপ্তি লাভ করে। একটা উদাহরণ দিলেই ঘটনাটি বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাইতে পারে, আমাদের গল্পের নায়ক অজিতকুমার একজন নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহার নাম অমিতা। কিন্তু সামাজিক ও নীতিগত কারণে অজিতের সহিত অমিতার মিলন হইতে পারে না। তাই সজ্ঞান মনে অজিত অমিতার কথা ভাবিতে পারে না। কিন্তু অমিতার কথা সে মন হইতে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না। ফলে তাহার অতৃপ্ত সঙ্গলিপ্সা তাহার নির্জ্ঞান মনের নিভৃত প্রদেশে বাসা বাঁধিল এবং স্বপ্নের মধ্য দিয়াই অমিতার সঙ্গলাভ করিয়া তাহার অতৃপ্ত কামনা তৃপ্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বপ্নের দ্বারদেশেও প্রহরী বসিয়া আছেন, তিনি এই অনীতিমূলক কামনাকে প্রবেশাধিকার দিবেন না। কাজেই সে-স্বপ্ন আর দেখা হইল না। কিছুদিন পরে অজিতকুমার স্বপ্ন দেখিল, সে একটি বিলাতী কুকুরকে বুকে লইয়া আদর করিতেছে। প্রহরী মহাশয় এ স্বপ্নটিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু প্রহরী মহাশয় স্বপ্নটিকে

যতটা নিরীহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নটি আদৌ ততটা নিরীহ ছিল না। যে কুকুরটিকে অজিতকুমার বুকে লইয়া স্বপ্নে আদর করিয়াছেন—সেই কুকুরটি হইতেছে তাঁহার নায়িকার ছদ্মরূপ!

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাগুলিকে আক্ষরিকভাবে মানিয়া না লইলেও, এটুকু ধরিয়া লইতে আপত্তি নাই যে, সংরুদ্ধ বাসনার জট্গুলি সক্রিয় শক্তি লইয়াই আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবান্বিত করে। যে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, নীতি-অনীতিবোধ আমাদের ব্যক্তিত্বকে তৈয়ার করে, সেই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অন্য কোনও শক্তি নির্জ্ঞান মনের মধ্যে থাকার অর্থই হইতেছে যে, সেই বিরুদ্ধ শক্তিটি পদে পদে আমাদের বাধার সৃষ্টি করিবে, আমাদের সমগ্র সম্ভাবনা দিয়া আমাদের কাজ করিতে দিবে না, প্রত্যক্ষে নকল বিনয়, নকল আনুগত্য দেখাইয়া অথবা ছদ্ম ব্যবহার করিয়া পরোক্ষে কার্য্যহন্তারক হইয়া সে আমাদের ক্ষতিই করিবে।

নিরুদ্ধ কামনা অথবা অনীতিমূলক অভিজ্ঞতার স্মৃতিজনিত জট্গুলি আমাদের প্রতি নকল আনুগত্য দেখায় বলিয়াই আমরা তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। এইজন্যই আমাদের অনেক ক্রিয়াকলাপের অর্থ উপর হইতে দেখিলে যাহা মনে হয়, তাহাদের ভিতরের অর্থ তাহা নহে। একজন লোকের হয়ত অনবরত হাত ধুইবার শুচি-বাতিক আছে। কিন্তু এই শুচি-বাতিকের গূঢ় অর্থ হয়ত এই হইতে পারে যে, ঐ লোকটি ঐ হাত দিয়া এমন কোনও পাপের কার্য্য করিয়াছে, যাহার স্মৃতি সে ঐভাবে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহে।

কৈশোরে আমরা যে সমস্ত ভয়ের বা পতনের স্বপ্ন দেখি, তাহারও এই জাতীয় একটা গূঢ় ব্যাখ্যা হইতে পারে। শারীরিক পতন হয়ত নৈতিক পতনের সূচনা করে, ভয়ের ব্যাপারটা হয়ত ব্যক্তিত্বের সহিত নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহী চিন্তাগুলির সংঘর্ষের ফল হইতে পারে।

এই জাতীয় স্বপ্নের কথাগুলি আমরা প্রায়ই স্বপ্নান্তে ভুলিয়া যাই, তাহার কারণ এই সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে যে সমস্ত অনীতির অভিযান থাকে, তাহার সংবাদ পাইলে সজ্ঞানে মনের দুঃখই বাড়িবে।

স্বপ্নে চলাফেরা (Somnambulism) করার অভ্যাস অনেকের আছে।

এই অভ্যাসের অর্থই হইতেছে স্বপ্নের সময় অদমিত কামনা সজ্ঞান মনের অগোচরে তাহার ইপ্সিত কাজ সারিয়া লয়। এই জন্যই যাহারা স্বপ্নে চলাফেরা করে তাহারা সে সব কথা সমস্তই ভুলিয়া যায়।

তোত্‌লামি প্রভৃতি মুদ্রাদোষ অনেক সময় অবদমিত ইচ্ছার জন্য হইতে উদ্ভূত হয়। অধিশাস্তার (super ego) ভয় এবং 'ইদ'-এর Id) আগ্রহ, এই দুইটির সংঘর্ষ হইতে অনেক সময় তোত্‌লামি আসিয়া থাকে। ন্যেটা হওয়া বা বাম হাতে কাজকর্ম্ম করাও নাকি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পিতা যে ভাবে কাজকর্ম্ম করেন তাহার বিপরীতাচারণ করাই ইহা প্রতীক।

আমাদের অনেকের মধ্যে অদ্ভুত খেয়াল বা ক্ষেপামি আছে। কেহ হয়ত ফাঁকা মাঠ দেখিয়া ভয় পায়, কেহ হয়ত ছুরি বা দড়ি দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে; রাস্তা দিয়া হয়ত একটি নিরীহ বৃদ্ধা চলিতেছে, পিছনে ছেলের দল হঠাৎ "ডাক্তার" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, অমনি দেখা গেল বৃদ্ধাটি মুখ ভ্যাংচাইয়া গলা ফাটাইয়া গালাগালি করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিল। উপর হইতে দেখিল এই সমস্ত ব্যাপারের যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু নির্জ্ঞান মনের তত্ত্বের খবর লইলে এই সমস্ত ক্ষেপামির অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝিতে পারা যায়।

ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি হয়, তাহা নিতান্ত অকারণে বা হঠাৎ হয় না—তাহা নির্জ্ঞান মনের প্রেরণাতেই ঘটিয়া থাকে। ছেলেরা যে কালি ছিটাইয়া বই নোংরা করে, তাহা নাকি স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহের প্রতীক, আমরা যে আত্মীয়কুটুম্বের নিকট লৌকিকতার চিঠিপত্র লিখিবার সময় ভুলভ্রান্তি করি তাহা নাকি সামাজিক "আমড়াগাছি", ভণ্ডামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই দ্যোতক। ফ্রয়েড বলেন, তাহা হইতেছে নির্জ্ঞান মনের তরফ হইতে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতে চাই বলিয়াই এমনটি ঘটিয়া থাকে।

অনেক সময় এক একজন লোককে একটা বিষয়ে অত্যধিক আসক্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও নির্জ্ঞান মনের একটি লীলা আছে। নির্জ্ঞান মনের অত্যধিক কামুকতা বা অবদমিত কামনা হয়ত বাহিরের আচরণে অস্বাভাবিক লজ্জায় বা ন্যাকামিতে প্রকাশ পায়,

অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অস্বাভাবিক ক্রোধ হয়ত আমাদেরই নির্জ্ঞান মনের মধ্যে ঐ সমস্ত ত্রুটির অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। কোনও কারণে বাল্য হইতে যাহারা ভোগবিলাসে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়, অনেক সময় তাহাদের অবদমিত কামনা তাহাদের নির্জ্ঞান মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সে বাড়ীর অন্যান্য সকলের ছোটখাট ভোগ-বিলাসগুলিকে সহ্য করিতে পারে না এবং সেই সমস্ত ভোগবিলাসের ব্যবস্থা দেখিলে হিংসা প্রকাশ করিয়া গৃহের শান্তির ব্যাঘাত করে।

যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আমাদের আচরণের মধ্যে এই জাতীয় অসামঞ্জস্য-গুলি আসিতে থাকে, আমাদের কৈশোরে সেই সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেশী ভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া কিশোরদের যারা শিক্ষক তাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত এবং সহানুভূতিকোমল ব্যবহারের দ্বারা এই সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শৈশবের সহিত কৈশোরের একটা সাদৃশ্য আছে। শৈশবের মত এই সময়টিতেও জাতক বাহিরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খাওয়াইতে পারে না এবং সেই জন্যই যেন সে শিশুর মতই বাহিরের জগৎ হইতে পলায়ন করিয়া অন্তর্বৃত্ত (introvert) হইয়া উঠে। জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে সে যেন কুণো হইয়া উঠে। আলস্য, ক্লান্তি, অকারণ ভয় বা অকারণ অপরাধের অনুভূতিতে ক্লান্ত হইয়া সে কল্পনার রাজ্যে কাজ করিতে চায়, দিবাস্বপ্নের কল্পিত আনন্দে মশগুল থাকিতে চায়। এই সময়ে বাহিরের খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বালকের মনের কল্পনা-বিলাসের প্রতিষেধের চেষ্টা করা মন্দ ব্যবস্থা নয়।

শৈশবের অসহায় অবস্থার পর বাল্যে জাতক জগতের সঙ্গে অধিকতর পরিচয়ের জন্য সে জগতের খানিকটা খাপ খাওয়াইয়া লইতে সমর্থ হয়। ইহার পর কৈশোরে আবার একটা অসহায় অবস্থা আসে। সেইজন্য কৈশোরের দিবাস্বপ্নগুলি প্রায়ই **পশ্চাৎমুখী** (regressive) হইয়া বাল্যের সাফল্যের দিকে ঝুঁকিতে থাকে এবং সে নূতন করিয়া কিছু শেখা বা করার চেয়ে পুরাতন পথেই চলিতে যেন সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে।

কৈশোরের **বিষাদ-প্রিয়তা** বা খিট্‌-খিটে ভাবটি মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের

সূচক। জগতের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারার জন্য নিজের প্রতি বা জগতের প্রতি যে বিরক্তি, তাহাই হয়ত মনের রুক্ষতা হইয়া প্রকাশ পায়, অতীত অন্যায়ের অনুভূতি হয়ত বিষাদ-প্রিয়তা হইয়া আমাদের পাইয়া বসে।

এই বয়সে জগতের সঙ্গে এই খাপ খাওয়াইবার অক্ষমতাটি অনেক সময় আমাদের বেপরোয়া করিয়া সমাজদ্রোহী ও অনীতি-পরায়ণ করিয়া তোলে, কখনওবা হয়ত যৌন-অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত **অপরাধ-প্রবণতা** যে নির্জ্জান মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে অনেক সময় উদ্ভূত হয়, তাহার একটি প্রমাণ হইতেছে যে, অপরাধী অনেক সময়েই তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, সে জানে না কেন সে অপরাধ করিতেছে, সে যেন "বলাৎ এব নিয়োজিত" হইয়াই অন্যায় কাজগুলি করিয়া যায়।

এই অপরাধ-প্রবণতা নানা রূপেই প্রকটিত হইতে পারে। কখনওবা হয়ত স্কুল-পলাতক বা গৃহ-পলাতক হইয়া বালক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। মনের স্বাভাবিক স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং গৃহ বা স্কুলের নিয়ম, নিষ্ঠা—এই দুইটি জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ফলে সংঘর্ষজনিত গূঢ়ৈষা হইতে ইহা সৃষ্ট হয়। কখনওবা হয়ত অকারণে মিথ্যা বলিবার অভ্যাসে ইহা প্রকটিত হইয়া উঠে। বিদ্যাবুদ্ধি বা শক্তিতে যে বালক ছোট এবং তাহার শক্তি-দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন, তাহার নির্জ্জান মনে প্রায়ই **আত্মাবমাননাজনিত জট্** বা **হীনমন্যতার** (inferiority complex) সৃষ্টি হয়। তখন সে অকারণে মিথ্যা কথা কহিয়া, তাক লাগাইয়া লোকজনকে চমকাইয়া দিয়া নিজের বাহাদুরী প্রচারের চেষ্টা করে।

চৌর্য্য কৈশোরের আর একটি অপরাধ। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছোট ছোট চুরির অভ্যাস প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রিদিগকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিয়া দিলেই রোগের প্রতিকার হয় না, মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক উপার্জ্জনী-বৃত্তিটি আছে, তাহারই বিকৃত রূপে এই দোষটি প্রকটিত হইয়া উঠে। এই দোষের প্রতিকার বা উৎকর্ষণ খুব সহজ নয় এবং নানা ছদ্মরূপে এই দোষটি মানুষের মনের উপর কার্য্য করিতে থাকে। রস্ (Ross) বলেন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিয়া রেল কোম্পানীকে ফাঁকি

দেওয়া, কাহারও নিকট বই চাহিয়া লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়া, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করা, 'দেখ্ তোর না দেখ্ মোর' এই ভাবে এটা-ওটা হাতড়াইবার চেষ্টা করা—এইগুলিকে চুরির মনোভাব ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? অথচ এই সমস্ত অভ্যাসগুলি অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত অভ্যাসগুলি সব সময়ের যে উপার্জ্জনী-বৃত্তির অস্বাভাবিক বিকাশ, তাহা নহে। অনেক সময় এই জাতীয় দোষগুলি অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা হইতেও সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আমরা যে সমস্ত জিনিষ চুরি করি তাহা অনেক সময়েই যৌন-ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতীক। নির্জ্ঞান মন সেই প্রতীকগুলিকে চুরি করিবার প্রেরণা দিয়া আমাদের অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করায়।

অনেক সময় দল পাকাইয়া গুণ্ডামি করা প্রভৃতিও ছেলেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই দোষের উৎকর্ষণ খুব কঠিন নয়। সহানুভূতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে এবং উপযুক্তভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে এই দলগুলিকে সমাজ-সেবা প্রভৃতি কাজে লাগান যাইতে পারে।

মোটামুটী আমরা বলিতে পারি, কৈশোরে যে সমস্ত অপরাধ, যে সমস্ত "স্খলন পতন ত্রুটি" আমাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহার অনেকগুলিই আমাদের নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গূঢ়ৈষা হইতে উদ্ভুত। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি বিধানের দ্বারা ইহার প্রতিকার হয় না। শিক্ষককে ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সহিত দেখিতে হইবে জট্‌গুলি কেন হইল এবং তাহার পর যুক্তির দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা তাহার দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে হইবে। শিশু যেমন পিতাকে অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখে এবং শত্রু বলিয়া মনে করে, কৈশোরের অবস্থায় বালক বালিকাও তেমনিই শিক্ষককে শত্রুস্থানীয় অথবা ভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তাহার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতে চায়। এইজন্য শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের বুঝাইয়া দেওয়া যে, তিনি ছাত্রদেরই দলের লোক, সুতরাং ছাত্রদের সহিত তাহার বিরোধ নাই। ছাত্রগণ যখন শিক্ষককে তাহাদের দলের লোক বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখনই সে তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইবে, নতুবা নহে।

চিন্তার বিবর্ত্তন

অনেকের বিশ্বাস, চিন্তা জিনিসটা একান্ত ভাবে মানুষেরই সম্পদ, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ইহাতে কোনও অধিকারই নাই, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। নান্ সাহেব বলেন, একটি কুকুরের চিন্তাধারার সহিত একজন ঋষির চিন্তাধারার পার্থক্যটা প্রণালীগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। মানুষ জগতের সহিত যতই নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, ততই তাহার মনোযন্ত্রেরও বিকাশ হইতে থাকে। এই বিকাশ ত্রিধারায় চলে: (১) কোনও একটা অভিজ্ঞতায় অভিভূত হওয়া (affective aspect) (২) সেই অভিজ্ঞতার ফলে কোনও কিছু কর্ম্মপ্রচেষ্টা করা (conative aspect) এবং (৩) অভিজ্ঞতাজনিত একটা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় বা সিদ্ধান্ত করা (cognitive aspect)। এই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ একটা হঠাৎ-ঘটা কাণ্ড নহে। ইহার বিকাশের পথে নানা প্রকার স্তর আছে এবং প্রাণীজগৎ হইতে মনুষ্যজগৎ সকলের মধ্যেই ইহার লীলা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিতেছে।

এই চিন্তাশক্তির বিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র।

জাতক যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন এই দৃশ্য-গন্ধ-গানে ভরা জগতে সে একেবারেই অপরিচিত ও নবাগত। সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে কোন জড়বুদ্ধি বালককে ধরিয়া আনিয়া যদি কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রিক্সার টুং টাং, ট্রামের ঢং ঢং, মোটারের প্যাক্ প্যাক্, ছ্যাক্ড়া গাড়ীর ঘড়্ ঘড়, জনতার হট্টগোল, ভীড়ের ঠেলাঠেলি, ভিখারীর আবেদন, সেলস্‌ম্যানের টানাটানি, আত্মীয়-বন্ধুর বিপদ-সঙ্কেত প্রভৃতিতে সে যতটা দিশেহারা হইয়া পড়ে, তাহার সহস্রগুণ দিশেহারা হইয়া পড়ে এই নবজাত শিশু। মাতৃগর্ভের নিরালা গর্ভনীড় হইতে সে হঠাৎ যখন সহস্র আবেদনে পূর্ণ এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার অনভ্যস্ত কাণে কত রকম অপরিচিত শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল,

অনভ্যস্থ চোখে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যপট হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, অনভ্যস্ত নাসিকায় হয়ত কত রকমের নাম-না-জানা গন্ধ প্রবেশ করিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, তাহার অনভ্যস্ত ত্বক্ দিয়া আবহাওয়ার শীতাতপ বোধ, পার্থিব জিনিসের কঠিন-কোমল স্পর্শ-বোধ তাহাকে চেতাইয়া তুলিল এবং এই সমস্ত জিনিসগুলিই একই সঙ্গে তাহার অনুভূতির রাজ্যে হানা দিল। অনুভূতির এই যুগপৎ আক্রমণে সে এতই দিশেহারা হইয়া পড়িল যে, বেচারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূমিষ্ঠ শিশু যে কাঁদিয়া উঠে, ইহাই হইল তাহার কারণ।

তারপর ধীরে ধীরে জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয় আরম্ভ হয়। এই পরিচয়ের ইতিহাস অতি বিচিত্র। বিরাট কলগুঞ্জনে গুঞ্জিত, সহস্র আবেদনে পুঞ্জিত, হঠাৎ ফাটিয়া-পড়া বিস্ময়ের জগতে জাতক যখন আসিয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতেই পারিল না যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহস্র আবেদনের মধ্যে কোনটীর প্রতি সে মনোযোগ দিবে। তখন অতীতের কোনও অভিজ্ঞতাই তাহার সম্বল নাই, তাহার আছে শুধু কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং অপরিস্ফুট দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়ার ক্ষমতা (reflexes); এই প্রবৃত্তি এবং দেহের প্রয়োজন তাহাকে যে বিষয়ে প্রেরণা দিবে তাহার মনোযোগ সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। নান্ সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ধরা যাইতে পারে, তাহার জন্মের কয়েকদিন পরেই জাতক তাহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রেরণায় তাহার চামচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নানাভাবে হাত পা নাড়িয়া বহু চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সে চামচটিকে ধরিল এবং একবার বাঁ চোখে, একবার বাঁ নাকে, একবার বা কাণে গুঁজিতে গুঁজিতে শেষ পর্য্যন্ত সে চামচটিকে মুখে পুরিতে সমর্থ হইল।

তাহার একটি **অভিজ্ঞতা** হইল।

পরে আর একদিন সে ঐ চামচটিকে পুনরায় দেখিতে পাইল। এবারে আশপাশের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় এই চামচটি সে অধিকতর স্পষ্টতার সহিত অন্যান্য জিনিস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লক্ষ্য করিল, কারণ এই জিনিসটির সহিত তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ের একটা সম্পর্ক আছে এবং তাহার ফলে দ্বিতীয়

বারের অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ অর্থ ও ব্যঞ্জনা আছে। এইভাবে অভিজ্ঞতার **প্রাথমিক সঙ্কেত** (primary meaning) দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতায় বদ্‌লাইয়া যায়। শিশুটির প্রথম অভিজ্ঞতাটি ছিল চামচ সম্বন্ধে নিছক **অনুভূতি** (sensation), দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতাটিতে তাহার পরিচিতি ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতির রং লাগিয়া গিয়াছে। নিছক নির্জ্জলা অনুভূতির এই যে একটা মনের রং লাগাইয়া নূতন ব্যঞ্জনায় তাহাকে নূতন করিয়া পাওয়া (perception), ইহাই হইতেছে চিন্তার মূল কথা। অনুভূতির সঞ্চয় যতই বাড়িতে থাকে, জগৎকে আমরা ততই নূতন করিয়া বুঝিতে শিখি। এই হিসাবে প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকেই আমরা খানিকটা নূতন করিয়া পাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাচীনের স্মৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণ শুধু যৌগিক মিশ্রণ নহে, ইহা খানিকটা রাসায়নিক মিশ্রণের মত, যাহার ফলে পুরাতনে স্মৃতি ও নূতনের অভিজ্ঞতা, এই দুইটি মিলিয়া একটি নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়।

এই সৃষ্টির জন্য আমাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ শক্তি প্রচুর সাহায্য করে। জিনিসটা এইভাবে ঘটে। শিশুটি প্রথমতঃ তাহাদের বাড়ীর গাইটিকে দেখিল। গোরু সম্বন্ধে তাহার ধারণা এখনও স্পষ্ট জমাট হয় নাই, তবে অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট গোরুটি সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট **প্রতিরূপ** (image) তাহার মনের মধ্যে রহিয়া গেল। পরে সে বুধি ছাড়া মঙ্গলা, শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি আরও অনেকগুলি গোরু দেখিল। ইহাদের কোনটিই ঠিক অবিকল এক রকম দেখিতে নয়। তাহা হইলেও গোরু সম্বন্ধে একটা ধারণা ঠিক করিয়া সে এই গোরুগুলিকেও বুধির স্বগোত্রীয় জীব বলিয়া বুঝিতে পারিল। কি ভাবে ইহা সম্ভব হইল ?

সে প্রত্যেক গোরুরই কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিল, পরে তাহাদের সাধারণ বিশেষত্বগুলিকে গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলিকে বর্জ্জন করিয়া গো-জাতি সম্বন্ধে একটি **ধারণা** (concept) তৈয়ারী করিল। এইভাবে প্রাথমিক অনুভূতির (sensation) অস্পষ্ট চেতনা দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতার পরিচয় ও ব্যঞ্জনায় (perception)

পরিপক্ক হইয়া বহুবারের অনুভূতির অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণী (twin methods of analysis and synthesis) শক্তির সাহায্যে **"ধারণা"**র (concepts, patterns or schemas) সৃষ্টি করিল।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয় না। বালকটি যখন "গোরু" সম্বন্ধে ধারণা খাড়া করিয়াছে, তাহার পর সে হয়ত একদিন একটি মহিষকে দেখিতে পাইল। অনেক দিক দিয়াই মহিষটিকে দেখিতে ঠিক গোরুর মত নহে, তবে গোরুর সহিত তাহার মিলও খানিকটা আছে। এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির দ্বারা সে শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতির সাধারণ গুণগুলিকে গোরু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গোরু সম্বন্ধে একটি ধারণা (concept) তৈয়ারী করিয়াছিল, সেই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির সাহায্যেই সে গোরুর সহিত মহিষেরও যে একটা সম্পর্ক আছে তাহা আবিষ্কার করিল।

এইভাবে বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে কোনও বস্তু হইতে বস্তুনিরপেক্ষ বিশেষত্বগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া এবং সেই বিচ্ছিন্ন গুণসমষ্টির দ্বারা এক একটি 'ধরণা' বা 'নমুনা' (schema or pattern) তৈয়ারী করা এবং পরে এই ধারণাগুলি একত্র করিয়া নূতন নূতন ধারণার সৃষ্টি করা, ইহাই হইতেছে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত শক্তির মূল কথা।

একজাতীয় অনেকগুলি জিনিস দেখিয়া তাহাদের সাধারণ গুণগুলি গ্রহণ করিয়া এবং বিশেষ গুণগুলি বর্জ্জন করিয়া সেই জাতি সম্বন্ধে যে একটা "নমুনা" আমরা মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখি, সেই নমুনার সঞ্চয়ই আবার আমাদের নূতন নূতন ব্যঞ্জনা দান করে। এইজন্যই একই জিনিসের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন অর্থের সঙ্কেত দান করে। একটি ফুল হয়ত সাধারণের কাছে শুধুই ফুল হিসাবে দেখা দেয়, কিন্তু কবির চোখে সে হয়ত ভগবানের প্রীতি-স্নিগ্ধ সুবাসিত রঙীন প্রেমপত্র হইয়া দেখা দেয়। জগতের শত সহস্র আবেদনের মধ্য হইতে আমরা যে দুই একটি মাত্রই গ্রহণ করি এবং বাকীগুলিকে দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনিনা, তাহারও কারণ হইতেছে মনের মধ্যে এই সঞ্চিত নমুনার তারতম্য। সুরের অনুভূতির নমুনার কোনও সঞ্চয়ই যাহার মনের মধ্যে নাই, সে কাহাকেও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে শুনিয়া সেই গানটিকে শব্দের

অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র মনে করিয়া তাহাতে কোনও মনোযোগ দিবে না, অর্থাৎ এই গানের আবেদনে তাহার মনে কোনও সাড়া জাগিবে না ; কিন্তু যাহার স্বর জ্ঞান আছে, যাহার মনের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের নমুনার সঞ্চয় আছে সে গানটি শুনিবামাত্র উৎকর্ণ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে এই স্বরটা ইমন ? না ভূপালী ? না গৌরী ? না অন্য কিছু ?

এই জন্যই জগতের সঙ্গে পরিচয় যত গভীর হইতে থাকে, নূতনের সহিত পরিচয়ের সুবিধা ততই গভীরতর ও ব্যঞ্জনাময় হইতে থাকে। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে—আমরা জাতির অতীত ইতিহাস হইতে অভিজ্ঞতার এমন কোনও সঞ্চয় লইয়া জন্মগ্রহণ করি কিনা যাহা আমাদের অনুভূতি, মনোযোগ প্রভৃতিকে বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিবে, বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে ? ইয়ুং (Jung) বলেন. হাঁ, আমরা কতকগুলি জাতিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় (cognitive disposition ro archetype) লইয়া জন্মগ্রহণ করি। জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই গঠিত হয় না, আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসের সঞ্চয়ও তাহার সহিত কাজ করে এবং আমাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপকে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত করে। সময় ও দূরত্বের (time and space) ধারণা এইরূপ একটা আমাদের জাতিগত সম্পদ। প্রত্যেক প্রাণীই এরূপ একটা সম্পদ লইয়া তাহার জীবনের কারবার আরম্ভ করে। তারপর আসে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও তাহার নব নব ব্যঞ্জনা ও নব নব সিদ্ধান্ত।

তবে এই সিদ্ধান্তের শক্তি একান্তভাবে মানুষের জিনিস নহে। ইতর প্রাণীরাও মানুষের মতই তাহাদের অনুভূতির ভিতর দিয়া সিদ্ধান্ত করে। গৃহের কর্ত্রীকে রুক্ষমূর্ত্তিতে "ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা" দেখিয়া গৃহমার্জ্জারী যখন লাঙ্গুল তুলিয়া পলায়ন করে, আবার তাহাকে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দেখিলে কিছু প্রাপ্তিযোগের আশা করিয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই মার্জ্জারীর মধ্যেও মানুষের মতই একটা বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের লীলা চলিতে থাকে।

তাহা হইলে মানুষ ও ইতর প্রাণীর সিদ্ধান্তের পমধ্যোর্থক্যটা কোন্‌খানে ?

পার্থক্য হইতেছে এই যে, ইতর প্রাণীদের সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির (perception) বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সেই বস্তুটির "খুঁট" ধরিয়া তাহার চিন্তা চলিতে থাকে, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে তাহারা বিমূর্ত্ত (abstract) চিন্তা করিতে পারে না। বিড়ালটি গৃহিণীর হাতে ঝাঁটা দেখিলে তবে ভয় পাইবে নতুবা ভয় পাইবে না। কিন্তু মানুষের চিন্তা শুধু এইটুকুর উপরই সীমাবদ্ধ নহে। ঝাঁটা দেখিলে ঘরের মেয়েটি হয়ত বিড়ালীর মতই ভয় পাইবে কিন্তু তাহার চিন্তাশক্তি আরও বস্তুনিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে বলিয়া সে ভাল মন্দ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির বিচার করিতে পারে এবং ঐ বয়সেই হয়ত সিদ্ধান্ত করিতে পারে "এই কাজটি করিতে নাই, মা রাগ করিবেন অথবা ভগবান পাপ দিবেন" ইত্যাদি। দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়, এই সিদ্ধান্ত একটি সার্কাসের শিক্ষিত ঘোড়া বা কুকুরও হয়ত করিতে পারিবে। তবে তাহার জন্য তাহাকে দুইটি এবং আরও দুইটি জিনিসকে পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও শিশু অবস্থায় তাহার চিন্তাশক্তি প্রত্যক্ষ অনুভূতির খুঁট ধরিয়া চলিতে থাকে বলিয়া তাহার চিন্তাকে সাহায্য করিবার জন্য জড়বস্তুর সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। চার দ্বিগুণে আট হয়—নামতার এই বস্তু-বিচ্ছিন্ন (abstract) সঙ্কেতটী তাহার কাছে স্পষ্ট হয় না, কিন্তু চারিটী মারবেল বা তেঁতুল বীজ দুইবার গ্রহণ করিয়া যে আটটি হয়, ইহা দেখাইয়া দিলে তাহার বুঝিবার সুবিধা হয়। এই জন্য শিশু বয়সে ছবি, নক্সা প্রভৃতিও তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া দিয়া তাহার চিন্তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এই মার্ব্বেল, তেঁতুল বীজ, ছবি, নক্‌সা প্রভৃতি আমাদের চিন্তার জন্য যতটা সাহায্য করে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য করে মানুষের ভাষা। অধ্যাপক স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন, ভাষা হইতেছে "essentially an instrument of conceptual analysis and synthesis", এই ভাষাই হইতেছে উচ্চতম চিন্তার শ্রেষ্ঠতম যন্ত্র। আমাদের মনের অস্পষ্ট ধারণাগুলি ভাষার শীলমোহর পাইয়া সর্ব্বসাধারণের কাজের জিনিস হইয়া ভাবের হাটে বিনিময়ের মুদ্রার কাজ করে। মানুষের ভাষা এক একটি বাস্তব জিনিসের প্রতিরূপ (image) হইয়া আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে এবং মানসচক্ষে

এই বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি পাশাপাশি দেখিয়া ঠিক ছবি বা নক্সার মতই আমরা চিন্তার সাহায্য পাইয়া থাকি। মা যখন ছেলেকে বলিলেন, "যেও না গোরুর কাছে, গুঁতিয়ে দেবে"; তখন দুর্দ্দান্ত গোরু, গোরুর শিংএর গুঁতায় ভুড়ি-ফাঁসা রক্তাক্ত দেহ এবং চারিদিকের ত্রস্তব্যস্ত অবস্থা, এই সমস্ত জিনিসেরই প্রতিচ্ছবিগুলি (image) ছেলেটির মানসপটে ভাসিয়া উঠে। কাজেই গোরুর কাছে যে যাওয়া উচিত নয়, এই সিদ্ধান্তটি বালক সহজেই করিতে পারে।

ভাষার এই সুবিধা আছে বলিয়াই মানবশিশুর চিন্তার ক্ষেত্রে যে সুবিধা হয়, ইতর প্রাণীর সে সুবিধা হয় না। এমন কি মানুষের মধ্যেও যাহারা মূক, বধির এবং তাহার ফলে ভাষার অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদেরও সে সুবিধা নাই। হয়ত "গোরু গুঁতাইয়া দিবে" এই জিনিসটা গোরুর গুঁতাইবার মত অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভাষায় অধিকারবিহীন মূক-বধিরকেও বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের ভাষায় এমন অনেক শব্দই আছে, যাহা অঙ্গভঙ্গী করিয়া দেখান যায় না। গৃহস্বামী প্রবাসে চাকরির স্থলে যাইতেছেন, তাঁহার চার বছরের কন্যাটি "যেতে নাহি দিব" বলিয়া বাঁকিয়া বসিল। পিতা বলিতে চাহেন "কেঁদো না, মাসখানেক পরে ফিরে আসবো, সেখানে না গেলে আমার চাকরি থাকবে না" প্রভৃতি। এই মনোভাবটি ভাষার সাহায্যে সাধারণ ছেলেমেয়েকে বুঝান যায়, বোবা ছেলেমেয়েদের ইসারার সাহায্যে তাহা বুঝান সম্ভব নহে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কাল-পরশু, মাস-বৎসর, দূর-নিকট, ভাল-মন্দ, মাঝারী, চলনসই, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি হাজার হাজার কথা প্রত্যেক ভাষাতেই আছে, যাহা নিছক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝান যায় না। এই-খানেই ভাষার বাহাদুরী। ভাষা স্থূল বস্তুর সাহায্য না লইয়া স্থূল বস্তুর মানস প্রতিরূপগুলি (image) লইয়া আমাদের চিন্তা করিতে সুবিধা ত দেয়ই, তাহা ছাড়া স্থূলবাচক জিনিসগুলি হইতে তাহাদের গুণধর্ম্ম ক্রিয়াবাচক (abstract) জিনিসগুলির পর্য্যন্ত প্রতিরূপগুলিকে মানসপটে নূতন সৃষ্টি করিয়া আমাদের চিন্তার সাহায্য করে। ভাষায় বঞ্চিত ইতর প্রাণীরা তাহা পারে না বলিয়াই তাহাদের চিন্তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ ছাড়িয়া মানুষের মত জটিল সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সমস্ত চিন্তাশক্তির মূলে আছে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি (perception)। জীবজন্তু এই অনুভূতির সূত্র ধরিয়াই তাহাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের পথে পরিক্রমণ করে, আর মানুষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির প্রতিরূপগুলি লইয়াই কাজ করিতে পারে। এই প্রতিরূপগুলি যে শুধু চক্ষুগ্রাহ্য জিনিসেরই হইবে এমন কোনও কথা নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনও অনুভূতির প্রতিরূপ লইয়া মানুষের চিন্তার কাজ করিতে পারে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া মানুষের অনুভূতির আরও দিক্ আছে এবং তাহাদের প্রতিরূপও (image) আছে। শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা বোধ (organic image), দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থানবোধ, (kinaesthetic image) প্রভৃতিরও প্রতিরূপ আছে। মানুষ এইগুলিকে অনুভূতির উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পৃথক্‌ভাবে কাজ করিতে পারে অর্থাৎ জিনিসের **ভাবটি** (idea) লইয়া ভাবিতে পারে।

শিক্ষাতত্ত্বে এখানে একটি আবশ্যকীয় তথ্যের কথা রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের প্রতিরূপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমান নহে, একজাতীয়ও নহে। কেহবা হয়ত কাণে শোনা জিনিসগুলি ভালভাবে স্মরণ করিতে পারে, কেহবা চোখে-দেখা জিনিসগুলি বেশী মনে রাখিতে পারে, আবার অন্য কেহ হয়ত হাতে করিয়া স্পর্শ করিলে তবে তাহাকে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা বা উপদেশেই কাজ হইবে, দ্বিতীয় দলের ছাত্রদের জন্য ছবি বা উপদেশেই কাজ হইবে এবং তৃতীয় দলের জন্য মডেল প্রভৃতির দরকার হইবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহার আরম্ভ, তাহার পর নব নব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির ভিতর দিয়া যাহার বিকাশ, সেই জিনিসটিরই চরম অভিব্যক্তি হইতেছে মানুষের জটিল সিদ্ধান্ত আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি। নান্ দেখাইয়াছেন, পাম্প, যন্ত্র এবং ট্রামগাড়ীর নমুনা (schema) দুইটির সংশ্লেষণ করিয়া রেলগাড়ীর আবিষ্ক্রিয়া হইল, গ্যাসের ইঞ্জিন, রাস্তার যানবাহনের নমুনার সংশ্লেষণের ফলে মোটর গাড়ীর উৎপত্তি

হইল। এইভাবে মানুষের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে। একেবারে নিছক নূতন সৃষ্টি কিছুই নাই। পুরাতন জিনিসের নূতন নূতন মিশ্রণ এবং নূতন নূতন সঙ্কেত গ্রহণের দ্বারাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মানুষ বর্ত্তমানে এমন একটা অবস্থায় আসিয়াছে যে, তাহার এই বুদ্ধিবৃত্তি যে ইতর প্রাণীদের মতই সাধারণ দেহযন্ত্র ও তাহার অনুভূতি দিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহা যেন আমরা এখন আর ভাবিতেই পারি না।

কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের কল্পনার বাহাদুরীও এই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির করাচুপি মাত্র। নান্ দেখাইয়াছেন, ড্যানিয়েল ডেফো (Danial Dafœ) যে রবিন্সন ক্রুশো (Robinson Cruso) লিখিয়াছেন তাহাও একটি কাল্পনিক অবস্থার কথা ভাবিয়া লইয়া এবং তাহার পর সংশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা সম্ভাব্য অবস্থাগুলিকে পর পর গ্রথিত করিয়া সম্ভব হইয়াছে।

ইংরাজীতে যাহাকে fancy বলা হয়, তাহাও একপ্রকার কল্পনারই লীলা। তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ শক্তির দ্বারা আমরা শুধু যে সম্ভাব্য জিনিসগুলিকেই গ্রথিত করি তাহা নহে, সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জিনিসগুলিই তাহাতে পাশাপাশি গাঁথিয়া যাওয়া হয়। ফলে কঙ্কাবতীর স্বপ্নের মত অথবা Alice in wonder land-এর মত কত অদ্ভুত জিনিসই আমরা দেখি।

সিদ্ধান্তও (reason) এই আবিষ্ক্রিয়ার মতই একই প্রণালীতে করা হয়, কারণ দুইটি ক্ষেত্রেই সংশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে দুইটি নমুনা (schema) হইতে এমন একটা সম্ভাব্য নমুনা (schema) তৈয়ারী করা হয়, যাহা বাস্তববিরোধী হইবে না।

প্রাণীদিগের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হিসাবে জার্ম্মাণীর গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পণ্ডিতগণের মন্তব্যগুলি অবধারণীয়। তাঁহারা বলেন, পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলির একটা সক্রিয় দিক্ আছে। একটি আলোকচিত্রের প্লেটের উপর দৃশ্য বস্তুর ছাপটি যে ভাবে কাজ করে, আমাদের পরিবেশগুলি আমাদের উপর সে ভাবে কাজ করে না, অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া আমরা কি ভাবে করিব, তাহা পরিবেশের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে আমাদের নিজেদের উপর। সুতরাং

কোন্ আবেদনে আমরা কি ভাবে সাড়া দিব তাহা শুধু দেহযন্ত্রের খুঁটিনাটি জানা থাকিলেই বলা চলিবে না, অথবা আমাদের জন্মগত বৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় থাকিলেই বলা সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ আবেদনের প্রতিক্রিয়াগুলি শুধু যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অতীত অভিজ্ঞাজনিত যে সমস্ত নমুনার (pattern) সঞ্চয় আছে, তাহার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা খাপ খাওয়াইবার চেষ্টার উপরই আমাদের প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য নির্ভর করে।

কতকগুলি শিম্পাঞ্জী লইয়া এই ব্যাপারে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বারোটি শিম্পাঞ্জীকে একটি জায়গায় ঘিরিয়া রাখাহইয়াছিল। সেখানে কতকগুলি কলা ঝুলান ছিল। বিভিন্ন শিম্পাঞ্জী সেই কলাগুলি খাইবার জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল; কেহবা একটি লম্বা লাঠি মাটির উপর শূন্যে দাঁড় করাইয়া সেই লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই কলাটির কাছ পর্য্যন্ত লাঠি বহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কেহবা কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স সংগ্রহ করিয়া একটির উপর আর একটি বাক্স স্থাপন করিয়া কলাগুলির নাগাল পাইতে চেষ্টা করিল, আবার কেহবা একটি লাঠির দ্বারা কলাগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল এবং লাঠিটি যখন মাপে ছোট বলিয়া মনে হইল, তখন একটি লাঠির খাঁজের মধ্যে আর একটি লাঠি প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিয়া কলাগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল।

এই সব চেষ্টার মধ্যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিভিন্ন শিম্পাঞ্জীর অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্নরূপ নমুনার সহিত বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইতরপ্রাণীদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ার সহিত মানুষের চিন্তার ও যুক্তির যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তির কাঁচা মাল যে অভিজ্ঞতার নমুনার সমৃদ্ধ হইতেই আহৃত হইতেছে, গেস্টাল্ট্ মতবাদীর মনস্তাত্ত্বিকগণের এই পরীক্ষাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

চিন্তা ও সিদ্ধান্তের প্রণালী সম্বন্ধে কোনও কিছু আলোচনা করিতে হইলে অধ্যাপক স্পিয়ারম্যান (Spearman)-এর আলোচনাগুলি উল্লেখ না

করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্পিয়ারম্যান চিন্তার কাজগুলিকে তিনটি সূত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সূত্রটি হইতেছে "প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি জ্ঞানের উদ্ভব করে"—আমি যখন একটি কাল রংএর কোনও জিনিস দেখিলাম তখন 'কাল' এই গুণটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল। শুধু তাহাই নহে, এই কাল জিনিসটি একটা কর্তৃ-নিরপেক্ষ কাল রঙ্ হিসাবে আমার কাছে আসিল না। আমি যে কর্তৃপুরুষ হিসাবে কাল রঙটি দেখিতেছি এই জ্ঞানটি আমার হইল।

তাঁহার দ্বিতীয় সূত্রটি হইতেছে "এই একাধিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা যখন আমাদের মনে সঞ্চিত হয়, তখন আমরা সেই বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শুধু যে অনন্য সম্পর্কশূন্য জ্ঞানই সঞ্চয় করি তাহা নহে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটুকুও অনুভব করি।" কাল জিনিসটি দেখিবার পর যখন একটি সাদা জিনিস দেখি, তখন এই দুইটি জিনিসের জ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে মনোভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হইয়াই রহিল না, 'কাল'র "সাদা"র যে একটি বিপরীতধর্ম্মী সম্পর্ক আছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম।

তৃতীয় সূত্রটি দ্বিতীয় সূত্রের অনুপূরক। এই সূত্র অনুসারে একটি অনুভূতির জিনিস এবং তাহার সঙ্গে ঐ জিনিসটির সম্পর্কের কথা (যেমন সমধর্ম্মিতা, বিপরীতধর্ম্মিতা প্রভৃতি) বলা হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পর্কে সম্পর্কিত দ্বিতীয় জিনিসটির কথাও আমাদের মনে পড়িয়া যাইবে। যেমন 'কাল' এই কথাটি উচ্চারণ করিবার পরই আমরা তাহার বিপরীতধর্ম্মী সম্পর্কের কথা ভাবি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই 'সাদা' এই কথাটি মনে পড়িয়া যাইবে।

আমরা উপমাধর্ম্মী যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করি, তাই এই সূত্রগুলির অধিকারে পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর যে সম্পর্ক, পৃথিবীর সহিত কাহার সেই সম্পর্ক ?"—সহজেই উত্তর আসিবে "সূর্য্যের"।

জ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে অভিজ্ঞতার জ্ঞানগুলি নিষ্ক্রিয় বস্তুভারের মত আমাদের মনোমধ্যে

সঞ্চিত হইয়া থাকে না। জ্ঞানের অর্থই হইতেছে জ্ঞেয় বস্তুর উপর একটি বুদ্ধি বা শক্তির অধিকার স্থাপন করা।

নবজাত শিশুটি যখন চক্‌চকে চামচটিকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তখন চামচটি সম্বন্ধে তাহার বুদ্ধির অধিকার দেয় নাই। কিন্তু চামচ সম্বন্ধে যখন তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় হইল, তখন চামচটির উপর তাহার একটা বুদ্ধির অধিকার জন্মিয়াছিল—কারণ চামচটির অর্থ সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে।

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের এই অধিকারটি উদ্দেশ্যমূলক আত্ম-সচেতন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ইহা ব্যবহারিক ((practical), কান্ত (aesthetic), নৈতিক (ethical) প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আমাদের অনেক জ্ঞানেরই যে একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পথচারী যখন কাহারও নিকট পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে কিংবা বাড়ীর ছোট মেয়েটি যখন গৃহিণীর নিকট নূতন জিনিসের রন্ধনপ্রণালীর কৌশল জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহার জ্ঞানের উদ্দেশ্য যে ব্যবহারিক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি স্কুলের ছাত্র যখন চন্দ্রগ্রহণ বা জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহার মধ্যেও একটা ব্যবহারিক ব্যঞ্জনা আছে। এই জ্ঞানের দ্বারা সে যখন ইচ্ছা জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টি করিতে পারে না বটে, কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে যে, এই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইবে অথবা এই সময়ে জোয়ার আসিবে, তাহা হইলেও এই জ্ঞান হইতে একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যে সমস্ত গবেষণাকে একেবারে প্রয়োজননিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তপশ্চর্য্যা মাত্র বলিয়া মনে হয়, তাহারও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে ; তখন সেটা হয়ত বর্ত্তমানে পরিস্ফুট নহে, এই মাত্র।

জন ডিউঈ (John Dewey) তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতামালায় (Gifford lecture) বলিয়াছেন, জ্ঞানের অর্থ ই হইতেছে বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতাকে লইয়া এমনভাবে কাজ করা যাহাতে মানুষের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তড়িৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থই হইতেছে তড়িৎকে মানুষের কাজে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক

আলোক, পাখা, ট্রাম, বেতার প্রভৃতি সৃষ্টি করা। কোনও জিনিসের সম্বন্ধে জ্ঞান কথাটির ব্যঞ্জনাই এই যে সেই জিনিসটির উপর ব্যবহারিক প্রভুত্ব স্থাপন।

ডিউঈ বলেন, মানুষের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রতিনিয়তই যেহেতু জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বর্ষার বৃষ্টিতে পুষ্করিণীর জলসম্পদের মত শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে বর্দ্ধিতই হয় না, তাহা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিতও হইতে থাকে। নূতন সৃষ্টির শক্তি যদি জ্ঞানের অর্থ হয়, তাহা হইলে অতীতের জ্ঞান বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানের নব নব সৃষ্টির অভিযানে সাহায্য করিবার জন্যই অতীতের জ্ঞানের প্রয়োজন। অতীতকে লইয়া অথবা অতীত কৃষ্টিকে লইয়া আদিখ্যেতা করিয়া বাহাদুরী করিবার জন্য অতীতের কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং অতীত সৃষ্টিকে রক্ষা বা সযত্নে পালন না করিয়া তাহার দ্বারা জীবনের অর্থনৈতিক, ধর্ম্ম-নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে নূতন নূতন গবেষণামূলক মনোভাব সৃষ্টি করাই জ্ঞানের তথা শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ডিউঈর এই সূত্রটি সামাজিক নীতি-অনীতি, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতির বিচারের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে মনে হয় "এইটি কর্ত্তব্য" এবং "এইটি অকর্ত্তব্য" এইরূপ চিরন্তনী নীতি কিছুই থাকিতে পারে না। আমাদের প্রপিতামহগণের যাহা করণীয় ছিল, আমাদের তাহা করণীয় নাও হইতে পারে, কারণ আমাদের জগৎ তাঁহাদের জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষি-সভ্যতার যুগে যে জীবনযাত্রা প্রচলিত ছিল, এখন কলকারখানার যন্ত্রসভ্যতার যুগে তাহা নাই, সুতরাং তখন জীবনযাত্রার যাহা আদর্শ ছিল এখন তাহা থাকিতে পারে না, তখন যাহা কর্ত্তব্য ছিল এখন তাহা কর্ত্তব্য নাও থাকিতে পারে।

শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতির দিক্ দিয়াও ডিউঈর এই মতবাদ আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্ত্তনের দাবী করে। অতীতের ভাবধারাকে, অতীতের কৃষ্টিকে রক্ষা করিবার উপদেশ আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু ডিউঈ বলিবেন, অতীতের কৃষ্টির দিকে চাহিয়া না থাকিয়া বর্ত্তমানের ছাত্রছাত্রীদিগকে পরিবর্ত্তনশীল

বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে শিখাইতে হইবে এবং বর্ত্তমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক, ধর্ম্মনৈতিক প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রশ্নের সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক মনোভাব তৈয়ারী করিতে হইবে।

জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি ছাড়িয়া এইবার তাহার কান্ত (aesthetic) দিকটির আলোচনায় আসা যাক। যাহাকে আমরা শিল্প বা ললিতকলা বলি তাহারও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। তবে খাঁটি শিল্পী মনোবৃত্তি যাঁহাদের তাঁহারা দৈনন্দিন প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবেই তাঁহাদের সুন্দরের সাধনা করেন। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অনেকটা প্রয়োজন-নিরপেক্ষ। তবে খাঁটি কান্ত জিনিসের সাধনা হাট-বাজারের প্রতিদিনের চাহিদার অপেক্ষা রাখে না, নিত্য যাহা ঘটে সেই তুচ্ছ 'সত্যে'রও অপেক্ষা রাখে না। আমরা যে সংশ্লেষণী-বিশ্লেষণী শক্তির কথা বলিয়াছি তাহারই সাহায্যে বাস্তব জগতে যাহা সচরাচর ঘটে না এমন সমস্ত সম্ভাব্য সত্যের সৃষ্টিই শিল্পীরা করিয়া থাকেন। জগতের ব্যর্থতা অসম্পূর্ণতাকে তাঁহারা কল্পনার আদর্শ দিয়া সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন, জগতের তুচ্ছতার উপর তাঁহারা চাহেন—

"To add the gleam
The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream".

ইহারই ফলে তাঁহাদের কল্পনার সৃষ্টিগুলি বাস্তব সৃষ্টির চেয়েও বাস্তবতর হয় এবং কল্পনায় আদর্শ সত্যের চেয়েও সত্যতর হয়। এই জন্যই কাব্যকলার সহিত নৈতিক সত্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং কবির সত্য ও সুন্দর নীতি শিবের সহিত সম্মিলিত হয়। ভবভূতি বলিয়াছেন—

"লৌকিকানাং হিনা ধুনামর্থং বাগানুবর্ত্ততে।
ঋষিনাং পুনরাদ্যানাম্ বাচমর্থোঽনুধাবতি॥"

লোকপ্রসিদ্ধ সাধু ব্যক্তিরা সত্যকে অনুবর্ত্তন করিয়া কথা বলেন, কিন্তু আদি ঋষিরা যাহা বলেন, সত্যই তাহার অনুবর্ত্তন করে। অর্থাৎ সাধারণ ভদ্রলোকরা সাবধানে কথা বলেন যাহাতে মিথ্যা বলিতে না হয়, কিন্তু মহাপুরুষেরা যে ভাবেই কথা বলুন না কেন, তাহা সত্য হইবেই, তাঁহাদের

বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয় সেইজন্য সত্য নিজের গরজে তাঁহার বাক্যের সত্যতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবে।

ভবভূতির এই উক্তিটী প্রাচীনপন্থী ধর্ম্মান্ধ কবির গোঁড়ামির কথামাত্র নহে, ইহার মধ্যে একটি কান্ত ব্যঞ্জনা আছে। যে সমস্ত কবি বা মহাপুরুষের পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি আছে তাঁহারা এমন একটা অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি পান যে, যাহার জন্য সাধারণ লোকের সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যাহা ভাবিতে পারে না, তাঁহারা সেই সব জিনিসের সন্ধান পান। এই জন্যই কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—

"There are few
Whom God whispers in the ear
The rest may reason, and welcome
It's we musicians know"—

এই মহাপুরুষরাই বাক্‌সিদ্ধ, এইজন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
যা ঘটে তা সব সত্য নহে।"

কবির রামচন্দ্র, সীতা প্রভৃতি কোনও দিন বাস্তব সত্য ছিলেন কিনা জানি না; আমাদের মত বাস্তব সত্যের ক্ষুদ্র জন্তুরা জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু তাঁহারা এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং যুগ যুগ ধরিয়া ভারত মহাদেশের কোটি কোটি নরনারীর জীবনযাত্রাকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতের বাণীই হইতেছে রামায়ণ ও মহাভারতের বাণী। এই বাণীর সাধক-মহাকবিরা তথাকথিত বাস্তবের অপেক্ষা রাখেন না। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলিও এই তুচ্ছ বাস্তবের দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া যায়, অথচ প্রয়োজনের দিক দিয়াও উভয়েই হইতেছে পরিণাম-রমণীয়, এবং উভয়েই হয়ত ভাত-কাপড় তেল-নুন-লকড়ির চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়।

মানুষের নৈতিক চিন্তাও ব্যবহারিক এবং কান্ত চন্তার মতই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তিকে মূলধন করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের নৈতিক শাস্ত্র স্বার্থপর গোঁড়া পুরোহিতগণের ছলনায় সৃষ্ট উপর-হইতে চাপান একটা

বিধিনিষেধের বন্ধন মাত্র নহে। নীতিজ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনের একটা অনিবার্য্য পরিণতি। কি ভাবে এই পরিণতিটি সম্ভব হয়, তাহা একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

আমাদের মধ্যে যে সঞ্চয়ী বৃত্তিটি আছে, তাহার প্রেরণায় হয়ত অপরের জিনিস চুরি করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সমাজ-জীবনে পাঁচজনের সঙ্গে বাস করিয়া এই বৃত্তির প্রেরণায় প্রতিদিন চুরি করিয়া যাওয়া সুবিধার ব্যাপার হইবে না। কারণ আমি একাই যদি চালাক হই এবং অপরের চুরি করি তাহা হইলে মন্দ হয় না, কিন্তু সকলেই যদি এইরূপ চালাক হয় এবং সকলে মিলিয়া আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এইভাবে একদিন যখন আমরা চুরি করার অসুবিধা অনুভব করিয়াছি তখনই ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। নীতিজ্ঞান আমাদের বলে, চুরি করার চেয়ে চুরি না করাই সুবিধার ব্যাপার, অতএব চুরি করিও না। এইভাবেই আমরা শিখিয়াছি মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল, ব্যভিচারের চেয়ে সাধুতা ভাল, উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে সংযম ভাল। এইভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাই স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে আমাদের মধ্যে নীতিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নীতিজ্ঞানই আমাদের পশুত্বের মুখে লাগাম পরাইয়া আমাদের অসামাজিক কামনা বাসনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কাজেই এই নীতি-জ্ঞানটি তুচ্ছ করিবার জিনিস নহে। এইজন্যই আমাদের নিজের সৃষ্ট বন্ধন হইলেও নীতির বন্ধনকে আমাদের মহাপুরুষেরা সর্ব্বনির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সমাজের বিধিনিষেধের বেদীতে নিজেদের বলি দিয়া থাকেন, "ইউটিলিটী"র বিচারে অথবা ব্যক্তিগত দাবীর যুক্তিতে সমাজ-আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেন না। নিজের লালসাকে তৃপ্ত করিবার জন্য যাহারা এই আদর্শের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য ওকালতি করিয়া "সবার উপরে মানুষ সত্য" (অর্থাৎ বিধিনিষেধ নহে) এই কবি-বাক্যের অপপ্রয়োগ করিয়া একটা গালভরা স্লোগান্ তুলিতে থাকে তাহাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

চরিত্রের পথে

জাতক একটা জটিল দেহযন্ত্র এবং কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া এই "দৃশ্য গন্ধ গানে" ভরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পরে ধীরে ধীরে জগতের সহিত তাহার কারবার আরম্ভ হয়। জগতের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে তাহার চরিত্রেরও বিকাশ আরম্ভ হয়।

মানুষের চরিত্র বলিতে আমরা মোটামুটি যাহা বুঝি তাহার স্বরূপ কি? ইহা কি দেহ-নিরপেক্ষ কতকগুলি মানসিক গুণের পুঁটুলি মাত্র? অতীতের মনস্তাত্ত্বিকেরা তাহাই মনে করিতেন। বর্ত্তমান জড়বাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা, বিশেষভাবে আচরণবাদীরা আবার মন, আত্মা প্রভৃতি দেহ-নিরপেক্ষ কোনও সূক্ষ্ম জিনিসের অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং আমাদের সমস্ত ব্যবহারকেই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কি? ইহাকে বুঝিতে হইলে প্রথমে **সরল প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া** (Simple reflex) কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠা, হঠাৎ একটা আলোক-রশ্মি দেখিয়া চোখের পাতা মুদিয়া ফেলা, এই জাতীয় জিনিসগুলি হইতেছে সরল প্রতিবর্ত্তক ক্রিয়া।

যখন এই জাতীয় একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার সঙ্গে একই সময়ে অথবা ঠিক পর পর ঘটে তখন সেই দুইটির অভিজ্ঞতা একত্র জড়াইয়া যায়, ফলে ইহাদের একটি অনুষ্ঠিত হইলে আর একটি আপনা আপনিই অনুষ্ঠিত হইবে। প্যাব্‌ল সাহেবের কুকুর ও ঘণ্টাধ্বনির-পরীক্ষাটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সর্ব্বজন-প্রচলিত উদাহরণ। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস ধরা হইল, ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার জিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ। এইবার কুকুরটিকে প্রতিবার মাংসখণ্ড দিবার সময় যদি একটি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তাহা হইলে এই দুইটি জিনিস তাহার মনের মধ্যে জুড়িয়া যাইবে। পরে শুধু ঘণ্টাধ্বনি করিলেই তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইবে। এক্ষেত্রে মাংস দর্শনের

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লালা-নিঃসরণ কৃত্রিম উপায়ে সংঘটিত হইল বলিয়া ইহার নাম কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া। প্যাভ্‌লভ্‌ বলেন, আমাদের যাহা কিছু শিক্ষা, যাহা কিছু আচরণ, সমস্তই হইতেছে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র।

এইভাবে আচরণবাদী পণ্ডিতগণ আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্মকেই আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের একটা যান্ত্রিক আচরণ মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই আচরণটি আবার পুনরাবৃত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চরিত্রের একটা স্থায়ী বিশেষত্ব রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে।

যে জিনিসটি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি তাহা হইতেছে প্রবৃত্তি বা বৃত্তি। পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস না করিলেও, এই বৃত্তিগুলিকে আমরা জাতির অতীত জীবনের অভ্যাসের সহজাত ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং এইভাবে বিচার করিলে বৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই। দুইটিই যান্ত্রিক ব্যাপার—প্রথমটি হইতেছে সহজাত এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জ্জিত।

জড়বাদী পণ্ডিতেরা এই অভ্যাস জিনিসটারও একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, একই ধরণের অবস্থায় একই ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তিই হইতেছে অভ্যাস। তাঁহাদের মতে যখন আমরা একটি বিশিষ্ট কাজ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের উপর একটা বিশিষ্ট রকম ছাপ পড়িয়া যায়। দ্বিতীয় বারে সেই কাজ করিবার সময় সেই ছাপটির উপর আবার একটা আঁচড় পড়িয়া দাগা বুলাইবার মত কাজ হয়, ক্রমশঃ যেন সেই আঁচড়ের ছাপটি দাগা বুলাইবার ফলে গভীর খাত কাটিয়া ফেলে। অভ্যাসের দ্বারা একটি কাজ যে সহজসাধ্য হইয়া উঠে, তাহার কারণ হইতেছে দাগা বুলান খাঁজ-কাটা পথে স্নায়ুপ্রবাহের গমন-সৌকর্য্যের জন্য।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একই কাজ একই ভাবে আবৃত্তি করিবার প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এ প্রেরণা আসে দক্ষতা অর্জ্জন এবং তাহার ফলে আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি হইতে। একটি কাজ প্রথমবার করিলাম, ভাল হইল না, আবার করিলাম, একটু ভাল হইল, আবার করিলাম, এবারে ঠিক হইল। এই যে কৃতকার্য্যতার আনন্দ, এই যে আত্মবিস্তারের আনন্দ, এই যে

নিজেকে "বা রে আমি" বলিয়া বাহাদুরী দিবার আনন্দ, এই আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি প্রেরণা জাগায়।

আমরা জানি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মনে কতকগুলি ছাপ (engram) রাখিয়া যায়। এই ছাপগুলি অনেক সময় আবার পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহত্তর একক বা ছাপজট (engram complex) সৃষ্ট করে। এইভাবে অতীতের অভিজ্ঞতার স্মৃতিগুলি ভবিষ্যতের কর্ম্মপ্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার কষ লাগিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলির প্রাথমিক সঙ্কেত (primary meaning) নূতন ব্যঞ্জনা (secondary meaning) লাভ করে। দীপ-শিখা যখন শিশু প্রথম দেখিল, তখন সে ইহাকে একটি উজ্জ্বল সুন্দর খেলিবার জিনিস বলিয়াই হয়ত ভাবিল। কিন্তু ইহাকে লইয়া খেলা করিতে যাইয়া যখন তাহার হাত পুড়িল, তখন দীপ-শিখা সম্বন্ধে সে নূতন ব্যঞ্জনার সঙ্কেত পাইল, ফলে দীপ-শিখাটি এখন আর তাহার নিকট খেলার বস্তুই নহে—ভয়ের বস্তুও বটে। এই ভাবেই অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের আচরণকে ক্রমশঃ বাঁধাবাঁধি করিয়া দিতে থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া, কতকগুলি "ভাল-লাগা" "মন্দ লাগা" এক হইয়া আমাদের মনে আর একটি বৃহত্তর একক সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম দিয়াছেন sentiment. বাংলার কোন কোনও লেখক "সংস্কার" কথাটি এই sentiment-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ঠিক প্রতিশব্দ হয়ত বাংলায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় ইহাকে 'রস' বলা হইয়াছে। রসবোধ, স্বভাব, সংস্কার, ভাব-নিষ্ঠা প্রভৃতি নানা শব্দ দিয়াই আমরা হাল্কাভাবে এই কথাটিকে প্রকাশ করিয়া থাকি। পরিভাষা যাহাই হউক, এই sentiment-এর ফলে আমাদের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, উৎসাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম-প্রেরণা প্রভৃতি একটি বিশিষ্ট ধারায় চলিতে থাকে। গান-বাজনা লইয়া যাহার sentiment তৈয়ারী হইয়াছে, সে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত উদাসীন; ছেলেপুলে পড়াশুনা করিতেছে না, সেদিকে হয়ত তাহার খেয়াল নাই, রুগ্না স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য হয়ত খেয়াল নাই, নিজের খাওয়া-দাওয়া

ভাল হইতেছে না, সে বিষয়েও হয়ত তাহার খেয়াল নাই, কিন্তু গানের খুঁত সে সহ্য করিতে পারে না ; যে ব্যক্তি গান ভাল গাহিতে পারে তাহাকে সে ভালবাসে, যে তাহার চেয়ে গানে বেশী ওস্তাদ, তাহাকে সে শ্রদ্ধা করে, যে তালে ভুল করে তাহার মাথায় তানপুরা আছাড় মারিয়া আঘাত করিতে চায়, যে সুর চিনিতে পারে না, সে অন্য বিষয়ে যত বড় বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহাকে সে নির্ব্বোধ বলিয়াই মনে করে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে দেখা যায়, বিদূষককে যখন বসন্ত-বর্ণনা করিতে বলা হইল, তখন সে বসন্তের সাদা ফুলগুলিকে একবার কল্‌মা ধানের ভাতের সঙ্গে, আর একবার মহিষের দুধের সঙ্গে তুলনা করিল। তাহার এইরূপ উপমা সংগ্রহের কারণ হইতেছে, সে ছিল ভোজন-রসিক, ভোজন সম্বন্ধেই তাহার sentiment তৈয়ারী হইয়াছে। কাজেই সব জিনিসকে সে ভোজনের উপকরণ দিয়াই বুঝিতে ও বুঝাইতে চায়। এই জাতীয় লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কেমন সিনেমা দেখলে?' সে হয়ত তাহাতে উত্তর দিবে "অখাদ্য"! একটি গোলগাল সৌম্যদর্শন ছেলেকে দেখাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "ছেলেটিকে কেমন দেখতে লাগে?" সে হয়ত উত্তর করিবে "বেশ আলুভাতের মত!"

এখন ইহা বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না যে, ঐ গায়কটি জন্ম হইতেই গায়ক ছিল না এবং বিদূষকটি জন্ম হইতেই ভোজন-রসিক ছিল না। তবে জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিজ্ঞতাগুলি তাহার আগ্রহ ও আবেগকে যে বিশেষ বিশেষ খাতে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহার ক্রিয়াকলাপগুলি একটি বিশেষ রকম ভঙ্গী লাভ করিতে থাকে। তাহার ফলে ক্রমশঃ সে একটি বিশিষ্ট জিনিসকে ভালবাসিতে অথবা বিশিষ্ট জিনিসকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, একটি বিশিষ্ট পরিবেশে তাহার অভিনিবেশ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে, একটি বিশিষ্ট প্রেরণায় একটি বিশিষ্ট ভাবেই তাহার প্রতিক্রিয়া রূপ নিতে থাকে। এই ভাবেই বিশেষ বিশেষ ভাবে তাহার sentiment তৈয়ারী হইতে থাকে। এই sentimentএর ফলেই দেখিতে পাওয়া যায় সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে আসিলে একজন যুবক হয়ত সিনেমার খবরটা প্রথম দেখিবে, আর একজন হয়ত খেলার খবরটিতে আগে চোখ

বুলাইয়া লইবে, একজন হয়ত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পড়িতে আরম্ভ করিবে, আর একজন হয়ত আদালতের কাহিনীতে মনোনিবেশ করিবে।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে সংযোগ-প্রয়াস (cohesion) বলে, তাহার ফলেই এক অভিজ্ঞতার ছাপ আর একটি অভিজ্ঞতার ছাপের সহিত জড়াইয়া যায়, যাহার ফলে এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ছাপজটগুলি দানা বাঁধিতে-বাঁধিতে বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে এবং আমাদের এক-একটা বিষয়ে রস বা সংস্কার (sentiment) সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংযোগ-প্রয়াসের কাজ এখানেই শেষ হয় না। বিভিন্ন ছাপজট্ যেমন একত্র হইয়া রসকে সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিভিন্ন রস আবার একত্র হইয়া আর একটি বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে। এইভাবে মানুষের মনোরাজ্যে বহু লইয়া একের এবং একের মধ্যে বহুর লীলা চলিতে থাকে। যাহাকে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব (double personality) বলে, সেই রকম অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই মনোরাজ্যে এই বহু এককের সংঘাত সাধারণতঃ হয় না; ফলে একই লোকের একাধিক বিষযে রস থাকিতে পারে, অথবা এক জাতীয় রসবিশিষ্ট লোক অন্য জাতীয় রসবিশিষ্ট লোককে ভালবাসিতেও পারে। যাহার গান সম্বন্ধে রস গড়িয়া উঠিয়াছে, সে গায়ককে শ্রদ্ধা করিবে আর স্বরজ্ঞানবিহীন লোককে ঘৃণা করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, একজন গায়ক হয়ত একজন স্বরজ্ঞানহীন গণিতজ্ঞকে শ্রদ্ধা করে, একজন ঝানু গণিতজ্ঞ হয়ত একজন কবিকে ভালবাসে ইত্যাদি। ইহার কারণ হইতেছে, রসের বিভিন্ন এককগুলি একটি বৃহত্তর এককের অংশীভূত হইয়া কাজ করে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। এই বৃহত্তর এককটিকে অধিরাজ রস (master sentiment) বলা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অধিরাজ রসটি কি? কি করিয়াইবা তাহার সৃষ্টি হয়? মানুষের মধ্যে যে আমিত্ববোধ আছে তাহাই বিভিন্ন রসকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে একটি বৃহৎ এককের মধ্যে অঙ্গীভূত করে।

কিন্তু প্রশ্নের সমাধান এখনও হইল না। এই আমিত্ববোধটিইবা জাগ্রত

হয় কি করিয়া? এই আমিত্বই বা কি বস্তু? ইহা কি আমাদের অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র? অথবা অভিজ্ঞতাগুলির অনুভবকারী একটি কর্তৃপুরুষ? অথবা একটি দুর্জ্ঞেয় অব্যক্ত অচিন্ত্যনীয় আত্মার সত্বা মাত্র? এই ব্যাপারটি লইয়া মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বহু বিতণ্ডা আছে। তবে শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় সে বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি একটি কর্তৃপুরুষের কর্তৃত্ব ছাড়া হইতে পারে না। তাহা হইলে "আমি" জিনিসটি কি অভিজ্ঞতার অনুভবকারী ব্যক্তি মাত্র? কিন্তু এই ব্যক্তিটি কি করিয়া বুঝিতে পারে যে, সে সেই অভিজ্ঞতাকে অনুভব করিতেছে। শিশু বা ইতরপ্রাণীদের মধ্যে এই আমিত্ব-বোধটি নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট নয়। তাহারা যখন দুঃখ পায়, তখন তাহাদের সমস্ত সত্বাটিই দুঃখময় হইয়া পড়ে, সুখের সময়ও তাই।

অশিক্ষিত বা অর্দ্ধসভ্য মানুষদের মধ্যেও এই 'আমিত্ব'বোধটি সব সময় সুস্পষ্ট নহে। একজন সাঁওতালীর নাম হয়ত সুকদেও। তাহাকে হয়ত জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তুমি এ কাজ' করেছ? সে তখন হয়ত উত্তরে বলিবে "না সুকদেও এটা করে নি।" "আমি হয়ত এ কাজ করিনি" এইভাবে উত্তম-পুরুষে কথা কহিবার অভ্যাস তাহার তৈয়ারী হয় নাই; কারণ "আমি" জ্ঞানটাই তাহার দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

তাহা হইলে এই "আমি" জ্ঞানটি ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? এই বিষয়ে দেহের দান অনেকখানি। এই দেহ দিয়াই শিশু অনুভব করে তাহার সুখ-দুঃখ, এই দেহ দিয়াই সে কাজ-কর্ম্ম করে, এই দেহের হস্তপদাদি যন্ত্রগুলি তাহার কথা শুনে এবং তাহার হুকুম তামিল করে। কিন্তু দেহের বাহিরের জিনিসগুলি এভাবে তাহার হুকুম তামিল করে না। তখন সে ভাবে যাহারা হুকুম তামিল করিল না, তাহারা হয়ত রাগ বা অভিমান করিয়াছে। তখন সে হয়ত তাহাকে তোষামোদ করে, তাহাতেও যখন কাজ হয় না, সে আড়ি দেয়, অথবা দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝে এই জড় বস্তুগুলি তাহার হুকুম বুঝিতে পারে না। জড় জিনিসকে জড় বলিয়া অনুভব করিতেও তাহার যথেষ্ট সময় লাগে; তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন শিশু হাঁটিতে হাঁটিতে

পড়িয়া গিয়া আছাড় খায়, তখন সে মনে করে, উঠানটিই তাহাকে ফেলিয়া দিল। তখন কেহ যদি উঠানকে মারে বা তিরস্কার করে, তখন সে খুশী হয়।

জড় বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা এবং দেহযন্ত্রের সক্রিয়তা—এই দুইটি জিনিসের পার্থক্যের মধ্য দিয়া শিশুর কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই তাহার "আমি" বোধটি বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইহার পূর্ণ বিকাশের জন্য একটা সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। এই সমাজের মধ্যেই সে দেখে কতকগুলি সক্রিয় সত্ত্বার অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহারা ঘোরা-ফেরা করে, হাসে-কাঁদে, কথাবার্ত্তা বলে, কেহ হয়ত তাহার সহিত বন্ধুতা করে, কেহবা শত্রুতাও করে। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়াই সে বুঝিতে পারে যে, ইহারাও এক-একটা 'আমি' এবং সেও একটা 'আমি'। এই সামাজিক পরিবেশ তাহার 'আমি'টিকে বিকশিত করিবার জন্য অন্য ভাবেও সাহায্য করে। সমাজ-মধ্যস্থ বিভিন্ন লোকের ক্রিয়াকলাপের সে অনুকরণ করে, অপরের চরিত্রের ভূমিকা নিজে অভিনয় করিতে চেষ্টা করে। যাহাদের সে বেশী খাতির করে বা ভালবাসে, তাহাদের ভূমিকাটির অভিনয়ই সে বিশেষভাবে করে। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সে বিভিন্ন লোকের আকার-ইঙ্গিত, ঘৃণা-বিদ্বেষ-প্রেমজনিত মুখাবয়বের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করে এবং আশপাশের লোকের ব্যবহারের দ্বারা তাহার নিজের কাজ-কর্ম্মের মূল্যও নিরূপণ করিতে শিখে।

এইভাবে অপরের স্তুতি-নিন্দাকে সে একটা বিশেষ রকম মূল্য দেয় বলিয়াই অপরের আচরণ তাহার প্রতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। তাহাকে যদি প্রতিনিয়তই বলা হয়, সে ভারী দুষ্ট ছেলে; তাহা হইলে সে বুঝিয়া লইবে যে, দুষ্টামিটি তাহার চরিত্রের একটা অখণ্ডনীয় বিশেষত্ব। আবার যদি তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে মহামানী দুর্য্যোধন হইয়া উঠিয়া আত্মম্ভরি স্বার্থপরতা লইয়া ভাবিতে শিখিবে দুনিয়ার আদর যত্নের একচেটিয়া অধিকার শুধু তাহারই আছে।

শিশু সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আচরণগুলিকে দেখে এবং তাহাদের কোনটির সহিত বা একাত্মতা অনুভব করে এবং

কোনটির সহিত তাহা করে না। এই ভাবে তাহার নিজের "**আমি**"টি যে কি জিনিস তাহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। ভদ্রপরিবারের একটি শিশু হয়ত পথচারী একজনের মাত্লামী লক্ষ্য করিল এবং তাহাতে কৌতুকও বোধ করিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই সে ঠিক করিয়া লইয়াছে, তাহার "আমি"টির সহিত এই মাতালের মাত্লামির একাত্মতা নাই, সুতরাং অনুকরণীয় নহে।

এই 'আমি'টি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে হইতেই তাহার **নীতিবোধ** জাগিতে আরম্ভ করে। এই নীতিবোধের জন্য মানুষ একটি কাজকে ঘৃণা করিতে শিখে, অন্য কাজকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে এবং এইজন্যই সে বুঝিতে পারে যে, এই কাজটা করা উচিত এবং ওই কাজটা করা উচিত নয়; অবশ্য করা-না-করা স্বতন্ত্র কথা। যে সমাজ-পরিবেশ শিশুর 'আমিত্ববোধ'টাকে জাগাইয়া তুলে, তাহাই তাঁহার নীতিবোধ সৃষ্টি করে। এইজন্যই নীতি-বোধের কোনও সার্ব্বজনীন আদর্শ নাই। সমাজ-পরিবেশের বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে যাহাদের সে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তাহাদের আচরণ দেখিয়াই শিশু তাহার নীতি ও আদর্শ ঠিক করিয়া লয়। সে হয়ত একজন সত্যবাদী ব্যক্তিকে ভালবাসে। পরে সে এই লোকটির গুণটাকে অর্থাৎ সত্যবাদিতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে ক্রমশঃ ব্যক্তিনিরপেক্ষ গুণ-দোষগুলি তাহার আদর্শকে তৈয়ার করে। এই আদর্শের যেমন একটা ব্যক্তিগত দিক আছে, তেমনই গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত রূপও আছে। এইজন্য জাতি হিসাবে কেহ সাহসী, কেহ হয়ত প্রভুভক্ত, কেহ লোভী, কেহবা নিরীহ ও ভদ্র।

শিশুর নীতিবোধের উপর পরিবেশের একটা প্রভাব আছে বলিয়াই তাহাকে মানুষ করিতে হইলে তাহার আশেপাশের একটা শুচিশুভ্র আদর্শ সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন। যে সমাজে চুরি, জুয়াচুরি, কালোবাজার, মিথ্যাচার প্রভৃতি অবাধে পরিক্রমণ করিতেছে, সে সমাজে ভাল ছেলে তৈয়ারী হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। বর্ত্তমান সময়ে যে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি-পরায়ণতা, উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-পরিবেশ অনেকটা দায়ী। পূর্ব্বকালে ছাত্রদের মানুষ করিবার জন্য যে তপোবনে গুরুগৃহে আদর্শচরিত্রের অধ্যাপকদের সহিত অবস্থানের ব্যবস্থা

ছিল এবং বর্ত্তমান কালে যে সহরের কোলাহল ও কপটাচার হইতে দূরে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential university) প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, ইহা এক হিসাবে খুব ভাল। এই ব্যবস্থার ও বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সমাজ-ব্যাধির বীজের সংক্রমণ হইতে বালকেরা খানিকটা রক্ষা পায়। এইভাবে সুরক্ষিত হইয়া অহরহঃ আদর্শ মানুষের কাছাকাছি থাকিয়া তাহাদের রস বা সংস্কারগুলি (sentiments) ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া তাহার চরিত্রকে এমন একটা দৃঢ়তা ও পূর্ণতা দান করে যে, পড়াশুনা শেষ করিয়া যখন সে সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন আর তাহার ভয় থাকে না; তখন তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে—তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে অতীতের তপোবনের গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমানের আবাসিক বিদ্যালয় প্রভৃতির একটা পার্থক্যের কথা বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান কালের আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রভৃতিতে একটা বিলাসিতার প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই বিলাসের প্রতিযোগিতা করিতে করিতে ছাত্ররা ক্রমশঃ স্বার্থপর, ভোগপরায়ণ ও আত্মাভিমানী হইয়া উঠে। যে-সব ছেলেরা গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক ভাইবোনের সঙ্গে, বহু পরিজনের সঙ্গে মানুষ হয়, তাহারা যেমন দরিদ্রের সংসারে মানাইয়া চলিতে পারে, পরের জন্য খানিকটা ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে পারে, ইহারা সেরূপ পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও মঠ প্রভৃতি পরিচালিত অনেক ছাত্রাবাস, বিশেষভাবে ছাত্রী-আবাস প্রভৃতিতে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা বাধ্যতামূলক সংযমের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ইহাতেও রোগের প্রতিকার হয় না। কারণ সংযম জিনিসটা উপর হইতে জোর করিয়া চাপাইলে অতৃপ্ত কামনাজনিত গূঢ়ৈষা বা complexএর সৃষ্টি হয়, অথবা গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে—"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরণ"—সেই জাতীয় ভণ্ডদলের সৃষ্টি হয়। তবে নীতিবোধ জাগাইবার উপায় কি?

শিশুর চরিত্র-গঠনে পরিবেশের প্রভাবের কথা ইতোপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিবেশের এই অনতিক্রম্য প্রভাব আছে বলিয়াই সুস্থ ও সবল চরিত্র গঠন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় সমাজ-জীবন

হইতে আদর্শচরিত্রের সন্ধান পাওয়া, সেই সমস্ত আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং নিজের 'আমি'টির সহিত সেই আদর্শের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত করা। ছাত্রদের বাল্য ও কৈশোর যুগে তাহাদের চোখের সমুখে ভাল আদর্শ না থাকিলে তাহারা সিনেমার তারকা, খেলার মাঠের জনপ্রিয় খেলোয়াড় প্রভৃতি স্থূলভ আদর্শকেই বাছিয়া লইয়া তাহাদের বিচিত্র সম্ভাবনাকে নষ্ট করে।

যাহাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় personality, অস্মিতা বা **চরিত্র** বলে, তাহা সৃষ্টি করাই হইতেছে শিক্ষার চরমতম উদ্দেশ্য। এই চরিত্রটি কি জিনিস? চরিত্র হইতেছে কাজে-কর্ম্মে, আদর্শে, নীতিবোধে 'আমি' সম্বন্ধে একটা সংহত ধারণার সৃষ্টি। এই সংহত আমিত্ববোধটি সৃষ্টি হইলে, মানুষ কোনটি গ্রাহ্য আর কোনটি ত্যাজ্য তাহা ঠিক করিতে পারে। বিশিষ্ট সংস্কার (sentiment) ও আদর্শের সহিত নিজের 'আমি'র অচ্ছেদ্য একাত্মতা স্থাপন করাই হইতেছে চরিত্রের লক্ষণ। যাহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংস্কারগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বল চরিত্রের লোকের মধ্যে এই জিনিসটি দৃষ্ট হয় না। তাই সে কর্ণধারহীন তরণীর মত ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলে, ফলে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যে, লোকটী লোভের ক্ষেত্রে সংযত হইয়া চলিতে পারিবে কিনা, চুরি করিবে কিনা ইত্যাদি।

অবশ্য এই চরিত্রের সবটুকুই মানসিক অনুশীলনের ফল নহে। ইহার মধ্যে মন ছাড়া একটা দেহের লীলাও আছে এবং কে যে কিরূপ চরিত্রের লোক হইবে, তাহা তাহার শরীর ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা ঠিক হইয়া যায়। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের শরীরের মধ্যে চার জাতীয় রস (humours) ক্ষরিত হয় এবং তাহার প্রভাবেই মানুষ ক্রোধশীল (choleric), জড় প্রকৃতির (phlegmatic), বিষাদশীল (melancholic) এবং আশাবাদী (sanguine) প্রকৃতির হয়। বর্ত্তমান শরীরতত্ত্বও এই জাতীয় মতবাদে খানিকটা বিশ্বাস করে। এ কথা বর্ত্তমানে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শরীরের মধ্যে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া, পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের মনোরাজ্যের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে এবং এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক

হইয়া যায়। ইহা ছাড়া থাইরয়েড (thyroid), এ্যাড্রিনাল (Adrenal), পিটুইটারি (pituitury) প্রভৃতি অচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির (ductless glands) কার্য্যও আমাদের চরিত্রকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। থাইরয়েডের কার্য্য ঠিক মত না হইলে শিশু জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, আবার ইহা বেশী ভাবে ক্রিয়াশীল হইলে সে অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে, পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ ভাল না হইলে শিশু অকর্ম্মণ্য, মোটা ও কাঁদুনে ইত্যাদি হয়। সুতরাং দেহতত্ত্বের বিচারে মনে হয় আমাদের জন্ম হইতেই আমাদের চরিত্র আমাদের পিতৃ-পুরুষাগত দেহযন্ত্রের বিশেষত্বের উপরই অনেকটা নির্ভর করে।

তাহা হইলে কি এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত দেহগত বিশেষত্ব লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় এবং অপ্রতিবিধেয় ভাবেই আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবে ? দেহবাদীরা বলেন, "হাঁ, প্রায় তাই, তবে উপযুক্ত ঔষধ, চিকিৎসা ও খাদ্য-ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে খানিকটা পরিবর্ত্তন করিতে পারি।"

যে সমস্ত পণ্ডিতগণ নিছক দেহবাদে বিশ্বাস করেন না এবং দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বে যাঁহারা আস্থাবান্ তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই অনুশীলনের দ্বারা উচ্চ কোটির চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারে। এই অনুশীলনটুকু না থাকিলেই জাতক তাহার জন্মগত বৈশিষ্ট্যের পথেই চলিতে থাকিবে ; কিন্তু যথাযথ অনুশীলন থাকিলে সে জন্মগত তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ মহৎ ও চরিত্রবান হইয়া উঠিতে পারে। মনস্তত্ত্বের পুস্তক না হইলেও, ভগবদ্-গীতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। অর্জ্জুন যখন মনের সংযমকে "বায়োরিব সুদুষ্করম্" বলিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মন যে দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে "অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" ৩৫।৬

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, পিতৃ-পুরুষাগত দেহযন্ত্রের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া, কোনও কোনও মানুষ যে চরিত্রবান্ হইয়া উঠে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয় ? নীতি-শাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্বের আলোচনায় এই প্রশ্নটি হইতেছে একটি জটিলতম প্রশ্ন। প্রকৃতিপরিপুষ্ট সহজাত প্রবৃত্তিগুলি খুবই শক্তিশালিনী, কিন্তু শক্তিমত্তর কে ?

নীতিবোধ না প্রবৃত্তি? সহজাত প্রবৃত্তি যখন আমাদের কোনও কোনও কার্য্যে প্ররোচিত করে, তখন নীতিবোধের ক্ষীণ প্রতিবাদ তো প্রায়ই ভাসিয়া যায়। তাহা হইলে কোন কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি যে মাঝে মাঝে নীতির পথে চলিতে সমর্থ নয়, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? জেম্‌স্ (W. James) ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিছক নীতিবোধ প্রবৃত্তি হইতে দুর্ব্বলতর। কিন্তু, নিছক নীতিবোধ + E প্রবৃত্তি হইতে প্রবলতর।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই Eটি কি জিনিস? ইহা কি দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তি, না অন্য কিছু? কিন্তু "বাইওলজি" (যাহার সহিত বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব অনেকখানি সম্পর্কিত) এই দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তিকে মানিতে চাহে না। তাহা হইলে ইহাকে বুঝিব কিরূপে? ইহাকে বুঝিতে হইলে ম্যাক্‌ডুগল্ সাহেবের রস বা সংস্কার (Sentiment) প্রভৃতির ব্যাখ্যাটি অনেকখানি কার্য্যকরী হইবে। যে সমস্ত সংস্কার লইয়া আমার আমিত্ববোধটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই আমিত্ববোধটিই সক্রিয় হইয়া আমাদের এমন একটি শক্তি দান করে যে, তাহার বলে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অনীতিমূলক দাবীকে দাবাইয়া নীতির পথে চলিতে সমর্থ হই। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, যাহাকে ইচ্ছাশক্তি বলা হইতেছে তাহা আমিত্ববোধ জিনিসটির সক্রিয় অভিব্যক্তি মাত্র। ইহা আমাদের প্রবৃত্তি, আবেগ, সংস্কার, আমিত্ববোধ প্রভৃতির ক্রমিক পরিণতির পরিপক্ক সুসম্পূর্ণ ফল মাত্র। মনের অন্তর্দ্বন্দ্ববিহীন সুসংহত চরিত্রের ক্রিয়মান অবস্থাটিই হইতেছে তথাকথিত ইচ্ছাশক্তি। আমার "আমি" বলিতে যতখানি বুঝায়, তাহাই আমার ইচ্ছাশক্তি হইয়া আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। একজন সাহিত্যরসিক হয়ত নূতন সিনেমার ছবি আসিলে তাহা দেখিতে যান না, কিন্তু একটা সাহিত্য সভা থাকিলে রৌদ্র-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়াও সেখানে যান। তাঁহার Sentimentটি সাহিত্য-রসকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য সিনেমা দেখার লোভ সংবরণ করিবার মত ইচ্ছাশক্তি তাঁহার পক্ষে যতটা সহজ, অপরের পক্ষে ততটা নহে। এইরূপ ধর্ম্মের আচারগত Sentiment বা ভাবনিষ্ঠার জন্য মুসলমানগণ দিনের পর দিন 'রোজার' উপবাস করিবার মত মনের জোর

পাইয়া থাকেন, গাজনের সময় হিন্দু সন্ন্যাসীরাও একমাস ধরিয়া উপবাস করেন। অন্য সময় হয়ত এই মনের জোরের প্রয়োগ তাঁহারা করিতে পারেন না। সংস্কারের নিষ্ঠা যাহার যত দৃঢ় ও সুসংহত, তাহার ইচ্ছাশক্তিও ততই দৃঢ় হইবে। এইজন্যই যাহাদের নিষ্ঠা নাই, যাহারা লঘুচিত্ত, যাহাদের সংস্কার কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের কোন বিষয়েই মনের জোর থাকে না, তাহারা কোনও বিষয়েই মন স্থির করিয়া চলিতে পারে না বলিয়া তাহারা "লাগে তুক না লাগে তাক্" এই ভাবে একবার ফিল্মষ্টার, একবার ব্যবসাদার, একবার কেরাণী প্রভৃতি নানা পথে ভাসিয়া বেড়ায় এবং হয়ত কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এই জাতীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের "আমি"টির ঠিক পরিচয় পর্য্যন্ত জানে না, ভাবনিষ্ঠা না থাকার জন্য কোনও সংস্কারই তাহাদের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, ফলে কোনও বিষয়েই তাহাদের মনের জোর নাই।

সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, দৃঢ়চেতা বলিয়া যাঁহাদের সুখ্যাতি করা হয়, তাঁহাদের রস আদর্শের সহিত একমুখী হইয়া আমিত্ববোধের সহিত সংহত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের 'আমি'ত্ববোধটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আত্মসম্মান বোধটি সুতীব্র। সেই জন্য ছোট কাজের সহিত অথবা আদর্শভ্রষ্টতার সহিত তাঁহারা নিজের 'আমি'কে বিজড়িত হইতে দেন না।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চরিত্র প্রভৃতির আলোচনার জন্য অতীন্দ্রিয় বিষয় বস্তুর অবতারণার প্রয়োজন নাই। মানুষ যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই মূলধন করিয়া মানুষ তাহার জীবনের জটিল যাত্রাপথে চলিতে চলিতে স্বাভাবিক পরিণতির বশেই সংস্কার, আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্র প্রভৃতিকে অর্জ্জন করিয়াছে। তবে এই স্বাভাবিক পরিণতিটি নানা কারণেই খানিকটা অনিশ্চিত। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা, উপযুক্ত চিকিৎসা প্রভৃতির দ্বারা, উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারিক প্রণালীর দ্বারা এই স্বাভাবিক পরিণতিটিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ছেলেদের চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার অনেকখানিই সম্ভব হইতে পারে।

শিক্ষার তত্ত্ব-কথা Laws of Learn

অতীতের মনস্তত্ত্বে শিক্ষার তত্ত্ব-কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হইত না। উড্ওয়ার্থ দেখাইয়াছেন, জেমস্-এর বিরাট পুস্তকের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও পরিচ্ছেদই নাই, এমন কি ঐ পুস্তকে বিষয়-নির্ঘণ্টের মধ্যে 'শিক্ষা' শব্দটির পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান মনোবিদ্গণের গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, ইতোমধ্যেই শিক্ষার তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়া ব্যাপারটা বেশ একটা তর্কের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার মূল তত্ত্বটি হইতেছে বন্ধনীর সৃষ্টি (bond formation)। কি সম্বন্ধে বন্ধনী? এই প্রশ্ন লইয়াও মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন, এই বন্ধনীটি হইতেছে সাইন্যাপ্স (synapse)-এর বাধা ভাঙ্গিয়া অভ্যাসজাত স্নায়ুপথ সৃষ্টির বন্ধনী; আবার কেহ বলেন, এই বন্ধনী হইতেছে ভাবগত অনুষঙ্গের বন্ধনী। চেষ্টিতবাদী (behaviorist)-গণ বলেন, শিক্ষার মূল কথাটি হইতেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত কৃত্রিম-প্রতিক্রিয়া, আবার গেস্টাল্ট্ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলেন, "সমগ্রের" অভিজ্ঞতাপ্রসূত "অন্তর্দৃষ্টি"র প্রভাবে নূতন নূতন সংস্থান ও সমস্যার সমাধানের মধ্যেই আছে শিক্ষার আদি রহস্য। থর্ণডাইক বলেন, চেষ্টা, ভ্রান্তি ও সফল চেষ্টার মধ্যেই আছে শিক্ষার মূল কথা, আবার গেটস্ (A. I. Gates) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, সমস্ত শিক্ষার মূলে আছে প্রতিক্রিয়া। তাঁহারা বলেন, আমরা প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সমস্ত শিক্ষা অর্জ্জন করি (we learn by reacting)। শিক্ষা জিনিসটা অলস নিষ্ক্রিয় পাত্রের ঘাড়ে আসিয়া-পড়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয়মাত্র নহে, ইহা একটা সক্রিয় প্রতিক্রিয়া, যাহা অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়তর ও নিপুণতর হইয়া উঠে।

প্রাচীন মনোবিদ্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা নাই বটে, তবে স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনাকেই শিক্ষা-তত্ত্বের সূত্রপাত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আরিষ্টটল্ তাঁহার 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, একটি জিনিস যদি অন্য

একটি জিনিসকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দুইটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য (similarity), বৈসাদৃশ্য (contrast) অথবা নৈকট্য (contiguity)-গত একটা সম্পর্ক আছে।

পরবর্ত্তী যুগে বৃটিশ অনুষঙ্গবাদিগণ এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লইয়া বিশেষভাবে নৈকট্যকেই তাঁহাদের অনুষঙ্গের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একটী ঘটনা যদি অন্য একটি ঘটনার কাছাকাছি ঘটে, তাহা হইলে ঐ দুইটি ঘটনার স্মৃতি পরস্পরের সহিত জুড়িয়া গিয়া এক হইয়া যায়। এই ভাবে দুইটি ভাব সম্মিলিত হইয়া একটি নূতন এককের সৃষ্টি করে। এইরূপ ব্যাপারটাকেই অনুষঙ্গ বলে।

এই অনুষঙ্গবাদকে হব্‌স্‌, হিউম, টমাস, ব্রাউন, মিল, বেইন্‌, হার্বার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং ইঁহাদের অনেকেই এমন সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে তাঁহাদেরই তত্ত্বগুলিকে সমৃদ্ধতর ভাবে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুষঙ্গের যাহা মূল কথা, অর্থাৎ একটি ভাব (idea) অন্য একটি ভাবের সহিত জুড়িয়া গিয়া নূতন একটি এককের সৃষ্টি করা, তাহাই যেন থর্ণডাইকের বন্ধনীবাদ হিসাবে নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শিক্ষা-তত্ত্বে গেস্‌টাল্ট্‌ মতবাদ, টমাস ব্রাউন-এর "mental chemistry" এবং হার্বার্ট-এর "apperception mass" স্বগোত্রীয়।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ শিক্ষা-তত্ত্বে যে সমস্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে (১) থর্ণডাইক প্রভৃতির বন্ধনীবাদ (connectionism) অথবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (stimulus-respons psychology), (২) প্যাভ্‌লভ্‌, ওয়াট্‌সন্‌ প্রভৃতির কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ এবং (৩) ওয়ার্দাইমার, কুহ্‌লার, হার্টম্যান, ম্যাক্‌ কোনেল্‌ প্রভৃতির গেসটাল্ট্‌ মতবাদই প্রধান। প্রথমে থর্ণডাইকের কথাই আলোচ্য। শিক্ষা-তত্ত্বে তাঁহার সূত্রগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

থর্ণডাইকের মতবাদ :

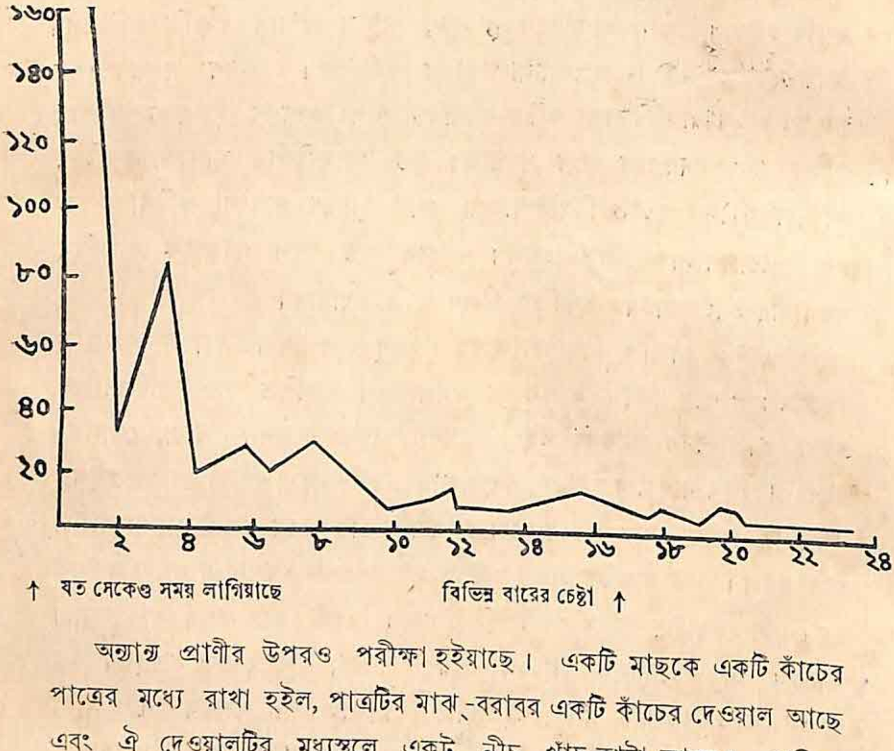
ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ (evolution) স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ও ইতর প্রাণীদের একটা স্বগোত্রীয়তা স্বীকৃত হইল। ফলে অনেকেরই

ধারণা হইতে লাগিল যে, মানুষের আচরণের জটিল তত্ত্ব জানিতে হইলে ইতর প্রাণীদের সরলতর আচরণগুলি খানিকটা পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। কাজেই মানুষের মনস্তত্ত্বকে সাহায্য করিবার জন্য পশু মনস্তত্ত্ব লইয়া গবেষণা খুবই সার্থক হইবে। ফলে জার্ম্মাণীতে হ্-বূন্, বৃটেনে মর্গ্যান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাণী-মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ মনস্তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রের ছত্রচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া জীববিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করিল এবং মনস্তত্ত্বের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, ক্লার্ক, চিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী-আচরণ গবেষণা করিবার জন্য বহু প্রয়োগশালা স্থাপিত হইল। ফলে সৃষ্টি হইল থর্ণডাইক প্রভৃতির বন্ধনীবাদ এবং ওয়াটসন্ প্রভৃতির কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ।

থর্ণডাইক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্ ও কলম্বিয়ার ক্যাটেল-এর ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি হ্-বূন ও মর্গ্যান-এর প্রদর্শিত পথেই পরিচালিত হইয়া প্রাণীদিগের আচরণ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। খাঁচা, গোলক-ধাঁধা প্রভৃতির সাহায্যে বিড়াল, কুকুর, মাছ প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। একটি বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়া খাঁচার পাশে একটি মাছ ঝুলাইয়া রাখা হইল। এই মাছটির নিকট যাইতে হইলে একটি দরজার সাহায্যে যাইতে হয়। ঐ দরজাটির সহিত একটি দড়ি উপরের একটি কপিকলের সহিত বাঁধা আছে। ঐ দরজাটিকে টানিলে দরজাটি উঠিয়া পড়িবে এবং মাছের নিকট যাওয়া সম্ভব হইবে। বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় এবং মাছের লোভে নানা প্রকার লম্ফঝম্ফ করিল, খাঁচার শিকগুলিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহার ভিতর দিয়া থাবা চালাইয়া মাথা ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়া চিৎকার করিয়া মাতামাতি করিল; পরে হঠাৎ দরজার দড়িটী কামড়াইয়া টান দিতেই দেখিল দরজাটি উপরে উঠিতেছে। বিড়ালটি এইবার দরজাটি খুলিয়া ফেলিল। বন্দিত্ব হইতে মুক্তির আনন্দ এবং মৎস্যের আস্বাদন-অভিজ্ঞতা তাহাকে দরজা খুলিবার কৌশলটি আয়ত্ত করিবার জন্য একটি প্রেরণা দিয়া রাখিল। পরে যখন বিড়াটিকে আবার খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখা হয়, সে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক চেষ্টাতেই বাহির হইতে সমর্থ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার

আর ভুলই হয় না—পলায়নের শিক্ষাটি সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত হইয়া যায়।

বিড়ালের শিক্ষার লৈখিক চিত্র



↑ যত সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে বিভিন্ন বারের চেষ্টা ↑

অন্যান্য প্রাণীর উপরও পরীক্ষা হইয়াছে। একটি মাছকে একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রাখা হইল, পাত্রটির মাঝ্-বরাবর একটি কাঁচের দেওয়াল আছে এবং ঐ দেওয়ালটির মধ্যস্থলে একটু নীচু খাঁচ-কাটা আছে। যেদিকে মাছটি রাখা হইল, সেইদিকে অত্যন্ত রৌদ্র এবং দেওয়ালের অপর দিক্‌টিতে বেশ ছায়া আছে। মাছটি রৌদ্র এড়াইয়া ছায়ার দিকে যাইতে চায়, কিন্তু যতই সে চেষ্টা করে, ততবারই সে নাক ঠুকিয়া আঘাত পায়। তাহার পর হঠাৎ একবার দেওয়ালের খাঁজ-কাটা নীচু অংশটি দিয়া লাফ দিয়া পালাইতে সক্ষম হয়। ইহার পর যতবারই তাহাকে রৌদ্রের দিকে রাখা হয় ততবারই সে ঐ একইভাবে পলায়ন করে এবং প্রতিবারই তাহার ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে। এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল, ভুল ও প্রচেষ্টা করিতে-করিতে সার্থক

প্রচেষ্টাটিকে মনে রাখিয়াই (Learning by selection of the successful variant) মাছটির শিক্ষা আরম্ভ হয়।

থর্ণডাইক বলেন, মানুষের শিক্ষাও এইভাবেই প্রচেষ্টা এবং ভুলের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সাইকেল চড়িতে শিখিতে হইলে আমরা অনেক আছাড় খাই, টাইপ শিখিতে হইলে ভুল টাইপ করি, সেতার বাজাইতে হইলে ভুল পর্দ্দায় আঙ্গুল দিয়া নানা প্রকার হাস্যকর ভুল করি—এইভাবে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া আমরা শিক্ষার দক্ষতা অর্জ্জন করি।

ভ্রান্তি ও ব্যর্থ চেষ্টার বিরক্তি এবং সফল চেষ্টার তৃপ্তির জন্যই ভ্রান্তি ও ব্যর্থ চেষ্টাগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায় এবং উদ্দীপক "S" (Stimulus) ও প্রতিক্রিয়ার "R" (Response) মধ্যে একটা বন্ধনীর সৃষ্টি হয়। পরে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই বন্ধনীটি দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। ইহাকেই শিক্ষা লাভ করা বলে। সুতরাং শিক্ষার মূল কথা হইতেছে তৃপ্তি, বিরক্তি পরিচালিত চেষ্টা ও ভ্রান্তি (Trial and error)।

এখন প্রশ্ন থাকিতে পারে, শিক্ষার যুগে ভুল চেষ্টাগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়া সার্থক চেষ্টাগুলিকে স্মরণ রাখিয়া আমরা যে ক্রমশঃ নিপুণতার দিকে অগ্রসর হই, তাহা কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে?

থর্ণডাইক এই সম্বন্ধে তিনটি মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন:

(১) অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দ (law of effect) *

(২) অনুশীলনজনিত উৎকর্ষতা (law of exercise)

(৩) মনের প্রস্তুতি (law of readiness)

(১) **অভিজ্ঞতার আনন্দ:** আমাদের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াজনিত অভিজ্ঞতার সবগুলিই আনন্দময় নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মধুর, কতকগুলি তিক্ত। কতকগুলি তৃপ্তিদায়ক, কতকগুলি বিরক্তিদায়ক। যেগুলি তিক্ত সেগুলি আমরা ভুলিতে চেষ্টা করি; আর যে প্রচেষ্টাগুলি মধুর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখি ও তাহাদের

* থর্ণডাইকের law of effect ও law of readiness-এর সহিত প্যাভ্লভ্-এর law of reinforcement ও mind-set-এর সাদৃশ্য আছে।

পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করি। ক্ষুধার সময় কিছু খাইলে আনন্দ হয়; অতএব এই আনন্দের স্মৃতি আমাদের শিক্ষা দিল যে ক্ষুধার সময় খাইতে হয়। অবশ্য অনেক সময় আপাতঃমধুর অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যতের দুঃখ ও অকল্যাণের হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের কল্যাণকর প্রচেষ্টাকে বাছিয়া লইয়া তাহাকেই স্মৃতির কোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখি।

আচরণবাদী ওয়াট্‌সন্ সাহেব এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার পথে অভিজ্ঞতার তৃপ্তি-বিরক্তির কোনও দান নাই; পুনরাবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার নবীনতাই হইতেছে তাঁহার মতে শিক্ষার মূল কথা।

তিনি ইঁদুর, সজারু প্রভৃতি জন্তুকে গোলকধাঁধার মধ্যে পুরিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গোলকধাঁধার মধ্যে অসংখ্য বদ্ধ গলি ছিল এবং একটি মাত্র পথ দিয়া তাহারা খাবারের সন্ধান পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরিতে ঘুরিতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা আসল পথটির সন্ধান করিল এবং বারংবার এই কাজ করিতে করিতে তাহারা ঠিক পথটি চিনিয়া লইতে শিক্ষা করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই পুনরাবৃত্তিই হইতেছে শিক্ষার মূল তত্ত্ব।

টম্‌সন্ সাহেব এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মন ব্যতীত শিক্ষার সম্ভাবনা নাই, মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা এগুলির বিচারই আমাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকে সঞ্চয় করিতে অথবা পরিত্যাগ করিতে প্রেরণা দেয়, নতুবা নিছক যান্ত্রিক অনুবর্ত্তনই আমাদের শিক্ষার মূল কথা হইতে পারে না। বিড়ালটি যে দরজা খুলিতে শিখিল, তাহার কারণ—দরজা খোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটু আনন্দানুভূতির অনুষঙ্গ (association) ছিল; মুক্তির আনন্দ, মৎস্যাস্বাদের আনন্দ প্রভৃতিই বিড়ালটিকে ভুল প্রক্রিয়া বন্ধ করিয়া ঠিক প্রক্রিয়াটিকে মনে রাখিবার প্রেরণা দিয়াছিল। মাছটি যে বার বার কাঁচের দেওয়ালে নাক ঠুকিয়া ভুল করে নাই, তাহার কারণ নাক ঠোকাটা তাহার কাছে আনন্দের অনুভূতি দেয় নাই। সেতার শিখিবার সময় আমরা যে ভুল তারে বার বার ঝঙ্কার তুলি না, তাহার কারণ—এই ভুলটি আমাদের কাণে বেসুরা বাজিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে পীড়া দেয়।

(২) **অনুশীলনজনিত উৎকর্ষভাবাদ ঃ** এই সূত্রে বলা হইয়াছে—অভ্যাসই আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে পূর্ণতা দান করে। কোনরূপ কাজের অভিজ্ঞতা যদি পীড়াদায়ক না হয় তাহা হইলে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিই আমাদের শিক্ষাকে পূর্ণ করিয়া তুলে।

এই পুনরাবৃত্তির সহিত অভিজ্ঞতার তীব্রতা ও আধুনিকতার একটি নিকট সম্পর্ক আছে। যে জিনিসটি আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা সহজে ভুলি না; যাহা এইমাত্র শিখিলাম এখনই তাহা ভুলি না, সামান্যভাবে অনুভূত জিনিসটি পুরাতন হইলেই ভুলিয়া যাই, তীব্রভাবে অনুভূত জিনিসটি দীর্ঘতর দিন স্মরণ রাখি, ইত্যাদি। এই পুনরাবৃত্তির সহিত মনের আনন্দের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সার্থক প্রচেষ্টাটি আমাদের মনে আনন্দ দেয়, অতএব সেই চেষ্টাটি পুনরায় করিতে ইচ্ছা হয় এবং যতবার চেষ্টা করা হয় ততই শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ হয়; এইভাবেই আমরা শিক্ষার পথে অগ্রসর হই।

(৩) **মনের প্রস্তুতি ঃ** অভিজ্ঞতার মধুরতা এবং পুনরাবৃত্তি ছাড়াও আর একটি সর্ত্তের উপর আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা নির্ভর করে। শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মনের তরফ হইতে একটা প্রস্তুতি ও আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি ও আগ্রহের অভাব যখন থাকে, তখন জোর করিয়া কিছু শিখাইতে হইলে মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ মন তাহাকে গ্রহণ করে না; এমন কি সদুদ্দেশ্যেও যদি তাহাকে অযাচিত সাহায্য করা হয়, তাহা হইলেও তাহাতে ফল খারাপ হয়। শিক্ষার ব্যাপারে মনের তরফ হইতে এই প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলিয়াই অনিচ্ছুক শিষ্যের কাণে ধর্ম্মোপদেশের কোনও ফল হয় না। অনিচ্ছুক ছাত্রের নিকট শিক্ষকের অধ্যাপনাও ব্যর্থ হয়। হার্বার্টের পঞ্চাঙ্গ শিক্ষা-পদ্ধতিতে "প্রস্তুতি"র উপযোগিতা এই জন্যই অনস্বীকার্য্য।

অভিজ্ঞতার মধুরতা, অভ্যাস এবং প্রস্তুতি—এই তিনটি মূল কারণ ব্যতীত শিক্ষার আরও কয়েকটি গৌণ কারণ আছে ঃ

(১) **বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া** (multiple response) ঃ খাঁচার বিড়ালটি যখন শিকের ভিতর দিয়া মাথা গলাইতে পারিল না তখন থাবা বাড়াইল, থাবা বাড়াইয়াও যখন মাছটি ধরিতে পারিল না তখন হয়ত

আঁচড়াইতে লাগিল। এইভাবে একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে শিক্ষা-পথে পরিচালিত করে।

(২) **মনের অবস্থা** (attitude, set or disposition): বিড়ালটি কোনও চেষ্টাই হয়ত করিত না যদি তাহার মনের তরফ হইতে ক্ষুধাজনিত প্রেরণা বা মৎস্যদর্শনজনিত লোভ না থাকিত। এইজন্যই বিদ্যালয়ে শেষের দিকের পিরিয়ড্গুলিতে ভাল ভাবে পড়ান যায় না। তখন ছাত্রদের মন খেলার আকর্ষণে, ক্ষুধার তাড়না প্রভৃতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে।

(৩) **আংশিক সাধনা** (law of partial activity): আমাদের অসম্পূর্ণ সাধনা প্রায়ই পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে টানিয়া লইয়া যায়; যে বিড়ালটি দড়ির ফাঁস টানিয়া আগল খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল—সে একটি অনভিজ্ঞ বিড়ালের চেয়ে পালাইবার ফিকির সহজে বুঝিবে; যে ছেলে গণমাপকের বা সংঘাভিক্ষণের (Group test) পরীক্ষা একবার দিয়াছে, সে পরের বারে অন্য ছেলে অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে, ইত্যাদি।

(৪) **অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যজনিত সুবিধা** (law of assimilation or analogy): একটি প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হইলে অন্য প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হওয়া সহজতর হয়। এই জন্য আদালতের উকিলরা একজাতীয় মকদ্দমায় কৃতকার্য্য হইলে সেই জাতীয় অন্য মকদ্দমাতেও কৃতকার্য্য হইতে আশা করে।

(৫) **আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া** (law of associative shifting): এক হিসাবে এই জিনিসটিকে কৃত্রিম প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। এই নিয়মটিকে এইভাবে বুঝাইতে পারা যায়: যদি একই সঙ্গে ক ও খ দুইটি কাজ হয়, তাহা হইলে হয়ত ক-এর প্রতিক্রিয়া অনুষঙ্গের দ্বারা খ-এর সহিত জড়িত হইয়া যাইতে পারে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ

প্যাভ্লভ্ প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ থর্ণডাইক-এর এই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা সমস্ত শিক্ষার পদ্ধতিগুলিকেই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (Conditioned reflex) বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

প্যাভ্‌লভের পরীক্ষাগুলির মধ্যে কুকুর লইয়া পরীক্ষাটির কথা অনেকের নিকটই পরিচিত। সমুখে একখণ্ড মাংস রাখা হইল। এই উত্তেজনার সাধারণ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার জিহ্বা হইতে লালা-নিঃসরণ। এখন তাহাকে প্রতিবারই মাংস খাইতে দিবার পূর্ব্বে যদি একটি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মাংসখণ্ড না দিয়াও শুধু ঘণ্টাধ্বনি করিলেই কুকুরের মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইবে। মাংস দর্শনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতেছে লালা নিঃসরণ, এই প্রতিক্রিয়াকে ঘণ্টাধ্বনির কৃত্রিম উপায়ে পুনরাবৃত্তি করাকে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বলে।

দেখা যাইতেছে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একটা বন্ধনীবাদের মত ব্যাপার আছে। এখানেও একটা বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে উদ্দীপক "S" ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার (C. R.) মধ্যে একটা সংযোগ-সেতু নির্ম্মিত হয়। এই-জন্যই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বা সর্ত্তাধীন প্রতিক্রিয়া শব্দটির পরিবর্ত্তে অনুষঙ্গমূলক প্রতিক্রিয়া বা সঞ্চারিত (transferred) প্রতিক্রিয়া শব্দটিও ব্যবহার করা চলে।

প্যাভ্‌লভ্ বলেন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাই হইতেছে এই কৃত্রিম প্রতি-ক্রিয়ার ফল। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলেই কুকুরটি শিখিয়াছে, ঘণ্টা বাজিলেই খাদ্য পাওয়া যায় এবং এই তত্ত্বটি শিখিয়াছে বলিয়াই ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই তাহার লালা নিঃসরণ হয়।

ওয়াট্‌সন, ল্যাশ্‌লী প্রভৃতি বিভিন্ন আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে প্যাভ্‌লভের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সকলেই ইহাকে শিক্ষার মূল কথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি মোটামুটি সর্ত্ত আছে। যথা—

১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফল হইতে স্বল্পস্থায়ী, সুতরাং ইহার ফলকে স্থায়ী করিতে হইলে অভিজ্ঞতার ঘন ঘন ও নিয়মিত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। এই পুনরাবৃত্তি না থাকিলে স্বাভাবিক বিস্মৃতি ও অনভ্যাসের ফলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া-লব্ধ শিক্ষা মুছিয়া যাইবে। তবে এই লব্ধ শিক্ষা অপব্যহারে একেবারে নষ্ট হয় না ; তার একটা রেশ থাকিয়া যায়। ফলে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার চেয়ে পরবর্ত্তী প্রচেষ্টায়

শিক্ষাটা সহজতর (Relearning is easier than learning) হয়।

২। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট উদ্দীপকে সীমায়িত। ইহা specific; ঠিক যে উদ্দীপকে একটি বিশিষ্ট কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, পরবর্ত্তী পরীক্ষায় ঠিক সেই উদ্দীপকটিরই প্রয়োজন হইবে। একটি বিশিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি দিয়া যদি কুকুরের লালা নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে, দ্বিতীয়বারেও ঐ ঘণ্টা ধ্বনিটিই করিতে হইবে। ঘণ্টার বদলে কাঁসর বাজাইলে কি ঢাক বাজাইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি হইবে না।

৩। ইহা "law of summation" মানিয়া চলে; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দীপকে বিভিন্ন সময়ে যদি এক জাতীয় একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই বিভিন্ন উদ্দীপকগুলি একত্র যুগপৎ কাজ করিলে প্রতিক্রিয়াটা আরও তীব্রতর হইবে। ধরা যাইল কুকুরকে মাংসখণ্ড দিবার পূর্ব্বে ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হইল; আবার অন্য সময় হয়ত তাহার গায়ে সুড়সুড়ি দিয়া ঐ জাতীয় একটা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হইল। এইবার ঐ দুইটি উদ্দীপক যদি এক যোগে ও যুগপৎ কাজ করে, তাহা হইলে লালা নিঃসরণ আরও ভালভাবে হইবে।

৪। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলিকে নানা ভাবেই বিনষ্ট করা যায়। ইহার ফলগুলি অব্যবহারেও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি অতি ব্যবহারে বা ব্যর্থ ব্যবহারেও নষ্ট হয়। কুকুরকে মাংস না দিয়া শুধু শুধু ঘণ্টা ধ্বনি করিয়াই তাহার মুখে লালা নিঃসারণ করান হইল। কিন্তু বার বার যদি শুধু ঘণ্টাধ্বনিই করা হয় আর ক্ষুধার খাদ্য মাংস খণ্ড দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহার আর লালা নিঃসরণ হইবে না। বার বার তাহাকে ঠকান যাইবে না। শিক্ষা-তত্ত্বে এই সূত্রটি স্মরণীয়। শাস্তি বা তিরস্কারে অনেক সময় ছাত্রদের অপরাধ সংশোধিত হয়। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে তাহা ছাত্রদের অপরাধ-প্রবৃত্তিকে আর সংশোধন করিতে পারে না। এইজন্যই অতিরিক্ত শাস্তির ফল প্রায়ই ব্যর্থ হয়, খিট্‌খিটে পিতার সন্তান অবাধ্য হয়, আবার অতিরিক্ত উপদেশ শুনিয়া-শুনিয়া ছেলেরা "উপদেশ ঘেঁচড়া" হইয়া উঠে।

৫। অনেকগুলি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে তাহাদের মধ্যে একটি

যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে অপরগুলিও যে নষ্ট হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে, তীব্র উদ্দীপকজাত প্রতিক্রিয়াটি নষ্ট হইয়া যাইল, কিন্তু তাহার চেয়ে দুর্ব্বলতর একটা উদ্দীপক সমান ভাবেই কার্য্যকরী রহিয়া যাইল।

৬। একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার ঠিক পূর্ব্বেই যদি একটি বাধা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক (distracting stimulus) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলটি খানিকটা ব্যাহত (inhibited) হয়। এই বাধা সৃষ্টিকারী বা চিত্তবিক্ষোভকারী উদ্দীপকটি যতই শক্তিশালী হইবে, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াজাত শিক্ষা ততই ব্যাহত হইবে। অবশ্য এই ব্যাঘাত জিনিসটা ক্রমশঃই গা-সওয়া হইয়া যায় এবং পরে চিত্তবিক্ষেপের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসে।

৭। ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপকের দ্বারা ব্যাহত (Inhibitions may be inhibited) করা যায়।

৮। এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বয়স্কদিগের চেয়ে শিশুদের উপর অধিকতর কার্য্যকরী হয়।

দৃঢ়ীকরণ সূত্র : (Law of re-inforcement) আমরা দেখিয়াছি, কুকুরের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতেছে মাংসখণ্ড এবং কৃত্রিম উদ্দীপক হইতেছে ঘণ্টাধ্বনি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, শুধু কৃত্রিম উদ্দীপক দিয়াই (অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি দিয়াই এবং মাংসখণ্ড না দিয়াই) আমরা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারি। কিন্তু এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার পর স্বাভাবিক উদ্দীপক অর্থাৎ মাংসখণ্ড যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বন্ধনীটি দুর্ব্বল হইয়া যায়। বিপরীত পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি দিলে বন্ধনীটি দৃঢ়ীভূত (re-inforced) হয়। এইজন্যই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার অনুগামী স্বাভাবিক উদ্দীপককে "re-inforcement"ও বলা হয়। অভ্যাস তৈয়ারী করিবার দিক দিয়া (তথা শিক্ষা-তত্ত্বের দিক দিয়া) এই re-inforcementটির খুবই প্রয়োজন। থর্ণডাইক তাঁহার 'law of effect' এবং গেস্টাল্টবাদিগণ তাঁহাদের 'factors of pregnance and good figure'

মতবাদের মধ্য দিয়া "re-inforcement'' বা দৃঢ়ীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

মানুষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগঃ মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া কতটা প্রযোজ্য ? আচরণবাদীরা বলিবেন, মানুষের শিক্ষার শেষ কথা যাহাই হউক না কেন, তাহার প্রথম কথা যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া, ইহা অনস্বীকার্য্য। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি শিশু যে তাহার আশপাশের জিনিসপত্রের নামের সহিত পরিচিত হয়, তাহাও এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ারই ফল। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তাহা কি ভাবে সম্ভব ? ধরা যাইতে পারে, একটি 'বল' লইয়া এইভাবে শিশুর অভিজ্ঞতা আরম্ভ হইল :

প্রথম অভিজ্ঞতাঃ মাতা 'বল' কথাটি উচ্চারণ করিলেন এবং মাতাকে অনুকরণ করিয়া শিশু ঐ শব্দটি করিতে চেষ্টা করিল।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাঃ মাতা আবার বলটি লক্ষ্য করিয়া 'বল' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন এবং শিশুও তাঁহার অনুকরণ করিল।

তৃতীয় অভিজ্ঞতাঃ শিশু মাতাকে অনুকরণ করিয়া পুনশ্চ 'বল' বলিল।

চতুর্থ অভিজ্ঞতাঃ শিশুটি এখন মাতার সাহায্য ব্যতিরেকে বলটিকে দেখিয়াই বল বলিয়া অভিহিত করিল ; এখন জিনিসের সহিত জিনিসের নামটি জুড়িয়া গেল। শিশু নাম শিক্ষার কার্য্য শেষ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচরণবাদীদের মতে শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে মনস্তত্ত্বের কোনও কথাই নাই। শুধু তাই না, আচরণবাদীরা মনস্তত্ত্বের মধ্যে দেহতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না এবং মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ারই একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। হারমোনিয়ামে একটি বিশিষ্ট পর্দ্দা টিপিলে যেমন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি বিশিষ্ট ধ্বনিই উত্থিত হয়—ইঁহাদের মতে মানুষের সব কাজগুলিই ঐ একই ভাবে হয়। গাছের ডালে কাঁচা আমটি ঝুলিতেছে, বালক তখনই ঢিল কুড়াইয়া লইল ও তাহাকে ভূপাতিত করিল ; আম্রটি যেমনই ভূপাতিত হইল, অমনই তাহার হাতের ছুরিটি খুলিয়া গেল ; আমটি ছ'ড়ান হইল। অমনই নুন-লঙ্কা-কলাপাতার ব্যবস্থা হইল এবং ঐ অপূর্ব্ব পদার্থটী পত্রপুটে সঞ্চিত হইয়া তাহার

মুখে উঠিল—এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলিই আচরণবাদীদের মতে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র, ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা কিছুই নাই।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিতে পারেন, বুদ্ধির ব্যাপার যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বালকটির কাজে পারম্পর্য্য আসিল কিরূপে? বালকটি আম দেখিয়াই প্রথমেই নুন-লঙ্কার সন্ধানে ছুটিল না কেন? প্রথমে যে আমটিকে ঢিল মারিয়া হস্তগত করিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল কিরূপে? ইতর প্রাণী বা শিশুদের সম্বন্ধে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার কথা আসিতে পারে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে।

অতএব দেখা গেল, শিক্ষাতত্ত্বের সমাধানের ব্যাপারে প্যাভ্‌লভ্‌ প্রভৃতি আচরণবাদীদের মতই শেষ কথা হইতে পারে না। এখন দেখা যাক, অন্য কোনও দল ইহার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাল সমাধান দিয়াছেন কি না।

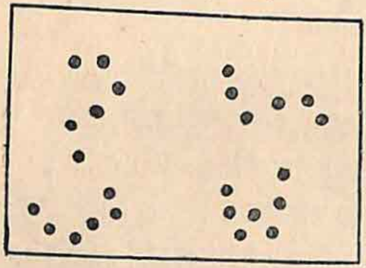
গেস্টাল্ট মতবাদ

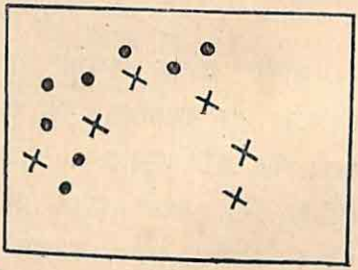
জার্ম্মাণ ভাষায় গেস্টাল্ট্‌ শব্দটির অর্থ হইতেছে আকৃতি (shape)। দৃশ্যপটের দৃশ্য বস্তুগুলির গতি ও সংস্থান লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতেই এই মতবাদটির সৃষ্টি হইয়াছে। সিনেমার পৃথক পৃথক স্থির ছবিগুলি কি ভাবে জুড়িয়া গিয়া মসৃণ একটানা গতির বিভ্রম সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তু-পুঞ্জ (আকাশের তারা, কাগজে আঁকা কালির ফোঁটা প্রভৃতি) কি ভাবে জোট পাকাইয়া সংহত হইয়া এক একটি আকৃতি বা ছবির বিভ্রম সৃষ্টি করে, এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া ইঁহারা গবেষণা করেন। এই গবেষণা দ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, "সমগ্র" জিনিসটা "খণ্ডের" সমবায় মাত্র নহে, তাহা একটা নূতন সৃষ্টি; এই "সমগ্র"ই প্রভাবান্বিত করে খণ্ডের অনুভূতিকে, পূর্ণতর অভিজ্ঞতার নমুনার (pattern) সঞ্চয়গুলির প্রভাবেই নূতন অভিজ্ঞতার খণ্ড বস্তুগুলির মধ্য হইতে নূতন নূতন এককের সৃষ্টি হয়; সুতরাং অংশ পূর্ণকে তৈয়ারী করে না, পূর্ণই অংশকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করে।

সংগঠন (Organization) কথাটি গেস্‌টাল্ট্‌ মতবাদে খুবই প্রচলিত। গেস্‌টাল্ট্‌বাদীগণ বলেন, সংবেদনগুলি (sensation) অভিজ্ঞতার নিষ্ক্রিয়

পুঞ্জ মাত্র নহে, তাহারা স্বয়ংক্রিয় সংগঠনকারী জিনিস ; তাহারা প্রতিনিয়তই পরস্পরের সহিত জুড়িয়া-জুড়িয়া নূতন-নূতন একক সৃষ্টি করিতেছে, পুরাণ অভিজ্ঞতার আদর্শেই (pattern) এই নূতন এককগুলি তৈয়ারী হইতেছে।

সংগঠনের সর্ত্ত : ওয়ার্দাইমার-এর সূত্রাবলী : কি ভাবে এই সংগঠন কাজ চলিতে থাকে ? ওয়ার্দাইমার (Wertheimer) দেখাইয়াছেন, একটা কাগজের পাতায় যদি অনেকগুলি কালির ফোঁটা আঁকা থাকে, তাহা হইলে যে ফোঁটাগুলির মধ্যে আকৃতি বা বর্ণগত সাদৃশ্য থাকে তাহারাই পরস্পর জুড়িয়া যাইয়া একটা কিছু ছবির বিভ্রম সৃষ্টি করিবে। এই ছবির তৈয়ারীর ব্যাপারে ফোঁটাগুলির সংস্থানগত নৈকট্য এবং অবিচ্ছিন্নতাও একটা বড় সহায়। ফোঁটাগুলির মধ্যে অনেকখানি করিয়া ছেদ থাকিলে এই ছবিটি তৈয়ারী হয় না।


নৈকট্য


সাদৃশ্য

সংগঠনের আর একটি সর্ত্ত হইতেছে, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাজনিত পরিচিতি (familiarity) ও মানসিক অবস্থা (set)। আকাশের বিচ্ছিন্ন তারকাগুলি হইতে অথবা চলমান মেঘপুঞ্জের মধ্য হইতে আমি হয়ত একটা হাতী দেখিলাম। কিন্তু হাতীর সঙ্গে যাহার পরিচয় নাই, যে হাতী দেখে নাই শুধু শূকর দেখিয়াছে, তাহার কাছে ঐ ছবিটিই হয়ত একটা শূকর বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

সংগঠনের আর একটি সর্ত্ত হইতেছে pregnance and good figure ; এই বিচ্ছিন্ন ফোঁটাগুলি হইতে যে ছবিটির বিভ্রম সৃষ্টি হইল, তাহা যদি

সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই ঐ ছবিটির স্মৃতি স্থায়ী ভাবে মনের মধ্যে থাকিয়া যাইবে—বারান্তরে ঐ ফোঁটাগুলি হইতে ঐ বিশিষ্ট ছবিটিরই অনুভূতি হইবে।

গেস্‌টাল্ট্‌বাদিগণ আচরণবাদিদিগের "উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া" (S—R) সূত্রটি মানিতে চাহেন না। কুহ্‌লার বলিয়াছেন, আচরণবাদীরা উদ্দীপক (S) শব্দটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু উদ্দীপকই প্রতিক্রিয়ার (R) সৃষ্টি করে, এ কথা বলিলে ঠিক হইবে না। মানুষ হইতেছে বহু অতীতের অভিজ্ঞতার নানা "প্যাটার্ণ"এর সমন্বয়ে গঠিত একটা স্বয়ংক্রিয় জিনিস; নূতন একটা উদ্দীপক আসিবামাত্র সে তাহার অতীত অভিজ্ঞতার নমুনার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতনভাবে সংগঠন করিতে আরম্ভ করে; ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈয়ারী হয় নূতন নূতন প্যাটার্ণ। কাজেই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সূত্রটিকে বাতিল করিয়া আমাদের নূতন সূত্র করা উচিত "উদ্দীপক প্যাটার্ণ"→নূতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া (pattern of stimulation)→সংগঠন→নূতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া (response to the products of organization)।

এই সংগঠনের ফলে বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে যে জিনিসটি তৈয়ারী হয়, তাহা যে একটা সম্পূর্ণ "নূতন সৃষ্টি," একটা সমবায় মাত্র নহে, এই কথাটাই গেস্‌টাল্ট মতবাদে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্পিয়ারম্যান্ সাহেব তাঁহার "noegenesis" তত্ত্বে এই "নূতন সৃষ্টির" কথাটাই অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। অনুষঙ্গবাদিগণ দেখাইয়াছিলেন, একটি ভাব (idea) আর একটি ভাবের সহিত জুড়িয়া যায়। ঠিক কথা; কিন্তু তাহার ভাবটি জুড়িয়া গিয়া যে এককটি সৃষ্টি করে, তাহা যে নিছক "সমবায়" মাত্র নহে, তাহা যে একেবারে একটা নূতন জিনিস হইয়া উঠে, এই তত্ত্বটি পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই।

কিন্তু একটা অনস্বীকার্য্য যে, শুধু সংগঠন, সংস্থান ও আকৃতির ভিন্নতায় এমন কতকগুলি নূতন গুণের সৃষ্টি হয়, যাহা উপাদানীভূত বস্তুগুলির কোনটির মধ্যেই থাকে না। তাজমহলের বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্যে

তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য নাই, ভৈরবী রাগিণীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, টোড়ীর মধ্যে তাহা নাই, অথচ দুইটি রাগিণীর মধ্যেই সাতটি স্বর আছে এবং 'রে' 'গা' 'ধা' 'নি'র কোমল পর্দ্দা ব্যবহৃত হয়।

বস্তুতঃ উপাদান-সংগঠনে গঠিত নূতন এককটি একটি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, ইহা নিছক সমবায় মাত্র নহে। এই নূতন এককটি বন্ধনীবদ্ধ মুক্তাখণ্ড মাত্র নহে, ইহা একটি মণি-মালিকা; ইহা কতকগুলি স্বরের পারম্পর্য্য মাত্র নহে, ইহা একটি মধু রাগিণী; ইহা দলবদ্ধ চলমান জনতামাত্র নহে, ইহা একটি সাড়ম্বর শোভাযাত্রা। এই তত্ত্বটি আর একজন মনোবিদ্ তাঁহার অনন্নুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন, "It is not beads connected by various clasps, but a necklace, it is not a series of tones but a melody, it is not men walking in columns, but a procession".

অন্তর্দৃষ্টিঃ গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অবদান হইতেছে অন্তর্দৃষ্টির মতবাদ। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কুহ্লার ব্যানারি-দ্বীপপুঞ্জের একটি পশুশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ইতর প্রাণীদের অন্তর্দৃষ্টি পরিচালিত বুদ্ধি আছে কিনা, এই ব্যাপারে তিনি শিম্পাঞ্জী লইয়া পরীক্ষা (১৯১৪) করেন। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাজীদের বুদ্ধিই সর্ব্বাধিক।

বারোটি শিম্পাঞ্জীকে একটি স্থানে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল—সেই স্থানটিতে লম্বা লাঠি, দড়ি, বাক্স প্রভৃতি ছড়ান ছিল এবং উচ্চে ক্যাম্বিসের একটি ত্রিপল হইতে কতকগুলি কলা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। দেখা গেল, কতকগুলি শিম্পাঞ্জী দশ হাত লাঠিটিকে মাটির উপর শূন্যে দাঁড় করাইয়া লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র লাঠি বাহিয়া উঁচুতে উঠিয়া কলাগুলি পাড়িয়া আনিল। অন্য কতকগুলি শিম্পাঞ্জী বাক্সগুলিকে একটির উপরে একটি স্থাপন করিয়া তাহার উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্তূপ সাজাইবার কৌশলটি অনেকেরই ঠিক হয় নাই। তাড়াতাড়ি ছোট বাক্সের উপর বড় বাক্স, তাহার উপর আর একটি এমনভাবে সাজাইল যে, তাহাদের ভারকেন্দ্র ঠিক রহিল না, ফলে তাহাদের উপর উঠিতে যাইয়াই হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। অন্য কতকগুলি

বানর হেলিয়া দুলিয়া টান খাইয়া বাক্সগুলি পড়িবার পূর্ব্বেই কলাগুলি ছিনাইয়া লইল এবং শেষ পর্য্যন্ত মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আবার কতকগুলি শিম্পাঞ্জী এ সমস্ত কিছুই করিল না। তাহারা লাঠিগুলিকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; যখন দেখিল যে একটি লাঠি দিয়া ঠিক নাগাল পাইতেছে না, তখন একটি লাঠিকে অন্য একটি লাঠির খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ফলের নাগাল পাইল এবং ইপ্সিত বস্তুটি আহরণ করিল। পরের দিন এই কার্য্যগুলি আরও ক্ষিপ্র ও নির্ভুলভাবে হইয়াছিল।

শিম্পাঞ্জীদের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থর্ণডাইকের চেষ্টা ও ভ্রান্তি অথবা প্যাভ্‌লভ্‌-এর কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার নীতিগুলি কাজ করে নাই। লাঠি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অথবা বাক্সের উপর বাক্স সাজাইয়া অথবা লাঠিগুলিকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিয়া যে ফলগুলির নাগাল পাওয়া যাইবে, ফলগুলির সহিত তাহাদের ফাঁকটুকু ভরাট হইয়া যাইবে এবং একটা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন ছবি তৈয়ারী হইবে, এই জাতীয় একটা ধারণার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাকেই অন্তদৃষ্টির লীলা বলা যাইতে পারে।

এই অন্তদৃষ্টিটি কি জিনিস? যে অন্তর্ভেদী "X Ray দৃষ্টি" দ্বারা দৃশ্য-বস্তুর উপর হইতে একেবারে ভিতরের মর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়, এই জাতীয় কোনও অন্তদৃষ্টির দাবী গেস্‌টাণ্টবাদিগণ করেন না। অথবা সাধু-সন্ত ব্যক্তিরা যে একটা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক শক্তির দ্বারা কোনও জিনিসের গোপন রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন, সেই জাতীয় অন্তদৃষ্টিও গেস্‌টাণ্ট্‌-মনোবিদ্‌গণের আলোচ্য নহে। তাঁহাদের অন্তদৃষ্টি অন্য জাতীয় জিনিস। সমগ্রের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে দৃষ্টি সমগ্রের অংশীভূত একটা জিনিসকে সমগ্রের অংশ হিসাবে বুঝিতে পারে যে, দৃষ্টি অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন জীবন-সংস্থানের একটা সমাধান করিতে পারে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য, সম্পর্ক ও "প্যাটার্ণ" আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাকেই গেস্‌টাণ্ট্‌বাদীগণ অন্তদৃষ্টি নাম দিয়াছেন। (তাঁহাদের মতে এই অন্তদৃষ্টিই হইতেছে সমস্ত শিক্ষার মূল কথা)

গেস্‌টাণ্ট্‌ মনোবিদ্‌গণ বলেন, চেষ্টা ও ভ্রান্তির (trial and error) পথ

হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ। ইহার মধ্যে পরিকল্পনা নাই, পর্য্যবেক্ষণ নাই, ঘটনা-সংস্থানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য একটা অনুসন্ধানী চেষ্টা নাই, কাজেই ইহার মধ্যে বহু ব্যর্থ পদক্ষেপ আছে, মূর্খ শক্তি-ক্ষয় আছে, তাই চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া যে সফলতা আছে, তাহা একটা আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র, সুচিন্তিত আবিষ্কার নহে।

কুহ্‌লার দেখাইয়াছেন, থর্ণডাইকের গোলক-ধাঁধা, খাঁচা, বাক্স প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষার সময় প্রাণীদিগকে লক্ষ্য বস্তুটি সম্বন্ধে সমগ্র ও অখণ্ড দৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেইজন্যই তাহাদিগকে চেষ্টা ও ভ্রান্তির বহু ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারা যদি লক্ষ্যবস্তুকে অনুভব করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সোজাই সেই স্থলে চলিয়া যাইত, অনর্থক শক্তিক্ষয় করিত না। তিনি একটি কুকুরকে একটা বেড়া দেওয়া অপরিচিত বাগানের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বেড়ার ওপারে কিছু খাদ্য দেওয়া ছিল। কুকুরটি বেড়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া ফাঁকা পথ ধরিয়া সোজা এক প্রচেষ্টাতেই খাবারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে ব্যর্থ পরিশ্রম করে নাই। কারণ পথ সম্বন্ধে সমগ্র ক্ষেত্রটিই তাহার দৃষ্টিপথের মধ্যে ছিল। তাই সে থর্ণডাইকের বিড়ালের মত থাবা দিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া বেড়ার তলা দিয়া নাক ঢুকাইয়া ব্যর্থ লাফ-ঝাঁফ করিয়া খাবারটি লইবার চেষ্টা করে নাই।

গেসটাল্ট্‌বাদিগণ বলেন, শিক্ষার্থী যখন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন যদি তাহাকে সমগ্র সংস্থানের ছবিটি দেখিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থী নিজেই সমাধানটি খুঁজিয়া পাইবে। তাঁহাদের মতে, আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলিই হইতেছে এই জাতীয় একটা ফাঁক (gap) সম্বন্ধে অনুভূতি এবং এই ফাঁকটুকু ভরাইবার মধ্যেই (principle of closure) আছে ঐ সমস্যার সমাধান।

কিন্তু সমস্যার সমাধানই শিক্ষার শেষ কথা নহে। একটা সমাধানের পর সমাধানের প্রক্রিয়াটিকে মনে রাখিতে হয়, সমাধানের প্রণালীটি অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়। তাহা কি ভাবে সম্ভব? এ সম্বন্ধে গেস্‌টাল্ট্‌-মতবাদীদের নির্দ্দেশ কি? থর্ণডাইক এই সম্বন্ধে 'law of effect or law of reward'

মতবাদে অথবা প্যাভ্‌লভ্‌ তাঁহার 'law of re-inforcement' মতবাদে যাহা বলিয়াছেন, গেস্‌টাল্ট্‌বাদিগণও সেই জাতীয় কথাই বলিয়াছেন। আমরা জানি সমস্ত সমস্যাই হইতেছে একটা "ফাঁক" সম্বন্ধে অনুভূতি এবং সমস্যার সমাধান হইতেছে সেই ফাঁকটি ভর্ত্তি করা। এই ফাঁক ভর্ত্তি করার ব্যাপারে যদি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সার্থক ছবি তৈয়ারী হয়, তাহা হইলেই উহা আমাদের মনে তৃপ্তি দিবে এবং সমাধানের প্রণালীটি আমাদের মনে দৃঢ়ীভূত হইবে। গেস্‌টাল্ট মতে, pregnance and good figure হইতেছে ইহার জন্য প্রয়োজন।

বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা ও সমন্বয়

শিক্ষাতত্ত্বের সম্বন্ধে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের ব্যক্তব্য সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, প্রকৃত সত্যটি কোন্ সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে? ওয়াশ্‌বার্ণ (Washburn) দেখাইয়াছেন, এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে একটা একদেশদর্শিতা আছে, ইহা যেন অনেকটা অন্ধের হাতী দেখার মত। তাই আমরা বলিতে পারি, প্রত্যেক মতবাদের মধ্যেই খানিকটা সত্য আছে এবং সমগ্র সত্যটি হয়ত আছে এই সমস্ত মতবাদের সমন্বয়ের মধ্যে।

এই সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন মতবাদের বিরোধগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় "চেষ্টা ও ভ্রান্তি" মতবাদ ও 'অন্তদৃ‍ষ্টি' মতবাদের মধ্যেই বিরোধটা সর্ব্বাধিক। এই বিরোধটির একটা মীমাংসা হইলে সমন্বয়টি সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমরা দেখিয়াছি, গেস্‌টাল্টবাদিগণ বলিয়াছেন, চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ, সুতরাং এই অন্ধ প্রচেষ্টা শিক্ষার তত্ত্বকথা হইতে পারে না। কিন্তু স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, আমরা যখন সাঁতার কাটিতে শিখি অথবা অনেকগুলি 'বল' লইয়া লোফালুফি (jugling) করিতে শিখি, তখন অন্তদৃ‍ষ্টি আমাদের কোনও সাহায্য করে না, নিছক চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই আমরা ক্রমশঃ সফলতার দিকে অগ্রসর হই। শুধু আঙ্গিক গতি বা অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যাপারেই যে এই চেষ্টা ও ভ্রান্তি কাজ করে তাহা

নহে, মানসিক অভ্যাসের দিক দিয়াও চেষ্টা ও ভ্রান্তির অবদান সামান্য নহে। আমরা যখন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর গণিত বা জ্যামিতির একটা সমাধান খুঁজিয়া পাই তাহাও অন্তর্দৃষ্টির চকিত চমকে হয় না, বহু চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ বহিয়া চলিতে চলিতে সমাধানটি চখের দৃশ্যক্ষেত্রের উপর ফুটিয়া উঠে। ইহা চেষ্টা ও ভ্রান্তি প্রণালীরই একটা শেষ পর্য্যায় মাত্র। বস্তুতঃ (স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে) অন্তর্দৃষ্টি হইতেছে একটা অবিশ্লেষিত (unanalysed) শিক্ষাপদ্ধতি; ইহাদের মধ্যে চেষ্টা ও ভ্রান্তিই গোপনে গোপনে কাজ করিয়া যায়।

এই জাতীয় যুক্তি শুনিয়া আমরা যেন দিশেহারা হইয়া পড়ি। কিছু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, অন্তর্দৃষ্টির ফলেই কুহ্‌লার-এর কুকুরটি অথবা শিম্পাঞ্জীগুলি কত সহজেই তাহাদের সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এখন আবার দেখিতেছি, শিক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা ও ভ্রান্তির অবদানও সামান্য নহে। তাহা হইলে শিক্ষার তত্ত্বটি কোথায়?

আমাদের মনে হয়, দৈহিক অভ্যাস-গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে চেষ্টা ও ভ্রান্তির কাজ খুব বেশী হইলেও, প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গেস্‌টাণ্ট্‌দিগের মতবাদ অনস্বীকার্য্য। ভাষাগত একটা বিমূর্ত্ত চিন্তা-শক্তির দ্বারা ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে আমরা একটা ফাঁক (gap) বুঝিতে পারি, পরে যখন অন্তর্দৃষ্টি-চালিত পথে পরিচালিত হইয়া এই ফাঁকটি ভরাট করি, তখনই হয় সমস্যার সমাধান। উড্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন:

"A problem amounts to a "gap" in the present situation, insight amounts to perceiving the gap and insightful behavior closes the gap".

এই ফাঁক ভর্ত্তি করার ব্যাপারটাই হইতেছে শিক্ষার সমাপ্তি। কিন্তু এই সমাপ্তির পথটি হইতেছে চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ।

গেস্‌টাণ্টবাদিগণ চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথকে অন্ধ অভিযানের পথ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক অন্ধ অভিযান নহে। ইহা হইতেছে আবিষ্কারের (exploration)-এর পথ। লক্ষ্য যখন অনাবিষ্কৃত থাকে, তখন এই

আবিষ্কারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। সমস্যার ইহাই হইল মূল তত্ত্ব। নতুবা লক্ষ্যবস্তুটি যদি দৃশ্যমানই হইল, তাহা হইলে আর সমস্যাটি কোথায় থাকে? আর তাহার সমাধানেরইবা বাকী থাকে কতটুকু? আইনষ্টাইন্ (Einstein) যখন ম্যাক্সওয়েল্-সমীকরণ (Maxwell equation) হইতে "অপেক্ষবাদে"র (relativity) দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি ঠিক থর্ণডাইকের বিড়ালের মত অন্ধ প্রচেষ্টা করেন নাই বটে, তবে তিনিও খানিকটা অন্ধ ছিলেন, কারণ লক্ষ্যবস্তুর সহিত তাঁহার তখনও প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই; তবে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিমূর্ত্ত চিন্তা লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল এইমাত্র। এই ইঙ্গিতের ফলে তিনি আবিষ্কারের অভিযান চালাইতে ছিলেন। জীবন সংস্থান যখন অন্ধ ও অজ্ঞাত হইবে, তখন আবিষ্কারের প্রণালীটিও খানিকটা অন্ধ হইতে বাধ্য। ইহা ইতর প্রাণীর পক্ষেও যতটা সত্য মানুষের পক্ষেও ততটাই সত্য।

এইভাবে বিচার করিলে অন্তর্দৃষ্টি এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির বিরোধটি অনেকখানি কমিয়া যায়। এই হিসাবেই ম্যাক্ কোনেল (Mc Connell) বলিয়াছেন:

"Trail and error method is not a senseless process—it is a process of approximation and correction It is consequently the essence of reasoning."

যতই দিন যাইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদগুলি ততই যেন কাছাকাছি আসিয়া একটা সমন্বয়ের পথ খুঁজিতেছে। কাজেই, কোনও একটি বিশিষ্ট মতবাদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত মতবাদ হইতেই শিক্ষা সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক পথ নির্দ্দেশের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন শিক্ষাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(ক) বন্ধনীবাদ: বন্ধনীবাদের মূল কথাটি এই যে, আমরা তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবৃত্তি করি এবং বিরক্তিকর জিনিসগুলি এড়াইয়া চলি।

"S" এবং "R"-ঘটিত বন্ধনীগুলি তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই তৃপ্তি বিরক্তির তত্ত্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানে খুবই প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ছাত্রদিগকে তিরস্কার করি বা শাস্তি দিই। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, শাস্তি বা তিরস্কার পাইলে ছাত্রগণ আর অন্যায় করিবে না, শাস্তি বা তিরস্কারের অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা এড়াইয়া চলিবার জন্যই তাহারা অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাকিবে। কথাটা খানিকটা সত্য হইলেও, সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। মৃদু তিরস্কারে খানিকটা ইপ্সিত ফল পাওয়া যাইলেও, তীব্র তিরস্কার বা শাস্তিতে প্রায়ই ফল বিপরীত হয়। অমনোযোগী বা অপরিচ্ছন্ন হইবার জন্য কোনও বালক যদি কঠোরভাবে তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে সে সংশোধিত হয় না, বরং অপরিচ্ছন্ন বা অমনোযোগী হইবার জন্য তাহার জেদ যেন বাড়িয়াই যায়।

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে, তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কারই হইতেছে শিক্ষার শক্তিশালী প্রেষণা*। এই পুরস্কারের অর্থ ছাত্রতোষণ নহে ; সফলতার আনন্দই সারস্বত সাধকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শিক্ষকের সর্ব্বপ্রধান কাজ হইতেছে, শিক্ষার সফলতার পথ সুগম করিয়া দেওয়া।

ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হইতেছে নির্ভুল আরম্ভ ও নির্ভুল উপস্থাপন। শিক্ষার জিনিসগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং এমন ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রদের প্রথম চেষ্টাগুলি সফল হয়। পাটীগণিত, বিজ্ঞান, অনুবাদ প্রভৃতির অনুশীলনের সময় ছাত্রদের অর্জ্জিত বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খুব সহজ সহজ প্রশ্ন প্রচুরভাবে দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্ররা বহুবার সঠিক উত্তর দিতে পারে। এই সফলতার আনন্দই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় দান করিবে। এইভাবে কাজ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের অভ্যাস দৃঢ়তর হইবে। তখন তাহারা ক্রমশঃ কঠিনতর প্রশ্ন সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ

* Learning seem to be best explained as a process of reward (Skinner : Educational Psychology P. 552)

ব্যবস্থা না করিয়া হঠাৎ কঠোর প্রশ্ন তাহাদের কাছে উপস্থাপিত করিলে তাহারা মুখতাড়া খাইয়া শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে বিমুখ হইয়া উঠিবে।

(খ) শিক্ষাতত্ত্বে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ : শিক্ষার ব্যাপারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য সাইমণ্ডস্ সাহেব ২৩টি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (Sandiford : Educational Psychology, pp. 202-204)। এই সমস্ত সূত্রগুলির স্মরণীয় সারার্থ এই :

১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে দৃঢ় করিবার জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন (থর্ণডাইকের পুনরাবৃত্তিবাদের সহিত তুলনীয়)।

২। অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া অনেক সময় বন্ধনী সৃষ্টিতে ব্যাঘাত করে। এইজন্যই তীব্র তিরস্কার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাঘাত সৃষ্টিকর।

৩। একটানা কাজের চেয়ে সবিশ্রাম কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

৪। বহুদিন অনভ্যাসে বন্ধনীর শক্তি শিথিল হইয়া যায় এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াজনিত শিক্ষা আমরা ভুলিয়া যাই।

৫। প্রাচীন অভ্যস্ত বিদ্যা ভুলিয়া যাইলেও পুনরায়ত্ত করিতে অল্পতর সময় লাগে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার একটা প্রাথমিক সর্ত্তই হইতেছে পূর্ব্বাস্বাদজনিত ঔৎসুক্য ও প্রস্তুতি (anticipatory adjustment)। কুকুরের মুখে লালা নিঃসরণ হইবার কারণ মাংস প্রাপ্তির পূর্ব্বাস্বাদজনিত প্রস্তুতি ও ঔৎসুক্য।

শিক্ষার ব্যাপারে এই পূর্ব্বাশা ও পূর্ব্বাস্বাদজনিত প্রস্তুতি না থাকিলে কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থাই ফলবতী হয় না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল, ছেলেরা বুঝিল পড়িবার সময় হইয়াছে ; শিক্ষক আসিলেন, ছাত্ররা তাঁহাকে শিক্ষকের বিধি-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকায় গ্রহণ করিল, পড়াশুনার জন্য একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। এই মানসিক প্রস্তুতি না থাকিলে অর্থাৎ ছাত্র যদি বিষয়ান্তরের চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহাকে কোনও পাঠই দেওয়া যায় না।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ঠিক পূর্ব্বেই যে উদ্দীপকটি (যেমন ঘণ্টাধ্বনি) দেওয়া হয়, তাহাকে 'ইঙ্গিত উদ্দীপক' (Cue Stimulus) বলা যাইতে পারে। আমরা জানি এই ইঙ্গিত উদ্দীপকটি ঠিক সময়ে প্রযুক্ত না হইলে S-CR

বন্ধনীটি সৃষ্টি হয় না। শিক্ষাতত্ত্বে ইহা একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য। ক্লাশে পড়াইবার সময় ঠিক যখন ছাত্রের প্রয়োজন হইবে ঠিক সেই সময়টিতেই যদি সে শিক্ষকের সাহায্য পায়, তাহা হইলেই তাহার শিক্ষাটি ভাল হইবে। এইজন্য রচনা প্রভৃতি সমাপ্ত হইবার অনেক পরে তাহার রচনার "post mortem" সংশোধনের ফল ভাল হয় না। এই জন্যই একটি ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে হইলে সেই ভাষাভাষী পরিবেশে তাহা ভাল হয়।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কতকগুলি পর্ব্ব বহিয়া একটা পারম্পরিক ক্রম অনুসারে চলে এবং ক্রমশঃ S ও CR-এর মধ্যবর্ত্তী প্রক্রিয়াগুলি বাদ যায়। একটি ভেড়াকে প্রয়োগশালায় লইয়া আসা হইল, একটি টেবিলের উপর তাহাকে রাখা হইল, উপযুক্ত সাজসজ্জা পরান হইল, ঘণ্টাধ্বনি করা হইল এবং পরে একটা বৈদ্যুতিক "শক্" লাগান হইল। ইহার ফল হইল টেবিল হইতে লম্ফ প্রদান। পরে বার বার এই প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাইল, ঐ ভেড়াটি প্রথমতঃ "শক্" খাইলে তবে লাফ দিত, পরে ঘণ্টা ধ্বনিতে, পরে পোষাক পরাইতে এবং আরও পরে শুধু টেবিলের উপর রাখিতে না রাখিতেই সে লাফ মারিত। এই ভাবে মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বগুলি উঠিয়া যায়। হলিঙ্‌ওয়ার্থ (Hollingworth) এই ব্যাপারটিকে "telescoping" আখ্যা দিয়াছেন।

এই "telescoping out" হওয়ার ব্যাপারটি শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। একজন ছাত্র হয়ত পড়াশুনা তৈয়ারী করে নাই বলিয়া তাহাকে ছুটির পর আধ ঘণ্টার জন্য আটকাইয়া রাখিয়া পড়া তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা হইল। এখন তাহার প্রাথমিক 'S' হইল পাঠে অমনোযোগ; শেষ 'R' হইল আধঘণ্টা (৪॥টা পর্য্যন্ত) বাড়তি থাকা, আর মাঝের জিনিসগুলি হইল পড়াটি তৈয়ারী করিয়া দেওয়া, সংশোধিত হওয়া, শিক্ষকের নির্দ্দেশ পালন করা। এখন ছাত্রটিকে যদি প্রায়ই আধ ঘণ্টা রাখা হয়, তাহা হইলে শুধু প্রাথমিক "S" ও শেষ "R" অর্থাৎ ৪॥টা বাজা, এই দুইটির মধ্যেই সংযোগ স্থাপিত হইবে। মাঝের কাজগুলি অর্থাৎ সংশোধনী চেষ্টা, পড়াশুনা করা, এইগুলি বাদ যাইবে; সে শুধুই ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া কালক্ষেপ করিবে। ইহাতে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

শিক্ষককে এই তত্ত্বটি মনে রাখিতে হইবে। শাস্তির সহিত শাস্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুটি সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে, নতুবা অপরাধী তাহার শাস্তিকে কৃত অপরাধের একটা অখণ্ডনীয় ফল মাত্র মনে করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহার আত্ম সংশোধনের মাঝের প্রক্রিয়াগুলি বাদ যাইবে।

(গ) শিক্ষাতত্ত্বে গেস্‌টাল্ট মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ: এই মতের দৃশ্য বস্তুর সংগঠন ও অন্তর্দৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শুধু দর্শন-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই যে এই নিয়মগুলি প্রযুজ্য তাহা নহে, সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপারেই ইহা সমানভাবে প্রযুজ্য। কাজেই শিক্ষা ব্যাপারেও এই নিয়মগুলি কার্য্যকরী হইবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা-গুলি প্রতিনিয়তই নূতন নূতন জীবন পরিবেশে নূতন ভাবে জোট পাকাইয়া, নূতন ভাবে সংগঠিত হইয়া নূতন নূতন এককের সৃষ্টি করে। এইজন্যই কুহ্‌লার (Kohler) বলিয়াছেন, শিক্ষা হইতেছে একটা সক্রিয় সংগঠনকারী (Learning may be described as an organizing process. Kohler—Gestalt Psychology P. 267) প্রণালী মাত্র।

নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইবামাত্র শিক্ষার্থীর কাজ হইতেছে নূতন পরিবেশে তাহার অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া ঠিক ভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া। পুরাতনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতনকে গ্রহণ এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে অভিজ্ঞতাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হয়। "All problems are solved as soon as the learner has achieved insight into their essential relationship" (Hartman)।

একটি ধূসর বর্ণের বাক্সের মধ্যে খাদ্য রাখিয়া একটি জন্তুকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইল। পরে 'ক' ও 'খ' দুইটি বাক্স রাখিয়া তাহাকে খাদ্য খুঁজিয়া লইতে দেওয়া হইল। "খ" বাক্সটি ধূসরতর বর্ণের এবং প্রত্যেক বারেই "খ" বাক্সের মধ্যেই খাদ্য রাখা হয়। প্রাণীটি প্রত্যেক-বারেই খাদ্য নির্ভুলভাবে খুঁজিয়া বাহির করে। এইবার বস্তু দুইটির সংস্থান পরিবর্ত্তন করা হইল। তাহাতেও ঠিক বাক্সটিকেই (খ) খুলিয়া সে খাদ্য

সংগ্রহ করিত। এইবার "ক" বাক্সটি সরাইয়া একটি তৃতীয় বাক্স "গ" দেওয়া হইল। এই বাক্সটি "খ" অপেক্ষা আরও ধূসরতর। এইবার প্রাণীটি কোন বাক্সটি খুলিবে? মাঝারি ধূসর বর্ণের বাক্সের সেই নির্দ্দিষ্ট (specific) উদ্দীপকেই কি সে সাড়া দিবে? না; সে "গ" বাক্সটিই খুলিবে। "খ"-এর সহিত "গ"-এর সম্পর্ক হইতেছে 'অধিকতর ধূসরতা'; এই অধিকতর ধূসরতার সম্পর্কবোধটাই তাহাকে "গ" বাক্সটি খুলিতে শিক্ষা দিবে—বিধি-নির্দ্দিষ্ট (specific) উদ্দীপক তাহা দিবে না।

এই পারস্পরিক 'সম্পর্কবোধটি' সৃষ্টি করিবার জন্য কি কি নিয়ম কাজ করে তাহা পূর্ব্বেই কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। সেই নিয়মগুলি ছাড়া আরও দুইটি নিয়ম আছে—generalization ও differentiation.

কাঁচা আম সবুজ এবং টক্। এই জাতীয় দু'চারটি অভিজ্ঞতা হইতে আমরা generalise করি সবুজ আম মাত্রই টক্। পরে যখন দেখি নেংড়া, বোম্বাই প্রভৃতি আম সবুজ হইলেও বেশ মিষ্ট, তখন আমরা আবার differentiate করি—"সবুজ আম মাত্রই টক্ নহে।" এইভাবেই আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান অগ্রসর হইতে থাকে। ৪ × ২ ৮ × ৪ ১৫ × ৩ প্রভৃতি গুণ করিয়া দেখি গুণফলটি ভারী সংখ্যা হইতেছে। তখন সিদ্ধান্ত করিলাম, "গুণ করিলে সংখ্যা ভারী হয়।" কিন্তু যখন ৪ × $\frac{১}{২}$, ৮ × $\frac{১}{৪}$, ১৫ × $\frac{১}{৩}$ জাতীয় গুণগুলি করিলাম তখন অভিজ্ঞতার ধাক্কা লইয়া বুঝিলাম গুণ করিলেই যে সংখ্যাগুলি ভারী হইবে, ইহা সর্ব্বত্র ঠিক নহে। এই generalise করিয়া যে নিয়মটি খাড়া করিয়াছিলাম, differentiate করিয়া তাহার ব্যতিক্রমটি আবিষ্কার করিয়া শিক্ষাকে পূর্ণতর করিলাম, অতীত অভিজ্ঞতাকে নূতনের আলোকে ঢালিয়া সাজাইলাম। গাড়ীর যেমন গতি ও 'ব্রেক্',—অভিজ্ঞতারও তেমনি generalization ও differentiation; এই দুইটি প্রণালীর কোনটিরও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। প্রতিনিয়তই যদি আমরা generalise করিয়া নিয়ম তৈয়ারী করি, তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করে। কলিকাতার একজন বা দুইজন লোক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিল। আমি অমনি generalise করিয়া বসিলাম

"কলিকাতার লোকগুলি বড় দুষ্ট"—এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে প্রতিনিয়তই যদি আমরা differentiate করিয়া ব্যতিক্রমই সন্ধান করি, তাহা হইলে অভিজ্ঞতার বস্তুপুঞ্জের মধ্যেও মূর্খ থাকিব, কোনও সমাধানই স্থির করিতে পারিব না, অভিজ্ঞতার 'বাঁশবনে ডোম কানা' হইয়া জড়ধীর মত আচরণ করিব।

এই generalization ও differentiation-এর দুইটি নিয়ম ছাড়াও, গেস্টাল্ট্-মনোবিদ্যার কতকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক আছে। যথা—

(১) যে কোনও সমস্যা শিক্ষার্থীর কাছে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে। শিক্ষক হয়ত তাঁহার ছাত্রকে বীজগণিতের factor বুঝাইতে অথবা পাটীগণিতের ভগ্নাংশ বুঝাইতে চান। এখন তাঁহার কাজ হইবে খণ্ড হইতে পূর্ণের দিকে না যাইয়া পূর্ণ হইতে তাহার অংশীভূত খণ্ডের সম্পর্ক বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা এবং সেই প্রসঙ্গেই factor বা ভগ্নাংশের উপস্থাপন করা।

(২) শিক্ষার্থীকে তাহার কাজের গতি ও যতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সময়মত তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহার কাজ হইবে ছাত্রদের অগ্রগতিকে শুধু সাহায্য করা, জোর করিয়া ঠেলিয়া (assisting and not pushing the student's rate of progress.) দেওয়া নয়।

(৩) শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও emotional অবস্থার সংবেগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে তাহার সমস্যার সমাধানের জন্য ইঙ্গিত দিতে হইবে।

(৪) ছাত্রের প্রয়োজন হইলেই তাহাকে প্রচুর সাহায্য দিতে হইবে। এই সাহায্যটি এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের আত্মপ্রচেষ্টা (self activity) বিশেষভাবে প্রেরণাযুক্ত হয়।

(৫) ধর্ম্মতত্ত্বে একটা কথা আছে "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" এই কথাটি শিক্ষাতত্ত্বেও প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। অভ্যাস সৃষ্টির দিক দিয়া, নিরর্থক শব্দ মুখস্ত করিবার দিক দিয়া এই আবৃত্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। যাঁহারা অনুষঙ্গবাদ ও বন্ধনীবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও এই

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনকে খুব বড় একটা স্থান দিয়াছেন, কারণ পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াই স্নায়ুগত (বা ভাব-সম্বন্ধগত) বন্ধনীগুলির সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। কাজেই অভ্যাস তৈয়ারীর দিক দিয়া অনুশীলন (drill), পুনরাবৃত্তি, এমনকি যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু ওয়ার্দাইমার প্রভৃতি গেস্টাল্ট্-বাদিগণ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধির (understanding) উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন, অন্ধ অনুশীলন আমাদের বুদ্ধিকে "নিয়মের" দাস করিয়া ফেলে, ফলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কাজেই গণিত প্রভৃতিতে বিশেষ একজাতীয় অঙ্ক শিখাইতে হইলে সেই জাতীয় বহু কঠিন কঠিন অঙ্ক না কষাইয়া বাছা-বাছা ছোট অঙ্কের ভিতর দিয়া সমাধানের তত্ত্বটি সম্বন্ধে উপলব্ধির সৃষ্টি করিলেই সমাধানটি বেশী আয়ত্ত হইবে। তবে ক্ষিপ্রকারিতার জন্য অভ্যাসের ও অনুশীলনের প্রয়োজন বরাবরই থাকিবে।

(৬) গেস্টাল্ট্ মতে ভাল শিক্ষকের কাজ হইতেছে ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টিকে উৎসাহিত করিয়া নূতন নূতন সমস্যাকে বুদ্ধিমানের মত আক্রমণ ও আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত মনোভাব তৈয়ারী করা।

মোট কথা, উপসংহারে বলা যায়, সমস্ত মতবাদেই কিছু না কিছু সত্য আছেই। শিক্ষকের কর্তব্য এই পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে সমন্বিত করিয়া সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষণের পথে অগ্রসর হওয়া।

শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম

কবি বলিয়াছেন—"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং।
স্বল্পং তথায়োর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ॥"

সুতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে, সেটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া কিভাবে ন্যূনতম সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে নানা প্রকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন—কিভাবে একাগ্রভাবে মনকে কেন্দ্রীভূত করা যায়, কিভাবে 'ভাব-সম্বন্ধ' বা 'অনুষঙ্গ' দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্নচিন্তাগুলিকে একত্র গাঁথিয়া রাখা যায়, ইত্যাদি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা সেগুলি আলোচনা করিব না। আমরা ধরিয়া লইতেছি, একই মানুষ একই রকম বুদ্ধির যন্ত্র লইয়া কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে কাজ করিলে অর্থাৎ কাজ ও বিশ্রামের সময়গুলি কিভাবে সাজাইলে তাহার সফলতা সর্ব্বাধিক হইবে?

ধরা যাইতে পারে, একজন ছাত্রের হাতে একটি বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ ঘণ্টা সময় আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পড়িবার সময়গুলি কিভাবে ভাগ করিলে, প্রত্যেক বারে কতক্ষণ ধরিয়া কাজ করিলে এবং কতখানি সময় বিশ্রামের জন্য অবসর রাখিলে তার ফল শ্রেষ্ঠ হইবে।

এই ১২০ ঘণ্টা সময়কে আমরা হয়ত এইভাবে ভাগ করিতে পারি—

১ বারে—	একটানা	১২০ ঘণ্টা
২ "	"	৬০ ঘণ্টা করিয়া
১০ "	"	১২ " "
৬০ "	"	২ " "
১২০ "	"	১ " "
২৪০ "	"	½ " "

প্রথম তিনটি ব্যবস্থার ফল ভাল হইবে না, ইহা নির্ব্বিচারে বলা চলে। তবে শেষের তিনটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ হইবে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষা খুব বেশী হয় নাই, তবে পাটীগণিত, টাইপ্-রাইটিং প্রভৃতির দক্ষতা লইয়া কিছু কিছু পরীক্ষা হইয়াছে।

থর্ণডাইক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ১৯২টি বালক লইয়া ছাত্রদের যোগ করিবার ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পড়িবার সময়গুলিকে ৫, ৭½, ১০, ১১¼, ১৫ এবং ২২½ মিনিট এইভাবে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, শেষোক্ত সময়গুলি অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে।

কিন্তু পাইল (Pyle), স্টার্চ (Satrch), এবিঙ্গহোস (Ebbinghaus) জোস্ট (Jost) প্রভৃতি পণ্ডিতের পরীক্ষার ফল অন্যরূপ দেখা গিয়াছে। ইহাদের পরীক্ষার ফলে ৩০ মিনিটের বিভাগগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল, ইহাতে কতখানি সময় এক সঙ্গে একাসনে বসিয়া কাজ করিলে ভাল কাজ হয় তাহারই বিচার হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি ভাবিবার কথা আছে। কতক্ষণ ধরিয়া একটি কাজ অভ্যাস করিতে হইবে তাহা না হয় স্থির হইল, কিন্তু প্রথম অভ্যাসের পর কতখানি বিশ্রাম করিয়া অথবা কতখানি সময় বাদ দিয়া দ্বিতীয় বার অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাও অবশ্য ভাবিবার কথা।

এই সম্বন্ধে ডিয়ারবোর্ণ (Dearborn) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ছাত্রদের দুইটি দলে ভাগ করিলেন, উভয় দলই দিনে দশ মিনিট করিয়া অভ্যাস করিল; তবে প্রথম দলটি অভ্যাস করিল দিনে একবার মাত্র, আর দ্বিতীয় দলটি অভ্যাস করিল দিনে দুইবার করিয়া। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, প্রথম দলটি ঐ কাজটি ১৬ দিনে এবং দ্বিতীয় দলটি ১৮ দিনে করিয়াছিল।

লিওন্ (Lyon) সাহেব কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা চালান। পরীক্ষাটি ছিল একাসনে বসিয়া মুখস্থ করা অর্থাৎ দিনে একবার মাত্র আবৃত্তি করা। অর্থযুক্ত কবিতা বা গদ্যের অনুচ্ছেদ মুখস্থ করার ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল যে, এই দুইটি প্রক্রিয়াতেই প্রায় একই রকম ফল হইয়াছিল। কিন্তু

সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় অথবা অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করিবার ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল, দিনে একবার করিয়া অভ্যাস করিলেই সময়ের সদ্ব্যবহার বেশী হয়।

অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার ব্যাপারটি জোস্ট সাহেব অন্য একভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একটি অনুচ্ছেদকে দিনে দশ বার আবৃত্তি করাইয়া—তিনদিন ধরিয়া আবৃত্তি করা এবং সেই অনুচ্ছেদটিকেই একদিনে ত্রিশবার আবৃত্তি করা, এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন, প্রথম ব্যবস্থায় শতকরা ১৫ ভাগ সুবিধা বেশী হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড ভাবে সবিশ্রাম কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কেন?

গ্রাহাম ওয়ালার (Graham Wallar) বলেন, অবিশ্রাম অভ্যাসের মধ্যে মন এমন একটি অবসর পায় না, যাহাতে অভ্যাসলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ভবিষ্যৎ দক্ষতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সবিশ্রাম অভ্যাসের মধ্যে সেই অবসরটুকু তাহার জুটিয়া থাকে। সেইজন্যই সবিশ্রাম অভ্যাসে শক্তি ও সময়ের অপচয় কম হয়।

জার্ম্মানদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, "আমরা শীতকালে সাঁতার কাটিতে শিখি এবং গ্রীষ্মকালে স্কেট খেলিতে শিখি।" অথচ মজার কথা হইতেছে, তাহাদের দেশে শীতকালে সাঁতার কাটিবার মত জলের অবস্থা থাকে না এবং গ্রীষ্মকালে স্কেট খেলিবার মত জমাট বরফও রাস্তাঘাটে থাকে না। অধ্যাপক জেম্‌স এই প্রবাদটির উপর খুব বেশী একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে আমরা সাঁতার কাটিতে অভ্যাস করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যাসের ফলগুলি দানা বাঁধিতে বা পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করে শীতের বিশ্রামের নিরিবিলি সময়টিতেই।

এইজন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, হয়ত একটি অঙ্ক লইয়া আমরা মাথা ঘামাইয়া কূল-কিনারা পাইতেছি না। তাহার পর ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে ঘুমের মধ্যেই অথবা ঘুমের বিশ্রামের পরই অঙ্কটির সমাধান ঠিক হইয়া গেল।

কেন এরূপ হয়? অধ্যাপক জেম্‌স বলেন, জাগ্রত ভাবে অভ্যাসনিরত

থাকার সময় অনুষঙ্গের (association) গোলমাল, একগ্রতার ব্যাঘাত, মনের একগুঁয়েমি প্রভৃতি কারণে সফলতায় বিঘ্ন আসে, কিন্তু নিদ্রার সময় বিশ্রামের নিরিবিলি অবসরে সেই বিঘ্নগুলি থাকে না বলিয়া সমাধানটি সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ড আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, অভ্যাসের অভাব জিনিসটা আমাদের দক্ষতাকে নিপুণতর করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিতে পারা যায় না এবং অবিশ্রাম অভ্যাসে নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস অপেক্ষা ফল ভাল হইলেও, এ কথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, বিশ্রামের মেয়াদ বেশী দীর্ঘ হইলেও ফল ভাল হয় না।

অধ্যাপক থর্ণডাইক বলেন, অনভ্যাসে যে পটুতা বৃদ্ধি করে তাহা ঠিক নয়। তবে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ এই ঃ

(১) অনভ্যাসের সময় পরিশ্রমজনিত অবসাদটি কাটিয়া গিয়া আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলি সবলতর হয়।

(২) একটানা অভ্যাসের সময় মনের মধ্যে যে একটা বিরক্তি ও অমনোযোগিতার ভাব আসে, অনভ্যাসের সময় তাহা কাটিয়া যায়।

(৩) উৎসাহের আতিশয্যে অভ্যাসের সময় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল পথে ছুটাছুটি করি, বিশ্রামের স্থৈর্য্যের সময় তাহা সংযত ও সংশোধিত হইয়া যায়।

সুতরাং থর্ণডাইক-এর মতে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা লাভ হয়, তাহা জেম্‌স্‌-বর্ণিত অভ্যাসের অন্তঃপুত্তির (Consolidation) জন্য ততটা নহে, যতটা হইতেছে বিশ্রামজনিত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

শিক্ষা-তত্ত্বে আর একটি প্রশ্ন প্রায়ই অনেকের মনে উদিত হয়। প্রশ্নটি হইতেছে—আমাকে যদি একটি দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, তাহা হইলে কবিতাটিকে সমগ্রভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে, না অংশতঃ খুচরা খুচরা ভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে? এই বিষয়টিও পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অর্থযুক্ত কবিতা হইলে, ৫ হইতে ২৪০ পংক্তি পর্য্যন্ত দীর্ঘ কবিতাগুলি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে বেশী শীঘ্র মুখস্থ হয়।

শারীরিক দক্ষতা অর্জ্জনের ব্যাপারে কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, অংশতঃ কাজ

করিলে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সিদ্ধি হয়। পেক্‌স্টাইন (Pechstin) প্রভৃতি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শুধু শারীরিক দক্ষতা বিষয়ে নয়, অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার সময়ও অংশতঃ কাজ করিলে কম সময়ে বেশী কাজ হয়। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্রভাবে পাঠ করিলে সব সময়েই যে সময়ের মিতব্যয় হয় তাহা নহে। যদি একাসনে বসিয়া একটানা ভাবে কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র জিনিসটা প্রত্যেক বারে আবৃত্তি করার চেয়ে একটু একটু করিয়া মুখস্থ করিয়া অগ্রসর হইলেই কাজ ভাল হয়; আর সবিশ্রাম কাজ করিলে অর্থাৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুই একদিন বিশ্রাম করিলে, সমগ্রভাবে কাজগুলি বেশী ফলপ্রসূ হয়।

বিশ্রামের মেয়াদটি কতখানি প্রলম্বিত করিলে দক্ষতা অর্জ্জনে সুবিধা হয়, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়াছে। ধরুন, এইমাত্র আমি একটি কবিতা মুখস্থ করিলাম। মুখস্থ করিবার পর যদি পুনরাবৃত্তি না করা হয়, অর্থাৎ মুখস্থ করার পর সঙ্গে সঙ্গেই যদি পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক ঘণ্টার পর দেখিব প্রায় $\frac{১}{২}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি, তৃতীয় দিনে $\frac{২}{৩}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি এবং ১ মাস পরে $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য মুখস্থ হইবার পর যদি আরও অনেকবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে এই বিস্মৃতির হারটি আরও অনেক কম হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও কিছু শিখিবার অপেক্ষা তাহা ভুলিয়া যাওয়াটা কঠিনতর। আমরা অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে পারি না, কিন্তু একটা ভাষার বর্ণমালা শিখিতে খুব বেশী সময় লাগে না।

অর্থহীন শব্দসমষ্টি শিক্ষা শেষ হইবার পর কতটুকু সময় অতীত হইলে কতটুকু অংশ মনে থাকে তাহা লইয়া এবিঙ্গহৌস সাহেব পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, শিক্ষা সমাপ্তির পর ৫ মিনিট সময় গত হইলে ৯৮% ভাগ মনে থাকে, ১০ মিনিট পরে ৮৯% ভাগ, ৭ ঘণ্টা পরে ৭১%ভাগ, ৮ ঘণ্টা পরে ৪৭% ভাগ এবং ২৫ ঘণ্টা পরে ৬৮% ভাগ মনে থাকে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ৪৮ ঘণ্টা পরে ৬৮% স্থলে ৬৯% ভাগ মনে থাকে, অর্থাৎ একদিন গত হইলে যতটা মনে থাকে, দুইদিন গত হইলে তাহার চেয়ে বেশী মনে থাকে।

ব্যালার্ডও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি গড়ে বারো বৎসর দশ মাস বয়স্ক ছাত্রদের লইয়া কাউপার-এর 'Loss of Royal George' নামক কবিতাটি পড়িতে দেন। তের মিনিটকাল পড়া হইবার পর তাহাদের নিকট হইতে বইগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল এবং ছাত্রদের বলা হইল কবিতাটি মুখস্থ লিখিতে। পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত ছাত্রদের এই কবিতাটি সম্বন্ধে কিছুমাত্র পরিচয় ছিল, তাহাদের বাদ দিয়া মাত্র ১৯ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র ছাত্র ৩৬ লাইনের সমগ্র কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে, আর অবশিষ্ট ছাত্রদের কৃতকার্য্যতার গড় হইল ২৭·৬ লাইন।

এই ঘটনার দুইদিন পরে তিনি ঐ বালকদের আকস্মিকভাবে আবার পরীক্ষা করিলেন। শিক্ষক বা ছাত্র কেহই ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং এই সময়টির মধ্যে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি হয় নাই। এবারের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, গতবারের একজনের জায়গায় ৮ জন ছেলে পুরা কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সাধারণ ছাত্রদের কৃতকার্য্যতার গড় হইয়াছে ৩০·৬ লাইন। আরও দেখা গেল যে, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে অবনতি একজনেরও হয় নাই, আর উন্নতি হইয়াছে ১৬ জনের।

এই অদ্ভুত ফল দেখিয়া তিনি বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ৫১৯২ জন ছাত্রের উপর তাঁহার পরীক্ষা চালাইলেন এবং বিভিন্ন দিনের ব্যবধানে কাহার কতটা মনে থাকে তাহাও লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক দিনের ব্যবধানে শতকরা ১·৬ ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু দুইদিনের ব্যবধানে শতকরা ৯·৪ এবং তিন দিনের ব্যবধানে ৬·১ লাভ হইয়াছিল। আবার চার দিনের ব্যবধানে শতকরা ২ ভাগ, পাঁচ দিনে ৫·৮ ভাগ, এবং সাত দিনে ১২·১ ভাগ ক্ষতি হইয়াছিল।

এই সব পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ :

(১) একটানা পড়ার চেয়ে সবিশ্রাম পড়া ভাল।

(২) অর্থযুক্ত অনুচ্ছেদ বা কবিতা মুখস্থ করিতে হইলে (এবং কবিতাটি দৈর্ঘ্যে ২৪০ লাইনের বেশী না হইলে) কবিতাটি প্রত্যেক বারেই সমগ্রভাবে দু'ই বার করিয়া প্রতিদিন পড়িলে কাজ ভাল হয়।

(৩) নিরর্থক শব্দসমষ্টি বা টুকিটাকি জ্ঞানের বিষয় মুখস্থ করিতে হইলে দশ-পণেরো হইতে ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত সময় প্রতিদিন বা একদিন অন্তর পাঠ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৪) শারীরিক দক্ষতার ব্যাপারে অংশতঃ অগ্রসর হইয়া কাজ করিলে সময়ের অপচয় কম হয়।

(৫) মুখস্থ হইবার পর আরও খানিকক্ষণ আবৃত্তি করিলে বেশীদিন মনে থাকার সুবিধা হয়।

(৬) সবিশ্রাম সাধনার পথে দুইদিনের বিশ্রামটিতে অপচয় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়।

সাধনার পথে চলিতে এই সমস্ত তথ্যগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। তাহা হইলেও, এইগুলি লইয়া বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। একটা কাজ একসঙ্গে দশ মিনিট করিব, কি আধ ঘণ্টা করিব, ঘড়ি ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। কাজের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ এবং কৌতূহল বর্ত্তমান থাকিলে ঘড়ির কাঁটার গতি দেখিয়া মাঝপথে জোর করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ কাজে আনন্দ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী মনোযোগকে দুর্ব্বল বা বিক্ষুব্ধ করিয়া না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটানাভাবে কাজ করিলে শক্তির অপচয়ের কোনও আশঙ্কা নাই। তবে মনোযোগ যখন ব্যাহত হয়, মন যখন ক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন খানিকটা সময় বিশ্রাম করা ভাল, কিন্তু এই বিশ্রামের সময়টি এমন দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, যাহাতে একটানা অনভ্যাসে ভাব-সম্বন্ধের বা অনুষঙ্গের (association) গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া প্রথম অভ্যাসের ফলটুকু নষ্ট হইয়া যায়।

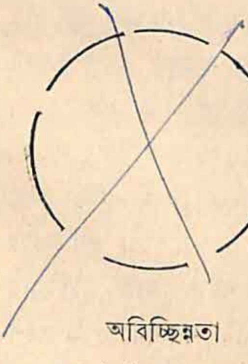
ইহা ছাড়া আর একটি কথা আছে। একটানা কাজ করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নাই। কাজেই সকলের জন্য বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দিলে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্ভাবনা অনেকটা নষ্ট করিয়াই দেওয়া হয়। প্রতিভার একটা লক্ষণই হইতেছে, একটানাভাবে অধিকতর সময় কাজ করিবার ক্ষমতা। সুতরাং প্রতিভাশালী বালকদের প্রতি যদি সব সময়েই উপদেশ দেওয়া হয়, "সাবধান, আধ ঘণ্টার বেশী পড়িও না, এইভাবে বিশ্রাম করিবে,

এইভাবে পড়াশুনা করিবে", তাহা হইলে তাহার কাজের স্ফূর্ত্তির উপর জোর করিয়া লাগাম পরাইয়া তাহার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞানের তথ্যগুলি না জানার মধ্যে বাহাদুরী কিছু নাই, তাহা একপ্রকার অন্ধতারই নামান্তর মাত্র; আবার বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সম্বন্ধে গোঁড়ামিও অন্য এক জাতীয় অন্ধতা আনয়ন করে। সাধনার পথে চলিতে হইলে এই উভয় জাতীয় অন্ধতা পরিত্যাগ করিয়াই চলা বাঞ্ছনীয়।

ধরিয়া লইলাম যে, শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া আমরা শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষার পথে পরিচালিত করিলাম। তাহা হইলেই তাহাদিগের শিক্ষার গতিটি কি একটানা উর্দ্ধমুখী হইবে? না; শিক্ষার পথটি কখন কুব্জ হইয়া, কখনও ন্যুব্জ হইয়া, উপরে উঠিয়া, নীচে নামিয়া, তাল ভঙ্গ করিয়া, খানা-ডোবা-খাত সৃষ্টি করিয়া, অত্যন্ত ছন্দোহীন অসম তালে চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার একটা চরম শৃঙ্গ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার পরেও সমতল অধিত্যকা কোনও সময়েই দৃষ্ট হয় না, প্রতিনিয়তই নিম্ন গতিকে সংযত করিয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আগ্রহ, অভিনিবেশ, শিক্ষার প্রণালী, পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাস, বয়স, ক্লান্তি, বিরক্তি, বিশ্রাম-বিন্যাস প্রভৃতি শত শত জিনিসই শিক্ষার পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে এবং তাহাদের অনেকগুলিকেই আমরা ঠিক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। তাহা হইলেও, সন্ধানী শিক্ষকের উচিত শিক্ষার পথের গতি, যতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক জ্ঞান রাখা, যাহাতে শিক্ষার হঠাৎ অবনতিতে তিনি নিরাশ হইয়া না পড়েন অথবা খানিকটা উন্নতি দেখিলেই ছাত্রের ভাবী সম্ভাবনা সম্বন্ধে একেবারে শেষ সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন। এই সাধনার সিদ্ধির পথের লৈখিক বৈজ্ঞানিক চিত্রটি পার্শ্বে প্রদত্ত হইল।



অবিচ্ছিন্নতা

সাধারণতঃ x অক্ষরেখার দ্বারা সময় এবং y অক্ষরেখার দ্বারা দক্ষতা বা

সফলতা দেখান হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে, এই শিক্ষা বা সফলতার রেখাটি একটানা ঊর্দ্ধগতিতে চলে না। মূল বিন্দু o (origin) হইতে প্রথমেই একটা উন্নতি সূচিত হয়, পরে রেখাটি বহু উপত্যকা, অধিত্যকা ও খাতের সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে-উঠিতে একটা শৃঙ্গের সৃষ্টি করে। আবার ইহার উর্দ্ধগতি মন্থর হইয়া যায়, আবার অবনতি আসে, আবার সামান্য উন্নতি আসে এবং চরম সফলতার পর আর উন্নতি হয় না। তখন সাধনার চরম প্রচেষ্টা দ্বারা এই উন্নতির মানটী বজায় রাখাই একটি দুঃসাধ্য সমস্যা হইয়া উঠে। সমগ্র শক্তিকে সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত রাখিতে হয়।

এই জন্যই ব্যাল্যার্ড বলিয়াছেন, দক্ষতার পথটা হইতেছে একটা গোল স্প্রীংকে টানিয়া সোজা করিবার মত ব্যাপার। ইহা প্রথমটা খুব সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন স্প্রীংটী সোজা করা হয় ব্যাপারটা তখনই শেষ হয় না। ঐ সোজাভাবে রাখাটাও কম কষ্টসাধ্য নয়।

শিক্ষার গতিপথে অধিত্যকা (Plateaus in learning):

শিক্ষার পথে উন্নতিটা যে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া শিক্ষার মানচিত্রে (grap) একটা অধিত্যকা সৃষ্টি করে তাহা ব্রায়ান এবং হার্টার (Bryan and Harter) প্রথম টেলিগ্রাফের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আবিষ্কার করেন।

যখন এই অধিত্যকা দৃষ্ট হয় তখন উন্নতির উর্দ্ধ গতিটি বন্ধ হয় বটে, তবে তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, উন্নতির প্রণালীটি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উপরের দিকে বৃদ্ধি যখন বন্ধ হইবে, তখন অন্যান্য দিকের কাজগুলি ভিতরের দিক হইতে অন্তঃপূর্ত্তির দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, অথবা নিম্নতর স্তরের অভ্যাসগুলি যান্ত্রিক (automatic) ও সরলতর হইতে থাকে।

অবশ্য অন্য কারণেও এই অধিত্যকার (plateau) সৃষ্টি হইতে পারে। ক্লান্তি, বিরক্তি, আগ্রহের অভাব, একঘেয়েত্ব প্রভৃতিও এই জিনিসটী সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা দেখিয়াই শিক্ষকের হতাশ হইবার কিছু নাই।

উন্নতির চরমসীমা ঃ

অধিত্যকা দেখিয়া হতাশ হইবার কারণ হয়ত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই কি মনে করিতে হইবে যে, এই অধিত্যকার পর আবার উন্নততর শৃঙ্গের সৃষ্টি হইবে? শিক্ষার চরমোন্নতির শৃঙ্গটি কোথায় অবস্থিত? শিক্ষার শেষ সীমা আছে। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, কোনও লোকই মিনিটে ৩০০ শব্দ টাইপ করিতে পারে না ও সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারে না, মানুষের শক্তিতে তাহা অসম্ভব। দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতির দিক দিয়াও যেমন মানুষের চরম সফলতার একটা সীমা আছে, জ্ঞানের সঞ্চয়ের দিক দিয়াও তেমনই একটা সীমা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক পণ্ডিত বিদ্যা বা জ্ঞানের সম্ভাবনার যে একটা সীমা আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নহে। আমরা জানি, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলেও সকলেই সব বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার যে একটা সম্ভাব্য উৎকর্ষ আছে, তাহাও ব্যবহারিক জীবনে ফুটিয়া উঠে না; তাহার "যথাসাধ্য ভাল" কখনই "সম্ভাব্য ভালোর" খুব কাছাকাছি যাইতে পারে না; তবে চেষ্টা করিলে প্রায় সকলেরই "বর্ত্তমান ভালটা" আরও ভাল হইতে পারে। এই তত্ত্বটিও পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে।

টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেণিং স্কুলের পরিণত বয়স্কের শিক্ষকগণের (ইহাদের সকলেই আট বা ততোধিক বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত) মধ্যেও প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করিয়া দশ দিনের অভ্যাসেই গণিতে অধিকতর দক্ষতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইহার কারণ হইতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের অধিকাংশ বিষয়ের নৈপুণ্যকে "যথাসাধ্য ভাল"র পর্য্যায়ে ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ পায় না। লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষের কোটি কোটি স্নায়ু-কেশ-পরিচালিত পথে যত প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তাহার সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্রকেই আমরা ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পাই। বংশগতির ধারা বহিয়াও আমরা যে লক্ষ লক্ষ সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহার অল্পই একটা অংশ বাস্তব কৃতিত্বে ফুটিয়া উঠে। আমরা অনেকেই চীনা, রাশিয়ান্ ভাষা অভ্যাস করি

নাই ও শিখি নাই—কিন্তু অভ্যাস করিলে হয়ত শিখিতে পারিতাম। অভ্যাস করিলে নাচিতে, গাহিতে, ছবি আঁকিতে, সেতার বাজাইতে এমন কত কি করিতে পারিতাম। কাজেই অভ্যাস করিলে প্রায় সব জিনিসই খানিকটা আয়ত্ত করা যায়। অবশ্য সব জিনিসই চরমভাবে আয়ত্ত করা হয়ত সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

চরম প্রতিভা যাঁহারা দেখাইয়াছেন, তাঁহারাও সাধারণ জিনিসগুলিকে অসাধারণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অসাধারণত্বটা সাধারণত্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী নহে। সাধারণ খেলোয়াড় হয়ত ১১।১২ সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারেন, আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বাজ হয়ত ৯॥০ সেকেণ্ডে সেই কাজটি করিতে পারেন।

কিন্তু শেষের দিকের এই বাড়তি নৈপুণ্যটুকু আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ইহার জন্য প্রচুর সময় ও অভ্যাসের প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রে যাহাকে "law of diminishing returns" বলে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহা প্রযুজ্য। যতই উন্নতি লাভ করিব, অধিকতর উন্নতিটা ততই কঠিনতর হইয়া উঠিবে। শুধু তাই নহে, চরম উন্নতি লব্ধ হইলেও তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখাও একটা কঠিন সমস্যা। প্রচুর সাধনা দ্বারা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়। অতীত কৃতিত্বের সুদ খাটাইয়া বিলাসী মহাজনের মত আরামে গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়লক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলা, চরম কৃতিত্বের শিখরটি যেমন সূক্ষ্ম তেমনই পিচ্ছিল। সেইজন্যই কৃতিত্বের শাস্তি হইতেছে অধিকতর সাধনা। দুরূহ সাফল্যকে অতন্দ্র সাধনায় প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া রাখিতে হয়।

দেহের মত মনের দক্ষতা এবং কর্ম্মশক্তির জন্যও অনেকে মনের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যায়াম, সংযম প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহারা বলেন, নিয়মিত অভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা যদি আমরা মনের একটি বিশিষ্ট সাধনা করি, তাহা হইলে সেই বিশিষ্ট বিষয়ের দক্ষতা অন্যান্য বিষয়েও সঞ্চারিত হইয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করিবে। মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে ধারণা ছিল ল্যাটিন, গ্রামার এবং গণিত অভ্যাস করিলে মনের শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়, যাহার ফলে মানুষের কর্ম্ম-জীবনে প্রভূত উপকার হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগেও বহু লোক অর্থ খরচ করিয়া পেশাদার মনস্তাত্ত্বিকদিগের নিকট হইতে মনঃশক্তি, বুদ্ধি বা স্মৃতি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ব্যায়াম প্রক্রিয়ার "প্রেস্‌ক্রিপশন্‌" ক্রয় করেন।

কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করিতে চাহেন না যে, এক বিষয়ের দক্ষতা অন্য বিষয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে।

গ্রীক্ মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, মনের সমস্ত কাজের পিছনে এক "আত্মা" জাতীয় জিনিসের লীলা আছে। এই আত্মা হইতেছে সম্পূর্ণ এবং অবিভাজ্য; সুতরাং আত্মার অংশবিশেষের উন্নতি হইলে সমগ্রভাবে আত্মারই উন্নতি হইল। কাজেই গণিতের অভ্যাসের দ্বারা মনের যে ধার দেওয়া হয়, সেই ধারাল মন দিয়া হয়ত কাব্যালোচনাও সহজসাধ্য হইবে। প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জাতীয় ধারণা পোষণ করিতেন। তবে তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, জ্যামিতি পাঠের দ্বারাই মনের তীক্ষ্ণতা সর্ব্বাধিক হয়।

শক্তিবাদ (Faculty theory) ও সঞ্চারণ

পরবর্ত্তী যুগে মনোবিদ্যায় "শক্তিবাদে"র (Faculty theory) উদ্ভব হইল। এই মতবাদের মূল বক্তব্যটা হইতেছে, মন জিনিসটা আগ্রহ, স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, আয়ান (temperament), সঙ্কল্প (will) প্রভৃতি কয়েকটি

শক্তি দ্বারা গঠিত। এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও পরস্পর সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই এই শক্তিগুলির বিভিন্ন মাত্রার সমবায়ে গঠিত। এখন যেহেতু এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুতরাং একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা যদি একটি বিশিষ্ট শক্তির ব্যায়াম করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যায়ামের ফলে সেই বিশিষ্ট শক্তিটিই সমৃদ্ধ হইবে ; ফলে জীবনের সব ক্ষেত্রেই সেই বিশিষ্ট শক্তিটি কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে। দাবাবড়ে খেলিয়া আমরা যদি চিন্তা বা অভিনিবেশ শক্তির ব্যায়াম করি, তাহা হইলে ঐ ব্যায়ামের ফলে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেও সমর্থ হইব, বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও কৃতকার্য্য হইব এবং দার্শনিক চিন্তাতেও কৃতিত্ব দেখাইব।

এই জাতীয় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া 'শক্তিবাদী' মনোবিদ্যার নির্দ্দেশে সে যুগে পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল "Formal discipline" ; এ ক্ষেত্রে "formal" কথাটির অর্থ আনুষ্ঠানিক নহে, form সংক্রান্ত (অর্থাৎ matter or বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত নহে) ; Formal discipline-এর যুক্তি হইতেছে, ল্যাটিন্ ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর জন্যই যে ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে, তাহা নহে, বুদ্ধিতে ধার দিবার জন্য এবং পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বিচারশক্তি বাড়াইবার জন্য তাহা পড়াইতে হইবে। গণিতের বিষয়বস্তুর জন্যই যে গণিত পড়াইতে হইবে তাহা নহে, গণিতের মাধ্যমে অভিনিবেশ, যুক্তি ও চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্যও তাহা পড়াইতে হইবে। সেই জন্যই সে যুগে ১৫ হাজার শব্দবিশিষ্ট spelling book মুখস্থ করান হইত। এই ১৫ হাজার শব্দের মধ্যে হয়ত ৯।১০ হাজার শব্দ এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য ছিল যে, হয়ত সারা জীবনেই তাহাদের কোনও প্রয়োজন হইত না। তবুও এই সমস্ত শব্দ মুখস্থ করান হইত —উদ্দেশ্য স্মৃতির ব্যায়াম। এই স্মৃতির ব্যায়ামের জন্যই ভূগোলের শত শত গিরিশৃঙ্গের নাম, অন্তরীপের নাম মুখস্থ করান হইত, কোনও দিনই এই সমস্ত নামগুলি জীবনের প্রয়োজনে লাগুক বা নাই লাগুক! এই মনোভাবের জন্যই ছাত্রদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের জন্য খেলাধূলা আর যুক্তির জন্য গণিত অভ্যাস করিতেই হইত।

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পর্কিত বিশ্বাসের মূলে আছে এই 'Formal discipline' মতবাদ ও শক্তিবাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাতত্ত্বে এই বিশ্বাসটি বহুদিন ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছিল। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা-পদ্ধতি এই দুইটির উপরই ইহার প্রভাব ছিল। এই মতবাদটি প্রথম একটা ধাক্কা খাইল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জেম্‌সের (W. James) গবেষণার ফলে।

সঞ্চারণ সম্বন্ধে জেম্‌স ও অন্যান্য পণ্ডিতদের পরীক্ষার তথ্যাবলী

জেমস্-এর বিশ্বাস ছিল যে, একটি কবিতার উপর দিয়া যদি স্মৃতিশক্তির ব্যায়াম করা হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি দিয়া অন্য কবিতাও মুখস্থ করা সহজ-সাধ্য হইবে। তিনি ভিক্টর হুগোর Satyr নামক কবিতাটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আট দিনে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩১$\frac{5}{6}$ মিনিটে তিনি ১৫৮ পংক্তি মুখস্থ করিলেন। ইহার পর, দিনে ২০ মিনিট করিয়া সময় লইয়া ৩৮ দিনে Paradise Lost-এর প্রথম সর্গ মুখস্থ করিলেন। এইভাবে খানিকটা স্মৃতির ব্যায়াম সাধন করিয়া তিনি আবার ভিক্টর হুগোর Satyr পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবারে দেখিলেন, নূতন করিয়া ১৫৮ পংক্তি মুখস্থ করিতে তাঁহার সময় লাগিয়াছে ১৫১$\frac{1}{2}$ মিনিট। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ইহাকেই negative (নঞর্থক) সঞ্চারণ বলা যাইতে পারে।

সাধনার এই বিপরীত ফল দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং এই বিষয়টি লইয়া বিভিন্ন লোককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, তিনজনের কিছু উন্নতি হইয়াছিল, একজনের অবনতি হইয়াছিল এবং অপর সকলের উন্নতি-অবনতি প্রায় ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না।

অধ্যাপক জেম্‌স্-এর পর বহু পণ্ডিত এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, সঞ্চারণের ফল খুব সন্তোষজনক নহে—অন্ততঃ সাধারণ লোক সঞ্চারণের ফলটা যতটা সুদূরপ্রসারী বলিয়া মনে করেন, ততটা নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষার ফলগুলি এইরূপ ঃ

উড্‌ওয়ার্থ সাহেব তাঁহার বাম হস্ত দ্বারা পেন্সিল দিয়া একটি বিন্দুতে বার বার আঘাত করিয়া ঐ বিষয়ে দক্ষতা ডান হাতে কতখানি সঞ্চারিত হয়

তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়ছিল যে, বাম হস্তের দক্ষতার শতকরা ৫০ ভাগ দক্ষিণ হস্তে সংক্রামিত হয়।

বিচার বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা লইয়া জাড্, থর্ণডাইক, উড্ওয়ার্থ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিষয়ে অভ্যস্ত লোকদের শতকরা ১·৮ এবং অনভ্যস্তদের শতকরা ৩·৩ ভাগ দক্ষতা সঞ্চারিত হইয়াছে।

অঙ্ক কষিবার সময়ে পরিচ্ছন্নতার উপর কোনও প্রতিক্রিয়া করে কিনা, এই সম্বন্ধে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—প্রতিক্রিয়া কিছুই নাই বলিলেই চলে; অর্থাৎ যে বালককে অঙ্ক সম্বন্ধে খুব পরিচ্ছন্ন হইতে শিখান হইয়াছে সে হয়ত একটি চিঠি লিখিতে যাইয়া কাটাকুটি করিয়া, কালি ফেলিয়া, পাতা নোংরা করিয়া অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়াছে।

ব্যাকরণ পাঠজনিত মনের সংযম ভাষা শিক্ষায় কতটুকু সাহায্য করে, এ বিষয়েও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা মাতৃভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাকে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষা সাহিত্য বিষয়ে অথবা নির্ভুল রচনা লিখিতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। তেমনি ল্যাটিন শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় নাই; বরং প্রতিক্রিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই শতকরা ২০-এরও বেশী হইয়াছে।

কক্সে (W. W. Coxe) ইংরাজী বানান শিক্ষার ব্যাপারে ল্যাটিন শিক্ষার প্রভাব লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ল্যাটিন না-জানা ছাত্রদের চেয়ে ল্যাটিন-জানা ছাত্ররা বেশী ভুল করিয়াছিল; অর্থাৎ ল্যাটিন শিক্ষার নঞর্থক (negative) সঞ্চারণ হইয়াছিল।

গোলক-ধাঁধা লইয়া পরীক্ষার ব্যাপারে একটা নূতন জিনিস দেখা গেল। একই জাতীয় ধাঁধার ক্ষেত্রে সঞ্চারণটি হইয়াছিল শতকরা ৭৭; কিন্তু গোলক-ধাঁধার ভিতরের অলিগলির সংস্থান একটু বদলাইয়া দিতেই দেখা গেল, সঞ্চারণটি শতকরা ১৯এ নামিয়া আসিল। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, ধাঁধাগুলি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির হইলে এই সঞ্চারণটি নঞর্থকও হইতে পারিত।

পাটীগণিতের সমস্যা সমাধানের অভ্যাস তর্কশাস্ত্রের যুক্তির ব্যাপারে কতখানি দক্ষতা সঞ্চারিত করিতে পারে, এই লইয়া উইঞ্চ (Winch) সাহেব

পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছেন, এই ব্যাপারে দক্ষতাটি প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ সঞ্চারিত হয়। জ্যামিতির দক্ষতা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—এক তৃতীয়াংশ ছাত্রের মধ্যে জ্যামিতিগত দক্ষতা অন্য বিষয়ে আদৌ সংক্রামিত হয় নাই (Rugg)। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও ধৈর্য্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেই পর্য্যবেক্ষণ শক্তি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কতটা সঞ্চারিত হয় তাহা লইয়া হেউইন্স্ (Miss Hewins) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সঞ্চারণ-মান হইতেছে শতকরা ৫·৪ মাত্র।

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২০০টি পরীক্ষা হইয়াছে। এই জাতীয় পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ :

(ক) শিক্ষার সঞ্চারণ সমর্থকও (positive) হইতে পারে, নঞর্থকও (negative) হইতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চারণ প্রায় নগণ্য।

(খ) সঞ্চারণের অনুপাত যেখানে একটু বেশী, সেখানে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় বিষয়টির সমজাতীয়তা আছে।

(গ) এমন কোনও মনের ব্যায়াম নাই যাহা একটা বিশিষ্ট শক্তির (faculty) সর্ব্বাঙ্গীন দক্ষতা হইতে পারে।

এই জাতীয় সিদ্ধান্তে আমাদের মন খানিকটা খারাপই হইয়া যায়। কিন্তু উপায় কি? সত্যকে অস্বীকার করিলে যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, শিক্ষিত ব্যক্তি (শুধু শিক্ষিত বলিয়াই) অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা facultyগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছেন বলিয়াই যে কোনও কাজে তাঁহারা হাত দিবেন তাহাই অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভালভাবে করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, অনেক কৃতী ছাত্র ব্যবসাক্ষেত্রে, হাতের কাজে, জীবনের অনেক বিষয়েই অশিক্ষিত প্রতিযোগীর নিকট পরাজিত হয়। বিদ্যার অহঙ্কারের সঙ্গে এই হীন পরাজয়ের অপমান তাহাদের একযোগে অভিভূত করিয়া ফেলে। অনেক সময় ইহাও দেখিতে

পাওয়া যায় যে, এম.এ., বি.এ. পাশ করিয়া অনেকে হয়ত কেরাণীগিরি আরম্ভ করিলেন। শিক্ষার দম্ভ তাঁহাদের মনে একটা স্বয়ংসিদ্ধভাব আনিয়া দেয় বলিয়া তাঁহারা কাজের খুঁটিনাটিগুলিও শিখিতে তত যত্ন দেখান না এবং অল্প শিক্ষিত সহকর্ম্মীদের সঙ্গেও ভালভাবে মেশেন না। পরে হয়ত তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই অল্প শিক্ষিত সহকর্ম্মীদের দলই তাঁহাদের পরাজিত করিয়া অধিকতর উন্নতি করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা হয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতের উপর অথবা নিজেদের দুর্ভাগ্যের অলঙ্ঘনীয় বিধানের উপর দোষ চাপাইয়া নৈরাশ্যবাদে জীবনকে পঙ্গু করিয়া শুধু যে নিজেদেরই ক্ষতি করেন তাহা নহে, সমাজের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ ও অকর্ম্মণ্যতার বিষ ছড়াইয়া থাকেন। শিক্ষার সঞ্চারণবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা না থাকিলে অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারাই যে মানসিক শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না, এই ধারণাটি থাকিলে, অর্থাৎ পুঁথিগত শিক্ষাই যে জীবন-সংগ্রামের চরম অস্ত্র নহে, প্রত্যেক কাজের জন্যই যে বিশেষ প্রকার ব্যবহারিক সাধনার প্রয়োজন আছে, এই তত্ত্বটি জানা থাকিলে তাঁহারা হয়ত জীবনে অধিকতর উন্নতি করিতে পারিতেন।

অনুসিদ্ধান্ত

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আমাদের এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একটা বিশেষ শিক্ষা সেই জাতীয় বা সমজাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং এই সঞ্চারণটি সদর্থক (positive) সঞ্চারণই হইয়া থাকে। ফলে সেতারের শিক্ষাটা সুরবাহার, স্বরোদ বা বীণাবাদনে সঞ্চারিত হইতে পারে, বেহালার দক্ষতা সারেঙ্গী-এস্‌রাজে সঞ্চারিত হইতে পারে, তবলার দক্ষতা খোল-ঢোল-মাদল-পাখোয়াজে সঞ্চারিত হইতে পারে।

তাহা হইলে সন্ধানী শিক্ষকের উচিত "সঞ্চারণের" তথ্যগুলি হইতে এমন সব তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাহাতে শিক্ষার একটি অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অভিজ্ঞতায়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হইয়া আমাদের সাধনাকে সমৃদ্ধতর ও পরস্পরের সহযোগী করিয়া তুলিতে পারে।

শিক্ষা-সঞ্চারণের কৌশল

এই ব্যাপারে গীতার একটা সূত্রকে আমরা শিক্ষা-তত্ত্বেরও সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি—"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।" অর্থাৎ অন্ধ যান্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞানমূলক অভ্যাস বেশী সঞ্চারিত হয় এবং নিছক তত্ত্বমূলক জ্ঞানের চেয়ে অন্তর্দৃষ্টি (ধ্যান)-যুক্ত অভ্যাস আরও বেশী সঞ্চারিত হয়। এই তত্ত্বটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত।

উড্রো হার্বার্ট (Woodrow Herbert) তিনটি দলের ছাত্র লইয়া মুখস্থ করিবার শক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একদল ছাত্রকে মুখস্থ করার ব্যাপারে কোনও অভ্যাসই করান হইল না, আর একটি দলকে শুধু অন্ধ যান্ত্রিক অভ্যাসের দ্বারা মুখস্থ করান হইল এবং তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ করিবার কৌশল সম্বন্ধে অনেকটা উপদেশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের শতকরা ৪৩% ভাগ সময় শুধু উপদেশেই কাটাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ৫৭% ভাগ সময় মুখস্থ করিতে দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে আবার এই তিনটি দলকে মুখস্থ করিতে দেওয়া হইল। দেখা যাইল, প্রথম দলটির চেয়ে দ্বিতীয় দলটি বিশেষ কিছু উন্নতির সঞ্চারণ দেখাইতে পারে নাই, তবে তৃতীয় দলটি বেশ উন্নতি দেখাইয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানমূলক অভ্যাসটী সহায়ক হইয়াছিল।

মেরেডিথ (G. P Meredith) নামে আর একজন মনোবিদ্ বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞা তৈয়ারী করিবার ব্যাপার লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে-দলটীকে তিনি সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঞ্চারণটী সমধিক হইয়াছিল। যাহারা শুধু অন্ধভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সঞ্চারণ তেমন হয় নাই।

শোলচাউ এবং জাড্ (Scholchow and Judd)-এর বন্দুক লইয়া লক্ষ্যভেদ পরীক্ষাটী হইতেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

দুই দল বালক লইয়া ১২ ইঞ্চি জলের ভিতর লক্ষ্যভেদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। একটি দলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিভাবে আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্ত্তন (Refraction) হয়, আর অন্য দলটীকে এ সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। দেখা গেল, উপদেশপ্রাপ্ত দলটির সফলতা

অনেক বেশী হইয়াছিল। আরও কিছুদিন পরে এই দুইটি দলকেই জলের ২ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি নীচের লক্ষ্যবস্তু ভেদ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এবারেও দেখা যাইল যে, যে দলটিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদেরই শিক্ষাটা বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, জ্ঞানমূলক অভ্যাসটাই নিছক অভ্যাসের চেয়ে বেশী সঞ্চারিত হয়।

এই জাতীয় পরীক্ষা হইতে মনে হয়, একটা বিশিষ্ট শিক্ষা কতখানি পরিমাণে সঞ্চারিত হইবে তাহা অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকের উপস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালীর উপর। ইহা ছাড়া ছাত্রের তরফ হইতে তাহাদের মনের অবস্থা, শিক্ষাকে আত্মস্থ করিবার ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির উপরও তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। একটা বিশিষ্ট শিক্ষা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা হইতে কিভাবে একটা সাধারণ তত্ত্বের সন্ধান করা যাইতে পারে, কিভাবে অভিজ্ঞতাকে generalize করিতে পারা যায়, এই সমস্ত জিনিসগুলি যদি শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক ভালভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে 'positive transfer'টা খুবই বেশী হয়।

সঞ্চারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

এই ব্যাপারে থর্ণডাইকের "theory of identical element" বা "উপাদানের ঐক্য" মতবাদটী সর্ব্বাধিক পরিচিত। তিনি বলেন, একটি বিষয়ের অভ্যাস তখনই বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে যখন এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে উপাদানগত ঐক্য আছে। কোন্ বিষয়ে উপাদানগত ঐক্য? থর্ণডাইক বিষয়বস্তুগত ঐক্য এবং শিক্ষা-প্রণালীগত ঐক্য—এই দুইটি ঐক্যকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, ভূগোল ইতিহাসকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের মধ্যেই ম্যাপএর প্রয়োজন হয়, যোগের প্রক্রিয়া গুণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে, কারণ গুণ জিনিসটাতে যোগের কাজও যথেষ্ট আছে, ফরাসী ভাষা জার্ম্মান ভাষাকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের শিক্ষার প্রণালীর মধ্যেই একটা

ঐক্য আছে ইত্যাদি। ব্যাগ্‌লি (Bagley) অবশ্য এই উপাদানগত ঐক্যের মধ্যে আদর্শগত ঐক্যকেই একটা বড় স্থান দিয়াছেন।

স্যাণ্ডিফোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন, থর্ণডাইকের এই "উপাদানগত ঐক্যে"র মতবাদ খুবই যুক্তিযুক্ত। আমাদের লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকেশ ও স্নায়ুশাখা-বাহিত স্নায়ু-তরঙ্গের লক্ষ লক্ষ গতি-পথের মধ্যে কতকগুলি পথ এমনই সাধারণ হইয়া যাইতে পারে যে, অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেই সাধারণ অলিগলি পথ দিয়াই স্নায়ু-তরঙ্গের স্রোত আবার প্রবাহিত হয়। কাজেই সাধারণ উপাদান যতই বেশী থাকিবে, শিক্ষার সঞ্চারণ ততই অধিক হইবে।

শিক্ষার সঞ্চারণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে থর্ণডাইক-মতবাদের প্রতিস্পর্দ্ধী মত হইতেছে জাড্-এর "generalization of experience" মতবাদ। জলের নীচে অবস্থিত বস্তুর লক্ষ্যভেদ করার পরীক্ষাটির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোকের গতি পরিবর্ত্তনের (refraction) তত্ত্বটি যে দলটিকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়ছিল, তাহারা তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে generalise করার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়াই শিক্ষা অধিকতর সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং এই generalise করিবার ক্ষমতার (একটি অভিজ্ঞতার সহিত অন্য অভিজ্ঞতার ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কে বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা) উপরই শিক্ষার সঞ্চারণের মূল তত্ত্বটি নিহিত আছে।

সঞ্চারণবাদ ও শিক্ষা-তত্ত্ব

শিক্ষা-সঞ্চারণ সম্বন্ধে তথ্যগুলির ব্যঞ্জনা শিক্ষা-তত্ত্বে সামান্য নহে। ইহা শিক্ষার পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতি উভয়কেই প্রচুরভাবে প্রভাবান্বিত করে।

আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, শুধু মানসিক ব্যায়ামের (formal discipline) জন্যই ল্যাটিন, ব্যাকরণ, গণিত, প্রভৃতির প্রয়োজন নাই এবং কোনও মানসিক ব্যায়ামই মনের শক্তিকে সমৃদ্ধ করে না, তাহা হইলে শুধু মানসিক উৎকর্ষের জন্যই ল্যাটিন, ব্যাকরণ, বানানের বই প্রভৃতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিব না। ব্যাকরণের যতটুকু প্রয়োজন,

শুধু সেইটুকু প্রয়োজনের জন্যই ব্যাকরণ পড়াইব, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই গণিত, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইব। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কিছু কিছু জিনিস আমরা পাঠ্যতালিকা হইতে পরিত্যাগ করিব। যদি দেখি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনেরও সারা জীবনেই cube rootএর প্রয়োজন হইবে না, তখন নির্বিচারেই ঐ জিনিসটিকে পাটীগণিত হইতে বাদ দিয়া দিব।

তবে এই মনোভাবটির বাড়াবাড়িও ভাল নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতি দিবসের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র প্রয়োজনের দাবীর মধ্যেই যদি সীমায়িত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার উচ্চ আদর্শ অনেক সময়েই ব্যাহত হয়।

বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জগৎটি ছাড়িয়া প্রত্যেক বালককেই একদিন বাস্তব জগতের বৃহত্তর জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে। সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সমস্যা সমাধানই হইল মানুষের চিরন্তন কর্ত্তব্য। কাজেই যে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তব-জীবন-পরিবেশে এই সমস্যা সমাধানের কাজ করিতে হয়, সেই জাতীয় আয়োজন প্রত্যেক স্কুল-কলেজে প্রচুর পরিমাণে থাকা উচিত। এই জন্য স্কুলের পাঠ্যসূচীর মধ্যেই তথাকথিত "Project method"-এর একটা ব্যাপক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, শিক্ষার সঞ্চারণটা "generalization of experiences"এর উপর অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে। আমরা আরও জানি, এই generalise করার ব্যাপারে ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানটা একটা খুবই বড় সহায়। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাপক আয়োজন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ভাষার সাহায্যেই আমরা বিমূর্ত্ত (abstract) বিষয় লইয়া মনের প্রয়োগশালায় গবেষণা করি এবং নূতন-নূতন সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে generalise করিতে সমর্থ হই। শিক্ষার সঞ্চারণ তত্ত্বটি শিক্ষার পদ্ধতির দিক দিয়াও অনেক সংস্কারের দাবী করিতে পারে।

আমরা যদি বুঝিতে পারি শুধু স্মৃতির ব্যায়াম করিলেই স্মৃতির শক্তি (faculty) বৃদ্ধি পাইবে না, তাহা হইলে শুধু স্মৃতির ব্যায়ামের জন্য ছাত্রদিগকে রাশি রাশি জিনিস মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে এই ব্যর্থ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিতে পারি।

'Formal discipline' যখন একেবারেই নিরর্থক এবং থর্ণডাইক-বর্ণিত অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দই (law of effect) যখন শিক্ষার মূল কথা, তখন অহেতুক পুনরাবৃত্তি (repetition) ও অন্ধ অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। আমরা এই কঠোরতা হইতেও ছাত্রদিগকে মুক্তি দিতে পারি।

তাই বলিয়া যে তাহাদিগকে কোনও পরিশ্রমের কাজই করিতে দেওয়া হইবে না, তাহাদিগকে আদুরে গোপাল ও আরাম-বিলাসী করিয়া তুলিতে হইবে, এমনও কথা নহে। তবে শুধু মানসিক অনুশীলনের জন্যই যে তাহাদিগকে খাটাইতে হইবে, এ যুক্তিও ঠিক নহে। সফলতার আনন্দের মধ্য দিয়া তাহাদের শিক্ষার অভিযানকে পরিচালিত করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে রসবোধ (sentiment) তৈয়ারী করিতে হইবে। ইহার পর শিক্ষার সাধনার পথে কঠিনতম পরিশ্রমও তাহাকে ভীত করিতে পারিবে না, বাধা-বিপত্তি-প্রলোভনও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, দুঃখ-দৈন্যের বিক্ষোভও তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না। শ্মশান-সাধক প্রেতের নৃত্যের মধ্যেও যেমন অবিচলিত নিষ্ঠায় ইষ্টদেবীর ধ্যান করিতে থাকে, তাহারাও সেইরূপ ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় সারস্বত সাধনা করিয়া যাইবে।

এই রস (sentiment) জিনিসটা হইতেছে একটা পরিণতির অবস্থা, প্রারম্ভের অবস্থা নহে। কাজেই শিক্ষার প্রারম্ভের দিকে ছাত্রদের মানসিক অবস্থা, তৃপ্তি-বিরক্তি-আবেগ-প্রক্ষোভ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেইগুলিকে সহ্য করিয়া শিক্ষককে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষকগণ যেন তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত আদর্শগুলি জোর করিয়া ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন, এমনকি মানসিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যেও নহে। তাহা হইলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ একটা বিরোধের ভাবই সৃষ্টি হইবে। আদর্শ যত বড়ই হউক না কেন, প্রত্যেককেই তাহা ভিতরের দিক হইতে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে—বাহিরের দিক হইতে তাহা আসিবে না, জোর করিয়া দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভক্তিতত্ত্বের মত শিক্ষাতত্ত্বেও অধিকারী ভেদটা একটা বড় সত্য।

স্মৃতি

সাধারণ ছাত্রদের যদি বলা হয় "কোনও একটা জিনিস শিক্ষা করার চেয়ে সেটি ভুলিয়া যাওয়া কঠিনতর কাজ", তাহা হইলে তাহারা হয়ত সে কথা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু তাহাদের যদি বলা হয় "আচ্ছা তোমরা চেষ্টা করিয়া অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা ভুলিয়া যাও দেখি ?" তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে কাজটি কত কঠিন। প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন, অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত গভীর যে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া সত্যই কঠিন, কিন্তু সাধারণতঃ কত কথাই তো আমরা ভুলিয়া যাই।

কথাটা বস্তুতঃ সত্য নয়। কোনও জিনিসই আমরা সহজে ভুলি না। একবার যাহা আমরা অনুভব করি, তাহা বীজের মধ্যে প্রাণশক্তির মত, ওষধির মধ্যে তেজের মত মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। যাহাকে একবার দেখিয়াছি, তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিলে চিনি-চিনি বলিয়া মনে হয়।

যে শক্তির দ্বারা প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে এইভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখা যায়, নান্ সাহেব তাহার নাম রাখিয়াছেন "সংরক্ষণ-প্রয়াস" (Mneme)। স্মৃতি এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের আত্মসচেতন প্রচেষ্টা। মনের কোঠায় যাহা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, তাহার সব কিছু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। তবে সব অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা "ছাপ" (engrams) রাখিয়া যায়। স্মৃতির কাজ হইতেছে বর্ত্তমানের অনুভূতির ইঙ্গিতে অতীতের অনুভূতিকে নূতন করিয়া পাওয়া। এই স্মৃতির মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ আছে অনুভূতির ছাপ-গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ আছে এই ছাপগুলির সঞ্চয় ও সংরক্ষণ এবং তৃতীয়তঃ এই ছাপগুলিকে মনের কোঠা হইতে বাহির করিয়া আনা এবং তাহাদিগকে নূতন করিয়া অনুভব করা।

বের্গস (Bergson) এই স্মৃতিকে দুইটী ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি হইতেছে **অভ্যাসমূলক স্মৃতি** (habit memory) আর একটি হইতেছে অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ **খাঁটি স্মৃতি**। অর্থবোধ না থাকিলেও নিছক পুনরাবৃত্তি

দ্বারা আমরা অনেক জিনিস মুখস্থ করিতে পারি। ইহা হইতেছে অভ্যাসমূলক স্মৃতির কাজ; কিন্তু খাঁটী স্মৃতির মধ্যে অনুসঙ্গ (association), অতীতের ছবি, অন্য ঘটনার ইঙ্গিত প্রভৃতি মনের কার্য্য জড়িত থাকে। নান্ বলিয়াছেন, বের্গস-এর শ্রেণীবিভাগটা জাতিগত বিভেদ ততটা নহে যতটা হইতেছে মাত্রাগত। তথাকথিত "অভ্যাস স্মৃতিটী" নিছক দেহযন্ত্রের প্রক্রিয়া নহে এবং দেহ-নিরপেক্ষ "খাঁটী স্মৃতি"টীও দেহ-নিরপেক্ষ নিছক মনের কার্য্য নহে। "অভ্যাস স্মৃতি"র গোড়ার দিকে মনের মধ্যে অনুষঙ্গজনিত ছবি যে জাগে না তাহা নহে, তবে বহুবার পুনরাবৃত্তিতে সেই ছবির আর প্রয়োজন হয় না এইমাত্র। হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে প্রথম স্বর-সাধনা করিবার সময় কোন্ পর্দ্দার পর কোন্ পর্দ্দা টিপিতে হইবে, কোন্ সময় কতটা "বেলো" করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ছবিই মনে রাখার প্রয়োজন হয়, পরে পুনরাবৃত্তিতে অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া যাইলে সেই ছবি মনে রাখিবার আর প্রয়োজন হয় না। তখন হাতের পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই এমন একটা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে যে, শুধু যান্ত্রিক অভ্যাসবশেই পর্দ্দার পর পর্দ্দাগুলিকে ঠিক ঠিক আমরা টিপিয়া যাইতে পারি। মনকে তখন আর হাতে সাহায্য করিবার জন্য অভিভাবকত্ব করিতে হয় না, সাবালক হাত নিজের কাজ নিজেই করিতে পারে, তখন মন যদি মনে নাও রাখে যে হাত একটা কাজ করিয়া যাইতেছে এবং মন যদি অন্য কোনও চিন্তায় ব্যস্তও থাকে, তাহা হইলেও হাত তাহার নিজের কাজ নির্ভুলভাবে করিয়া যাইতে পারে। এ্যাডামস্ তাই বলিয়াছেন, "যুক্তিযুক্ত ভাবে ভুলিয়া যাওয়াই হইতেছে সত্যকারের শিক্ষা।"

এই জন্যই দেহবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ স্মৃতি, অভ্যাস এবং অনুষঙ্গ প্রভৃতিকে একই পর্য্যায়ের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের মতে এই সবই হইতেছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্র দিয়া প্রবহমান জ্ঞানবহা ও কর্ম্মবহা স্নায়ু-স্রোতের প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ মাত্র। যখন আমরা কোনও কিছু অনুভব করি তখন সেই অনুভূতি ও তাহার প্রতিক্রিয়াটী আমাদের জ্ঞানবহা ও কর্ম্মবহা স্নায়ুর নির্দ্দেশক্রমেই সংঘটিত হয়। তাহার ফলে স্নায়ু-স্রোতের গতি-পথের একটা ছাপ বা খাত বা নেমিক্ষত আমাদের

স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া যায়। পরে আবার সমজাতীয় অনুভূতি যখন জাগে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বে আমরা যে ভাবে সাড়া দিয়াছি, দ্বিতীয় বারেও সেই ভাবেই সাড়া দিই, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানবহা ও কর্ম্মবহা স্নায়ুস্রোত প্রথম অভিজ্ঞতার নেমিখিন্ন পথেই প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে, স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুস্রোতের খাতটি আরও গভীরতর ও প্রশস্ততর হইয়া এমন একটা পথ তৈয়ারী করিয়া দেয় যে, পরবর্ত্তী আবেদনগুলির প্রতিক্রিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় বারের মতই একই ভাবে অথবা অধিকতর সহজ ও সরল ভাবেই সম্পন্ন হয়। এইভাবে বার বার একই ভাবে সাড়া দেওয়া এবং পূর্ব্বকৃত কাজগুলিকে সহজতর ভাবে করার জন্য যে প্রবণতা তৈয়ারী হয়, তাহাকেই বলে **'অভ্যাস'**। এই অভ্যাস জিনিসটা হইতেছে অতীত কার্য্যের অন্ধ এবং সরলতর পুনরাবৃত্তি মাত্র। আর এই পুনরাবৃত্তিটি যখন আত্মসচেতন ভাবে হয়, অর্থাৎ এই পুনরাবৃত্তি করিবার সময় যখন আমরা মনে রাখি যে, এই আবেদনে আমরা এইভাবে অনুভব করিয়াছি এবং এইভাবে তাহার সাড়া দিয়াছি, তখন যাহা ঘটে তাহা হইতেছে **'স্মৃতি'**। অনুষঙ্গ হইতেছে এই স্নায়ুর গতি-পথেরই আর একটা ব্যাপার মাত্র। যখন একটি অনুভূতি হইতে স্নায়ুপ্রবাহ একই পথে যাত্রা না করিয়া সাইন্যাপ্স-এর (synapse) শাখা-প্রশাখা বহিয়া অন্য পথে যাত্রা করে অথবা অন্য একটি উপনদী জাতীয় খাল বহিয়া চলিতে-চলিতে প্রাচীন মূল প্রবাহ পথে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে বলে **'অনুষঙ্গ'**। এই অনুষঙ্গই একটা অনুভূতির সঙ্গে আর একটা অনুভূতির গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। ঘর-পোড়া গোরুর আগুন সম্বন্ধে একটা অনুভূতি হইয়াছে; আবার সিঁদুরে মেঘের লাল রঙের মধ্যে একটা লালের অনুভূতি হয়, অনুষঙ্গ তাই আগুনের সঙ্গে সিঁদুরে মেঘের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিল, ফলে ঘরপোড়া গোরুর মধ্যে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াই আগুনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইভাবে অনুষঙ্গ স্নায়ুজালের পরস্পর সংলগ্ন টানা-পোড়েন জাতীয় খাতের মধ্য দিয়া স্নায়ু-স্রোতের গতির বিভিন্নতা দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার সাহত অন্য একটি অভিজ্ঞতার সংযোগ ব্যবস্থা করিয়া আমাদের স্মৃতিকে সাহায্য করে। অক্ষরবদ্ধ একটি শব্দ চোখে

পড়িলেই যে তাহা উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে ইহার মধ্যেও এই অনুষঙ্গের লীলা আছে। অক্ষরবদ্ধ শব্দটি প্রথমে দেখিলে চক্ষুর স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে এবং তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিলে স্বরোৎপাদনকারী স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে, এই দুইটি প্রতিক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটিতে-ঘটিতে সেই প্রতিক্রিয়া দুইটী পরস্পরের সহিত এমন ভাবে জড়াইয়া যায় যে, স্নায়ুপ্রবাহ একটির পথ বহিয়া চলিতে-চলিতে অন্য একটির স্রোত বহিয়া চলিয়া যায়।

অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা যাহাই হউক, ইহা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি অভিজ্ঞতার সহিত আর একটি অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে জড়াইয়া দেয় যে, একটি ঘটনা আর একটি ঘটনাকে সহজেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারিক জীবনেও অনেক সময়েই এই অনুষঙ্গের গ্রন্থি বাঁধিয়াই অনেক জিনিস মনে রাখিবার ব্যবস্থা করি। আলিবাবার গল্পে কাশিমের যে শোকজনক পরিণতি হইয়াছিল, তাহার কারণ হইতেছে কাশিমের অনুষঙ্গের নির্দ্দেশগুলি ভুল হইয়া সে "চিচিং ফাঁক" কথাটি ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই।

অনুষঙ্গ, অভ্যাস এবং স্মৃতি এই সবগুলিকে যদি কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রবাহের গতির পথের গভীরতা এবং সেই গতিপথ দিয়া নূতন অনুভূতি ও কর্ম্ম-প্রেরণার অনুবর্ত্তনশীলতার ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, স্মৃতির দুইটী প্রধান সর্ত্ত আছে ঃ একটি হইতেছে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতার ছাপ বা 'খাত' গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা (retentiveness) এবং আর একটি হইতেছে সেই খাত বহিয়া নূতন অনুভূতি বা কর্ম্মপ্রয়াসের স্নায়ু-স্রোতকে প্রবাহিত করিবার ক্ষমতা (recall)।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসিতে পারে, যে দুইটি সর্ত্তের উপর স্মৃতি নির্ভর করে তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বাড়ান যাইতে পারে কিনা?

জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, না, স্মৃতির সংরক্ষণ শক্তির দিক দিয়া স্মৃতিকে কিছুতেই বাড়ান সম্ভব নহে। এই সংরক্ষণ শক্তি মানুষের স্নায়ুর সমৃদ্ধি ও উপাদনের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি ভাল মন্দ যাহা হইবার

তাহা জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হইয়া যায় এবং তাহার আর কোনও পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। স্থতরাং কাহার সংরক্ষণ শক্তি কিরূপ হইবে, তাহা তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই চির জীবনের জন্য ঠিক হইয়া যায়, কোনও রকম কৃষ্টি, কলা ও সারস্বত সাধনা তাহার উৎকর্ষ সাধনা করিতে পারে না।

তাহা হইলে কি স্মৃতিশক্তিকে বাড়াইবার আর কোনও উপায়ই নাই? নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে স্মৃতিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায় এইভাবে:

(১) বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে অনুভব্যকে বিজড়িত করিতে পারিলে সেই অনুষঙ্গের সূত্র ধরিয়া পুরাণ কথা অনেক সময় মনে পড়িয়া যায়।

(২) অনুভূত জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগ এবং এক একটি এককের (unit) মধ্যে একীকরণ করিতে পারিলেও ভবিষ্যতে মনে পড়িবার স্থবিধা হয়।

(৩) স্মরণীয় জিনিসগুলির অর্থবোধ থাকিলে অনুষঙ্গ গঠনের স্থবিধা হয়, স্থতরাং যাহা পড়িতে হইবে অথবা মনে রাখিতে হইবে, তাহার অর্থবোধ করিতে পারিলে মনে পড়িবার স্থবিধা হয়।

(৪) যেখানে অর্থবোধ সহজ নহে সেখানে নূতন ব্যঞ্জনা দিতে পারিলে অবথা ছন্দে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিলেও মনে রাখিবার স্থবিধা হয়।

(৫) কোনও জিনিস পড়িবার বা শিখিবার সময় শিক্ষার্থীর প্রবল আগ্রহ মনে রাখিবার অনুকূল হয়। আগ্রহের নিবিড়তা মনের অন্যান্য বিরুদ্ধ চিন্তাকে অপসারিত করিয়া দেয়, ফলে মনটী মোছা শ্লেটের মত পরিস্কার হইয়া অনুভূতির ছাপগুলিকে স্পষ্টতমভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ফলে স্মৃতি কাজ করিতে পারে অবাধে।

ম্যাক্‌ড্যুগল, স্মিথ (Miss M. Smith) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, স্মৃতির মধ্যে সংরক্ষণ-শক্তিকে যে বাড়ান যায় না বলিয়া জেমস্ প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সংরক্ষণ-শক্তিও অভ্যাসের দ্বারা বাড়ান যাইতে পারে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ প্রভৃতির বন্ধনী স্মৃতিকে সাহায্য করিতে পারে না,

সেরূপ ক্ষেত্রগুলি লইয়াও অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একসঙ্গে কতকগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া তাহার যতখানি অংশ পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে তাহা দেখিয়া স্মৃতির মাপকাঠির সন্ধান করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি এই :

প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম **'শিক্ষা ও সঞ্চয়'** প্রণালী (learning and saving method) ; ইহাতে কতকগুলি নিরর্থক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ছাত্রকে দেখান হয়, তাহার পর সেই শব্দগুলিকে পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, ছাত্র সমস্ত শব্দগুলিই একেবারে আয়ত্ত করিতে পারে না। তখন একই ভাবে তাহাকে দ্বিতীয়বার শব্দগুলি দেখান হয় এবং তাহাকে আবার পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয়। এইভাবে পরীক্ষা অগ্রসর হইতে থাকে যতক্ষণ না ছাত্রটি পূর্ণ শব্দসমষ্টিকে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিতে পারে। ইহার কিছুদিন পরে ছাত্রটিকে সেই শব্দসমষ্টি পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলা হয়। প্রথমবারে শিক্ষার সময় যতবার অভ্যাস করিতে হইয়াছে তাহা হইতে দ্বিতীয়বারের অভ্যাসের সংখ্যাটী বাদ দিলেই যে অনুপাতটী পাওয়া যাইবে, তাহাই হইতেছে সংরক্ষণের মাপ।

দ্বিতীয় প্রণালীকে **স্মারণ পদ্ধতি** (Prompting method) বলা হয়। ইহাতে শিক্ষণীয় শব্দগুলি মোটামুটি পড়িয়া যাইবার পর শিক্ষার্থীকে শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয় এবং যে যতবার ভুল করে বা ভুলিয়া যায়, ততবার তাহাকে সাহায্য করা হয়। কোন্ ব্যাপারে কতবার সাহায্য করিতে হয়, তাহার সংখ্যা হইতে শিক্ষার ক্ষমতা নির্ণীত হয়।

তৃতীয় প্রণালীটিকে **'যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি'** (Scoring method) বলা হয়। ইহাতে শব্দসমষ্টিগুলিকে কয়েকবার শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। এই ব্যাপারে সাধারণতঃ Trochaic ছন্দ ব্যবহার করা হয়, শব্দসমষ্টিগুলি জোড়ায়-জোড়ায় সাজান থাকে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর শিক্ষার্থীকে হয়ত এই জোড়াগুলির প্রথম অংশটি বলা হয় এবং দ্বিতীয় অংশটি পূরণ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী যতবার শুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহারই উপর তাহার সাফল্য (Score) নির্ভর করে।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, তাৎক্ষণিক স্মৃতি অথবা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার বা সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিবার ক্ষমতার (immediate memory) সহিত সংরক্ষণ শক্তির (retention) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে সে যে বেশী-দিন মনেও রাখিতে পারে, এমন কোনও কথা নাই। **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** নির্ভর করে (১) অভ্যাসের সংখ্যা এবং (২) মনোযোগের তীব্রতার উপর।

অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় আত্মসচেতন চেষ্টা ব্যতিরেকেই মনের উপরে ভাসিয়া উঠে। যখন আমরা নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া শয্যা গ্রহণ করি, তখন দিনের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় সিনেবার ছবির মত মনের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে থাকে। হাসি-হাসি মুখ, টুকরা-টুকরা কথা, পথপ্রান্তে অবস্থিত বেদনাখিন্ন ভিখারীর কাতর দৃষ্টি, ফুটবল মাঠের হাস্যকর ঘটনা প্রভৃতি কত ছবিই হয়ত আমাদের মানস-চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। এগুলিকে মনে করিবার জন্য আমাদিগকে সচেতন প্রয়াস কিছুই করিতে হয় না। যে শক্তির দ্বারা অতীতের অভিজ্ঞতা-গুলি এই ভাবে স্বতঃই মনের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহাকে মনস্তাত্ত্বিকগণ **perseveration** নাম দিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি বা তাৎক্ষণিক স্মৃতির সহিত এই perseverationএর একটা বিষমানুপাত সম্পর্ক আছে।

এই তাৎক্ষণিক স্মৃতির সহিত বয়সের সম্পর্কটি কি, ইহা লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, এই বিষয়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা বালকের ক্ষমতা অল্প। মিউমান্ (Meumann) দেখাইয়াছেন, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ধীরে ধীরে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে, ১৩ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই শক্তি আরও ক্ষিপ্রভাবে বাড়িতে থাকে এবং ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই শক্তি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ২৫ এর পর হইতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এই শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে; তবে খুব প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি তেমন বুঝিতে পারা যায় না এবং অনেকের বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষিপ্র স্মৃতির সহিত সংরক্ষণের দীর্ঘত্বের কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা নির্ভর করে অনুভূতির ছাপগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার দক্ষতা আর মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানের সমৃদ্ধির উপর। প্রথমটি অনুষঙ্গ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, যথাযথ শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ান যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে বাড়াইবার বিশেষ কোনও উপায় নাই।

সংরক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণ বয়স্কদের অপেক্ষা বালক বলিকাদের ক্ষমতা অধিক এবং এই ক্ষমতা ১১।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর হ্রাস পায়। বস্তুতঃ বাল্যকালে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার কাজটি কঠিনতর বলিয়া মনে হইলেও, এই সময়ে মুখস্থ রাখার শক্তিটি বেশী থাকে। এইজন্যই রাস্ক বলিয়াছেন, "শিশু বয়সে শিখ, ভাল করিয়া শিখিবে।" শিক্ষা অর্থে যদি শিক্ষার সংরক্ষণ ধরা হয়, তাহা হইলে এই উপদেশের যথার্থতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই যে সমস্ত জিনিসগুলি সারা জীবন মনে রাখা প্রয়োজন, তাহা শিশু বয়সেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ও স্থায়ী স্মৃতি ছাড়া অন্যান্য দিক দিয়াও স্মৃতির প্রকারভেদ আছে। কেহ হয়ত কবিতা ভালভাবে মনে রাখিতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নাম, সংখ্যা প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে না, কেহ হয়ত নাম-সংখ্যা-তারিখ প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে, কিন্তু কবিতা বা ঘটনা পারম্পর্য্য ভালভাবে মনে রাখিতে পারে না। কেহ হয়ত কাণ দিয়া শুনিলে ভালভাবে মনে রাখিতে পারে, কিন্তু চুপি-চুপি পাঠ করিলে বা মনে-মনে পড়িলে তাহা মনে রাখিতে পারে না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি কোন্ অনুভূতি দিয়া কে যে বিশেষভাবে অনুভব করে, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন্ দ্বারটি দিয়া কাহার অনুভূতিগুলি সহজে প্রবেশ করে, তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই। এই জন্যই শিক্ষকের উচিত ক্লাশের মধ্যে শুধু বক্তৃতা না করিয়া নানাভাবে ছাত্রদের অনুভূতিকে জাগ্রত করা। ছাত্ররা কাণ দিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনুক, ছবি, মডেল, গ্রাফ, নক্সা প্রভৃতি দেখিয়া সেগুলি অন্যভাবে অনুভব করুক, হাতে-কলমে কাজগুলি করিয়া, ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে

অভিনয় প্রভৃতি করিয়া কর্ম্মবহা স্নায়ুর সহিত তাঁহারা পরিচয় লাভ করুক এবং এই ভাবে সমগ্র চেতনার সহিত বিষয়কে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করুক। এই ব্যবস্থা দ্বারা শ্রবণ-কেন্দ্রিক, দর্শন-কেন্দ্রিক, স্পর্শ-কেন্দ্রিক—বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতিবিশিষ্ট ছাত্রদেরই যে শুধু বুঝিবার স্থবিধা করিয়া দেওয়া হয় তাহা নহে, প্রত্যেক ছাত্রেরই স্মৃতির সংরক্ষণ শক্তিকে বিশেষভাবে সাহায্যও করা হয়। কাণ দিয়া শুনিয়া যাহা অনুভব করিলাম, চোখ দিয়া দেখিয়া তাহা দৃঢ়তর হইল, হাতে-কলমে তাহা সম্পাদন করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা আরও দৃঢ়তর হইল। মোট কথা স্মৃতিকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করিতে হইলে অনুভূতিকে সমবায়ী করিতে হইবে। বস্তুতঃ স্মৃতির সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন **আগ্রহ** আর **পুনরাবৃত্তি**। আগ্রহ থাকিলে সমগ্র চেতনা দিয়াই আমরা অনুভূতির জিনিসগুলিকে গ্রহণ করি। ফলে অনুভূতির ছাপটী আমাদের মনে স্পষ্ট এবং গভীরভাবে গৃহীত হয়। বহু আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া স্নায়ু-প্রবাহের গতিপথটী গভীরতর হইতে থাকে। ফলে খাঁজ-কাটা দাগাবুলান পথে ছেলেদের অ আ ক খ শেখার যেমন স্থবিধা হয়, পঠিত জিনিসগুলি মুখস্থ বলিবার বা অভ্যস্ত ক্রিয়াকলাপের পুনঃ প্রদর্শনী দেখাইবারও সেইরূপ স্থবিধা হয়। আমাদের দেশে যে একটা পাঠনীতি আছে "আবৃত্তি সর্ব্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী", তাহার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আমরা এই স্নায়ু-প্রবাহ তত্ত্ব দিয়া বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান শিক্ষাতত্ত্বে পাঠ দিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা জাতীয় ভূমিকা করিয়া (preparation) এবং পাঠের শেষে যে বার বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার (driling) ব্যবস্থা আছে, তাহা এই আগ্রহ ও পুনরাবৃত্তির সাহায্যে স্মৃতিকে স্থায়ী করারই ব্যবস্থা। স্মৃতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই স্থায়িত্ব থাকে না কেন অর্থাৎ আমরা ভুলিয়া যাই কেন, এই কথাটিও আসিয়া পড়ে। আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি আমাদের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা তাহার সব কিছুই মনের কোঠায় জমা থাকে—যত অস্পষ্টই হউক না কেন তাহার একটা ছাপ মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়। তাহা হইলে অতীতের ঘটনাগুলি সবই আমরা স্মরণ রাখিতে পারি না কেন? অর্থাৎ আমরা ভুলিয়া যাই কেন?

ফ্রয়েড বলেন, আমরা ভুলিয়া যাইতে চাই বলিয়াই ভুলিয়া যাই। যে ঘটনা আমাদের পক্ষে বিরক্তিকর অথবা লজ্জাকর সেই ঘটনাগুলিকে আমাদের নির্জ্ঞান মন বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া দেয়। আর যাঁহারা স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্য দিয়া স্মৃতিকে বুঝাইয়া থাকেন তাঁহারা বলেন, বিস্মৃতির কারণ হইতেছে—

(১) ঘটনার ছাপটি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর তেমন গভীরভাবে দাগ কাটিতে পারে নাই বলিয়া।

(২) ঘটনাটির সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সম্পর্ক অনুষঙ্গের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি বৃহত্তর একক (unit) সৃষ্টি না হওয়ায় যূথভ্রষ্ট হইয়া তাহা মনের গহনে হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া।

(৩) প্রতিস্পর্দ্ধী ঘটনাবলীতে অভিভূত হওয়ায় ঘটনার ছাপটী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া।

(৪) ঘটনাটী পুরাতন হইবার জন্য তাহার ছাপটী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে-হইতে একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে বলিয়া।

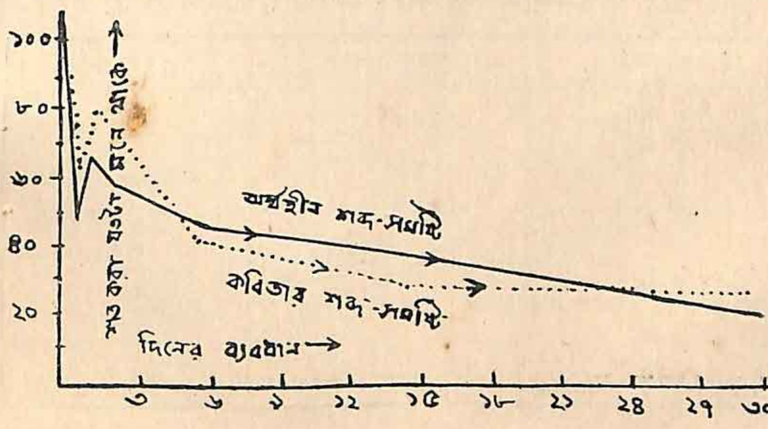
(৫) পুনরাবৃত্তির অভাবে ঘটনার ছাপটী আর নূতন করিয়া গভীর ও সজীব হইতে পারে না বলিয়া, ইত্যাদি।

এই ভুলিয়া যাওয়ার সহিত ঘটনার প্রাচীনত্বের সম্পর্কটী অত্যন্ত গভীর। একটি জিনিস যত বড়ই হউক না কেন, দূরে চলিয়া যাইলে তাহাকে ছোট দেখায় এবং আরও দূরে যাইলে আর দেখাই যায় না। স্মৃতির সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। সময়ের দূরত্ব যতই বাড়িবে, ঘটনার স্মৃতিও ততই অস্পষ্ট হইবে। তবে ইহার সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা আছে।

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, একটি কবিতা এইমাত্র শিক্ষা করা হইল। এখনই অর্থাৎ কবিতাটি কয়েকবার পাঠ করিবার পর যেইমাত্র পুস্তক না দেখিয়াই তাহাকে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলাম তখনই কবিতাটী অভ্যাস করা বন্ধ করিলাম। এইবার এক ঘণ্টা পরে দেখিব কবিতাটির $\frac{১}{৪}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি, তৃতীয় দিনে $\frac{১}{২}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি এবং এক মাস পরে $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। সময়ের অনুপাতে আমরা কি ভাবে ভুলিয়া যাই, সে সম্বন্ধে এবিঙ্গহৌস (Ebbinghaus) একটি তালিকা দিয়াছেন :

শিক্ষা শেষের পর সময়ের দূরত্ব	শতকরা স্মৃতির অনুপাত (অর্থহীন শব্দসমষ্টি)	শতকরা স্মৃতির অনুপাত অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি)
৫ মিনিট	৯৮	১০০
২০ মিনিট	৮৯	৯৬
১ ঘণ্টা	৭১	৭৮
৮ ঘণ্টা	৪৭	৫৮
২৪ ঘণ্টা	৬৮	৭৯
২ দিন	৬৯	৬৭
৬ দিন	৪৯	৪২
১৪ দিন	৪১	৩০
৩০ দিন	২০	২৪
১২০ দিন	৩	০

অন্যান্য পণ্ডিতগণও এই বিষয়ে অনুরূপ ফল পাইয়াছেন। ইহাদের সময়ের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, বিস্মৃতির লৈখিক চিত্রটি (graph) প্রথমে হঠাৎ নামিয়া যায়, তাহার পর ধীরে ধীরে ইহা ভূমির সহিত সমান্তরাল হইয়া চলে, কিন্তু কোনও সময়েই ভূমির সহিত সমরেখ হয় না (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।



Radossawljewitsch নামক একজন পণ্ডিত দেখিয়াছেন যে, অর্থহীন শব্দ সমষ্টিগুলির স্মৃতি ছয় ঘণ্টার পর শতকরা ৪৭ ভাগ থাকিয়া যায়, কিন্তু ১ দিন ও ২ দিন পরে তাহা যথাক্রমে ৬৮ ও ৬১ ভাগ থাকিয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সময়ের প্রাচীনত্বে স্মৃতির দিক দিয়া উন্নতি হইল কি করিয়া? ছয় ঘণ্টা পরে যতটা মনে রাখা সম্ভব ছিল, ১ দিন পরে তাহা অপেক্ষা বেশী মনে রাখা সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার সম্ভাব্য উত্তর, রাত্রের বিশ্রামজনিত ক্লান্তির অপনোদন মনকে আরও কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলে বলিয়া দীর্ঘ বিশ্রামের পর বেশী মনে রাখা সম্ভব হয়।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা হইতেছে আচরণবাদী পণ্ডিতদের। অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই ব্যাপারটির অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, ৬ ঘণ্টার চেয়ে ২৪ ঘণ্টা বিশ্রামের ফলে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় বেশী হয়। তাহার কারণ হইতেছে, বিশ্রামের অবসরে অনুভূতির **দৃঢ়ীকরণ** (**consolidation**) ; আর সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিক দিয়া কিছু কিছু জিনিস আমাদের স্মৃতি হইতে সরিয়া যায়, অপর দিক দিয়া তেমনই অতীত অনুভূতির ছাপগুলি ক্রমশঃ সুসংহত ও সুসজ্জিত হইয়া যথাযথ **ছাপজটের** (**engram complex**) সৃষ্টি করে বলিয়া স্মৃতির কার্য্যকারিতা নূতন করিয়া বাড়িয়া যায়।

ডাঃ ব্যালার্ড-এর স্মৃতি-পরীক্ষা ঃ

ব্যালার্ডএর স্মৃতি-সম্পর্কিত পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির তালিকা দেওয়া হইল ঃ

দিনের ব্যবধান	শতকরা লাভ	শতকরা ক্ষতি
১ দিন	×	১·৬
২ ”	৯·৪	×
৩ ”	৬·১	×
৪ ”	×	২·০
৫ ”	×	৫·৮
৬ ”	×	৮·৭
৭ ”	×	১২·১

তাঁহার পরীক্ষাগুলি প্রণিধানযোগ্য। এই পরীক্ষার খুঁটিনাটিগুলি "শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মনে রাখিবার ব্যাপারে শুধু পড়া বা সাধনাটাই একমাত্র কথা নহে, সাধনা ও বিশ্রামের যথাযথ বিন্যাসও প্রয়োজন। বিশ্রামের যেরূপ ব্যবধানে স্মৃতির লাভের অঙ্ক বেশী হয়, সেইরূপ ব্যবধান দিয়া পড়াশুনা করিলে অপচয় কম হইবে। এই সম্বন্ধে "শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম" শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য ঃ

"বার তের বৎসরের বালক বালিকাদের অসম্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি প্রখর কিন্তু সম্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি তত নহে। এই জন্য যে সকল পাঠ্য বিষয়ে যুক্তি অপেক্ষা তথ্য অধিক সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

"সম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও যৌবনকালে ইহার পরিপুষ্টি হয়। যত্ন ও চেষ্টার সাহায্যে সম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা যায়। যৌবনকালে বৈষয়িক আসক্তি প্রবল হওয়ায় অসম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বালকবালিকা অপেক্ষা অল্প হয়।

"সাধারণতঃ বালকবালিকারা সাত-আট বৎসর পর্য্যন্ত পাঠ্য বিষয় শুনিয়া সহজে কণ্ঠস্থ করিতে পারে। পরে চৌদ্দ-পণের বৎসর পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের দেখিয়া ও উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া মুখস্থ করিবার ক্ষমতা প্রবল থাকে।

"বার তের বৎসরের পূর্ব্বে বালকেরা কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া কিংবা দেখিয়া শুনিয়া ও লিখিয়া পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে পারে না। এ বয়সের পূর্ব্বে লিখিয়া লিখিয়া পাঠ মুখস্থ করিবার রীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

"বয়স্ক ব্যক্তি শুধু দেখিয়া ও মনে-মনে পড়িয়া কোনও বিষয় শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে। আবার লিখিয়াও অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারে।

"বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে একই বিষয় শিক্ষা করিলে বালক তাহা সহজে বিস্মৃত হয় না।

"মনোযোগ সহকারে যে বিষয়ের উপলব্ধি করা যায় তাহা সহজে আয়ত্ত

হয় ও স্মৃতি হইতে অপসৃত হয় না। অমনোযোগী হইয়া বহুবার পাঠ্য বিষয় আবৃত্তি করিলেও তাহা কণ্ঠস্থ হয় না এবং কণ্ঠস্থ হইলেও স্থায়ী হয় না।

"বালক-বালিকা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এককালীন পাঠ্য অল্প হওয়া আবশ্যক।

"পাঠ্য বিষয় নির্ভুলভাবে কণ্ঠস্থ করিতে যতবার আবৃত্তি করা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা পাঁচ ছয় বার অধিক আবৃত্তি করা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে আয়ত্ত বিষয় অধিকতর বদ্ধমূল হয় ও স্মৃতি হইতে সহজে অপসারিত হয় না।

"কোন বিষয় তালের সাহায্যে শিক্ষা দিলে সহজে আয়ত্ত হয় ও শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

"ক্লান্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ক্ষমতা কমিয়া যায়।

"মনোযোগের বিঘ্নকর জিনিস বিশেষভাবে কর্ণগ্রাহ্য আবেদনজনিত বিঘ্ন মুখস্থ করিবার পক্ষে ক্ষতিকর।

"বালক বালিকাদের স্মৃতিতে রক্ষিত ঘটনা প্রায়ই কল্পনার ঘটনার সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া যায়। সেইজন্য তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর খুব নির্ভর করা যায় না।

"যাহারা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে তাহারা দীর্ঘকাল মনেও রাখিতে পারে।

"জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথবা উনমানসিকতাযুক্ত বালক বালিকাদের স্মৃতিশক্তি সাধারণ বালকবালিকাদের চেয়ে অল্প।

"প্রাণীদের বুদ্ধির তারতম্য নির্ভর করে তাহাদের সমৃদ্ধ স্মৃতির শক্তির উপর।"

সাধারণ ছাত্রদের যতটা স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়া আমাদের ধারণা, ছাত্রদের স্মৃতিশক্তি তদপেক্ষা অধিক আছে। সাধারণতঃ ৯ হইতে ১৫ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন বৎসরে তিন হাজার লাইন কবিতা বা গদ্য অনায়াসেই শিক্ষা করিতে পারে এবং এইভাবে শিক্ষালব্ধ বিষয়ের এক অষ্টমাংশ হইতে এক চতুর্থাংশ জিনিস তাহাদের সারা জীবনের সম্পদ হইয়া মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

ক্লান্তি

সাধনার পথে চলিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্ম্মশক্তি ধাপে ধাপে একটানাভাবে বাড়িয়া চলে না, তাহা প্রথমটা দ্রুতভাবে বাড়িয়া চলে, তাহার পর যেন থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, আবার থমকাইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থায় আসে যে, তাহা আর চলিতে পারে না। সেই সময় কাজে সম্পূর্ণ বিশ্রাম না দিলে কর্ম্মশক্তি আরও অনেকক্ষণের জন্য পঙ্গু হইয়া থাকে।

কাজেই ক্লান্তি যখন বিশ্রামের দাবী করে, তখন বিশ্রাম না দিলে সিদ্ধি আরও চিরায়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রায়ই ক্লান্তি এবং কাজের একঘেয়েত্বের জন্য বিরক্তিজনিত অনিচ্ছা (boredom), এই দুইটি জিনিসের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ফলে মন যখন প্রকৃত ক্লান্ত না হইয়াও আদুরে খোকার মত নিছক আলস্যবশতঃ বিশ্রামের দাবী করে, তখন তাহাকে প্রশয় দিলেও সাধনার ক্ষতি হয়।

এই প্রকৃত ক্লান্তির স্বরূপটি জানিয়া না রাখিলে আমাদের দুই দিক দিয়া অসুবিধা হইতে পারে। আদুরে গোপাল মনকে নাই দিয়া তাহার নিকট হইতে যতটা কাজ পাওয়া সম্ভব, তাহা না পাওয়া, অথবা সে যতটা কাজ করিতে পারে তাহার অধিক কাজের বোঝা তাহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া তাহার কর্ম্মশক্তির ক্ষতি করা। অতএব আমাদের জানিয়া রাখা দরকার ক্লান্তির লক্ষণটি কি ?

দৈহিক বিচারে ক্লান্তি জিনিসটা আসে (১) পেশী (২) স্নায়ুতন্ত্র ও (৩) প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়াকে (reflex) কেন্দ্র করিয়া।

পেশীর ক্লান্তি ঃ একজন ব্যায়ামসাধক যখন একটি বারবেল লইয়া বার বার উত্তোলন করিতে থাকে, তখন কয়েকবার উত্তোলন করিবার পর তাহার এমন একটি অবস্থ আসে যখন তার আর বারবেলটি উত্তোলন করিবার শক্তি

থাকে না ; তখন তাহার পেশীগুলি তাহার মনের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে না। এই জাতীয় অবস্থাটিকেই আমরা পেশীর ক্লান্তি বলিয়া থাকি।

পেশীগত ক্লান্তি সম্পর্কে Mosso তাঁহার আবিষ্কৃত ergograph লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া গিয়াছে :

(ক) কার্য্যারম্ভের প্রথম দিকেই একটা অবসাদের ভাব আসে, কার্য্য চালাইয়া যাইলে তাহা আবার কমিয়া যায় এবং তাহার পর ক্লান্তি আসে। (খ) পেশীর সঙ্কোচনের ফাঁকে ফাঁকে যদি অন্ততঃ ১০ সেকেণ্ড করিয়া বিশ্রাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্লান্তি আসে না। (গ) ক্লান্তির পর খানিকটা বিশ্রাম দিলে স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসে ; ergograph যন্ত্রে অঙ্গুলির সঙ্কোচক পেশীর ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে পেশীর শক্তি স্বাভাবিক হয়। (ঘ) পূর্ণ ক্লান্তির পর যদি আবার পেশী সঙ্কোচনের জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পেশী এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, বিশ্রামের জন্য আরও অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। (ঙ) নির্দ্দিষ্ট সময়ের এককের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি অঙ্গ সঞ্চালন করা হয়, তত তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসে। (চ) খাদ্যের সরবরাহ কম হইলে, অথবা শরীর হইতে পেশীর ক্ষয়জাত দ্রব্যের যথাযথ নিষ্কাশন না হইলে, শীঘ্র শীঘ্র ক্লান্তি আসে ; অপর পক্ষে massage-এর সাহায্যে রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা, অথবা খাদ্য বা চিনির সরবৎ প্রভৃতি দ্বারা ক্লান্তির অপনোদন হয়। (ছ) শরীরের কতকগুলি পেশী ক্লান্ত হইলে অন্য পেশীগুলিরও কার্য্যকারিতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় (জ) অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি শারীরিক শক্তিকে কমাইয়া দেয়। (ঝ) অ্যাল্‌কহল্‌, কফিন্‌, নিকোটিন প্রভৃতি ক্লান্ত পেশীকে কতখানি সতেজ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই, তবে শরীরের মধ্যে চিনি ইন্‌জেক্‌শান্‌ করিবার পর ৩০ হইতে ৪০ মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় যে, শক্তি অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে ; বিপরীত পক্ষে সুস্থ শরীর হইতে কৃত্রিম উপায়ে চিনি বাহির করিয়া লইলেও পেশীর শক্তি কমিয়া যায়।

স্নায়ুপ্রণালীর ক্লান্তি (Nerve Trunk) : পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পেশীর ক্লান্তি শীঘ্র শীঘ্র আসিলেও স্নায়ুপ্রণালীর ক্লান্তি সহজে আসে না।

মস্তিষ্ক হইতে কোনও একটা প্রেরণা যখন স্নায়ুপ্রণালী বহিয়া পেশীতে চলিতে থাকে, তখন স্নায়ুপ্রণালীতে খানিকটা ক্ষয়ক্ষতি যে হয় না তাহা নহে, তবে তাহা অতি অল্প। স্নায়ুপ্রবাহকে ক্লান্ত করা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়া (Reflexes) ঃ ভয়ে কাঁপা, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠা, খাদ্যদ্রব্য দেখিলে জিহ্বায় রসক্ষরণ হওয়া, গরম জিনিসে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ হাত সরাইরা লওয়া প্রভৃতি কাজগুলিকে 'প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়া' (reflexes) বলা হয়। এই প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়ার উপর ক্লান্তির প্রভাব কতটুকু তাহা লইয়া শেরিংটন অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, মেরুদণ্ডের স্নায়ুজনিত প্রতিবর্ত্তক প্রতিক্রিয়াগুলি (spinaler reflexes) বার বার উত্তেজনায় অথবা একটানা উত্তেজনায় ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্লান্তিটি পেশীর ক্লান্তির জন্য হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, এই স্নায়ুর পরিশ্রমের জন্য একটি কুকুরের সঙ্কোচক পেশীটি যখন সঙ্কোচন কার্য্যের জন্য সাড়া দিতে পারে না, তখন এই পেশীটিই হয়ত সুড়সুড়ি বা অন্য জাতীয় আবেদনে সাড়া দেয়। এক্ষেত্রে পেশীটি যদি ক্লান্ত বা অবসন্ন হইত তাহা হইলে যে পেশীটি সঙ্কোচন কার্য্য করিতে পারে নাই সেটি অন্য কার্য্যও করিতে পারিত না। স্নায়ু-প্রণালীর সহিত সংযোগকারী সাইন্যাপ্সের অবসাদের জন্যই পেশীটি ঐ সাইন্যাপ্সের অধিকারভুক্ত কাজটি করিতে পারিল না, কিন্তু অন্য কাজ করিতে পারিল।

আবার দেখা গিয়াছে, ত্বকের কোনও একটি অংশ যদি সুড়সুড়ির আবেদনে সাড়া না দেয়, তখন তাহারই কাছাকাছি অন্য অংশ তাহাতে হয়ত সাড়া দিবে। তবে প্রথম স্নায়ুকেশটির ক্লান্তির পূর্ব্বে যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, অন্য ক্ষেত্রে হয়ত প্রতিক্রিয়াটি অন্যভাবে হইবে। স্নায়ুপ্রান্তের কেশগুচ্ছের প্রত্যেকটি কেশ এইভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন ভঙ্গী দিয়া মানুষের দেহযন্ত্রকে এতখানি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে হারমোনিয়ামের বিশিষ্ট পর্দ্দা টিপিলে যেমন একটি বিশিষ্ট সুর উঠে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর বিশিষ্ট আবেদনে প্রত্যেকবারেই একটি বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া হয় না।

পেশী, স্নায়ুপ্রণালী (Nerve trunk) এবং সাইন্যাপ্স—এইগুলির মধ্যে সাইন্যাপ্সগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই হিসাবে এইগুলি বিদ্যুৎবর্ত্তনী বা সারকিট্-এর মধ্যে "ফিউস্"-এর মত; অতি সহজেই সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার অতি সহজেই সেগুলির সংস্কারও করা যায়।

ক্লান্তির কারণ ঃ

তিনটি কারণে ক্লান্তি আসিয়া থাকে; যথা—(১) শক্তি সঞ্চারণকারী খাদ্যরসের অভাব, (২) শরীরের ক্ষতিজনিত বিষাক্ত আবর্জ্জনার (waste products) অস্তিত্ব, (৩) অক্সিজেনের অভাব।

(১) খাদ্যদ্রব্যের সার ভাগ হইতে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা রক্তের সাহায্যে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ ও শক্তির ভাণ্ডার রূপে মাংসপেশীস্থ জীবকোষের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। যখন স্নায়ু হইতে কোনও প্রেরণা পেশীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন এই শক্তি-ভাণ্ডারের খানিকটা অংশ ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে পেশীর সঙ্কোচন সম্ভব হয়। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সঙ্কোচন কার্য্য চলিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন এই সঞ্চিত শক্তিভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে এবং তখন আর সঙ্কোচন সম্ভব হইবে না। এই অবস্থাটিকেই আমরা ক্লান্তি বলিয়া থাকি। এই সময়ে বিশ্রাম দিলে ধীরে ধীরে আবার শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষমতা ফিরিয়া আসে।

(২) পেশীগুলি কাজ করিবার সময় যখন সঙ্কুচিত হয় তখন তাহার মধ্যে কিছু কিছু অংশ দগ্ধ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (toxin) থাকে। এই বিষাক্ত আবর্জনাটি বেশী মাত্রায় সঞ্চিত হইলেও শরীরের মধ্যে ক্লান্তির অবসাদ সৃষ্টি হয়। Masso পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটি সুস্থ কুকুরের দেহে ক্লান্ত কুকুরের রক্ত ইন্‌জেক্‌শান্ করিয়া সুস্থ কুকুরটির মধ্যেও ক্লান্তির লক্ষণ আনা যাইতে পারে।

(৩) পেশী সঙ্কোচনের সময় পেশীর মধ্যে যে দহন কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা শোণিতের মধ্যস্থিত রক্ত-কণিকা-বাহিত অক্সিজেন বায়ুর সাহায্যেই হইতে থাকে। কাজেই ক্লান্তির সহিত অক্সিজেনের একটা বিষমানুপাত

সম্পর্ক আছে। শরীরের ক্লান্তির সময় যে lactic acid জমিয়া থাকে, তাহা অক্সিজেনের সাহায্যেই বিদূরিত হইয়া থাকে। কাজেই অক্সিজেনের অভাব হইলে অথবা ফলতঃ lactic acid এর আধিক্য হইলে শরীরের ক্লান্তি আসে।

ক্লান্তির প্রকারভেদ ঃ

সাধারণতঃ (১) শারীরিক, (২) মানসিক এবং (৩) অনুভূতিজ (sensory)—এইভাবে ক্লান্তির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ খুব সার্থক নহে। কারণ অনুভূতির যন্ত্রগুলি (sensory organs) স্নায়ুবাহিত প্রেরণায় ও পেশীর সাহায্যে কাজ করে। সুতরাং ক্লান্তি জিনিসটা কোন স্থানে যে প্রথম সূচিত হয় তাহা বলা শক্ত। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। প্রথমটি পেশী ও দ্বিতীয়টি স্নায়ুতন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া লোকের ধারণা। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, এই দুই জাতীয় ক্লান্তিও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং অন্য সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ শারীরিক বা বিশুদ্ধ মানসিক ক্লান্তির উদাহরণ পাওয়া খুবই কঠিন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ক্লান্তির কোনও মাপকাঠি আছে কি? ক্লান্তির বিভিন্ন অবস্থাগুলির মাপ করিবার মত মাপকাঠি পাওয়া শক্ত। কারণ, আগ্রহ, অভিনিবেশ, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি ক্লান্তির অবসাদকে এমনই ভাবে প্রভাবান্বিত করে যে, ক্লান্তিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ক্রেপেলিন (Kraepelin) ক্লান্তির নিরিখ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া যে তথ্যগুলি পাইয়াছেন তাহা এই ঃ (১) কর্ম্মশক্তি প্রথমেই (আগ্রহ ও অভিনিবেশের জন্য) দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে ; (২) তাহার পর আরও খানিকটা সময় ইহা ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে (৩) তাহার পর উন্নতি বন্ধ হইয়া রেখাটি সোজাভাবে (horizentally) চলিতে থাকে ; (৪) ইহার পর আগ্রহ কমিয়া যাইবার জন্য কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং রেখাটি নামিয়া আসিতে থাকে ; (৫) শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তির অবসাদজনিত কর্ম্মশক্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত কর্ম্মশক্তি আর একবার বাড়িয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ক্রেপেলিন-এর সিদ্ধান্তগুলি লইয়া থর্ণডাইক, চ্যাপমান, রীড্ প্রভৃতি

অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সব পরীক্ষায় থর্ণডাইক ক্রেপেলিন বর্ণিত বিভিন্ন অবস্থানগুলির সন্ধান পান নাই। চ্যাপমান আদি উত্তেজনা (initial spurt) লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রীড্ নিজের উপর পরীক্ষা চালাইয়া 'আদি উত্তেজনা' অথবা 'অন্তিম উত্তেজনা' (end spurt) কোনও কিছুরই সন্ধান পান নাই।

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ক্লান্তির মাপকাঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কতকগুলি শারীরিক ক্লান্তি, কতকগুলি বা মানসিক ক্লান্তি মাপিবার পক্ষে উপযুক্ত। ক্লান্তি মাপিবার কয়েকটি উপায় বর্ণিত হইল :

Aesthesiometer : কম্পাসের দুইটি কাঁটা লইয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ারী। ক্লান্তির সময়ে চর্ম্মের স্পর্শশক্তি কমিয়া যায়। কত কাছাকাছি কাঁটা দুইটি চাপ দিতেছে ইহা বুঝিতে পারার ক্ষমতার উপর ক্লান্তির তারতম্য নির্ভর করে। যন্ত্রটির প্রয়োগ সব সময়েই সার্থক হয় না ; কারণ, কাঁটা দুইটির যুগপৎ প্রয়োগ, চাপের ক্ষমতা সব সময়ে ঠিক রাখা সম্ভব হয় না।

Ergograph : Mosso এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হাতের অঙ্গুলিটি একটি ওজন তুলিবার জন্য কতবার সঙ্কুচিত হইতে পারে, এই যন্ত্রে তাহা দেখা হয়। একটি ঘূর্ণমান ড্রামের উপর স্বয়ংসিদ্ধভাবে রেকর্ড লইবার ব্যবস্থা আছে। একটি টেবিলের উপর হাতের কব্জিটি দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে এবং শুধু আঙ্গুলের সাহায্যে ভারটি তুলিবার ব্যবস্থা থাকে। আঙ্গুলটি ওজন লইয়া কিভাবে পর পর সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহা একটি ঘূর্ণমান ড্রামের উপর আপনা আপনিই লিখিত হইয়া যায়। আঙ্গুলের ক্লান্তির সহিত সমগ্র শরীরের ক্লান্তির একটা সম্পর্ক আছে ধরিয়া লইয়া আঙ্গুলের ক্লান্তির সাহায্যে দৈহিক ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি হইতেছে, শারীরিক ক্লান্তি আসিবার সময় শুধু মনঃশক্তি প্রয়োগ করিয়া অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করা যায় এবং তাহার ফলে ক্লান্তির মাপে বিশেষত্ব ঘটে।

Dynamometer : এই যন্ত্রে কিলোগ্রামের মাপে হাতের মুঠা করিবার শক্তির পরীক্ষা করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে, মানসিক ক্লান্তি যতই বেশী হইবে, এই মুঠা করিবার চাপের শক্তি ততই কমিয়া যাইবে।

Algesiometer : এই যন্ত্রে ত্বকের স্পর্শশক্তি মাপা হইয়া থাকে। একটি ভোঁতা মুখবিশিষ্ট সূঁচ দ্বারা ত্বকের উপর চাপ দেওয়া হয় এবং কতখানি চাপ দিলে কষ্ট আরম্ভ হয়, তাহার মাপের উপর ক্লান্তির মাপ ধরা হয়। ধরা হয় যে, ক্লান্তির সহিত এই যন্ত্রণা-বোধটি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

Kinematometer : এই যন্ত্র হাতের কনুইটিকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তচাপ অঙ্কিত করিতে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক দোলনে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথমে মাপিয়া লওয়া হয়। পরে আবার চাপ আঁকিতে বলা হয় এবং চাপের দৈর্ঘ্য হইতে যেটুকু কমবেশী হইবে, তাহাকেই ক্লান্তির মাপ ধরা হয়।

Tapping method : ইহাতে ক্লান্তিবিশিষ্ট মানুষকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টোকা দিতে বলা হয়। মানুষ যত ক্লান্ত হইবে টোক দেওয়ার সংখ্যা ততই কমিয়া যাইবে।

Reaction time-test : উত্তেজনা ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সময় দেখিয়াও ক্লান্তির মাপ করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত ক্লান্ত হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়া ততই বিলম্বিত হইবে।

Respiration and pulse variation : ক্লান্তির সময় নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া যায়, এই বিশ্বাস লইয়া নিশ্বাসের বা নাড়ীর গতির মাপ দেখিয়া ক্লান্তির পরিমাণ মাপা হইয়া থাকে।

Eye accommodation : অনেকের বিশ্বাস, সাধারণ অবস্থায় চক্ষু দিয়া একসঙ্গে যতটা জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, ক্লান্তির সময় তাহার তারতম্য হয়। কাজেই এই তারতম্য দেখিয়া ক্লান্তিরও তারতম্য মাপা যাইতে পারে।

Dictation : মানুষ যতই ক্লান্ত হইবে শ্রুতিলিখনে বানান ভুলের সংখ্যাও ততই বেশী হইবে। তাই শ্রুতিলিখনের পরীক্ষা দ্বারাও ক্লান্তি মাপ হইয়া থাকে।

Calculation : ক্লান্তির সময় সংখ্যার যোগের ভুল একটু বেশী হইয়া থাকে। সেই জন্য যোগের অঙ্কের সাহায্যেও ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত উপায় ছাড়া অনুক্ত পদ-পূরণ, বিভিন্ন শব্দের মধ্যে এক একটি বিশিষ্ট অক্ষরকে কাটিয়া বাদ দেওয়া অথবা অক্ষরের সংখ্যা গণনা করা, কবিতা বা শব্দসমষ্টি মুখস্থ প্রভৃতি নানা উপায়ে ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, শারীরিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মানসিক ক্লান্তি মাপ করিবার চেষ্টা প্রায়ই নির্ভরযোগ্য নহে। এমনকি যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারাও, মানসিক ক্লান্তির একটা বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কাজেই মানসিক ক্লান্তির মাপ করিতে হইলে একটানা মানসিক পরিশ্রমের পর মনের কর্ম্মশক্তি যতটা হ্রাস পাইয়া থাকে তাহাই বিচার্য্য।

এই বিষয়ে অর্থাৎ নিছক মানসিক পরিশ্রমের পর কতখানি মানসিক ক্লান্তি আসে, এই লইয়া থর্ণডাইক, মিস্ অরাই (Miss Arai) প্রভৃতি অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। থর্ণডাইক ১৬টি ছাত্র লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনটি সংখ্যার অঙ্ককে তিনটি সংখ্যার অঙ্ক দিয়া গুণ করিতে বলা হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রত্যেক ছাত্রকেই খাইবার জন্য অল্প একটুখানি সময় অবসর দিয়া চার হইতে বারো ঘণ্টা ধরিয়া একটানা ভাবে কাজ করান হয়। পরের দিন ঐ একই কাজ মাত্র আধ ঘণ্টা করান হয়। প্রথম দিন কাজের শেষের দিকে অঙ্কগুলি করিতে যত সময় লাগিয়াছিল এবং যত ভুল হয়, তাহার সহিত দ্বিতীয় দিনের সময় ও ভুলের সংখ্যার অনুপাত দেখিয়া তিনি ক্লান্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই পরীক্ষা দ্বারা ক্লান্তির নিরিখ ঠিক হয় নাই। কারণ ষোলজনের মধ্যে তিনজনের কাজের শেষের দিকে (অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্লান্তির দিকে) যতটা কাজ হইয়াছিল, কাজের প্রথম দিকেই তাহার চেয়ে কম কাজ হইয়াছিল এবং সাতজনের কাজের সময় গড়ে ৫৪% ভাগ বাড়িয়াছিল।

এই সম্বন্ধে মিস্ অরাই-এর (জাপানী মহিলা গ্র্যাজুয়েট্) পরীক্ষা আরও চমক্প্রদ। তিনি প্রতিদিন বেলা ১·৪৬ হইতে রাত্রি ১০·০৮ পর্য্যন্ত মনে মনে গুণনের কার্য্য করিয়া ক্লান্তির পরিমাণ মাপিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল একটানা মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি প্রকৃত ক্লান্তির (অর্থাৎ যে ক্লান্তি মানুষের কর্ম্মশক্তিকে সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দেয়) সন্ধান পান নাই।

ইহার পর তিনি পরীক্ষার প্রক্রিয়া বদ্‌লাইয়া প্রথম বারে অঙ্কের অক্ষরগুলি চক্ষে দেখিয়া মনে মনে গুণের কাজ করেন। এবারে তিনি অঙ্কগুলিকে একবার দেখিয়া লইয়াই শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ৯২৬৩×৫৭৪৮

শ্রেণীর গুণগুলি মনে মনে করিতে থাকেন। এবং প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত পর পর চারদিন ধরিয়া গুণ করিয়াও ক্লান্তির সন্ধান পাইলেন না, এই কঠোর পরিশ্রমের পরও তাঁহার খুব বেশী সংখ্যক ভুলভ্রান্তি হয় নাই, শুধু কাজের ক্ষিপ্রতা খানিকটা কমিয়া গিয়াছিল এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কাজের ক্ষিপ্রতা কমিয়া যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, কাজের দক্ষতা কমিয়া গিয়াছে বা ক্লান্তি কর্ম্মশক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে থর্ণডাইক বলিয়াছেন, "এই জাতীয় কঠিন কাজ একটানাভাবে ১০।১২ ঘণ্টা করার পর কাহারও কার্য্যে যদি ক্ষিপ্রতা কিছু কমিয়া যায় অথবা ভুলভ্রান্তি বেশীও হয়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তাহার মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে। সেক্সপীয়ার যতখানি সময় লইয়া তাঁহার Hamlet নাটকটি লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ সময় লইয়া তাহা লিখিলে এই বুঝিতে হইবে না যে, সেক্সপীয়র-এর প্রতিভা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।"

অনেকের ধারণা আছে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু-চলাচলের অভাব হইলেও মানসিক পঙ্গুতা আসে। এই সম্বন্ধেও থর্ণডাইক, ম্যাককল্, চ্যাপমান প্রভৃতি প্রচুর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ছাত্রদিগকে যথাসাধ্য কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারিলে ক্লান্তি সহজে আসে না। মানুষের ইচ্ছা ও আগ্রহ তাহার কর্ম্মশক্তিকে অনেকখানি অটুট রাখিতে পারে।

স্কুলে সারাদিন পরিশ্রমের পর ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ মানসিক ক্লান্তি আসে, তাহার পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ছাত্রদের কর্ম্মশক্তি শতকরা ১ হইতে ৫ ভাগ মাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেকের ধারণা, শেষের দিকে ছাত্রদের মানসিক শক্তি ৫০% ৬০% ভাগ কমিয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা ক্লান্তি ততটা নহে যতটা হইতেছে একঘেয়েত্বজনিত কাজে অনিচ্ছা। কাজেই স্কুলের শেষের দিকের পিরিয়ডগুলিতে যদি সরস ও মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলি পড়ান হয় তবে এই অনিচ্ছা-জনিত অবসাদ বা কার্য্যকারিতা শক্তির হ্রাস কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসিতে পারে, স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি নীরস অর্থাৎ সহজে ক্লান্তি আনয়ন করে এবং কোনটিইবা সরস অর্থাৎ বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্তাকর্ষক থাকে? এই সম্বন্ধে ওয়েগ্‌নার (Wegner) প্রভৃতি

aesthesiometer লইয়া পরীক্ষা করিয়া কাঠিন্য হিসাবে বিষয়বস্তুগুলিকে এইভাবে পরপর সাজাইয়াছেন : অঙ্ক ১০০, ল্যাটিন ৯১, জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ৯০, ইতিহাস-ভূগোল ৯০, ফ্রেঞ্চ ৮২, বিজ্ঞান ৮০, ড্রইং ও ধর্ম্ম ৭৭।

Kemsies সাহেব dynamometerএর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, recreational treat হিসাবে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ই হইতেছে কঠিনতম বিষয়।

আমাদের মনে হয়, বিভিন্ন বিষয়গুলি অন্য-নিরপেক্ষভাবে শুষ্ক বা নীরস. ক্লান্তিকর বা সুখসাধ্য নহে। ইহা পাঠনভঙ্গী, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে এবং পাঠনভঙ্গী ভাল না হইলে তথাকথিত সুখপাঠ্য বিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিব? মিস্ অরাই বা থর্ণডাইক-এর পরীক্ষা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, শারীরিক ক্লান্তি যত শীঘ্রই আসুক না কেন, মানসিক পরিশ্রমের ক্লান্তি সহজে আসে না—আমাদের মস্তিষ্ক এমনই যে, তাহাকে কাজ দিয়া সহজে ক্লান্ত বা সাময়িকভাবে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলা প্রায় অসম্ভব। তবে একটানা ভাবে অনেকক্ষণ মানসিক পরিশ্রম করিলে দক্ষতা বা ক্ষিপ্রকারিতা খানিকটা কমিয়া যায়।

অস্বাস্থ্যকর বা চিত্তবিক্ষোভকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গেই যে মানসিক দক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত ক্লান্তিই হউক অথবা বিরক্তিই হউক, ইহাদের একটা জীবতাত্ত্বিক (biological) ব্যঞ্জনা আছে যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, এইবার কাজে বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সতর্কীকরণের আদেশটি না মানিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ক্লান্তি দেহযন্ত্রের সমতা রক্ষার নির্দ্দেশ দেয়। একটা যন্ত্র যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন দেহকে বিশ্রাম দিলে অন্য একটি যন্ত্র কাজ করিবার সুযোগ পায়। ইহাতে সমগ্রভাবে পূর্ণতা ও দক্ষতারই সুযোগ আসে। কাজেই ক্লান্তির নির্দ্দেশটুকু মানিয়া লইয়া ক্লান্ত যন্ত্রটিকে বিশ্রাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিশ্রামের অর্থ সম্পূর্ণ কর্ম্মবিরতি বা নিদ্রা নয়। অনেক সময় কর্ম্মের 'রুটিন্' পরিবর্ত্তন করিলেই বিশ্রাম লাভ হয়। ফলে সারাদিন অঙ্কের হিসাবের

পর একটু খেলা-ধূলা বা বিশ্রাম, আবার সারাদিন কল-কারখানায় দৈহিক পরিশ্রমের পর একটু সঙ্গীত-সাধনা বা একটু পড়াশুনা করাও বিশ্রাম। তবে অত্যন্ত ক্লান্তির সময় শুধু কর্ম্মের রুটিন্ পরিবর্ত্তন করিলেই বিশ্রাম লাভ করা যায় না, তখন শরীর-মনকে সম্পূর্ণভাবে এলাইয়া দিয়া অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পেশীগুলিকে শিথিল করিয়া দিয়া, মনকে সর্ব্বচিন্তামুক্ত করিয়া শুইয়া থাকিলে শীঘ্রই ক্লান্তি অপনোদিত হয়। যৌগিক "শবাসন" প্রভৃতিও ক্লান্তি অপনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

তবে যৌগিক শবাসন বা আত্মসচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা যে ক্ষেত্রে দেহ-মনকে শিথিল করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে নিদ্রাই হইতেছে ক্লান্তি অপনোদনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ক্লান্তি অপনোদনের দিক দিয়া, শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের দিক দিয়া নিদ্রার প্রয়োজন খাদ্যের অপেক্ষাও অধিক। এই বিষয়ে দুইটি কুকুরকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল; একটিকে পর পর সাতদিন কিছু খাইতে দেওয়া হয় নাই এবং আর একটিকে সাতদিন ঘুমাইতে দেওয়া হয় নাই। দেখা গিয়াছিল, যে কুকুরটি খাইতে পায় নাই, সে পরে বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু যে ঘুমাইতে পায় নাই, সেই কুকুরটি বাঁচিতে পারিল না।

তবে এই নিদ্রার প্রয়োজন সকলের জন্য সমান নয়। ক্লান্তির প্রতিষেধক হিসাবে নিদ্রার একটা সার্ব্বজনীন অনুপাত বাহির করা সহজ নয়। ইচ্ছাশক্তি এখানে অনেকখানি কার্য্য করে। সম্ভবতঃ নিদ্রারও একটা কৌশল আছে। এই কৌশলটী যাহাদের জানা আছে, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্তির অবসাদ কাটাইয়া উঠিয়া আবার কর্ম্মশক্তি ফিরিয়া পায়। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের সকলেরই বোধহয় এই কৌশলটী জানা ছিল; নেপোলিয়ান খুব বেশী সময় নিদ্রা যাইতেন না, আকবর তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন, নেতাজীও নাকি আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতেন না, মহাভারতের বীর অর্জ্জুনও "গুড়াকেশ" অর্থাৎ "জিতনিদ্র" ছিলেন। ঘুমের কুম্ভকর্ণরা নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মযোগী হইতে পারে না, আর ক্লান্তির বিশ্রাম-বিলাসী আরামপ্রিয় আদুরে গোপালরাও খুব কৃতী লোক হইতে পারে না। আসলে 'যুক্ত আহার বিহার' অর্থাৎ জীবনের সব কর্ম্মই সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

অভিনিবেশ

শিক্ষার ব্যর্থতার যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে উনমনস্কতা বা অন্যমনস্কতা অন্যতম। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিক্ষক পাঠনের সময় ক্লাসের অভিনিবিষ্টতা রাখিতে সমর্থ হন তাঁহার পাঠন ফলপ্রসূ হয়। কাজেই শিক্ষক, অভিভাবক বা শিক্ষাব্রতীর নিকট অভিনিবেশ তত্ত্বটি খুব প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ একটি অনন্য-নিরপেক্ষ মানসিক শক্তি এবং অনুশীলন প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে মনের "বিবৃতিবাদ" বা অন্য-নিরপেক্ষ শক্তিবাদ (faculty psychology) পরিত্যক্ত হইয়াছে। অভিনিবেশ হইতেছে, একজন লোকের একটি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া। সুতরাং অভিনিবেশ হইতেছে, আমাদের অভিজ্ঞতার একটি অবস্থা মাত্র—ইহাতে একজন কর্ত্তৃপুরুষ এবং একটি কর্ম্মের দ্যোতনা থাকিবেই। পূর্ব্বতন মনস্তাত্ত্বিকগণ অভিনিবেশের ব্যাপারে বিশেষ একটু জোর দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ হইতেছে "কোনও একটি বিষয়ের উপর চৈতন্যের কেন্দ্রীকরণ মাত্র।"

অবশ্য অভিনিবেশের এই সংজ্ঞাটি অনেক দিক দিয়াই ব্যঞ্জনাময়। কারণ, আমরা জানি প্রতেক অভিনিবেশের ব্যাপারেই একটি কেন্দ্র এবং তাহার পরিবেশ (margin) দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা কোনও জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত করি তখন দৃষ্টির কেন্দ্রগত জিনিসটিকেই ভালভাবে দেখিতে পাই, কিন্তু যে জিনিসটি আমরা দেখি তাহার আশেপাশের অনেক জিনিসই কিছু কিছু দেখিতে পাই। তবে এই দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে যে জিনিসটি যত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহা ততই অস্পষ্ট হইতে থাকে। চোখের দৃষ্টিক্ষেত্রের মতই অভিনিবেশের ক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কেন্দ্র এবং তাহার একটি পরিবেশ আছে। অভিনিবেশের কেন্দ্রগত জিনিসটি চৈতন্যের উপর যতটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কেন্দ্রের চারিদিকের জিনিসগুলি ততটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না। আবার অভিনিবেশের চেষ্টায় কেন্দ্র হইতে

দূরস্থ কোনও জিনিসকে যদি কেন্দ্রগত করা যায়, তাহা হইলে তাহাও স্পষ্টতর হইয়া চৈতন্যের রাজ্যে ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য মনীষী টিচেনার বলিয়াছেন, অভিনিবেশের প্রশ্নই হইতেছে অনুভূতিগ্রাহ্য স্পষ্টতা : "The problem of attention centers in the fact of sensible clearness."

অভিনিবেশের কেন্দ্রগত স্পষ্টতা এবং পরিবেশগত অস্পষ্টতা থাকিলেও, পরিবেশস্থ এই আব্ছা জিনিসগুলির প্রভাবও চৈতন্যের উপর কম নহে। কারণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই এই পরিবেশগত জিনিসগুলির মধ্য হইতে একটি না একটি জিনিস অভিনিবেশের কেন্দ্রস্থলে ছুটিয়া আসে। পরিবেশস্থ বহু জিনিসের মধ্য হইতে এই যে এক একটি জিনিসকে চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে টানিয়া আনা, এই যে মনের নির্ব্বাচনী শক্তি, ইহাকেই অভিনিবেশ বলা হয়। ইহার মধ্যে কর্ম্মপ্রয়াসের (conation) লীলা আছে। সুতরাং অভিনিবেশ প্রসঙ্গে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকদের মত শুধু চৈতন্যের কথা বলিলেই চলিবে না, ইহার মধ্যেকার কর্ম্মপ্রয়াসের দিকটাও আলোচ্য। ম্যাকড্যুগলের মতে অভিনিবেশ হইতেছে "a striving to cognise" কিংবা "attention is merely conation or striving from the point of view of its affect on cognitive process."

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে কোন বিষয়ে আমাদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট হইবে? অভিনিবেশের সর্ত্ত কি? অনেকের বিশ্বাস, একটি বিশিষ্ট জিনিস যে আমাদের অভিনিবেশকে আকৃষ্ট করে, তাহার কারণ ইহার আকস্মিকতা ও তীব্রতা; হঠাৎ বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল, হঠাৎ একটা কিছু ভারী জিনিস পতনের শব্দ হইল, অমনি আমাদের মনোযোগ বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইল। অতএব মনোযোগের একটা সর্ত্ত হইতেছে এই আকস্মিকতা ও তীব্রতা।

কিন্তু দেখা গিয়াছে, ঘটনার তীব্রতা ও আকস্মিকতা অর্থাৎ কর্ত্তৃনিরপেক্ষ বস্তুজগতের (objective) আবেদনই মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র কারণ নহে, ইহার জন্য কর্ত্তার ইচ্ছা, আগ্রহ প্রভৃতিরও প্রয়োজন। কাজেই মনোযোগ প্রসঙ্গে আগ্রহের কথাও আলোচ্য। আমাদের অনুভূতির অসংখ্য জিনিসের মধ্য হইতে, জগতের গীত-গন্ধ-গানে ভরা সহস্র আবেদনের মধ্য

হইতে দুই একটি বিশেষ বিশেষ জিনিসকেই যে আমরা বাছিয়া লই, তাহার কারণ হইতেছে ঐ সব বিষয়ে আমাদের আগ্রহ। আগ্রহ যত বেশী হইবে মনোযোগ ততই তীব্র ও স্থায়ী হইবে। ইহা হইল আগ্রহের কর্তৃনিরপেক্ষ একটা বস্তুময় (objective) ব্যঞ্জনার দিক।

আবার এই বস্তুময় ব্যঞ্জনা ছাড়াও "আগ্রহ" কথাটির মধ্যে একটা কর্তৃপুরুষের (subjective) ব্যঞ্জনাও আছে। "তাহার গানে আগ্রহ আছে" এই কথাটির অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, গানের বিষয়ে সে আগ্রহশীল অথবা গানে তাহার মন রসায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে গানের ব্যঞ্জনা নিছক বস্তুকেন্দ্রিকই নহে, ইহার মধ্যে একটা কর্তৃকেন্দ্রিক ব্যঞ্জনাও আছে। স্টাউট্ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক এই কর্তৃকেন্দ্রিক অর্থেই আগ্রহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আগ্রহ হইতেছে, "affective conative aspect of experience." ড্রেভার সাহেবও ইহাকে "instinct interest" এই নাম দিয়া ইহার affective দিকটির উপরই জোর দিয়াছেন।

আগ্রহ একটা সাময়িক অভিজ্ঞতা মাত্র নহে। তাহার গানে আগ্রহ আছে, এই কথাটির অর্থ এই নহে যে, যতক্ষণ গান হইবে ততক্ষণই সে তাহাতে মনোযোগী হইবে এবং তাহার পরই গানের কথা ভুলিয়া যাইবে। আগ্রহ হইতেছে কর্তার মনোগত একটি স্থায়ী ভঙ্গী। ম্যাক্‌ড্যুগল্ বলিয়াছেন, "Being interested is then, an enduring condition of the subject"—এই গানের আগ্রহটী তাহার চরিত্রের একটা স্থায়ী বিশেষত্ব। একটি জিনিসকে ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতি লইয়া সেই জিনিসটিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে যে সংস্কার বা রস গড়িয়া উঠে, তাহারই ফলে এই আগ্রহের সৃষ্টি। এই জন্যই আগ্রহ জিনিসটি একটা আকস্মিক অথবা সাময়িক বিশেষত্ব মাত্র নহে। মনের বিকাশ ও গঠনের সঙ্গে ইহার একটা সম্পর্ক আছে। সেই জন্য ড্রেভার বলিয়াছেন, "আগ্রহ হইতেছে মানুষের স্বভাবের ("Interest is the disposition in its dynamic aspect".) সক্রিয় অবস্থা।"

এই আগ্রহ যদি মানুষের স্বভাব বা সংস্কারের অভিব্যক্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে বলা যায়, দেহ-মনের প্রয়োজনে যে প্রবৃত্তিগুলি কাজ করে, সেই-গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই মূল আগ্রহগুলি প্রথম দানা বাঁধিয়া উঠে। ইহার পর জীবন পরিক্রমার পথে চলিতে-চলিতে প্রবৃত্তিগত মূলধনগুলি ক্রমশঃ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইতে-হইতে প্রবৃত্তির প্রাথমিক সঙ্কেত (primary meaning) নূতন ব্যঞ্জনায় (Secondary meaning) রসায়িত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে মনের ভাণ্ডারে নানা জাতীয় ছাপ (engram) একত্র হইয়া "ছাপ্‌জট্" (engram complex) হিসাবে দানা বাঁধিতে থাকে এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জিনিসকে ঘিরিয়া এক একটি রসবোধ বা সংস্কারের (sentiment) সৃষ্টি হয়। এই সংস্কারই আগ্রহকে পরিপুষ্ট করে এবং "আগ্রহ" আবার মনোযোগকে সহায়তা করে।

এখন এই সহজাত প্রবৃত্তি-পরিপুষ্ট মূল আগ্রহজনিত মনোযোগই হউক অথবা সংস্কার-পরিপুষ্ট আগ্রহজনিত মনোযোগই হউক, ইহারা খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—ইহাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির লীলা নাই। এই ইচ্ছাশক্তি যেন লাগাম কসিয়া সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে যে, নিছক ইচ্ছাশক্তি যখন ইচ্ছার জোরেই মনকে একটা বিশিষ্ট ব্যাপারে নিবিষ্ট করাইতে পারে, তখন মনোযোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আগ্রহ, সংস্কার প্রভৃতি আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ ছাত্ররা ত ইচ্ছাশক্তির জোরেই এক একটা বিষয়ে মনোযোগকে নিবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নহে। ইচ্ছাশক্তি আদৌ আসিবেই বা কেন? কোনও একটা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আগ্রহ না থাকিলে সে বিষয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেও ইচ্ছা করিবে না। কাজেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক অভিনিবেশই হউক অথবা ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশই হউক, তাহার সহিত আগ্রহের সম্পর্ক একটা থাকিবেই।

আরও একটি প্রশ্ন, এই ইচ্ছাশক্তিটিই বা কি? ইহার স্বরূপ কি? বস্তুতঃ এই ইচ্ছাশক্তিটি এই প্রবৃত্তি বা ওই প্রবৃত্তি, এই সংস্কার বা ওই সংস্কারের ফলমাত্র নহে—ইহা সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রেরণার অভিব্যক্তি। যে অধিরাজ-রস

বা সংস্কার (master sentiment) আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে, যাহা আমাদের চরিত্রকে একটা বিশিষ্ট রূপ দান করিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, যাহার ফলে আমাদের কর্ত্তব্যদ্বন্দ্বের সময় আমরা একটা বিশিষ্ট পথ বাছিয়া লই, বিভিন্ন কামনার দাবীকে দাবাইয়া প্রেয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেয়ের পথ বাছিয়া লই, সেই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ক্রিয়মান অবস্থাই হইতেছে ইচ্ছাশক্তি।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশকে যেমন প্রবৃত্তিজাত (Sustained by instinct) এবং সংস্কারজাত (Sustained by sentiment)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিজাত অভিনিবেশকেও Implicit : single act of will এবং Explicit : repeated act of will—এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

মোটামুটি আমরা অভিনিবেশের এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারি :

অভিনিবেশ

- স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশ — Non-volitional
  - প্রবৃত্তিজাত স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশ — Sustained by instinct
  - সংস্কারজাত স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশ — Sustained by sentiment.
- ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ — volitional
  - অস্পষ্ট ইচ্ছাকৃত একক কার্য্য — Implicit : Singie act of will
  - স্পষ্ট ইচ্ছাকৃত পুনরাকৃত কার্য্য — Explict : Repeated act of will

পঠন-পাঠনের ব্যাপারে আগ্রহ ও অভিনিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য এবং অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাতত্ত্বে নানা জাতীয় উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক সময় এই সমস্ত উপায়গুলিকে ছাত্র-তোষণমূলক

শিক্ষাপ্রণালী (Soft Pedagogies) বলিয়া প্রাচীনপন্থী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন।

এই সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। আগ্রহ এবং ভাল-লাগাটা এক নহে। আমাদের আগ্রহের জিনিস হইতেছে সেইগুলি, যাহাতে আমাদের স্বার্থ জড়িত আছে এবং স্বার্থের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির সঙ্গেই জড়িত আছে আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতা। সুতরাং কোনও জিনিস ভাল লাগে বলিয়া তাহাতে যে আমাদের আগ্রহ আছে, তাহা নহে, আমাদের আগ্রহের সিদ্ধি হয় বলিয়াই তাহা আমাদের ভাল লাগে। এই আগ্রহ হইতেছে আমাদের রস অথবা রস-পুষ্ট চরিত্রের একটা সক্রিয় অবস্থা মাত্র এবং এই আগ্রহেরও উপরে আছে 'ইচ্ছাশক্তি'। এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই আপাতঃ তিক্ত অথচ পরিণাম-মধুর অনেক বিষয়েই আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই আগ্রহ দিয়া অভিনিবেশকেও নিযুক্ত রাখা সম্ভব। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য খানিকটা আপাতঃ তিক্ত এবং হয়ত বিরক্তিকর খাটুনির কাজ থাকেই। সেগুলিকে এড়াইয়া যাইলে চলিবে না। তবে সেইগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদিগের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকে সঞ্জীবিত করিয়া, তাহাদের আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করিয়া। সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সময় যে সমস্ত সিদ্ধি আসে তাহার জন্য উৎসাহ দান করিলে সেই উৎসাহের আনন্দ নূতন করিয়া আগ্রহ ও অভিনিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করিবে।

নিছক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আগ্রহ তথা অভিনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় বলিয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বহু বিরক্তিকর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তথাকথিত Soft pedagogy বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-প্রণালীকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু তিক্ত বা বিরক্তিকর সাধনার পথেই যে চলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইচ্ছা করিয়া বিরক্তিকর সাধনা করিয়া চিত্ত সংযমের চেষ্টার মধ্যে অনর্থক শক্তি ক্ষয় হয়। আগ্রহ থাকিলে, প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা থাকিলে একটানা ক্লান্তিকর পরিশ্রমও আর বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয় না, ভবিষ্যৎ সিদ্ধির আশাই বর্ত্তমানের পরিশ্রমের তিক্ততাকে

মধুরায়িত করিয়া তুলে। তবে এ সম্বন্ধে অধিকারি-ভেদ আছে; অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু বা বালকের দল, যাহাদের মধ্যে কোনও রস বা চরিত্র গঠিত হয় নাই এবং যাহারা এখনও প্রবৃত্তির প্রাথমিক প্রেরণার পথেই চলাফেরা করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সিদ্ধির চেতনা পরিস্ফুট নহে, ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ (volitional) প্রভৃতি তাহাদের অধিগম্য নহে। এইজন্য শিশু বা বালকদের শিক্ষা ব্যাপারে এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই তাহাদের অভিনিবেশে সাহায্য করে। কাজেই এই বয়সে তথাকথিত soft pedagogy বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন আছে। তাহার পর তাহার রস বা সংস্কার যতই দানা বাঁধিতে থাকিবে, তাহার ব্যক্তিত্ব যতই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, আত্ম-সম্মান বোধ যতই তীব্রতর হইতে থাকিবে, ততই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশে তাহার ক্ষমতা বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং বয়স্ক ছাত্রদের পাঠনের সময় তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য খুব বেশী লম্ফঝম্ফ করিয়া রং-চংএ ছবি-ম্যাপ-মডেল প্রভৃতির সাহায্য লইয়া তথাকথিত পাঠন-যন্ত্রাদির ব্যবহার করিয়া পড়াইবার ততটা প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যে-সমস্ত ব্যাপারে ছাত্রদের 'রস' তৈয়ারী হইয়াছে, যে-সমস্ত খুসী খেয়াল বা সখকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, যে বিষয়ে দক্ষতার উপর তাহারা তাহাদের আত্মসম্মানকে স্থির করিয়াছে, সেইগুলিকে মূলধন করিয়াই তাহাদের ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এইভাবে চেষ্টা করিলে শিক্ষক ছাত্রদের নিকট ভয়ের বস্তু হইবে না। এই ভাবেই সাধনা ও আনন্দ একমুখী হয় এবং শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের আনন্দের সহায়ক ও সখের সঙ্গী হইয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন।

অবশ্য একথা সত্য, যাহা স্বাভাবিক ভাবে চিত্তাকর্ষক মনের উপর তাহার আবেদন বেশী হইবেই এবং সেই জন্যই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশের আকর্ষণ বেশী হইবেই। কিন্তু স্কুল কলেজে এবং জীবনের সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নানা দিক দিয়াই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের অনুশীলন করিতে হইবেই। এই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের ক্ষমতা

মানুষের একটা অমূল্য সম্পদ। কাজেই তথাকথিত চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-প্রণালীর অজুহাতে যে সব ব্যাপারে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেইগুলিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি না করিয়া স্কুল কলেজে ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের অনুশীলন করাই বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ হওয়া উচিত। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি অন্যরূপ হইবে।

এখন অভিনিবেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যে সমস্ত পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাদের কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

কতটা পরিমাণ জিনিসের উপর আমরা একসঙ্গে মনোনিবেশ করিতে পারি এই বিষয়ে স্পিয়ারম্যান সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিখ্যাত 'Law of Span'এ বলিয়াছেন, মানুষ যে ভাবেই তাহার অভিনিবেশকে নিযুক্ত করুক না কেন তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে। ফলে একটি বিষয়ে মনোযোগকে নিবিষ্ট করিলে অন্য বিষয়ে মনোযোগ কমিয়া যাইবে।

কতগুলি জিনিসকে মন একসঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে, এই লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। ট্যাচিস্টোস্কোপ (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে একটি দৃশ্য বস্তুকে অতি অল্প সময়ের জন্য চক্ষুর সম্মুখে ধরা হয় এবং মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে মানুষ যতগুলি জিনিসকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারে তাহা লইয়া পরীক্ষা করা হয়। দেখা গিয়াছে, একজন বয়স্ক ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে ছয়টি যথেচ্ছ বিভিন্ন বিন্দুর সংস্থান মনে রাখিতে পারে। তবে ঐ বিন্দুগুলি যদি তাসের বিন্দুর মত কোনও একটি "প্যাটার্ণে" আঁকা থাকে তাহা হইলে আরও অধিক সংখ্যক বিন্দুকে মন গ্রহণ করিতে পারে।

চক্ষু-গ্রাহ্য জিনিসের মত কর্ণ-গ্রাহ্য জিনিস লইয়াও পরীক্ষা করা হইয়াছে। Metronome প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পর পর একজাতীয় শব্দ সৃষ্টি করিয়া দেখা গিয়াছে আটটি শব্দকে গ্রহণ করা সম্ভব।

একটানা ভাবে কতক্ষণ সময় মনোযোগকে ধরিয়া রাখা যায়, এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এক সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি বিশিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে পারেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। একটানা ভাবে একটি বিশিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ

কেন্দ্রগত করিয়া রাখা সম্ভব নয়। প্রতি পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর মনোযোগ সরিয়া যায়, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

অভিনিবেশকে যুগপৎ কতকগুলি বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে, এই লইয়াও পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যুগপৎ তুইটি বিষয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট করিলে তুইটি কার্য্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অভিনিবেশের স্রোত একটি খাতে প্রবাহিত হইলে যতটা শক্তিশালী ভাবে প্রবাহিত হয়, তুইটি খাতে প্রবাহিত হইলে তাহার স্রোতোধারা শক্তিহীন হইবেই। এই ক্ষেত্রে স্পিয়ারম্যান-এর 'Law of Span'এর নীতিটি প্রযোজ্য। তাহা হইলে একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কি সম্ভব নহে? এক হিসাবে তাহাই বটে। তাহা হইলে নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির যুগপৎ অভিনিবেশের শক্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কি মিথ্যা? না; তবে সে সব ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্নমুখী মনোযোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে একটির পর আর একটি বিষয়ে ক্ষিপ্রভাবে এবং পর্য্যায়ক্রমে মনের কেন্দ্রীকরণ।

আর একটি ভাবে যুগপৎ মনোযোগ সম্ভব হয়। আমরা জানি, যে ব্যক্তি প্রথম সাইকেল চালাইতে অথবা তারে নাচিতে শিক্ষা করে সে তখন তাহার সমগ্র চেতনা দিয়াই তাহা করে এবং সেই সময় অন্য বিষয়ে একটু মনোযোগ দিলেই সে পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন এই কাজটি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত হইয়া যায় তখন সাইকেল চালান বা তারে-নাচা জাতীয় কাজগুলি নিম্ন-মস্তিষ্ক দিয়াই যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায় এবং চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য তাহার উর্দ্ধ-মস্তিষ্ক খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশের প্রসঙ্গে পল্লীগ্রামের মেয়েদের চিড়া কুটিবার যে উদাহরণটি দিয়াছেন, যুগপৎ অভিনিবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে সেটি প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কাজগুলি অভ্যাসের মাধ্যমে সরলায়িত হইয়া স্বয়ংচালিত যন্ত্রের আবর্ত্তনের মত হইয়া যায়। ফলে সেই কাজটির সঙ্গে অন্য কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

যুগপৎ অভিনিবেশের প্রসঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে মনোযোগ একটি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সরিয়া যায়, সে ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের আর একটি লীলা আছে। অনেক

সময় মন সরিয়া যাইলেও, মনের প্রেরণার যে কর্ম্ম-প্রয়াসের (conation) আরম্ভ হয়, তাহার কার্য্য চলিতেই থাকে : "conation outlasts the coguition that initiates it" (Mc Dougall)। ফলে অভিনিবেশের প্রেরণায় দেহযন্ত্র যখন একটি কাজ করিয়া চলিতেছে ইতিমধ্যেই অভিনিবেশ বিষয়ান্তরে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত একটি কাজ করিবার জন্য স্থির করিলাম, পরে সেই কাজটি করিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কোন একটি জিনিস আনিতে যাইলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ত মনোযোগ সরিয়া গিয়াছে এবং কোন্ জিনিসটি আনিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। তখন কি যে করি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িলাম।

বাহিরের গোলমাল মনোযোগকে ক্ষতি করিতে পারে কি না, এই বিষয়ে আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গোলমাল অনেক সময়ে মনোযোগের সাহায্যই করে। কারণ গোলমালের সময় জোর করিয়া মনোযোগকে নিয়োগ করিবার জন্য যে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা আসে, তাহার ফলে শান্তির পরিবেশে মনোযোগ যতটা তীব্র হয়, অনেক সময় গোলমালের পরিবেশে তাহা অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, গোলমালের পরিবেশে যাহাদের মনোযোগ দেওয়া অভ্যাস, এই গোলমালটুকু না থাকিলে ফাঁকা আসরে যাত্রা গানের মত তাহাদের মনোযোগও যেন ঠিক জমে না। এই তত্ত্বটী বর্ত্তমান শিক্ষাব্রতীদের মনে রাখা উচিত। কারণ, বর্ত্তমানে তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশে অধ্যয়নের তপশ্চর্য্যা করিবার সুযোগ অনেকেরই নাই। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই পড়াশুনার অভিনিবেশের জন্য এতটা সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। অভিনিবেশ খানিকটা অভ্যাসের ব্যাপার। কলকারখানার ঘর্ঘর শব্দের মধ্যেই শিল্পী অনায়াসে নূতন নূতন পাড়ের ডিজাইন তৈয়ারী করিতে পারেন, কলিকাতার ট্রাম বাস প্রভৃতির গোলমালের মধ্যে অনেক ছেলেই অঙ্কও কষিতে পারে, কবিতাও লিখিতে পারে, গভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারেও মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারে।

কি প্রকার অঙ্গসংস্থান করিলে অভিনিবেশ গভীরতর হয়? আমরা জানি, আরাম কেদারায় বসিয়া বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়া হেলান দিয়া কোনও জটিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সহজ নয়। বস্তুতঃ তীব্র ভাবে মনোযোগ দিতে হইলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। যে সকল ছাত্র অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, তাহারা যদি খানিকক্ষণ বসিয়া, খানিক বা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়াশুনা করে তাহা হইলে ফল ভাল হয়। যান্ত্রিক ভাবে আবৃত্তিমূলক মুখস্থ প্রভৃতি করিবার সময় চঞ্চল বালকদিগকে এদিক-ওদিক পায়চারী করিতে-করিতেও মুখস্থ করান যাইতে পারে। তাকিয়া হেলান দিয়া বা টেবিলের উপর পা তুলিয়া পাঠ অভ্যাসের চেয়ে ইহাতে কাজ ভাল হয়। শুধু সখের পড়া অথবা সময় কাটাইবার জন্য নাটক-নভেল জাতীয় লঘু বিষয় পড়া আরামের অঙ্গসংস্থানের মধ্য দিয়া চলিতে পারে। নতুবা কোনও কঠিন বা জটিল বিষয় পড়িতে হইলে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিতে হইবেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মেরুদণ্ড সোজা না রাখিলে কোনও গভীর চিন্তার কাজ করা যায় না।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মানুষের অভিনিবেশের প্রকারভেদ আছে। কেহ বা একটি বিষয় অনেকক্ষণ একটানা ভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে (intensive type), কেহ বা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে দমকে-দমকে (by jerks) মনোযোগ দিতে পারে (distributive type)। মনে হইতে পারে, যে ব্যক্তি একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনোযোগ দেয়, সে কোনও বিষয়েই তেমন তীব্রভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু এ ধারণাটি ঠিক নহে। কারণ মনোযোগ ত যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ে না, তাহা তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি বিষয়ের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়। কাজেই সাময়িক-ভাবে প্রত্যেক বিষয়েই সমান তীব্রভাবে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব নহে।

বিভিন্ন বালকের অভিনিবেশের ক্ষমতা যে বিভিন্ন প্রকার, এই তত্ত্বটি শিক্ষকদের নিকট খুব প্রয়োজনীয়। তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া তাহাকে তাহার শক্তির উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

মনোযোগের অন্য জাতীয় প্রকারভেদও আছে। অনুভূতিগ্রাহ্য জিনিস-

গুলিকে অনুভব করিবার সময় কেহ কেহ তাহাদের মনোযোগকে এমন ভাবে নিবদ্ধ করে যে, শুদ্ধ অনুভূতির জিনিসটিকেই তাহারা গ্রহণ করে (fixtating type) ; আবার কেহ কেহ অনুভব করিবার সময় তাহাদের মনোযোগকে এমন ভাবে প্রয়োগ করে যে, অনুভূতির কেন্দ্রগত জিনিসটির চারিপাশের জিনিসগুলিকেও তাহারা কিছু কিছু গ্রহণ করে (fluctuating type)। ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের অভিজ্ঞতার জিনিসগুলিকে ঠিক যথাযথভাবে বর্ণনা করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তাহার সহিত কিছু কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রভৃতিও মিশাইয়া দেয়। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা হয়ত রিপোর্টার, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, রাজদূত প্রভৃতি কার্য্যে সফলতা লাভ করিবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সমালোচক, সাহিত্যিক হিসাবে কৃতী হইবে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিখুঁত নৈর্ব্যক্তিক সত্য লইয়া কারবার করিবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ব্যক্তিগত মন্তব্য মিশাইয়া বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করিবে। বলা বাহুল্য, এই উভয় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রয়োজন আছে।

অভিনিবেশের স্থির (static type) ও চঞ্চল (Dynamic type)— এই ভাবেও শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রেরা যখন কোনও কার্য্যে মনোযোগ দেয় তখন তাহারা কাজের প্রারম্ভ হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত কাজে মন নিবদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় টাইপের ছাত্রদের মন মাঝে মাঝে দুর্নিগ্রহ অশ্বের মত পথ হইতে সরিয়া যায় এবং তাহাকে আবার বল্গার সাহায্যে পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

বয়স ভেদেও মনোযোগের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ের উপরই তাহাদের মনোযোগ নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অনুভূতির আবেদনহীন শুদ্ধ তত্ত্ব বা ভাবের উপর সহজে মনোযোগ দিতে পারে না। কাজেই সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, আত্মা-পরমেশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের নিকট তথ্য বা তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলে তাহাতে তাহারা মনোযোগ দিতে পারে না। বালক বয়সে রস, সংস্কার, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির বিকাশ হয় না, সেই জন্য তাহাদের অভিনিবেশকে নিযুক্ত করিতে হইলে

কৌতূহল, আত্মবিস্তার (self assertion) প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ বালকদের অভিনিবেশ অত্যন্ত চঞ্চল, বহুক্ষণ স্থিরভাবে কাজ করিয়া যাইতে ইহারা সমর্থ নহে।

অভিনিবেশের যথাযথ নিয়োগ শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এইজন্য শিক্ষকদিগকে অভিনিবেশের বিশেষত্ব ও তত্ত্বগুলি জানিয়া রাখা ভাল। শিশুদের অভিনিবেশ ও পূর্ণবয়স্ক লোকদের অভিনিবেশ এক নয়। ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ শিশুদের অধিগম্য নয়। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। শিশু একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। কাজেই পড়িবার সময় শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে হয়ত তাহার অর্থবোধ হইতে অসুবিধা হইতে পারে, আবার অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে হইলে হয়ত উচ্চারণের দিকে তাহার মনোযোগ শিথিল হইয়া যাইবে। অথচ তাহাকে বানান, উচ্চারণ, অর্থ সব কিছুই ত শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে করণীয় এই যে, নূতন পদ আয়ত্ত করাইবার সময় শিশুকে প্রথমে পদের উচ্চারণ শিখাইতে হইবে, উচ্চারণে অভ্যস্ত হইলে, তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে উচ্চারণ ও অর্থ আয়ত্ত হইলে বানান শিখাইতে হইবে।

সামান্য বিঘ্নতেই শিশুর মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহার পাঠনের সময় যাহাতে তাহার মনোযোগের বিঘ্ন না ঘটে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশু একটানাভাবে এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেইজন্য তিন হইতে পাঁচ বছরের শিশুদের এককালীন পনের হইতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। পনের মিনিট একটানা পড়াইবার পর দশ বার মিনিট বিশ্রাম দিয়া আবার তাহাকে অন্য জিনিস পড়ানো যাইতে পারে এবং দিনের মধ্যে সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুর এই তিনবার পড়ানো যাইতে পারে। শেষের দুইবার পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যবস্থা করা ভাল।

ছয় হইতে দশ বৎসরের বালকদের পঁচিশ ত্রিশ মিনিট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর দশ মিনিট বিশ্রাম দিয়া আরও দুই তিন বার পড়ানো যাইতে পারে।

কিশোরদিগকে একটানা চল্লিশ মিনিট একটি বিষয় পড়ান যায়।

একটানা ভাবে মনোযোগ দেওয়া পূর্ণ বয়স্ক লোকের পক্ষেও সহজ নয়। বস্তুতঃ যখন আমরা একটানাভাবে কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিই, তখন আমাদের মন একটি বিন্দুতে ঠিক নিবদ্ধ থাকে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন দিকের উপর মন পর্য্যায়ক্রমে ঘুরাফিরা করিতে থাকে। অতএব কোনও বিষয়ের উপর মনোযোগকে স্থায়ী করিতে হইলে তাহার উপায় হইতেছে, সেই সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডার বৰ্দ্ধিত করিয়া নানা জাতীয় প্রশ্নের উত্থাপন করতঃ পূর্ব্ব পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি করা।

আমাদের শৈশবে প্রবৃত্তি এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত সংস্কারের প্রভাব খুব বেশী কাজ করে। কাজেই মনোযোগকে শক্তিশালী করিবার জন্য এইগুলির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। বাল্যে কৌতূহল প্রবৃত্তিটি অত্যন্ত প্রবল থাকে। কাজেই এই সময় বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া মনোযোগের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহার পর মানুষ যতই চরিত্রের পথে অগ্রসর হইতে থাকে তাহার রসগুলি ততই দানা বাঁধিতে থাকে। তখন যে বিষয়ে রস তৈয়ারী হইয়াছে সে সেই বিষয়ে অধিকক্ষণ ইচ্ছাকৃত মনোযোগ প্রয়োগ করিতে পারে। পরে এই রস যখন পরিপক্ব হইয়া চরিত্রে পরিণত হয় তখন ইচ্ছাশক্তি ও আত্মসম্মান বোধই তাহার মনোযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

ক্রীড়াচ্ছল

সাধারণতঃ খেলাকে কাজের বিপরীত বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য কাজ-পালান বা কাজ-ভোলান খেলা যে নাই তাহা নহে; কিন্তু খেলার যেটি মূল বিশেষত্ব সেটি খুব উচ্চস্তরের কাজের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। খেলার বিশেষত্ব হইতেছে, স্বাধীনভাবে আত্মবিস্তার (self-assertion); শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধকদের শিল্প-সাধনার মধ্যে সেই আত্ম-বিস্তারের লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সে-ই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-যোগী, যে কঠিনতম কর্ম্মের মধ্যেও খেলার মুক্তি ও খেলার আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকে, আর সেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হইতে পারে, যে খেলার বন্ধন-হীন আনন্দের মধ্যে ব্রতচারীর সংযম ও নিষ্ঠা আনয়ন করিতে পারে। এমনটি হইলে কঠোর কর্ত্তব্যের বোঝা "খেলবার বাঁশী"তে পরিণত হয়। কাজকে যদি আমরা অপরের দ্বারা ঘাড়ে-চাপান বোঝামাত্র মনে না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত আনন্দের সাধনা বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ কাজকে যদি খেলার চোখে দেখিতে পারি, তাহা হইলে কাজ আর ভয়ের বস্তু থাকে না।

শিক্ষাতত্ত্বে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলে "ক্রীড়াচ্ছল"। ইহাতে খেলার ছলে পড়ান হয়, ফলে পড়া জিনিসটাই খেলার আনন্দে মধুর হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞানে যাহারা ক্রীড়াচ্ছলের অবতারণা করিয়া শিক্ষাকে খেলার মত চিত্তাকর্ষক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত আনন্দের সাধনা করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মণ্টেসরবীর (Dr Maria Montessori) নাম অগ্রগণ্য। ইঁহার শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষত্ব হইতেছে, শিক্ষার দায়িত্বটি যতদূর সম্ভব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া এবং শিক্ষকের শাসন ও তত্ত্বাবধানকে যথাসম্ভব পরিহার করা। খেলার মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা, মণ্টেসারী শিক্ষার মধ্যেও আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্রেরা তাঁহার didactic apparatus লইয়া তাহাদের অঙ্গ-চালনার দক্ষতা অর্জ্জন করিবে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অনুশীলন করিবে এবং পড়া লেখা

ও গণিত অভ্যাস করিবে। এই সব ব্যাপারে শিক্ষকের তত্ত্বাবধান খুব বেশী থাকিবে না, ছাত্রেরা খানিকটা নিজেদের খুশীমত চলিবে এবং খুশীমত কাজ করিবে। মণ্টেসরী বলেন, ছাত্রদের এইভাবে স্বাধীনতা দিলে তাহারা পড়ার মধ্যে খেলার আনন্দ পাইবে আর তাহা ছাড়া অনুভূতির অনুশীলনের ফলে শুধু যে হাত পা প্রভৃতির দক্ষতাই বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, ইহা ছাড়া তাহাদের আত্মনির্ভরতা, সৃজনীশক্তি, অভিনিবেশ বৃদ্ধি পাইবে। এই উপায়ে তাহারা নিজেদের এবং অপরকে সম্মান করিতে শিখিবে।

মণ্টেসরী যে খুব অন্যায় কথা বলেন নাই তাহা খুবই সত্য। তবে এক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে। খেলার মধ্যে যে কল্পনা-প্রবণতা তথা কল্পনা-বিলাস আছে, শিশুদের মধ্যে যে রূপকথার জগতে বিচরণশীলতা আছে, তাহা শিশুর খেলার অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া থাকে। মণ্টেসরী কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই জিনিসটির উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, এই কল্পনা-বিলাস ভবিষ্যতে ছাত্রদের অপদার্থ স্বপ্ন-বিলাসী করিয়া তুলে। মনে হয়, ছেলেদের অনুভূতির অনুশীলন, হস্তপদাদির দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতির বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া মণ্টেসরী কল্পনার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া ভুল করিয়াছেন।

মণ্টেসরী-প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্রদিগকে পড়াশুনার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইবার প্রেরণা দেওয়া এবং খেলার ছলে শেখার জিনিসগুলিকে পরিবেশিত করা। তবে এই প্রণালীটির মণ্টেসরিই যে প্রথম বা একমাত্র পথ-প্রদর্শক, তাহা নহে। অনেকদিন হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে heuristic method বলিয়া একটি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতেও এই প্রকার আত্মনির্ভরতার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং এই প্রণালীর ব্যাপক প্রচার করেন। প্রথমতঃ এই প্রণালী দ্বারা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিখান হইত। পরে অন্যান্য বিষয় শিখাইবার জন্যও এই প্রণালী অনুসৃত হইত। ইহাতে ছাত্রদিগকে মৌলিক গবেষণার অভিনয় করিতে দেওয়া হইত। ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের হাতে পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিবে—ইহাই হইল এই প্রণালীর উদ্দেশ্য।

আর একজন শিক্ষাবিদ্ কিটীং (D. M. W. Keatinge) যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়ার নীতিকে পছন্দ করিতেন না, তবুও তিনি একদিক দিয়া এই প্রণালীটিই ইতিহাস-পাঠনের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠনের সময় তিনি সত্যকারের দলিলপত্র, মুদ্রা, তাম্রলিপি প্রভৃতির ব্যবহার করিয়া ইতিহাসের পাঠনটিকে গবেষণার ক্রীড়াচ্ছলের ভিতর দিয়া পড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার 'জর্জ জুনিয়র রিপাবলিক' এবং ইংলণ্ডের হোমস্ লেন-এর 'লিটল্ কমনওয়েলথ'এর কথা উল্লেখযোগ্য। হোমস্ লেনের প্রতিষ্ঠানটী প্রথমতঃ জর্জ জুনিয়র রিপাবলিকের মত চতুর্দ্দশ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক অপরাধপ্রবণ বালকদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ইহাতে সাধারণ বালকদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে অসৎ সঙ্গে ভাল ছেলেগুলি নষ্ট হইত না। খারাপ ছেলেগুলি যাহাতে ভাল ছেলেদের আদর্শে ভাল হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের লওয়া হইত। এই স্কুলের বিশেষত্ব ছিল, ইহার আইন শৃঙ্খলা কোনও কিছুই উপরের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ঘাড়ে চাপান জিনিস ছিল না; এ যেন "আমরা সবাই রাজা মোদের রাজত্বে"র দেশ! তাহারাই নিজেদের আইন নিজেরাই তৈয়ারী করিত বলিয়া সে আইন ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে হইত না।

লেন-এর (Homes Lane) বিশ্বাস ছিল, বালকদের মধ্যে যে অপরাধ-প্রবণতা আছে, তাহা জন্মগত পশুভাবের জন্য ততটা নহে, যতটা হইতেছে তাহাদের কৈশোরের উদ্দাম উৎসাহ-স্রোত উপযুক্ত পথ না পাইয়া অসামাজিক পথে রীতিনীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া উপ্‌চাইয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া। সুতরাং এই রোগের প্রতিকার হইতেছে দমন বা রোধনের মধ্যে নহে, পরন্তু প্রবৃত্তির উদ্গতি বা উৎকর্ষণের (Sublimation) মধ্যে। এই উৎকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হইত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বায়ত্ত শাসনের ভার দিয়া এবং তাহাদের সহজ আত্ম-বিস্তারের (Self assertion) প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিয়া। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানে তাহাদের বাহাদুরির পথ খুলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া অন্যায় কাজ করিয়া বাহাদুরী লাভ করিবার

অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করিবার চেষ্টা তাহাদের করিতে হইত না। এই ব্যবস্থার ফলে দুর্দ্দান্ত দুষ্ট বালকের দল পরিশ্রমী শৃঙ্খলানিষ্ঠ সুশীল বালকে পরিণত হইত। এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ যে কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বাহিরের শক্তি বলিয়া মনে করি সেই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার মধ্যে হয়ত একটা নেতাগিরির আস্ফালনের আনন্দ আছে, কিন্তু নিজেদের সম্মতিক্রমে যে আইন তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাকে অমান্য করিলে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং বন্ধুদের ঘৃণার পাত্র হইয়া কোণঠেসা হইয়া পড়িতে হয়।

এই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের শিক্ষাপ্রণালী হইতে এইটুকু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা এমন কি তাহাদের পাঠনের ব্যাপারেও কর্ত্তৃত্বের জঙ্গী-আইন অথবা পুলিশী-শাসনের তীব্রতা কমাইয়া কর্ত্তৃত্বের অংশ এবং দায়িত্ব খানিকটা ছাত্রদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ফল ভালই হয়। এই প্রণালীগুলি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষা ব্যাপারে বাঁধাধরা রুটিনকে একটু আল্গা করিয়া দিয়া ছাত্রদের প্রয়োজন, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ করিবার জন্য একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালই। এই স্বাধীনতা বালকদের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে, তাহা তাহার সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলে এবং কাজের রুক্ষতার মধ্যে খেলার আনন্দও আনিয়া দেয়।

প্রশ্ন জাগে, ছেলেদের যদি এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যদি নিজেদের পথেই তাহাদের চলিবার সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রচলিত শ্রেণী-বিভাগ (class system) এবং সময়-তালিকা (time table) প্রভৃতির বন্ধনের ভিতর দিয়া সে স্বাধীনতা কি ভাবে সম্ভব হইবে? প্রত্যেক ছাত্রই যদি নিজের রুচি অনুযায়ী চলে, তাহা হইলে ক্লাসের বাঁধাধরা পঠ্যসূচীর ভিতর দিয়া তাহা কি ভাবে সম্ভব হইবে? বর্ত্তমানের যে পাঠন-ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাহিরের নিয়ম অনুযায়ী ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত করিতেই হইবে এবং একটি ক্লাসের ছেলেদের সকলকে একই গতিবেগে একই বিষয়ে জ্ঞানের পথে

চলিতে হইবে। ইহাকে যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক না কেন, বড় বড় স্কুলে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তাহা হইলে ক্রীড়াচ্ছলের এই নব ভাবধারাকে বিদ্যালয়ের পাঠন-ব্যবস্থায় কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে? যেখানে যতদূর সম্ভব ক্লাসকে বিভাগে (section) বিভক্ত করিয়া প্রচুর ঐচ্ছিক বিষয় পাঠনের সুযোগ দিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগের ব্যবস্থা করিয়া খানিকটা কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খুসী খেয়ালের চেয়ে শিক্ষকের নির্দ্দেশ বেশী ভাবে কাজ করে, ছেলেরা যে কি বিষয় শিক্ষা করিবে তাহার বিধান-ব্যবস্থা শিক্ষকই করিয়া দেন। মণ্টেসরী কিন্তু এই বিষযে ব্যক্তিগত ছাত্রকে তাহার খেয়ালের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী। তবে স্কুল জিনিসটা সমাজ-জীবনের একটি ছোট সংস্করণ বলিয়া এবং সমাজ-জীবনে অনেক কাজই একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়াও বটে, আর কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রণালীতে অনেক পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় হয় বলিয়াও বটে, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংঘগত পাঠন-ব্যবস্থাকে স্বীকার তিনি করিয়াছেন। নৃত্য, গীত, শারীরিক ব্যায়াম, হস্ত-সম্পাদ্য কাজ, উদ্যানচর্য্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়, স্থান ও পাঠন-ব্যবস্থা আছে।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান কোথায়? ছাত্ররা যদি নিজেরাই সাধনার পথে চলিবে তাহা হইলে শিক্ষক কি কাজ করিবেন? মণ্টেসরী বলিয়াছেন, তিনি একজন "দ্রষ্টা" (observer); তবে কি তিনি খানিকটা নিষ্ক্রিয় ভগবান হইয়া থাকিবেন? না; বিদ্যালয়কে যে আমরা মানব সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়াছি, বিদ্যালয়কে সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যতটাই চেষ্টা করা যাক না কেন, সে সমাজ হইতেছে খানিকটা কৃত্রিম সমাজ, একটা মনোমত আদর্শ বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবাঞ্ছনীয় জিনিসের বর্জন এবং বাঞ্ছনীয় সংযোজনে গঠিত একটা কৃত্রিম সমাজ-পরিবেশ। শিক্ষকগণ এই পরিবেশটি গঠন করিয়া দিবেন, তাঁহারা মঞ্চশিল্পী মাত্র; এই মঞ্চে অভিনয় করিবে বালকেরাই। এ কথা সত্য যে, বালকেরা সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা "হাস্য পেলেই হাস্য করি

নৃত্য পেলেই নাচি" এ জাতীয় স্বাধীনতা নহে, এ স্বাধীনতা পাঠন-যন্ত্র (didactic apparatus) লইয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পথেই চলিতে থাকে, তাহাকে রঙিন্ পশম লইয়া রংএ রং মিলাইতেই হইবে, রংবেরংএর খেলার জিনিস লইয়া শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুসারে খেলিতেই হইবে, ইন্দ্রিয় অনুশীলনের জন্য নানা জাতীয় জিনিস লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি নাড়ানাড়ি করিয়া জিনিসের ওজন, মাপ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচিত হইতেই হইবে, বিভিন্ন মাপের সমবর্ত্তুল কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে (cylinders) উপযুক্ত গর্ত্তে পরাইবার চেষ্টা করিয়া জিনিসের আকার আয়তন সম্বন্ধে অনুমান শক্তির অনুশীলন করিতেই হইবে। এই জিনিসগুলিকে লইয়া তাহারা যে তাহাদের কল্পনা মত পুতুল খেলা খেলিবে সে অধিকার সেখানেও নাই। কাজেই এখানেও যে খেলা তাহারা খেলে, তাহা শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুসারেই খেলিতে হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মণ্টেসরী শিক্ষককে যে "দ্রষ্টা" মাত্র বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই দ্রষ্টা নিষ্ক্রিয় নিরীহ সত্তামাত্র নহে, তিনি প্রয়োজন হইলেই সক্রিয় সাহায্য করিবেন, তবে কথায় কথায় উপর-পড়া হইয়া ব্যস্তবাগীশের মত অযাচিত উপদেশ ও অযাচিত সাহায্য দিয়া বালকদের কাজে বাধা দিবেন না, এই পর্য্যন্ত।

উচ্চতর শ্রেণীগুলিতেও এই প্রণালী অনুসরণ করা উচিত—যথাযথ প্রশ্ন-বিন্যাসের দ্বারা ছাত্রদের এমন একটা অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের মন জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে। এই জিজ্ঞাসার ভাবটি আসিবার পর তখন তাহাদের জ্ঞাতব্য জিনিসটি বলিয়া দিতে হয়, নতুবা অযাচিত অনায়াসলব্ধ জ্ঞানের আদর হয় না এবং তাহা মনের মধ্যে স্থায়ী ভাবে সঞ্চিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ঘাড়ে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না, তাহাকে সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে এই সাধনায় পথনির্দ্দেশ ও সাহায্য করিবেন এইটুকুই হইতেছে তাঁহার কর্ত্তব্য, অনিচ্ছুক ক্রেতার নিকট বিদ্যার "হকারি" করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলে যেমন কালে তাহাতে অঙ্কুর বাহির হয়, শিক্ষক যদি তেমনই ছাত্রদের উপযুক্ত জিজ্ঞাসু অবস্থায় উপযুক্ত চিন্তার

বীজ ছড়াইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহা যথাকালে অঙ্কুরিত হইবেই। এই সত্যটি ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রকারান্তরে জানিতেন, সেইজন্য গুরু-শুশ্রূষাকেই (শ্রবণ করিবার ইচ্ছা) তাঁহার বিদ্যালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা)।

চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুর কার্য্য বলা হইল। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্ত্তব্য কি হইবে? রুশো প্রভৃতি অনেকের ধারণা আছে যে, মানব শিশু দেবত্বের সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তাহাদিগকে নিজেদের স্বাভাবিক পথে ছাড়িয়া দিলেই কুঁড়ি হইতে ফুলের মতই তাহারা আপনা আপনিই বর্ণগন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, মানুষ পশুত্বের মূলধন লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছে, অনেক সাবধানে অনেক সংগ্রামে তাহাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিলে তবে তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়।

পশুত্ব হয়ত মানুষের গোড়ার কথা হইতে পারে এবং পাপের অভিজ্ঞতার চাবুক খাইতে খাইতে মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে চলিতেও পারে; কিন্তু সেই স্বাভাবিক পরিণতি এত দীর্ঘদিনে সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে পরিশ্রমের এতটা অপচয় হয় যে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করা বিপজ্জনক।

কাজেই নীতির ক্ষেত্রেও উপযুক্ত পরিচালনার প্রয়োজন আছে। তবে এই পরিচালনার জন্য উপদেশ বা নীতির বাণীর চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণ এবং সমাজ-সঙ্গত প্রভাবই অধিকতর কার্য্যকরী হয়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়" এই উক্তিটি নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই হিসাবে এই ব্যাপারে শিক্ষকের সম্ভাবনা অনেকখানি। তাঁহাদের পরিপক্ব জ্ঞান, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও সুগঠিত চরিত্র হইয়া তাঁহারা ছাত্রদের আশেপাশে নিজেরাই একটা বিশুদ্ধ পরিবেশ, সৎসঙ্গের আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং নিজেদের আচরণ দিয়া ছাত্রদের অজ্ঞাতসারেই তাহাদের চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন।

বুদ্ধির মাপকাঠি

বুদ্ধি মাপকের প্রয়োজন :

সারারাত্রি অন্ধকারে দাঁড় টানা হইল, ভোর বেলা দেখা গেল যে, নৌকাটি ঘাটেই বাঁধা রহিয়াছে। তাড়াতাড়িতে নোঙর তুলিতে ভুল হইয়াছিল! এইরূপ ত্রুটির জন্য এই জাতীয় ব্যর্থতা শিক্ষকের জীবনেও আসিতে পারে, যদি তিনি ছাত্রের বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির প্রাথমিক পরীক্ষাটি না করিয়া তাহাকে তাহার অনধিগম্য বিষয়বস্তু পড়াইবার জন্য চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই, কারণ "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ।"

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচনের সময়ও তাহার বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি সম্বন্ধে একটা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। ক্লাশের ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতির জন্যও তাহার বুদ্ধির মাপ করিয়া লওয়া দরকার। কারণ অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছাত্রের সহিত অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছাত্রকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিলে বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ উভয়েরই ক্ষতি হয়। সে ব্যবস্থাটা হয় একই জোয়ালে দুর্ব্বল ও সবল বলদ জুড়িয়া দিবার মত।

কিন্তু বুদ্ধিকে মাপা যাইবে কি করিয়া? পথের দৈর্ঘ্য, কূপের গভীরতা, বৃক্ষের উচ্চতা, জড় পদার্থের আয়তন বা ভার—এ সমস্তই মাপা যায়; কিন্তু মন বা বুদ্ধির মাপ কি করিয়া সম্ভব হইবে?

দৈহিক গঠন দেখিয়া বুদ্ধি মাপের চেষ্টা :

অনেক সময় আমরা মানুষের আকৃতি দেখিয়াই তাহার বুদ্ধি বা মানস-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করি। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে এতবড় সাহিত্যিক হইয়াছেন, তাহা নাকি তাঁহার নাকের জোরে। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও এই জাতীয় কথায় বিশ্বাসটা আমাদের কাছে নূতন নহে। বত্রিশটি রাজ-লক্ষণের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি; সামুদ্রিক শাস্ত্রে আছে: পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।

ত্রিহ্রস্বঃ পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ বস্তুতঃ "আকার সদৃশপ্রজ্ঞঃ" কথাটি নিছক কবির উচ্ছ্বাসই নহে। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর লক্ষণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা আছে। যে সব কন্যা অতিশয় রোমশ অথবা রুক্ষ, পুরুষোচিত দেহবিশিষ্ট তাহারা নাকি বিবাহের পক্ষে সুলক্ষণা নহে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বুদ্ধি-মাপকের ইতিহাস :

শরীরগত আকৃতি দেখিয়া বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা শুধু এ দেশেই নহে, পাশ্চাত্ত্য দেশেও এই জাতীয় চেষ্টার ইতিহাস আছে।

মুখ সামুদ্রিক : অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে (১৭৭৫) ল্যাভেডর সিদ্ধান্ত করিলেন, এই জাতীয় নাকের গঠন শিল্পকলার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করে, এই রকম ঠোঁটের গঠন বুদ্ধির প্রখরতা ইঙ্গিত করে, ইত্যাদি।

শির সামুদ্রিক : অতঃপর গল্ (Gall), স্পার্জিম্ (Spurzhim) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুখ-সামুদ্রিক ছাড়িয়া শির-সামুদ্রিকের (Phrenology) দিকে বেশী ঝোঁক দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মানুষের বুদ্ধি প্রভৃতির মাপ করিতে হইলে তাহার মাথার গঠনটি (আয়তন নহে) লক্ষ্য করিতে হইবে। মাথার সুমুখের দিকটি পরিপুষ্ট হইলে হয়ত লোকে বেশী জেদী হয়, পশ্চাৎ দিকটি পরিপুষ্ট হইলে প্রতিভাশালী হয়, ইত্যাদি। পরে এ মতও খণ্ডিত হইল। গ্যাল্টন (১৮৮৩) প্রমাণ করিলেন, মুখ বা মাথার গঠনের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও সম্পর্ক নাই।

অন্য ভাবে বুদ্ধি মাপের চেষ্টা : তখন ধারণা ছিল যে, মানুষের চক্ষু কর্ণ ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলির শক্তি প্রায় সকল ব্যক্তিরই এক প্রকার এবং মনই তাহাদের খাটাইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সমস্ত দেহ-যন্ত্রের ব্যবহার যত সমর্থভাবে করিতে পারিবে, সেই তত বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে ত্বকের স্পর্শানুভূতি তথা বুদ্ধির তীব্রতা মাপিবার জন্য কম্পাসের কাঁটার মত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু পরে দেখা যাইল, এই স্পর্শানুভূতি প্রভৃতির দিক দিয়া বুদ্ধিমান ইউরোপীয়গণের সহিত নরখাদক জড়বুদ্ধি বন্যদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই, এবং (ব্যালার্ডএর ভাষায়) মোটা চামড়ার

লোকরাই যে মাথা মোটা হইবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। এমন কি দৃশ্যবস্তুর বা উজ্জ্বলতার পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা, গানের সুর বা পর্দ্দার কড়ি কোমল বোধশক্তি প্রভৃতির সহিতও বুদ্ধির সম্পর্ক নাই।

তখন মনস্তাত্ত্বিকগণ বলিলেন, মনের পৃথক অস্তিত্ব কিছু নাই; ইহা ইন্দ্রিয়াদি দেহ-যন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করে। সুতরাং মনের বা বুদ্ধির নিরিখ নির্ণয়ে দেখিতে হইবে, কোন লোকটি তাহার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সাহায্যে কত ক্ষিপ্রভাবে কাজ করিতে পারে। তখন হইতে বুদ্ধির প্রখরতা মাপিবার জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়জনিত মাপের (Reaction time) চেষ্টা চলিতে লাগিল। অনুভূতির তীব্রতা মাপের চেষ্টা ছাড়িয়া এইবার অনুভূতির ক্ষিপ্রতা মাপিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া বুদ্ধি মাপিবার চেষ্টা হইতে লাগিল এবং এই উদ্দেশ্যে নানা রকম যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইল। ওয়েবার (Waber), ফেক্‌নার (Fechner) প্রভৃতি এই দিক দিয়া নানা রকম পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

পরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, dynamometer (হাতের মুঠার শক্তি মাপক যন্ত্র), Ergograph (হাতের মধ্যের আঙ্গুলের শক্তি মাপক যন্ত্র), Aesthesiometer (স্পর্শ শক্তির তীব্রতা মাপক যন্ত্র), Tapping machine (পেশীর ক্ষিপ্রতা মাপক যন্ত্র) প্রভৃতির দ্বারা মানুষের বুদ্ধির মাপ পাওয়া যায় না।

তখন এবিংহস্‌ (Ebinghaus), হুইপিল্‌ (Whipple) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কেহ বা স্মরণশক্তির পরীক্ষা দ্বারা, কেহ বা কল্পনা শক্তির পরীক্ষা দ্বারা, কেহ বা অনুষঙ্গ, অভিনিবেশ প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির প্রখরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিক্ষার সঞ্চারণ (Transfer of learning) সম্বন্ধে গবেষণার ফল হইতে দেখা গেল যে, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির (faculty) মধ্যে কোনও প্রকার সম্পর্ক (correltion) নাই। ফলে কাহারও স্মৃতি শক্তি বেশী থাকিলে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও বেশী থাকিবে অথবা কল্পনা শক্তি বেশী থাকিলে বিচার শক্তিও যে বেশী থাকিবে, এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। কাজেই তথাকথিত faculty, অনুষঙ্গ, অভিনিবেশ, কল্পনা প্রভৃতি মাপের দ্বারা মনের মাপ পাওয়া যাইবে না।

বিণে এবং মেট্রিক স্কেলের আবিষ্কারঃ শেষ পর্যন্ত ফরাসী পণ্ডিত বিণে (Binet) এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে সমস্ত দুর্মেধা বালকদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহাদেরই বাছাই করিবার জন্য বিণের কাজ আরম্ভ হয়। তিনিও পূর্ব্ববর্তী পণ্ডিতদের মতই অনুভূতি ও মনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতাজ্ঞাপক যন্ত্রাদি লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তবে একদিক দিয়া পূর্ব্ব সূরীদিগের সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্তী পণ্ডিতগণ একটি অথবা অত্যল্প সংখ্যক মানসিক শক্তি (faculty) পরিমাপ করিয়াই বুদ্ধির মাপ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিণে কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধি অত্যন্ত জটিল, নানাজাতীয় কাজের মধ্য দিয়া ইহা অভিব্যক্ত হয়। কাজেই নানাজাতীয় প্রশ্নের মধ্য দিয়া বুদ্ধির নমুনা সংগ্রহ করিয়া তবে বুদ্ধিকে মাপিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে হইল (১) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা (purposive direction) (২) পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া (active adaptation) এবং (৩) দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা —এইগুলির মধ্য দিয়াই বুদ্ধি কাজ করিয়া যায়। তখন তিনি বুদ্ধি মাপের জন্য এই সমস্ত ক্ষমতাগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকগুলি প্রশ্ন তৈয়ারী করিলেন। এই প্রশ্নগুলি লইয়া তিনি একটি স্কুলের কতকগুলি বালকের বুদ্ধি মাপিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখা গেল, বিণের এই পরীক্ষায় ভাল মন্দ মাঝারি প্রভৃতি যে যেমন নম্বর পাইল, সেই নম্বরের সহিত সেই বালকগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও পুঁথিগত বিদ্যার সাময়িক পরীক্ষার ফলগুলির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (co-relation) রহিয়াছে।

এইভাবে গবেষণা করিতে করিতে বিণে বুদ্ধির মাপকাঠির একটা সন্ধান পাইলেন (১৯০৫)। অতঃপর তিনি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্নস্তবক তৈয়ারী করিয়া তাহাদের একটা মেট্রিক মান (Metric scale) স্থির করিলেন। তাঁহার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মাপকাঠিতে স্কুলের ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ বৎসরের ছাত্রদের জন্য মোট ৫৪টি প্রশ্ন ছিল। ১১, ১৩ ও ১৪ বৎসরের বালকদিগের জন্য তিনি কোনও প্রশ্ন তৈয়ারী করেন নাই।

মনোবয়স ঃ যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৬০।৭০ জন বলিতে পারে, তাহা সেই বয়সের নির্দ্দিষ্ট মান হইল। এইভাবে তিনি শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিই স্থির করিলেন না, বুদ্ধির একটা মনোবয়সও (mental age) স্থির করিলেন। মনোবয়সের অর্থ হইল এই যে, এই মাপের জন্ম বয়সে (chronological age) সাধারণ বালকেরা এই মাপের বুদ্ধির পরিচয়টুকু দিতে সমর্থ হয়; এই হিসাবে সাধারণ বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের মনোবয়স ও জন্মবয়স একই রকম হইবে; প্রতিভাশালী বালকদের মনোবয়স জন্ম বয়সের চেয়ে বেশী হইবে ইত্যাদি। যদি সাত বৎসরের একটি বালক নয় বৎসরের বালকদের নির্দ্দিষ্ট মানের প্রশ্নগুলি উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মনোবয়সের দিক দিয়া সে তুই বৎসর বেশী অগ্রসর আছে। আবার যদি নয় বৎসরের বালকটি নয় বৎসরের বা আট বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলি বলিতে না পারিয়া মাত্র সাত বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে মনোবয়সের দিক দিয়া তুই বৎসর পিছাইয়া (retardation) আছে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, সহপাঠিদের মধ্যে কতটা মনোবয়সের পার্থক্য থাকিলে তাহাদের আর এক বিভাগে (section) রাখা উচিত নয়? বিণে বলেন, ৮ এর ঊর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য ৩ বৎসরের পার্থক্য থাকিলে এবং ৮ এর নিম্ন বয়স্কদের জন্য ২ বৎসরের পার্থক্য থাকিলে আর তাহাদের এক বিভাগে (section) রাখিয়া পড়ানো উচিত নয়।

বিণের শিষ্যবর্গ ঃ 'বিণে'র পর ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ 'বিণে'র বুদ্ধি মাপকের সার্থকতা দেখিয়া নানাভাবে বিণের মাপকগুলির সংস্কার করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের সিরিল বার্ট (Cyril Burt), আমেরিকার টারম্যান্ (Terman), কুলম্যান্ (Kuhlman), গডার্ড (Goddard) এবং জার্ম্মাণীর ষ্টার্ণ (Stern), ববারট্যাগ্ (Bobertag) প্রভৃতি বিখ্যাত।

বিণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ষ্টার্ণই প্রথম "মনস্বিতাংশ" (I.Q.) আবিষ্কার করেন। তিনি স্থির করিলেন, কোনও ছেলের মনোবয়সকে যদি

তার জন্মবয়সের অঙ্ক দিয়া ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে বালকটির মনস্বিতাংশ। যেমন একটি বালকের মনোবয়স ১০ এবং জন্ম বয়স ৮ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{১০}{৮}$ বা ১·২৫।

বিণের সিদ্ধান্ত লইয়া আমেরিকায় যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে টারম্যান্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। Standford বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করেন বলিয়া তাঁহার গবেষণার ফলটি Standford Revision নামে খ্যাত। ইহাতে ৩ হইতে ১০ বৎসরের ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক বয়সের জন্য ৬টি করিয়া ৪৮টি; ১২ বৎসরের জন্য ৮টি, ১৪ বৎসরের জন্য ৭টি, সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৬টি, প্রতিভাশালী পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৫ এবং বৈকল্পিক ১৬টি একুনে ৯০টি প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে। বিণের মত টারম্যান্ও ১১ ও ১৩ বৎসরের বালকদের জন্য কোনও প্রশ্নের ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ ঐ বয়সে কৈশোরের আবির্ভাবটি কোন কোনও ক্ষেত্রে শীঘ্র শীঘ্র, আবার কোনও ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধির পরিপক্কতার একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি পাওয়া যায় না।

টারম্যান্ অনেক নূতন নূতন প্রশ্ন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পরীক্ষার্থীদের শব্দ-সম্পদের বিচারমূলক প্রশ্ন এবং সংখ্যাকে পশ্চাদ্দিক হইতে গণনার প্রশ্ন অন্যতম। তবে মনস্বিতাংশের নিরিখটিকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং সেই নিরিখ অনুসারে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করার জন্যই তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁহার মনস্বিতাংশের সূত্রটি এইরূপ:

$$\text{মনস্বিতাংশ (I. Q.)} = \frac{\text{মনোবয়স}}{\text{জন্ম বয়স}} \times ১০০$$

এই সূত্রানুসারে একটি ৮ বৎসরের বালকের মনোবয়স ১০ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{১০}{৮} \times ১০০ = ১২৫$; সেইরূপ একটি ১০ বৎসরের বালকের মনোবয়স ৮ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{৮}{১০} \times ১০০ = ৮০$ ইত্যাদি।

এই মনস্বিতাংশ অনুসারে টারম্যান্ ছাত্রদের নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিষাছেন:

১৪০এর উর্দ্ধ মনস্বিতাংশ হইলে প্রতিভাশালী (genius.)।

১২০ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশ হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি (of very superior intelligence)।
১১০ " ১২০ " " বুদ্ধিমান্ (of superior intelligence)।
৯০ " ১১০ " " সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত (of Average ")।
৮০ " ৯০ " " অল্পধী (Dull)।
৭০ " ৮০ " " জড়বুদ্ধির সীমারেখা of Boderline defficiency)।

৭০এর কম মনস্বিতাংশ হইলে তাহা জড়বুদ্ধির পর্য্যায়ে পড়ে। এই জড়বুদ্ধিদের মধ্যেও আবার মনস্বিতাংশের তারতম্য অনুসারে টারম্যান্ আরও শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, যথা—

৫০ হইতে ৭০ মনস্বিতাংশ হইলে নির্ব্বোধ Moions
২০ বা ২৫ হইতে ৫০ " " হীনবুদ্ধি Imbeciles
২০ বা ২৫-এর কম " " অপদার্থ জড়বুদ্ধি Idiots

গণমাপক বা সংঘাভিক্ষণ ঃ

বিণে, ষ্টার্ণ, টারম্যান্ প্রভৃতির বুদ্ধি-মাপকগুলি খুব কার্য্যকরী হইলেও, এই-গুলির একটি অসুবিধা হইতেছে যে, এই পরীক্ষাগুলি মৌখিক এবং এইগুলি ব্যক্তিগতভাবে করিতে হয় বলিয়া ইহাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যখন অত্যল্প সময়ে বহু লোককে পরীক্ষা করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তথাকথিত "গণ-মাপক" (Group test) খুব কার্য্যকরী হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকার ওটিস্ (Otis)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিই সমষ্টিগত বুদ্ধিপরীক্ষা বা গণ-মাপকের প্রবর্ত্তক। এই জাতীয় পরীক্ষার একটি ছাপান পুস্তিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ (battery) থাকে এবং প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে এবং প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলিও প্রশ্নের পাশেই ছাপান থাকে। পরীক্ষার্থীকে শুধু অনুপযুক্ত পদটি কাটিয়া দেওয়া, কি বিশেষ একটি শব্দের নিম্নে রেখা টানিয়া দেওয়া, অনুক্ত পদটি পূর্ণ করা প্রভৃতি কাজ করিতে হয়। ইহাতে মোটেই বেশী সময় লাগে না। ফলে ২০০।২২০টি প্রশ্নের উত্তর করিতে

হয়ত ২৪।২৫ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া হয় না। গত মহাযুদ্ধের সময় এই-ভাবে অতি অল্প সময়ে ৭০০০০০র উপর লোককে নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদের এই পরীক্ষার কৃতিত্ব অনুসারে ছোট বড কাজ দেওয়া হয়। পরে দেখা যায়, এই গণ-মাপকের পরীক্ষায় যাহারা বেশী নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি খুব কৃতকার্য্যতার সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই জাতীয় প্রশ্নের সাহায্যে শুধু বুদ্ধির নিরিখই যে নির্ণীত হয় তাহা নহে, অধীত বিদ্যারও পরীক্ষা এইভাবে করা যাইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (objective test) সূত্রপাতও এই গণ-মাপকের মধ্য হইতেই। এই পরীক্ষার বিশেষত্ব হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষকের ভাল লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতির উপর বিচারটি প্রভাবান্বিত হয় না এবং ইহা পরীক্ষা করিতে সময়ও কম লাগে। ইহা ছাড়া পরিচ্ছন্নতা, রচনা-কৌশল প্রভৃতির অভাবের জন্য ইহাতে নম্বর কাটা যায় না। এই জাতীয় পরীক্ষায় বহু সংখ্যক প্রশ্ন থাকে বলিয়া ইহাতে জ্ঞানের সার্ব্বভৌম পরীক্ষা হয়।

আমেরিকার সংঘাভিক্ষণের অনুকরণে ইংলণ্ডে ডাঃ ব্যালার্ডের Chelsea test, Crichton test, অধ্যাপক গড্‌ফ্রে টমসন-এর Northumberland test প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু বুদ্ধিমাপকের বিবর্ত্তনে ওটিস্, ব্যালার্ড, টমসন প্রভৃতির অবদানই শেষ কথা নহে। ইহাদের সংখাভিক্ষণ বা গণমাপকগুলি দ্বারা শুধু তাহাদেরই বুদ্ধির মাপ করা সম্ভব যাহারা লিখিতে ও পড়িতে জানে। কিন্তু অশিক্ষিতের বুদ্ধি মাপিবারও ত প্রয়োজন আছে। ইহার জন্য আমেরিকায় আর এক জাতীয় মাপক "বিটা টেষ্ট" (B-test) প্রবর্ত্তিত হয়। Porteus-এর গোলক ধাঁধা পরীক্ষা (Maze test), Pinter ও Patersonএর হস্তসম্পাদ্য পরীক্ষা (Performance test) প্রভৃতির দ্বারা অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও বুদ্ধি পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

বুদ্ধি মাপকের আবিষ্কৃত তথ্য ঃ

এই সমস্ত মাপকের সাহায্যে আজকাল মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ প্রায় নির্ভুলভাবেই নির্ণয় করা যায় বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। এই সমস্ত

বুদ্ধি-মাপকগুলির বহুল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেকগুলি চমক্‌প্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; যথা—

(১) স্বভাবজাত বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না—ফলে পূর্ণ বয়সের পর মানুষের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার মনস্বিতাংশ প্রায় একই থাকিয়া যায়। (২) বুদ্ধির বিকাশ জাতকের জন্মের পর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি হয়। (৩) ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি খুব ধীর গতিতে বিকশিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৪ বৎসরের পর আর বুদ্ধি বাড়ে না। (ডাল্ (Doll) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বুদ্ধির পরিণতিটি ১৩ বৎসরেই চরম সীমায় উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করেন। আমেরিকার Army test-এ সৈনিকদিকের মনস্বিতাংশের গড় ছিল (বিণের নিরিখ অনুসারে) ১৩·০৮ বৎসরের সমান।) (৪) টারম্যান, ব্যালার্ড প্রভৃতির মতে ১৬ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। তবে ওটিস্, মন্‌রো প্রভৃতির মতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি বাড়িতে পারে। বর্ত্তমানে যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখা গিয়াছে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও নাকি ২৩।২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অত্যন্ত সামান্য মাত্রায় বুদ্ধি বাড়িতে থাকে। মোটের উপর অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত হইতেছে, সাধারণতঃ ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

বুদ্ধিমাপকের পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে, ১৬ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। এই তত্ত্বটি অনস্বীকার্য্য। তবে ইহাতে নিরাশ হইবারও কিছুই নাই এবং পাণ্ডিত্যে অরুচি হইবারও কিছুই নাই। এমন কি বুদ্ধির প্রয়োজনেও জ্ঞানের সম্পদের প্রয়োজন আছে। নির্জ্জলা বুদ্ধি দিয়া সব কাজ করা যায় না,—অর্জ্জিত জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া বুদ্ধিকে সাহায্য করে এবং কর্ম্মনৈপুণ্যকে বাড়াইয়া তুলে। পরিণত বয়সের পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ১৪ বা ১৬ বৎসরের বুদ্ধির মূলধন লইয়াই তাঁহাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জ্ঞানের সহায়তায় জগতের সহিত দক্ষতর ভাবে কারবার করিতে পারেন।

আরও একটি কথা আছে। মনের সহিত অর্জ্জিত জ্ঞানের সম্পর্কটি ঠিক আধারের সহিত আধেয়ের সম্পর্কের মত নহে। সুজীর্ণ অন্ন যেমন রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া দেহেরই অংশীভূত হইয়া দেহকে পুষ্ট করে, তেমনই সুসমৃদ্ধ জ্ঞান

মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মনের শক্তি তথা বুদ্ধিকে বাড়াইয়া তুলে। এই জন্যই এডামস্ বলিয়াছেন, "Facts become faculty". পেটার স্যাণ্ডিফোর্ড এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই বুদ্ধির Vertical ও horizental বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিয়াছেন।

বুদ্ধি মাপকের ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভাশালী, জড়বুদ্ধি প্রভৃতিদের সংখ্যাগত অনুপাতটি কিরূপ, তাহাও অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মোটামুটি যাহাকে curve of chance বলা হয়, মানুষের বুদ্ধির অনুপাতটি সেই curveটিই অনুসরণ করিয়া চলে। টারম্যান্ ১০০০ আমেরিকান বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কিরূপ মনস্বিতাংশ যুক্ত বালকের শতকরা হার কত, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন :

৫৬ হইতে ৬৫ মনস্বিতাংশের হার				০·৩৩	
৬৬	,,	৭৫	,, ,,	২·৩	
৭৬	,,	৮৫	,, ,,	৮·৬	= ৯৪·৭% (৭৬ হইতে ১২৫)
৮৬	,,	৯৫	,, ,,	২০·১	
৯৬	,,	১০৫	,, ,,	৩৩·৯	
১০৬	,,	১১৫	,, ,,	২৩·১	
১১৬	,,	১২৫	,, ,,	৯·০	
১২৬	,,	১৩৫	,, ,,	২·৩	
১৩৬	,,	১৪৫	,, ,,	০·৫৫	
				১০০·১৮	

অন্যান্য পণ্ডিতদের গবেষণার ফলটিও প্রায় অনুরূপ।

থর্ণডাইকের মতে মনস্বিতাংশের হারটি এইরূপ—

১৪০-এর ঊর্দ্ধ মনস্বিতাংশ	০·২৫	
১২০ হইতে ১৪০ "	৬·৭৫	
১১০ " ১২০ "	১৩·০০	=৮৬%
৯০ " ১১০ "	৬০·০০	
৮০ " ৯০ "	১৩·৫০	
৭০ " ৮০ "	৬·০০	
৭০-এর নিম্ন "	১·০০	
	১০০·০০	

এই গবেষণাগুলি শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া খুবই আশাপ্রদ। কারণ, অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং একেবারে নির্ব্বোধ, ইহাদের বাদ দিয়া শতকরা ৮০।৯০টি বালকই হইতেছে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে অবশ্য মনস্বিতাংশের তারতম্য আছে, কিন্তু "তোর কিচ্ছু হবে না" বলিয়া সরাসরি বিদায় দেওয়া যায় এমন নির্ব্বোধ খুবই কম। তাহা হইলে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনসাধারণের শিক্ষার মান প্রভূত পরিমাণে উন্নত করা সম্ভব।

বুদ্ধি-মাপকের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়া আরও কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর পিণ্টার (R Pinter) তাঁহার 'Intelligence Testing : Methods and results' নামক গ্রন্থে যে-সব চমক্প্রদ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ মোটামুটি এই :

(১) অনুভূতিজ বৈকল্য (যেমন অন্ধত্ব, বধিরতা প্রভৃতি) যে জাতির মধ্যে বেশী, তাহাদের মনস্বিতাংশের হার কম। (২) সাধারণ লোকের চেয়ে অপরাধপ্রবণ লোকের মধ্যে মনস্বিতাংশের হার অনেক কম। (৩) জাতি হিসাবে কোন কোনও জাতির মনস্বিতাংশ কম বা বেশী হয়, যেমন নিগ্রোদের মনস্বিতাংশ অল্প, ইংরাজ-ক্যানাডিয়ান্ প্রভৃতিদের বেশী। (৪) স্ত্রী পুরুষ ভেদে মনস্বিতাংশের পার্থক্য প্রায় নাই বলিলেই চলে। (৫) সাধারণ

শ্রমিকদের চেয়ে দক্ষ কারিগরদের মনস্বিতাংশ অধিক। (৬) দক্ষ কারিগর-দের পুত্রকন্যার মনস্বিতাংশ সাধারণ শ্রমিকদের পুত্রকন্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ যে বুদ্ধি দিয়া আমরা একটা বিশিষ্ট কাজে দক্ষতা অর্জ্জন করি, তাহা পুত্র পৌত্রাদিতে সংক্রামিত হয় ইত্যাদি।

বুদ্ধি মাপকের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রয়োজন ঃ

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কুইন্টিলিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস ফুলার, স্যার জন এডাম্‌স পর্য্যন্ত সকলেই বলিয়াছেন যে, শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার বিষয়টির মতই ছাত্রকেও বুঝিবার চেষ্টা করা। ডাঃ ব্যালার্ড তাঁহার 'Group test' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক শিল্পীকেই তাহার শিল্প-সাধনার উপাদানকে চিনিতে ও জানিতে হয়। মৃৎশিল্পীকে মাটি চিনিতে হয়, তন্তুবায়কে সূতা চিনিতে হয়। তাহা না চিনিলে তাহার শিল্প ব্যর্থ হয়। সাধারণ মাটি দিয়া চিনামাটির অথবা শূকরের লোম দিয়া সিল্কের রুমাল তৈয়ারী করা যায় না। তেমনি শিক্ষকও সব ছাত্রকে দিয়া সব কিছুই করিতে পারেন না। অথচ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অভিভাবক হইতে সরকার পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষকদিগের নিকট হইতে ঐ জাতীয়ই একটা কিছু আশা করেন। বুদ্ধিমাপকের ব্যবস্থা এই বিষয়ে অনেকখানি প্রতিকার করিতে পারে। বুদ্ধি-মাপকের দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া যায় যে, কোন্ ছাত্রটি কি ধরণের কতদূর পড়াশুনা করিবার অধিকারী। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত হইতে এই দিগদর্শন মিলিবে।

মনস্বিতাংশ	বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সম্ভাবনা	পেশা সম্বন্ধে সম্ভাবনা
১৫০এর উর্দ্ধে	সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা	উচ্চতম দায়িত্বের পদের যোগ্য
১৩৫ হইতে ১৫০	উচ্চ বিদ্যা	বড় বড় রাজকার্য্য
১১৫ ,, ১৩৫	মাধ্যমিক শিক্ষা	কেরাণীগিরি ও উচ্চস্তরের কারিগরী
১০০ ,, ১১৫	মাধ্যমিক শিক্ষা	সাধারণ টেক্‌নিকাল্ কাজ প্রভৃতি
৮৫ ,, ১০০	উচ্চ প্রাথমিক ও কিছু বেশী	সাধারণ কারিগরী, ছোটখাট ব্যবসায় ইত্যাদি
৭০ ,, ৮৫	নিম্ন প্রাথমিক	মজুর
৫০ ,, ৭০	... ...	অতি সাধারণ দিন মজুর
৫০এর নিম্ন	... ...	বিশেষ তত্ত্বাবধানে পুনরাবৃত্তিমূলক কার্য্য

সাধারণ ক্লাশের পাঠন-ব্যবস্থার মধ্যেও বুদ্ধি-মাপকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের মনোবয়স হিসাবে একই শ্রেণীর ছাত্রদের আবার ক খ গ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে ফল খুব ভাল হয়। ইহার চেয়েও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতেছে একই মনস্বিতাংশযুক্ত বালকদের মধ্যে আবার জন্মবয়স অনুসারে আর একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া লওয়া। পড়ানোটা তখনই উৎকৃষ্ট হয় যখন (সংঘগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি বজায় রাখিয়াই) ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থ ও সময়ের দিক দিয়া এই ব্যষ্টিগত পাঠন-ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলিয়াই খানিকটা বাধ্য হইয়া বিভিন্ন ছাত্রকে এক একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমষ্টিগত ভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগটি এমন ভাবেই করা উচিত যাহাতে যথাসম্ভব এক জাতীয় ছাত্রই এক শ্রেণীতে থাকে। এইজন্য মনোবয়স, জন্মবয়স, মনস্বিতাংশ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে বিভাগ উপ-বিভাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত।

এইরূপ শ্রেণীর বিভাগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাতত্ত্ববিৎ বলেন যে, ইহাতে প্রতিযোগিতার অভাবে নির্ব্বোধ ছাত্রগণ শুধু পিছাইয়া পড়িবে না তাহাদের মধ্যে হীনমন্যতাও আসিবে। এই অনুযোগটি সত্য হইলে বলা যায় নির্ব্বোধ ছাত্রদের সঙ্গে বুদ্ধিমান্ থাকিলে তাহাদেরও সম্ভাবনার অনেকখানি অপচয় হইবে।

আরও একটি কথা আছে। ধরা যাইতে পারে, একটি ক্লাশে একটি ছাত্রের মনস্বিতাংশ ১২০, আর একজনের ১০০ এবং তৃতীয় আর একজনের ৫০। এখন এই তিন জনেরই জন্মগত বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তিন জনেরই বিদ্যাবত্তা প্রায় একই রকমের হইবে। কিন্তু যতই ইহাদের বয়স বাড়িতে থাকিবে ইহাদের মনস্বিতাংশ এক থাকিলেও, বিদ্যার তথা মনোবয়সের পার্থক্যটা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তিন জনেরই বয়স যখন ১৬ বৎসর হইবে, তখন ৫০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে $\frac{১৬ \times ৫০}{১০০} = ৮$ বৎসর; ১০০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে

$\frac{১৬ \times ১০০}{১০০} = ১৬$, এবং ১২০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে $\frac{১৬ \times ১২০}{১০০} = \frac{৯৬}{৫} = ১৯\frac{১}{৫}$; সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বয়সে প্রতিভাশালী বালকটির সহিত নির্ব্বোধ ছাত্রটির মনোবয়সের পার্থক্য হইবে ১১ বৎসরেরও বেশী। এতখানি পার্থক্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোনও সম্ভাবনাই নাই এবং প্রতিযোগিতাকে অসম্ভব মনে করিয়াই নির্ব্বোধ ছাত্রটি হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া একপাশে সরিয়া থাকিবে। তাহার চেয়ে তাহাকে যদি তাহারই অনুরূপ মনস্বিতাংশ যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে রাখা হইত, তাহা হইলে তাহার হীনমন্যতার অনুভূতিটা অল্পতর হইত এবং সে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে পারিত।

জন্মবয়স এবং পরীক্ষার ফল দেখিয়া শ্রেণী বিভাগটাই এ দেশে প্রচলিত। এই সঙ্গে ছাত্রদের মনোবয়সের হিসাবটিও ধরা বাঞ্ছনীয়। ডাঃ ব্যালার্ড দেখাইয়াছেন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি কুখ্যাত পল্লীতে একটি বড় স্কুলে একজন নূতন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াই ছাত্রীদের মনস্বিতাংশ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিলেন, তাহার ফলে পরবর্ত্তী বৎসরে তেত্রিশটি ছাত্রী বৃত্তি পাইল। অথচ ঐ বিদ্যালয়ে বিগত দশ বৎসরে একটিও বৃত্তি পায় নাই। ডাঃ ব্যালার্ড আরও বলেন যে, আমাদের স্কুল পাঠশালাতে যে ভাবে পড়ানো হয় তাহাতে দুর্মেধা বা নির্ব্বোধ ছাত্রদের সহজেই চিনিতে পারা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভাশালী ছাত্ররা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। তাহার কারণ, দুই একটি কথা কহিলেই নির্ব্বোধ ছাত্রকে চিনিয়া ফেলা যায়, কিন্তু লাজুক বুদ্ধিমান বালক অনেক সময়েই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। ফলে বুদ্ধি থাকলেও, সুযোগ ও উৎসাহের অভাবে নির্ব্বোধ ছাত্রদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের প্রতিভা বিকশিত হইার সুযোগ পায় না।

মান নির্ণয়ঃ

এখন প্রশ্ন—এ দেশের ছাত্রদের জন্য এই জাতীয় গণমাপক তৈয়ারী করিতে হইলে জন্মবয়সের অনুপাতে মনোবয়সের মানগুলি কি ভাবে স্থির করিব?

ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা। শুধু শিক্ষিত অথবা শুধুই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছাত্র লইয়া পরীক্ষা চালাইলে সমগ্র দেশের পক্ষে মনোবয়সের মানটি অযথা উচ্চ বা অযথা ভাবে নিম্ন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, যে বয়সের ছাত্র লইয়া গবেষণা করা হইবে সেই ছাত্রগুলির বয়স যেন নিখুঁত ভাবে নির্ভুল হয়। তাহা না হইলে জন্মবয়সের সহিত মনোবয়সের অনুপাতটি ভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

এইবার যে প্রশ্নগুলি যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্রই বলিতে পারিবে তাহা সেই বয়সের মনস্বিতাংশের গড় সূচনা করিবে। তবে "অধিকাংশ ছাত্র" বলিতে কি বুঝিব, এই সম্বন্ধে সব পণ্ডিত একমত নহেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রশ্নগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৬০।৭০ জন বলিতে পারে, বিণের মতে তাহাই হইতেছে সেই বয়সের নির্দ্দিষ্ট মান। আমেরিকার অনেক স্থলে যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৭৫ জন বলিতে পারে, সেইগুলিকে সেই বয়সের মান বলিয়া ধরা হয়। বার্ট বলেন, যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৫০ জন বলিতে পারে, সেই বয়সের এক বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালকদের উপযুক্ত মান হইবে। এইভাবে হয়ত ৫০০টি ছাত্র লইয়া একটি মান (standard) ঠিক করা হইল। এইবার এই মানগুলি ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য হয়ত আরও ২০০ জন ছাত্রের উপর একই প্রশ্নগুলি দেওয়া হইল। এখন পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০ জন ছাত্রের এবং বর্ত্তমান ২০০ জন ছাত্রের অর্থাৎ একুনে ৭০০ জন ছাত্রের মনস্বিতাংশের গড়টি যদি প্রথম বারের গড়ের সহিত একই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মানগুলি সার্ব্বজনীন ভাবে শুদ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্ন ও প্রশ্নগুচ্ছ :

এইবার বিচার্য্য, কতকগুলি প্রশ্ন-স্তবক থাকিবে, প্রত্যেক স্তবকে কতকগুলি করিয়া প্রশ্ন থাকিবে এবং সেইজন্য কতখানি সময় দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আমেরিকার গণমাপকগুলি আমাদিগকে খানিকটা পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারে।

আমেরিকায় সৈন্যদের গণমাপক—"আল্‌ফা টেষ্ট"

প্রশ্ন-স্তবক সংখ্যা	বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্ন স্তবক	স্তবক পিছু প্রশ্ন-সংখ্যা	স্তবক পিছু সময়
১	নির্দ্দেশ পালনের শক্তি (Instruction test)	১২	২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড
২	গণিত বিষয়ক	২০	৫ " ×
৩	শ্রেষ্ঠ উত্তর	১৬	১ " ৩০ "
৪	শব্দের অর্থ	৪০	১ " ৩০ "
৫	বাক্যের বিন্যাস	২৪	২ " × "
৬	ক্রমিক সংখ্যা	২০	৩ " × "
৭	সম্পর্ক নির্দ্দেশ, উপমা প্রভৃতি (analogies)	৪০	৪ " × "
৮	সাধারণ জ্ঞান	৪০	৪ " × "
	মোট...	২১২	২৩ " ১৫ "

টারম্যান্‌-গণমাপকে এইরূপ ১০টি প্রশ্নস্তবকে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৫টি প্রশ্ন ছিল এবং সময় দেওয়া হইয়াছিল ২৭ মিনিট। প্রশ্নের নমুনা এইরূপ :

Analogies : প্রশ্ন (১) : অনুক্ত পদটি পূর্ণ কর—

রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে সম্পর্ক, রাজার সহিত—সেই সম্পর্ক ; অথবা— রাজপুত্র : রাজকন্যা : : রাজা : —

এইরূপ— পেন্সিল্‌ : ড্রয়িং : : তুলি : —

প্রশ্ন (২) : বন্ধনীর মধ্যে লিখিত পদগুলির মধ্য হইতে উপযুক্ত পদটির নিম্নে একটি রেখা টান।

কর্ণ : শ্রবণ : : চক্ষু : (টেবিল, হাত, দেখে, শুনে)

অশ্রু : শোক : : হাস্য : (আনন্দ, স্মিত, বালিকা, দন্ত-বিকাশ)

শব্দের অর্থ জানিবার জন্য প্রশ্ন : প্রশ্ন (১) : নিম্নের ব্রাকেটের মধ্যস্থ শব্দ[illegible]র মধ্য হইতে বিপরীতার্থক শব্দটির নিম্নে রেখা টান—

উচ্চ — (নিম্ন, ক্ষুদ্র, যুবক, নীচ)

উত্তপ্ত— (বরফ, অন্ধকার, শীতল, অগ্নি)

প্রশ্ন (২) : নিম্নলিখিত শব্দগুলি হয় সমার্থক অথবা বিপরীতার্থক ; যদি সমার্থক হয় তাহা হইলে সমার্থক শব্দটির নীচে এবং যদি বিপরীতার্থক হয়, তাহা হইলে বিপরীতার্থক শব্দটির নিম্নে একটি রেখা টান—

ভাল — মন্দ সমার্থক, বিপরীতার্থক

ছোট — ক্ষুদ্র সমার্থক, বিপরীতার্থক

বাক্যের অর্থবোধক প্রশ্ন : প্রশ্ন (১) : ঠিক উত্তরটির নিম্নে একটি রেখা টান—

ছেলেরা খেলা করে কি ?……… হাঁ, না—

পাখীর দেহ কি পালকে ঢাকা ….. হাঁ, না—

প্রশ্ন (২) : নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে একটি শব্দ বাদ দিয়া তাহার পর শব্দগুলি ঠিকভাবে সাজাইলে একটি অর্থযুক্ত বাক্য হইতে পারে। যে শব্দটি বাদ দেওয়া হইবে সেইটি কাটিয়া দাও—

আছে তাহার একটি ভিতর বই

ছুরি চেয়ার ধারাল হয়

ক্রমিক সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন : প্রশ্ন (১) : নিম্নের সংখ্যাগুলি দেখ এবং শূন্য স্থানগুলিতে যে যে সংখ্যাগুলি থাকা উচিত তাহা বসাও—

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, — —

৯, ১ ৭, ১, ৬, ১, — —

১৫, ১৬, ১৪, ১৭, ১৩, ১৮, — —

৩, ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৮ — —

সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন : প্রশ্ন (১) অনুপযুক্ত কথাগুলি কাটিয়া দাও—

ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায়—শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকাল।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম—কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ, মণ্ট্ ব্ল্যাঙ্ক্।

প্রশ্ন (২) : যুক্তি প্রদর্শন কর—

আকাশে মেঘ থাকিলে শীত কম হয় কারণ—(ক) মেঘ গরম

(খ) মেঘ পৃথিবীর তাপকে বিকীর্ণ হইতে দেয় না।

(গ) মেঘ শীতকে আকাশ হইতে নামিতে দেয় না।

প্রশ্ন (৩) : ঠিক উত্তরটির নিম্নে একটি রেখা টান—

দুইটি সংখ্যার গুণফল	সব সময়ে সংখ্যা দুইটির ল, সা, গু ও গ, সা, গুর গুণফলের সমান হয়
	মাঝে মাঝে " " " " " " "
	কখনও ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, হয় না

বুদ্ধির গণ-মাপকের জন্য নানা জাতীয় প্রশ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। শুধু বুদ্ধিমাপের জন্য নহে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায়ও এই জাতীয় প্রশ্ন দেওয়া হয়।

প্রশ্নগুলির বৈশিষ্ট্য :

বুদ্ধি-মাপকের প্রশ্নগুলির সহিত সাধারণ স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নের উদ্দেশ্যগত একটা বড় পার্থক্য আছে : (১) বুদ্ধি-মাপকের প্রশ্নগুলি ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানিবার জন্য এবং (২) স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলি ছাত্রদের অতীতের সাধনার কৃতিত্ব জানিবার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী হয়। অবশ্য বর্ত্তমানের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাগুলিতেও অধীত বিদ্যার পরীক্ষা লওয়া হয়, তবে বুদ্ধি-মাপকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা ততটা নয়, যতটা হইতেছে অধীতব্য বিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রের সম্ভাবনা নির্ণয় করা। কাজেই একটা বিদ্যালয়ে বা একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রার্থী হইলে তাহার সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয় এই বুদ্ধি-মাপকের পরীক্ষার।

বুদ্ধি-মাপকের পরবর্ত্তী অধ্যায় :

এই সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য নিছক বুদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য কর্ম্মকুশলতা, শব্দানুষঙ্গ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা, পেশাগত পরীক্ষা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কর্ম্মকুশলতা পরীক্ষা নানা ভাবে হইতে পারে। একটি ছবিকে হয়ত কয়েকটি টুকরা করিয়া কাটিয়া সেই টুকরাগুলি পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হইল। যে যত ক্ষিপ্রভাবে টুকরাগুলিকে যথাযথ বিন্যাস করিয়া পূর্ণাঙ্গ ছবিটি তৈয়ারী করিতে পারিবে, তাহার কৃতিত্ব তত অধিক। অনেকটা মণ্টেসরি শিক্ষা-প্রণালীর didactic aparatus জাতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা কর্ম্মকুশলতা নানা ভাবে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Hugo Munsterberg **পেশাগত সম্ভাবনা** পরীক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। তিনি পেষ্ট বোর্ডের মডেলের উপর কাল্পনিক রেল লাইন, পথচারী মানুষ, গাড়ী-ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া কিভাবে একটি কাল্পনিক গাড়ী চালাইয়া লওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যাহারা এই "খেলা ঘরের" গাড়ীটি ভাল ভাবে চালাইতে পারিয়াছিল, তাহারাই বাস্তব গাড়ীগুলিও ভালভাবে চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই জাতীয় অনেক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আজকাল Industrial Psychology প্রায় একটি প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শব্দানুষঙ্গ পরীক্ষা ইয়ুঙ (Jung) সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সম্মুখে একটি শব্দ দেখান হয় এবং সেই শব্দটির প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রথমেই যাহা মনে আসে সেই কথাটি লিখিতে বলা হয় এবং সেইজন্য যতটা সময় লাগে তাহা Stop watch লইয়া দেখিয়া লওয়া হয়। যে শব্দটিতে প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়, বুঝিতে হইবে সেই শব্দটিকে কেন্দ্র করিয়া পরীক্ষার্থীর নির্জ্ঞান মনে কোন গূঢ়ৈষণা লুকাইয়া আছে। এই ভাবে বিভিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া পরীক্ষার্থীর মনের কথা, স্বভাব ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যাইতে পারে। ইয়ুঙ সাহেব মনোবিকলন কার্য্যের জন্য এই ধরণের পরীক্ষার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূলার (Muller) নামে একজন সুইস্ ইঞ্জিনীয়ার মানুষের **প্রক্ষোভের** তীব্রতা মাপিবার উপায় আবিষ্কার করেন। প্রক্ষোভের তীব্রতার সময় শরীরের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোতের গতিপথটিকে বাধা দিবার শক্তিটি হ্রাস পায়। সুতরাং এই হ্রাস পাওয়ার মাপটি দেখিয়া আমরা একটি মানুষের প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা প্রক্ষোভের তীব্রতা মাপিতে পারি।

গণ-মাপকের সমালোচনা ঃ

এই ভাবে বুদ্ধিমাপের অভিযানটি আজকাল শুধু ব্যাপকতরই হয় নাই, পরন্তু ইহা লইয়া বড় মাতামাতি ও আদিখ্যেতা দেখা দিয়াছে। বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের সময় "আল্‌ফা টেষ্ট," "বিটা টেষ্ট" প্রভৃতি গণ-মাপকের দ্বারা সৈন্যদের নির্ব্বাচন ব্যাপারে সুফল পাওয়ায় গণ-মাপকগুলিকে আমেরিকা প্রভৃতি

দেশে মানুষের প্রায় অভ্রান্ত পরিচয়ের মাপকাঠি বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন, এই সমস্ত গণ-মাপকে মানুষের কি পূর্ণ পরিচয়টুকু পাওয়া যায় ?

স্বপক্ষে যুক্তি : প্রত্যেক পরীক্ষার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প আছে। বুদ্ধিমান লোক বলিতে আমরা স্বতঃই যাহা বুঝি তাহা হইতেছে এই যে, নির্ব্বোধ লোকটি যে সমস্ত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, বুদ্ধিমান লোকটি তাহা পারে। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বোধ লোকটি যত বিষয়ে তাহার বুদ্ধি খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে বেশী বিষয়ে বুদ্ধি খেলাইতে পারে এবং তৃতীয়তঃ নির্ব্বোধ লোকটি যত শীঘ্র শীঘ্র একটা সমাধান খুঁজিয়া পায়, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে তাড়াতাড়ি তাহা খুঁজিয়া পায়। ফলে বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্নের ক্রম-কাঠিন্য (difficulty or level), প্রশ্নের সার্ব্বভৌমতা (width or range) এবং ক্ষিপ্রতা (speed)—এই তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বিণে হইতে ব্যালার্ড পর্য্যন্ত সমস্ত আধুনিক মনোবিদ্‌গণই তাঁহাদের প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিবার সময় এই তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

প্রশ্ন তৈয়ারী ছাড়াও পরীক্ষা সার্থক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন : (১) সিদ্ধতা (validity) (২) নির্ভরযোগ্যতা (reliability) (৩) পরীক্ষকের রুচি-বিরাগ-নিরপেক্ষতা (objectivity) (৪) পরীক্ষা-পরিচালনা ও সাফল্যাঙ্ক (marks) দেওয়া সম্বন্ধে সহজতা (ease of administration) and scoring) এবং (৫) মান সম্বন্ধে (satisfaction of the norm) নিশ্চয়তা। এই দিক দিয়াও গণ-মাপকের পরীক্ষাগুলি যথেষ্ট প্রশস্তি দাবী করিতে পারে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-মাপকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অবশ্য ছাত্রের স্বাস্থ্য, সুযোগ-সুবিধা, উৎসাহ, চরিত্র প্রভৃতির উপর এই সম্ভাবনাটির সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। এই নিরিখগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিভুর্ল পরীক্ষা-প্রণালী প্রভৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে।

রচনা জাতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষকের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উপর উত্তরটির সফলাঙ্ক খানিকটা নির্ভর করে। অপর পক্ষে গণ-মাপকের প্রশ্নের উত্তরগুলি

শুধু রেখা-টানা বা ঢেরা-কাটা প্রকৃতির হওয়ায় ইহা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পরীক্ষা বলা চলে। পরীক্ষা পরিচালনা ও সফলাঙ্ক নিরূপণ ব্যাপারেও এই জাতীয় পরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। ইহাতে সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থীর একসঙ্গে ৩০।৩৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা লওয়া যায় এবং সেই পরীক্ষার খাতাপত্র দেখিবার জন্য পণ্ডিত পরীক্ষক অথবা সময়েরও খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। একটি আদর্শ উত্তরের ছক্ দেখিয়া যে কেহ খাতা দেখার কাজ চালাইতে পারে।

এই জাতীয় পরীক্ষার নির্ণীত মান সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে পরীক্ষার উপাদানগুলি সম্বন্ধে নিখুঁত ও অভ্রান্ত হইতে হইবে এবং বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা চালাইয়া সার্ব্বজনীন গড়টির সন্ধান করিতে হইবে।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ এই জাতীয় পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হইতেছে, ইহার প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে একটা 'লাগে তুক্ না লাগে তাক্' জাতীয় ব্যাপার ঘটে। কিছু জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, খানিকটা আন্দাজে একটা রেখা টানিয়া বা ঢেরা কাটিয়া কিছুটা নম্বর পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে, এই জাতীয় পরীক্ষায় ক্ষিপ্রভাবে চিন্তা করা, ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত-সমাধান করা প্রভৃতির উপরই অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই জাতীয় পরীক্ষায় চালাক লোকেরা যতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করেন, এমন সাবধানী দার্শনিক ভাবাপন্ন চিন্তাশীলেরা হয়ত ততটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন না।

অবশ্য একথা সত্য যে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত করিবার শক্তির একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে। ইংরাজীতে slow-witted কথাটি যে নির্ব্বোধ-এর প্রতিশব্দ, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অনস্বীকার্য্য। যে লোকটি দেরী করিয়া বুঝে, তাহাকে আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই মনে করি। তবে ইহাও ঠিক যে, যাহারা দেরী করিয়া সিদ্ধান্ত করে তাহাদের সকলেই নির্ব্বোধ নহে। আমেরিকার "আল্‌ফা" বা "বিটা" পরীক্ষায় যে সমস্ত লোককে বেশী বুদ্ধিমান মনে করিয়া বড় বড় কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা খুব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সত্যের একটি দিক মাত্র দেখা গিয়াছিল ; প্রমাণ

হইয়াছিল যে, যাহাদের বুদ্ধিমান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা সত্যই বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু ঐ পরীক্ষায় এই জিনিসটি প্রমাণিত হয় নাই যে, যাহাদের নির্ব্বোধ বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান কেহ অবহেলিত বা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে নাই।

আমেরিকার সৈনিকদের পরীক্ষায় যে শুধু "স্মার্টনেস্"টাই দেখা হইয়াছিল এবং বুদ্ধির অন্যান্য দিকগুলি (যেমন চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি) যে খানিকটা উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ডাঃ ব্যালার্ডও স্বীকার করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত Columbian Mental Test-এ Common Sense Test নামে কতকগুলি প্রশ্ন সংযোজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে সময়ের ক্ষিপ্রতার চেয়ে চিন্তা ও বিচার শক্তির দিকটিতেই অধিকতর ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

ম্যাক্সওয়েল গারনেট (Maxwell Garnett) বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে যে "c' factor" বা রসিকতা চাতুর্য্য প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও এই গণমাপকগুলির মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধির যে আর একটি দিক আছে, যাহা নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির ভিতর দিয়া আরব্ধ সাধনাকে সিদ্ধির দ্বারদেশে লইয়া যায় এবং যাহার অভাবে প্রতিভার ক্ষণিক স্ফুরণে কোনও তত্ত্বই আলোকিত হয় না এবং যাহাকে ডাঃ ওয়েব (Webb) "w factor" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও এই গণ-মাপকের মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

গণ-মাপকে অভ্যাসগত যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতাকে অনেক সময় বুদ্ধিগত ক্ষিপ্রতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাতে নির্জ্জলা বুদ্ধির হিসাব পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্যালার্ড দেখাইয়াছেন, একজন লোক যদি আর একজনের চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতার সহিত একটি বড় যোগের অঙ্ক কষিতে পারে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে না যে, সেই লোকটি দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে দ্বিগুণ বুদ্ধিমান। কারণ প্রথম লোকটি হয়ত দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর অভ্যস্ত। অভ্যাসগত যান্ত্রিক সহজসাধ্যতা ও ক্ষিপ্রতা আর স্বাভাবিক বুদ্ধিজনিত ক্ষিপ্রতা এক নহে। আমেরিকার গণ-মাপকগুলি মূলতঃ

সময়গত পরীক্ষা বলিয়াই তাহার মধ্যে অভ্যাসগত ক্ষিপ্রতা বুদ্ধিগত ক্ষিপ্রতার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

গণ-মাপকের পরীক্ষার দ্বারা মানুষের প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচয় মিলে না। তথ্যের উপস্থাপন ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য, যুক্তির শৃঙ্খলা, চিন্তার পারম্পর্য্য সৃজনীশক্তি প্রভৃতির সন্ধান এই গণ-মাপকের দ্বারা পাওয়া যায় না। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলিয়াছেন, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে পড়িলে তালিকা মালিকাতে পরিণত হয়। কথাটা সত্য। যে প্রতিভা শুষ্ক ঘটনার তালিকা হইতে কাব্য-উপন্যাসের মালিকা, ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপ হইতে তাজমহল, অস্ফুট মনোভাবকে স্ফুটতর করিতে পারে, সেই প্রতিভার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ হইতেছে মানুষের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলার বিকাশ করা। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই অধিনায়কত্ব করিতে পারে যাহার মধ্যে একটা সুসংস্কৃত সুপরিচ্ছন্ন সুসম্বদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলা ধরিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই যুক্তিশৃঙ্খলার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গণ-মাপকের প্রশ্নগুলির উত্তর হিসাবে রেখা টানা, টিক্ দেওয়া, ঢেরা কাটা প্রভৃতির মধ্যে এই যুক্তিশৃঙ্খলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হইতেছে সৃজনীশক্তি। যে শক্তি আমাদের দুঃখ-সুখ-হাসি আর অশ্রুকে উজ্জ্বল করিয়া, সুন্দরতর করিয়া চিত্রিত করিতে পারে, সে শক্তিটিও অবহেলার বস্তু নহে। অথচ মনস্বিতার যে দিক দিয়া এই শিল্প বা সৃজনীপ্রতিভা অভিব্যক্ত হয়, তাহার সন্ধানও এই গণ-মাপকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই সৃজনীশক্তি মানুষের বহু মূল্যবান সম্পদ। ইহা শুধু যে নূতন সৃষ্টিই করে, তাহা নহে; ইহাই আবার আবেগের সহিত মিলিত হইয়া মানুষকে জাগ্রত করিতে, উত্তেজিত করিতে, প্রবুদ্ধ করিতে, ক্ষিপ্ত করিতে সাহায্য করে। বুদ্ধ বা চৈতন্যের গৃহত্যাগ হইতে ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় ব্যাপারই নিছক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু হইয়াছে যে শক্তির দ্বারা তাহার পরিচয় গণ-মাপকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আরও একটি কথা আছে। যে বুদ্ধিকে আমরা মনস্বিতাংশ (I. Q.)

জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ আছে কি? বাস্তব জগতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া কঠিন। বুদ্ধি কথাটাই আসিয়াছে বুধ্ হইতে, যাহার অর্থ হইতেছে "জানা"। অথচ নিছক জ্ঞান বা অসংবদ্ধ বিদ্যা যে বুদ্ধিকে প্রখরতর করে না, তাহা নানা দেশেরই পণ্ডিত-মূর্খদের গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চয়কে ক্ষিপ্রভাবে কাজে লাগাইয়া জগতের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে সার্থকভাবে সমাধানে পৌঁছাইবার ক্ষমতার মধ্যেই আছে বুদ্ধির পরিচয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাহাকে I. Q বা মনস্বিতাংশ বলা হয়, তাহাও বয়সের অনুপাতে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রমাণ দেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

মনস্বিতাংশের ব্যঞ্জনাটির কথা বাদ দিয়া সাধারণভাবেই যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বুদ্ধি বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তাহা হইলে নানা মুনির নানা মতের সন্ধান পাওয়া যাইবে: কেহ বলিবেন, বুদ্ধি হইতেছে নূতন নূতন প্রয়োজনে চিন্তাকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা (Stern : 1914)[1]। কেহ বলেন, ইহা হইতেছে সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার ক্ষমতা (Terman, Plato)[2]। কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেছে নূতন নূতন জীবন-পরিবেশে থাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা (Pinter)[3]। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেছে শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা (Colvin, Freeman 1940)[4]।

এই শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষমতা প্রসঙ্গে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের তথা মস্তিষ্কের কথা আসিয়া পড়ে। যে ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র এমন সমস্ত উপাদানে প্রস্তুত যে তাহাতে অভিজ্ঞতার ছাপগুলি সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায় এবং সেই ছাপগুলি স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায়, তাহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা যাইতে

(1) "—a general capacity of the individual consciously to adjust his thinking to new requirement"—Stern.

(2) "An individual is intelligent in proportion as he is capable of abstract thinking"—Terman.

(3) "—the ability of the individual to adapt himself adequately to relatively new situations of life"—Pinter.

(4) "—Capacity to learn" Colvin; "—ability to learn actions or to perform new actions that are functionally useful"—Freeman.

পারে। অপরপক্ষে যাহার শরীরে স্নায়ুপথ সহজে তৈয়ারী হয় না এবং যাহার মধ্যে অনুষঙ্গগত বন্ধনগুলি সহজে সৃষ্টি হয় না, তাহাকেই নির্ব্বোধ বলা হয়। যাঁহারা এইভাবে বিচার করেন, তাঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি হইতেছে উৎকৃষ্ট স্নায়ুতন্ত্রের ফল মাত্র। স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, অন্ততঃ শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া 'বুদ্ধি' এবং "শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষমতা" প্রায় সমার্থবোধক।

বুদ্ধির এই দেহ তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা ছাড়া জীবতত্ত্বমূলক (biological), সমাজতত্ত্বমূলক এবং বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাও আছে।

পেটারসনের (Peterson) মতে বুদ্ধি হইতেছে "a biological mechamism by which the effects of a complexity of stimuli are brought together and given a somewhat unified effect in behaviour." (1921, symposium)।

থার্সটন (Thurstone) বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছে: (১) জন্মগত প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করা (২) দমিত প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া কল্পনাশক্তির প্রভাবে সেগুলিকে একটা ব্যবহারিক রূপ দেওয়া এবং (৩) সেই সুসংস্কৃত প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তির সুবিধা হয় (1921, symposium)। বলা বাহুল্য, থার্সটনের এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে থর্ণডাইকের (১) বিমূর্ত্ত বা সূক্ষ্ম (abstract) বুদ্ধি (২) সামাজিক বুদ্ধি এবং (৩) ব্যবহারিক বুদ্ধি— এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগের একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

Boynton তাঁহার 'Encyclopœdia of Educational Research'-এ 'বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরীক্ষা' নামক প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, বুদ্ধি হইতেছে মানুষের একটি জন্মগত শক্তি, যাহা দ্বারা সে নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনে তাহার জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে অথবা সেই পরিবেশের সংস্কার বা পুনর্গঠন করিতে পারে ("ability to adopt to and reconstruct the factors of his environment in accordance with the most fundamental needs of himself and his group": 1941)।

বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদের গহনতা উদ্ভিন্ন করিয়া একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এবং আন্তর্জ্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতসভা (Symposium) আহূত হয়। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং বুদ্ধি সম্পর্কে স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, ভাষাজ্ঞান, যুক্তিশৃঙ্খলা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রকারিতা, অনুভূতির তীব্রতা প্রভৃতি গুণগুলির কোন্‌টির প্রভাব কতখানি, তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। অথচ মজা এই যে, যাহার স্বরূপটি এখনও স্থির হইল না, তাহার পরিমাণ ও নিরিখ লইয়া বহু গবেষণা ও সিদ্ধান্তই পণ্ডিতেরা বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন এবং বুদ্ধির মাপকাঠির সন্ধান তাঁহারা যে অভ্রান্তভাবেই পাইয়াছেন, ইহাও যেন বর্ত্তমানে সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

কিভাবে ইহা সম্ভব হয়? কাহারও মতে একটি জিনিস মাপিতে হইলে তাহার স্বরূপটি যে জানিতেই হইবে এমন কথা কি আছে? আমরা বিদ্যুতের স্বরূপ জানি না, অথচ বিদ্যুতের 'ইউনিট্' মাপিয়া থাকি।

স্পীয়ারম্যান বলেন, এ যুক্তি ঠিক নহে, কারণ বৈদ্যুতিক শক্তির 'ইউনিট্' মাপিবার সময় জানার দরকার সারকিট্ (circuit)-এর মধ্যে কি কি আছে। বুদ্ধির সারকিটের মধ্যে স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা প্রভৃতি আছে কি? আরও প্রশ্ন আছে। বুদ্ধি কি একটি প্রধান কেন্দ্রীয় শক্তির লীলা? অথবা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির লীলা? অথবা পরস্পরনিরপেক্ষ অনেকগুলির শক্তির লীলা?

যে বৎসর বিণে (Binet) তাঁহার বিখ্যাত "মেট্রিক স্কেল" প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান যখন বুদ্ধির স্বরূপ ও নিরিখ লইয়া দীর্ঘ গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মনেও এই জাতীয় প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি দেখিলেন, বুদ্ধি সম্বন্ধে যত মতামত প্রচলিত আছে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) রাজতন্ত্রবাদ (monarchic doctrine)

(২) সামন্ততন্ত্রবাদ (oligarchic doctrine) (৩) অরাজকতাবাদ (anarchic doctrine)

রাজতন্ত্রবাদ ঃ এই মতে বুদ্ধি হইতেছে একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির লীলা। এই কেন্দ্রীয় শক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, ফলে যাহার এক বিষয়ে বুদ্ধি বা দক্ষতা আছে, সে অন্য বিষয়েও বুদ্ধি বা দক্ষতা দেখাইতে পারে। এই জাতীয় মতবাদের ফলেই ডাঃ জনসন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিউটনও মহাকাব্যের রচয়িতা হইতে পারিতেন, যদি তিনি তাঁহার প্রতিভাকে গণিতের দিক হইতে কাব্যের দিকে পরিচালিত করিতেন। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার ব্যাপারে যে গণিত, দর্শন বা সাহিত্যের দক্ষতা দেখিয়া লওয়া হয়, তাহার মূলেও এই জাতীয় একটা বিশ্বাস আছে। এই যে, যে-ব্যক্তি গণিত বা দর্শনে বুদ্ধি দেখাইতে পারিবে, সে রাজকার্য্য পরিচালনাতেও বুদ্ধি দেখাইতে পারিবে। স্টার্ণ, হার্ট, উড্রো, বার্ট, ব্যালার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জাতীয় মতবাদ পোষণ করেন। এই কেন্দ্রীয় শক্তিকে কেহ বা "General ability" কেহ বা "All round efficiency" কেহ বা "General efficiency" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সামন্ততন্ত্রবাদ ঃ এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির ফলমাত্র নহে, ইহা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির সম্মিলিত ফলমাত্র। বিণে, টারম্যান্, উড্ওয়ার্থ, মাক্সওয়েল্, গারনেট্ প্রভৃতি এই জাতীয় মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিণে বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছে: (১) উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা, (২) পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা এবং (৩) দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা। উড্ওয়ার্থ বলেন, বুদ্ধির মধ্যে সাতটি শক্তির প্রভাব আছে ; (১) অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবার শক্তি, (২) পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, (৩) শিক্ষার প্রয়োগ শক্তি, (৪) পরিবেশকে বুঝিবার শক্তি, (৫) অধ্যবসায়, (৬) সমস্যাকে আয়ত্ত করিবার শক্তি এবং (৭) অনুসন্ধিৎসা। গারনেট্ বলেন, বুদ্ধির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি (g factor) এবং আর একটি চতুরতা-রসিকতা (cleaverness)

জাতীয় শক্তি (c factor) আছে। গারনেটের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা পরে হইবে।

অতীত যুগের তথাকথিত faculty psychologyতে এই জাতীয় (oligarchic) মতবাদকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য অভিনিবেশ, স্মৃতি, বিচার শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সম্পর্ক নিরপেক্ষ শক্তির (faculty) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে মনের অখণ্ড একত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও, মনের কার্য্য বিচার করিতে হইলে এগুলিকে না মানিয়াও উপায় নাই। এই জন্যই স্পীয়ারম্যান বলিয়াছেন, এই facultyগুলি প্রত্যেক খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইলেও পরিণামে জয়ী হয়; এই মতবাদ মৃদু মলয়ের স্পর্শেই নতশির হইয়া পড়ে, অথচ প্রবলতম ঝটিকাও ইহাকে উৎখাত করিতে পারে না।

অরাজকতাবাদ ঃ এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির ফলে নহে, অথবা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির ফলও নহে, ইহা হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকগুলি অরাজক শক্তির লীলা। কোনও ব্যক্তি যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি দেখায়, তাহা হইলে সে যে অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই মতের পরিপোষক থর্ণডাইক বলেন, বুদ্ধি হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির ("a host of highly particularized and independent faculties") ফলমাত্র। জি, এইচ, টমসনও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে বুদ্ধি হইতেছে "মেণ্ডেলীয় এককের" (Mendelian unit ঃ 'বংশগতি ও উত্তরাধিকার' পঃ দ্রঃ) মত কতকগুলি পিতৃপুরুযাগত সহজাত বৈশিষ্ট্য, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং সেগুলি কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির (General Factor) ফলমাত্র নহে। তিনি বলেন, "If there be a 'General Factor' at all, it might be the Power to shake down rapidly into good team work."

স্পীয়ারম্যান-এর মতবাদ ঃ

বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যানএর মতবাদটি এই সমস্ত

মতবাদের সমন্বয়ধর্ম্মী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বুদ্ধিগত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা সাধারণ বা কেন্দ্রীয় শক্তির (g factor) লীলা আছে এবং এই সাধারণ শক্তিটি ছাড়া কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শক্তির ('s' factor) লীলাও আছে। এই কেন্দ্রীয় শক্তি বা 'g' factorটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে একই প্রকারে কাজ করিবে; কিন্তু 's' factor-গুলির মধ্যে পরস্পর কোনও প্রকার সম্পর্ক নাই। ফলে একটি বা দুইটি বিশেষ ব্যাপারে একজন যদি দক্ষতা দেখায়, তাহা হইলে অন্য বিষয়গুলিতেও যে সেই লোকটি দক্ষতা দেখাইতে পারিবে এমনও নিশ্চয়তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন ব্যক্তির কেন্দ্রীয় শক্তিটি (g factor) দুর্ব্বল, ইহার ফলে সে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও সে হয়ত ভাল তবলা বাজাইতে ও ছবি আঁকিতে পারে। এই ছবি আঁকা ও তবলা বাজান ব্যাপারটি তাহার বিশেষ শক্তি বা 's' factor-এর ফল। এই বিশেষ বিদ্যাটিতে সে দক্ষতা দেখাইয়াছে বলিয়াই তাহার সাধারণ বুদ্ধিও যে খুব ভাল হইবে, এমন কোনও কথা নাই; ফলে যে ব্যক্তি তবলার তাল-জ্ঞানে অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সেই হয়ত সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত কাব্য ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অতি সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও দিতে পারিবে না। স্পীয়ারম্যান-এর মতে মানুষের বুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতেছে এই 'g' factor এবং বহু 's' factor-এর সম্মিলিত ফল মাত্র।

স্পীয়ারম্যান যখন প্রথম এই মতবাদটি প্রচার করেন তখন অনেক মনস্তাত্ত্বিকই তাহার প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক গডফ্রে টমসন (Godfrey Thomson যিনি বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অরাজকতা মতবাদের পোষক) গণিত শাস্ত্রের জটিল আলোচনা মধ্য দিয়া প্রমাণ করেন যে, স্পীয়ারম্যানের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত। কিন্তু স্পীয়ারম্যান ইহার পর দীর্ঘ ২৫ বৎসরের গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি শুধু গণিত শাস্ত্রের নয় দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও সত্য।

তিনি বলেন, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক বা অনুবন্ধ

(correlation) আছে। ফলে a b p q-কে যদিও যথাক্রমে মানুষের বিপরীতার্থক শব্দ বুঝিবার ক্ষমতা (opposites), পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা (discrimination), শূন্যপদ পূরণের ক্ষমতা (completion) এবং অযৌক্তিক পদটি কাটিয়া দিবার ক্ষমতা (cancellation)—এই চারিটি মানসিক ক্ষমতা বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে

$rap \times rbq - raq \times rbp = 0$ এই সমীকরণটি পাওয়া যায়।

এই সমীকরণটি (tetrad equation) প্রমাণ করা কঠিন নহে। যদি ধরা হয় a এবং pর অনুবন্ধ হয় 0.80, b এবং qএর 0·09, a এবং qএর 0·30, আর b এবং pর 0·24, তাহা হইলে ঐ tetrad equationটির মান বসাইলে

$0{\cdot}80 \times 0{\cdot}09 - 0{\cdot}30 \times 0{\cdot}24 = 0$ এই সমীকরণটি সিদ্ধ হয়।

স্পীয়ারম্যান বলেন, মানুষের বিভিন্ন শক্তির এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক (correlation) ইহার কারণ হইতেছে এই যে, এই বিভিন্ন শক্তিগুলি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির (g factor) সহিত সম্পর্কিত।

এই কেন্দ্রীয় শক্তিটি কি? শরীরতত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত স্নায়ুতন্ত্রের সমৃদ্ধি; গ্রন্থিতত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত বিভিন্ন নিশ্ছিদ্র গ্রন্থির রসক্ষরণের সমতা; মনস্তত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত তথাকথিত সাধারণ বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি। বস্তুতঃ ইহা এমনই একটা শক্তি যাহা কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে মানুষের দক্ষতাকে সঞ্চারিত করিতে পারে, যাহার জন্য মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে সহজেই শিক্ষা-গ্রহণ ও দক্ষতা-অর্জ্জন করিতে পারে। ইহার সহিত স্মৃতিশক্তির তেমন কোনও সম্পর্ক নাই, তবে তথাকথিত যুক্তি, পরিচ্ছন্নতা (clearness) ক্ষিপ্রতা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির সহিত যেন একটা সম্পর্ক আছে।

এই কেন্দ্রীয় শক্তির (g factor) সহিত একটা বিশেষ শক্তির (s factor) অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট রকমের অনুপাত আছে এবং এই অনুপাত হইতে মানুষের অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার দক্ষতা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যাইতে পারে। স্পীয়ারম্যান বলেন, g factor-এর সহিত সংস্কৃত, ল্যাটিন্, গ্রীক্ প্রভৃতি ক্লাসিক্স্ ভাষার

দক্ষতার অনুপাতটি হইতেছে ১৫র সহিত ১এর অনুপাতের সমান, অপর পক্ষে g factor-এর সহিত সঙ্গীতের অনুপাতটি হইতেছে ১এর সহিত ৪এর সমান। এই অনুপাতটি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা চলে যে, যে-ব্যক্তি ক্লাসিক্স্-এ ভাল, সে অন্যান্য বিষয়েও খানিকটা ভাল হইবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সঙ্গীতে ভাল, সে কেন্দ্রীয় শক্তির (g factor) সমৃদ্ধির জন্য অন্যান্য বিষয়েও যে ভাল এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। কারণ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে "s factor"-টিই বলত্তর এবং এই "s factor" বুদ্ধির অন্যান্য দিকের প্রতি কোনও ইঙ্গিতই করিতে পারে না।

এই কেন্দ্রীয় অধিরাজ শক্তির সহিত বিশেষ বিশেষ শক্তির (s factor) অথবা বিশেষ শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ? স্পীয়ারম্যান বলেন, কেন্দ্রীয় অধিরাজশক্তিটি হইতেছে যেন একটি মূল উৎস এবং ইহা হইতে বিভিন্ন স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া বিভিন্ন মানসিক শক্তিকে (s factor) সমৃদ্ধ করিতেছে। ফলে এই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যেও একটা জ্ঞাতিত্বের সম্পর্কের মত পারস্পরিক অনুবন্ধ থাকে। অপর পক্ষে থর্ণডাইকের মতে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিই (s factor) হইতেছে বুদ্ধির মূলতত্ত্ব, ইহাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বা ভ্রাতৃত্বের কোনও বন্ধন নাই। তবে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে লক্ষ্য করিলে যেমন কয়েকটি সাধারণ গুণণীয়ক পাওয়া যায়, তেমনই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাত্রা অনুসারেই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ নির্ণীত হয়।

স্পীয়ারম্যান-এর বুদ্ধি সম্বন্ধে মতবাদটিকে সাধারণতঃ "দুইটি গুণণীয়ক মতবাদ" (two factor theory) বলা হয়। এই মতবাদটি বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ধর্মী। স্পীয়ারম্যান নিজেও তাঁহার মতবাদকে electic বা সমস্ত মতবাদের সংগ্রহমূলক মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিমতটি নিরর্থক নয়। কারণ রাজতন্ত্রবাদ হিসাবে তিনি বুদ্ধির অধিরাজ একটি কেন্দ্রীয় শক্তিকে (g factor) স্বীকার করিয়াছেন, সামন্ততন্ত্রবাদ হিসাবে বিভিন্ন

মানসিক শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং অরাজকতাবাদ হিসাবে পরস্পর নিরপেক্ষ s factorকেও স্বীকার করিয়াছেন।

অন্যান্য মতবাদ ঃ

ডাঃ ওয়েব বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্পীয়ারম্যান-এর 'g' factor, 's' factor প্রভৃতি ছাড়া আর একটি factor-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যবসায় (persistence of motive)। বুদ্ধি সম্বন্ধে কাহার সম্ভাবনা কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ক্ষমতা জানিবার প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক যে প্রতিভা শুধু "চমকে ঝলকে" ফুটিয়া উঠে, ক্ষণিকের আলোকে দেখা দেয়, পলকে মিলাইয়া যায় এবং নিজের পূর্ণ পরিচয় না দিয়াই "চকিত নূপুরে" চলিয়া যায়, তাহাকে দিয়া বিশেষ কোনও কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনার সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না। এইজন্যই কাহারও বুদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে হইলে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের শক্তির কথাগুলি চিন্তা করা উচিত। এইজন্যই অনেক পণ্ডিত অধ্যবসায়কেই প্রতিভার মুলতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। হোগার্থ বলিয়াছেন, "I know no such thing as genius—genius is nothing but labour and deligence." প্রতিভার মধ্যে যে একটা অলৌকিক শক্তি আছে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাকে দৈব প্রেরণার প্রভাব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দৈব প্রেরণাকে বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় এবং যাইলেও সেই প্রেরণাকে সফল করিবার জন্যও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে। এইজন্য বারট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, "Genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration". এক্ষেত্রেও অধ্যবসায়েরই জয়গান করা হইয়াছে।

ম্যাক্সওয়েল গারনেট বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 'g' factor ছাড়া আর একটি factorএর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে 'c' factor; মানুষের রসিকতা ও রসবোধ, মৌলিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি এই 'c' factorএর পর্য্যায়ে পড়ে। তিনি বলেন, বুদ্ধি জিনিসটি শুধু অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তি বা 'g' factorএর ফলও নহে, আবার নিছক 'c' factorএর ফলও

নহে; ইহা হইতেছে এই দুইটি শক্তির সম্মিলিত ফল। তিনি বলেন, "It is probably that genius, as the word is commonly understood, is more directly measured by $E=\sqrt{g^2c^2}$ than by g (measuring General Ability or capacity to concentrate attention) alone, or even by c (measuring cleaverness as we have defined it, or tendency to associate by similarity) alone."

ডাঃ ওয়েব-এর আবিষ্কৃত 'w' factor এবং গারনেট-এর 'c' factor এই দুইটির আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের প্রতিভার স্বরূপ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অভ্রান্তভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। যিনি বাস্তবিক প্রতিভাশালী তাঁহার 'g' এবং 'c' দুইটি factorই থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই দুইটির সহিত 'w' factor যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভা শুধু "চমক ঝলকে"ই প্রকাশিত হইবে এবং তাহা দ্বারা কোনও একটানা পরিশ্রম বা চিরায়িত আবিষ্কারের কাজ হইবে না।

আবার যে ব্যক্তির উৎকৃষ্ট 'w' আছে, কিন্তু 'g' বা 'c' ভাল নাই, তিনি শুধু অধ্যবসায়ের জোরেই অনেকখানি কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কাজের মধ্যে মৌলিকতা বা স্থষ্টির নূতনত্ব থাকিবে না। অপরপক্ষে, কোনও ব্যক্তির যদি 'w' এবং 'g' ভাল হয়, কিন্তু 'c'টি ভাল মাত্রায় না থাকে, তাহা হইলে তিনি অধ্যবসায়ী পণ্ডিত বা গবেষক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লেখা বা কথা-বার্ত্তার মধ্যে রসিকতার দ্যুতি থাকিবে না, কাব্যের সরসতা বা ভাবের ব্যঞ্জনা থাকিবে না। তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক রচনায় কৃতকার্য্য হইবেন, কিন্তু যাঁহাদের Romantic (সাহিত্য সমালোচনার ভাষায়) শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলা হয়, তাঁহাদের মত ঐতিহাসিক উপাদানের শুষ্ক কঙ্কালের উপর কল্পনার রক্তমাংস সংযোজন করিয়া প্রাণের স্পন্দন স্থষ্টি করিতে পারিবেন না, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জিনস্ (Jeans) প্রভৃতির মত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিকে উপন্যাসের মত সরস করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। অবশ্য ঐতিহাসিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপস্থাপনে কাব্য অলঙ্কারের খাদ মিশাইয়া বিষয়টিকে চমৎকার করিয়া তোলা আদৌ উচিত কিনা, এ প্রশ্নও উঠিতে পারে। তবে সে প্রশ্নের বিচার উপস্থিত অবান্তর।

উপসংহার : বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিলে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। মনীষী ব্যালার্ডের কথায় বলা যায়, এই সমস্ত আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধী মতবাদের মূলে খানিকটা করিয়া একদেশ-দর্শিতা আছে। বুদ্ধির এক একটি দিকের প্রতি এক একজন পণ্ডিত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই এই সমস্ত বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সমস্ত মতবাদের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বুদ্ধি হইতেছে এমন একটি মানসিক শক্তি, যাহা (১) অসংখ্য রূপে অভিব্যক্ত হয়, (২) স্থূল বিষয়ের চেয়ে সূক্ষ্ম, উচ্চ ও বিমূর্ত্ত (abstract) বিষয়ক চিন্তার মধ্যেই যাহার পরিচয় অধিকতর ভাবে পাওয়া যায়, (৩) যাহা মানুষকে নূতন নূতন পরিবেশ ও নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে সাহায্য করে, (৪) তত্ত্বানুসন্ধানে বা উপায় উদ্ভাবনে যাহার ক্ষমতা আছে এবং (৫) জ্ঞানের আহরণের চেয়ে জ্ঞানলব্ধ তত্ত্বগুলিকে বিন্যাস বিশ্লেষণ উপস্থাপন গ্রন্থন প্রভৃতির মধ্যেই যাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যালার্ডের সিদ্ধান্ত সমীচীন। তিনি বলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহাশূন্যের মধ্যে বুদ্ধিরও কোনও নিরিখই নির্ণীত হয় না। শুধু তাই নয়, জ্ঞানকে যে যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারে, সাধারণতঃ তাহাকেই তত বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা হয়।

ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রকারিতার সম্পর্ক অনস্বীকার্য্য হইলেও এ কথাটিও না মানিয়া উপায় নাই যে, অভ্যাসগত দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সমাধানের ক্ষিপ্রতাকে বাড়াইয়া দেয়। ইহা ছাড়া শরীর বা মনের অবস্থা, আগ্রহ প্রভৃতিও আমাদের ক্ষিপ্রতাকে প্রভাবান্বিত করে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নূতন নূতন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা, নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার ও তাহাদের সার্থক ভাবে সমাধান করিবার ক্ষমতার মধ্যেও যে বুদ্ধির কাজ আছে, তাহাও প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বুদ্ধি প্রসঙ্গে cleverness প্রভৃতি গুণগুলিকেও বাদ দেওয়া চলে না। তাহা হইলে বুদ্ধির স্বরূপটি কি ? কোন্ সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে বুঝা যাইবে ?

আমাদের মনে হয়, কোনও সংকীর্ণ সংজ্ঞার গণ্ডীর মধ্যে বুদ্ধির স্বরূপটি বুঝা যাইবে না, ইহার জন্য একটা ব্যাপক সংজ্ঞার প্রয়োজন হইবে। "অভিজ্ঞতার সহিত কারবার করিবার উপযুক্ত একটা সার্ব্বভৌম মানসিক-শক্তি"—এই জাতীয় একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিলে হয়ত বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করিতে পারা যায়।

ইংরাজ মনস্তাত্ত্বিকগণ বুদ্ধির ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধির কোন সংজ্ঞা দিতে স্বীকৃত হন নাই, এমন কি তাঁহারা 'বুদ্ধি' এই কথাটিই ব্যবহার করিতে চাহেন না। এই জন্য বার্ট (Burt) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়াছেন "একটি সহজাত মানসিক ক্ষমতা" (an inborn mental efficiency) এবং ব্যালার্ড বলিয়াছেন, বুদ্ধি হইতেছে (একই প্রকার জ্ঞানের সমৃদ্ধি, আগ্রহ ও অভ্যাসগত ক্ষিপ্রকারিতার ক্ষেত্রে) একটা আপেক্ষিক সার্ব্বভৌম মানস-দক্ষতা (Intelligence is the relative general efficiency of minds measured under similar conditions of knowledge, interest and habitation)। শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধি সম্বন্ধে এইটুকু জানিলেই চলিবে।

জড়বুদ্ধি বালক ও তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

উত্তররাম চরিতে আত্রেয়ী বলিয়াছিলেন ঃ

"বিতরতি গুরুপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়ো র্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহরন্তি বা।
ভবতি পুনর্ভুয়ান ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্ তথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ ॥"

বাস্তবিকই গুরু সুমেধা দুর্মেধা নির্ব্বিশেষে সকলকে শিক্ষা দেন ; কিন্তু সে শিক্ষা সর্ব্বত্র ফলবতী হয় না। কাজেই শিক্ষককে পড়াইবার সময় নিজের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যেমন জ্ঞানবান হইতে হয়, তেমনই ছাত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধেও অবহিত থাকিতে হয়। কারণ, ছাত্রের শিক্ষা-গ্রহণের শক্তি কতটুকু তাহা জানা না থাকিলে অনেক প্রচেষ্টাই ব্যর্থশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। যেহেতু "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ"—হাজার চেষ্টা করিয়াও বককে শুকপক্ষীর মত পাঠ শিখান যায় না। এই জন্য ছাত্রদের চিনিবার জন্য তাহাদের বুদ্ধির দৌড় কাহার কতটা, সে সম্বন্ধে একটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে বিণে, টারম্যান্, ব্যালার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মানুষের বুদ্ধির একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বয়সের অনুপাতে বুদ্ধির 'মান' 'মনোবয়স' প্রভৃতিও বাহির করিয়াছেন। এই সমস্ত মাপকের দ্বারা বুঝা যায়, কে প্রতিভাশালী, কে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কে বা 'জড়বুদ্ধি'।

জড়বুদ্ধি বলিতে মোটামুটি তাহাদেরই বুঝায় যাহারা বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে বাল্যে বা যৌবনে কোনও সময়েই নিজের শক্তিতে নিজে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

যাহাকে মনোবিজ্ঞানে 'মনস্বিতাংশ' (I. Q.) বলা হয়, তাহার বিচারে এই জড়বুদ্ধিদের শ্রেণীভেদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে করা হয়। ইহার সার্ব্বজনীন নিরিখ নাই বলিয়াই সাধারণতঃ তাহাদিগকে আমরা জড়বুদ্ধি বলি, যাহারা বিদ্যালয়ের সর্ব্বজনপ্রচলিত পঠন-পাঠনের মধ্য হইতে কিছুই

শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না এবং যাহারা বিনা সাহায্যে জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেও পারে না। ইংলণ্ডে জড়বুদ্ধিদের আইনতঃ সংজ্ঞা হইতেছে (১৯২৭) এইরূপ: "Mental defectiveness means a condition of arrested or incomplete development of mind existing before the age of eighteen years, whether arising from inherent causes induced by desease or injury."

এখন প্রশ্ন—সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা কত জন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। কারণ, 'মনস্বিতাংশ' ৫০ ধরিলে যত জন জড়বুদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবে, মনস্বিতাংশ ৭০ ধরিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক জড়বুদ্ধির পর্য্যায়ে পড়িবে। তাহা হইলেও একটা মোটামুটি ধারণা করা কঠিন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় পনর লক্ষের উপর লোককে বুদ্ধিমাপের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহাদের বিভিন্ন ভাবে 'Alpha' এবং 'Beta intelligence test' করিয়া দেখা গিয়াছিল, শতকরা ০·৫ লোককে একেবারে কাজের অনুপযুক্ত বোধে বাদ দিতে হইয়াছিল এবং ০·৬ জনকে নির্বুদ্ধিতার জন্য কুলির কাজ দিতে হইয়াছিল।

জড়বুদ্ধি বালক বালিকাদের মধ্যে যাহারা বয়সে দশ বৎসরেরও কম, তাহাদের মৃত্যুর হার সাধারণ ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী। কাজেই একটি বিশিষ্ট দেশে কতগুলি করিয়া জড়বুদ্ধি বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হঠাৎ বলিয়া ফেলা সহজ নহে। Haggerty এবং Nash ৬৬৮৮ জন ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জড়বুদ্ধি ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ১·১৫ (যাহাদের মনস্বিতাংশ ৬০এর কম) এবং যে সমস্ত ছাত্রদের মনস্বিতাংশ ৬০ হইতে ৭০-এর মধ্যে, সেই সমস্ত ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৫·১; আমেরিকার 'National Commitee for Mental Hygiene' ৫২৫২৪ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; শতকরা ২·২ জন হইতেছে জড়বুদ্ধি এবং শতকরা ৩·৭ জন জড়ত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সীমারেখায়। মোটামুটি এই নিরিখটিকে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, কি বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য এ দেশে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই।

এই জড়বুদ্ধিদের মনস্বিতাংশের মাপ ছাড়া অন্য কোনও ভাবে চিনিবার উপায় কি ? উত্তরে বলা যাইতে পারে "মোটামুটি আছে" ; ইহাদের চেহারার মধ্যেই একটা জড়ত্বের ছাপ মাখান থাকে। জড়বুদ্ধিদের সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। একদল জড়বুদ্ধির লোক আছে, তাহাদের দেখিতে অনেকটা মঙ্গোলিয়ানদের মত ; বাদামের মত চোখ, চোখের কোণের দিকটিতে ডবল খাঁজ, ছোট মাথা, কুৎসিৎ কাণ, ছোট ছোট আঙ্গুল, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটি ভিতরের দিকে বাঁকা ইত্যাদি ; ইহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলিয়ন আকৃতি পাইতে থাকে, মাতাপিতার মুখাবয়বের সহিত ইহাদের যেন সম্পর্ক নাই, একসঙ্গে ইহাদের রাখিলে পরস্পরকে পরস্পরের ভাই বলিয়া মনে হয়।



Mongolian idiot

বড় পরিবারে বৃদ্ধা মাতার গর্ভে অনেক সময় এই জাতীয় মূর্খদের জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। তথাপি গর্ভদোষে যে জড়বুদ্ধিদের উদ্ভব এ কথাও বিশেষ জোর করিয়া বলা যায় না। মাতার বার্দ্ধক্য পুত্রের জড়ত্বের হয়ত একটা পরিপোষক কারণ, এমনও দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চদশ বর্ষীয়া মাতার গর্ভেও জড়বুদ্ধিযুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে মাতার বার্দ্ধক্যের সহিত সন্তানের জড়ত্বের একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে।

মঙ্গোলিয়ান নির্ব্বোধদের মনোবয়স কখনও সাতের বেশী হয় না ; অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সের শিশুর চেয়ে বুদ্ধিমান্ ইহারা কোনও বয়সেই হইতে পারে না। ইহারা সাধারণতঃ ভাল মানুষ ; ছট্‌ফটে ও আমোদপ্রিয় হয়, জটিল অঙ্গভঙ্গী করিতে ইহারা সহজে পারে না এবং সাধারণতঃ কুড়ি বৎসরের মধ্যেই মারা যায়।

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি লোক হয়—তাহাদিগকে অল্পমস্তিষ্ক (micro-

cephalic) বলা যাইতে পারে। ইহাদের মাথার উপরের দিকটা অত্যন্ত ছোট হয়। ইহারাও চঞ্চল, আমুদে এবং অনুকরণপ্রিয় হয়; কোনও কাজই ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে পারে না।



Microcephalic idiot

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে Cretin বলা হয়। থাইরয়েড (thyroid) গ্লাণ্ড-এর অপর্য্যাপ্ত রসক্ষরণের জন্য এই জাতীয় জড়তা দৃষ্ট হয়। ইহাদের লক্ষণ হইতেছে, বড় মাথা, ছোট পা, থাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট, ঝোলা জিভ, শুষ্ক এবং কুঞ্চিত চামড়া। যেন তাহাদের অপরিণত বৃদ্ধির অনুপাতে চামড়ার মাপ একটু বড়। জন্মের সময় ইহাদের সাধারণ বালকের মতই মনে হয়, ছয় মাস বয়সের পর হইতে ইহাদের মধ্যে জড়ত্বের লক্ষণগুলি ফুটিতে থাকে। ইহারা অলস প্রকৃতির, সহজে হাসিতে চায় না, বসিতে ও দাঁড়াইতে শিখিতে দেরী করে, হয়ত চার বৎসর বয়সে দাঁড়াইতে শিখে এবং ছয় সাত বৎসর বয়সে কথা কহিতে সমর্থ হয়। ইহাদের যৌবনও খুব দেরীতে আসে, কেহ কেহ চিরদিনই 'বন্ধ্যা' থাকে।



Cretin

এই তিন জাতীয় নির্ব্বোধ ছাড়া আর এক জাতীয় নির্ব্বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা একটু অন্য প্রকৃতির; ইহাদিগকে বোকা পণ্ডিত (idiots savants) বলা যাইতে পারে। ইহারা অন্যান্য সব বিষয়ে সাধারণ জড়বুদ্ধিদেরই মত, কিন্তু কেহ হয়ত ভাল ছবি আঁকিতে পারে, কেহ হয়ত ভাল বাজনা বাজাইতে পারে, সন তারিখ মনে রাখিতে পারে, ইত্যাদি।

এই সমস্ত জড়বুদ্ধিরা সকলেই জন্ম হইতেই জড়ত্ব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, যাহারা অসুখ, অপালন, আকস্মিক আঘাত প্রভৃতির জন্য সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত। জন্মের পর বাহিরের ঘটনাই অনেক সময় এ জন্য দায়ী। উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি পাইলে ইহাদের মধ্যে অনেকেই জড়ত্বকে কাটাইয়া উঠিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান অথবা মনোবিজ্ঞান এই জড়বুদ্ধিতার কারণ বাহির করিতে পারিয়াছে কি? এই জড়ত্বের জন্য দায়ী কে? প্রজনন বা উত্তরাধিকার? না বাহিরের পরিবেশ?—স্বাস্থ্যহীনতা না অশিক্ষা? দারিদ্র্য? না, মাতাপিতার বীজপঙ্কের দোষ? অন্ধ নিয়তি, না মাতার গর্ভাবস্থায় মানসিক (complex) গূঢ়ৈষা?

ক্লার্ক (Clark) সাহেবের অভিমতে, আমাদের মনে প্রবৃত্তির দমন ও রোধনজনিত গূঢ়ৈষার মধ্য হইতেই জড়মতিত্বের সূচনা হয়। সুতরাং উপযুক্তভাবে মনোবিকলন প্রভৃতির সাহায্যে জড়মতিত্বের সংস্কার করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সত্যিকারের কোনও জড়বুদ্ধিযুক্ত লোকের মনোবিকলনের দ্বারা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

অনেকে বলেন যে, এই জড়মতিত্ব যেহেতু আমাদের জন্ম হইতেই আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, অতএব এই জড়মতিত্বের সহিত মাতা-পিতার বীজপঙ্কের একটা সম্পর্ক আছে। 'গর্ভের দোষে রাবণ রাক্ষস' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। এ কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের একটা গূঢ় ইঙ্গিত আছে। সন্তান যখন গর্ভস্থ থাকে তখন অনেক কারণেই তাহার মধ্যে জড়ত্ব আসিতে পারে। এমনও দেখা গিয়াছে—জরায়ুর উপর অতিমাত্রায় এক্সরে (X-Ray) কিরণ-সম্পাতে অনেক সময় জাতকের অল্পমস্তিষ্কতাজনিত (micro-cephaly) জড়মতিত্ব আসে। গর্ভাবস্থায় মাতার অপরিপুষ্টি, ভিটামিনের অভাব, সিফিলিস্ প্রভৃতিও অনেক সময় জাতকের মধ্যে জড়মতিত্বের সঞ্চার করে।

অপরাধপ্রবণতা ও প্রজনন লইয়া Kallikak ও Juke বংশের বংশধারার আলোচনা অনেক হইয়াছে এবং বংশের মধ্যে একজনের অপরাধপ্রবণতা থাকিলে তাহা বংশানুক্রমে ধারা বহিয়া চলিতে থাকিবে—এই জাতীয়

কথার যতটা সত্য আছে তাহার চেয়েও বোধহয় বেশীভাবেই প্রচার হইয়া আসিয়াছে। জড়মতিত্ব লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষা এখনও তেমন ব্যাপকভাবে হয় নাই। ইহার সুবিধাও তেমন নাই। ইঁদুর গিনিপিগ্ প্রভৃতিকে লইয়া ১৮।২০ পুরুষ পরীক্ষা করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে এই জাতীয় পরীক্ষা আরম্ভ হইলেও সিদ্ধান্তে আসিতে অনেকদিন কাটিয়া যাইবে।

শরীর-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখা যায়, বেশীর ভাগ জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকই অপরিপুষ্টাঙ্গ; কিন্তু এই অপরিপুষ্টতার সহিত রক্তের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। মস্তিষ্ক-তত্ত্ব অথবা সাধারণ গঠনের দিক দিয়া সাধারণ বালক এবং জড়বুদ্ধি বালকের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জড়বুদ্ধি বালকদের মস্তিষ্কের কোষের সংস্থান ও neuronএর গঠনভঙ্গীর মধ্যে অনেকটা এলোমেলো ভাব বিদ্যমান।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী মনোযোগে অসমর্থ, কল্পনা-শক্তি তাহাদের কম, বিচার বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতা, মৌলিকত্ব প্রভৃতি নাই বলিলেই চলে। জন্তু ও ইতর-প্রাণীদের মতই ইহারা প্রায় অনুভূতির স্তরেই অবস্থান করে; অনুভূতি হইতে বিচার এবং বিচার হইতে সিদ্ধান্ত ইহারা সহজে করিতে পারে না—অন্তদৃ ষ্টি ইহাদের কোনও সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিত দেয় না। অভিভাবনের (suggestion) প্রভাব সাধারণ বালকদের মধ্যে ততটা শক্তিশালী হয় না, যতটা হয় এই জড়বুদ্ধিদের উপর। ফলে দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে ভাঙ্গাইয়া নানাভাবে নাচাইতে পারে অথবা নানা প্রকার অকাজ-কুকাজ করাইতে পারে যাহা একজন বুদ্ধিমান বালককে দিয়া করানো হঠাৎ সম্ভব নয়। "তোর কাণটা কাকে নিয়ে গেলো" বলিলে বুদ্ধিমান বালক নিশ্চয়ই কাকের পিছনে পিছনে ছুটিবে না, কিন্তু জড়বুদ্ধি বালক হয়ত তাহা করিতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তি ও আগ্রহের দিক দিয়াও এই জড়বুদ্ধি বালকেরা একটু খাটো, যৌন-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অনেক সময় ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্যানরোজ (Panrose) বলেন, সাধারণ নির্ব্বোধদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটামুটি

সাধারণভাবে থাকিলেও, পূর্ণ জড়বুদ্ধি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটেই থাকে না। তাহারা যে সন্তান উৎপাদন করিয়া পৃথিবীতে জড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা যেন প্রকৃতিরও অভিপ্রেত নয়। এই জন্যই কি মনস্বিতাংশের তীব্রতার সহিত যৌন প্রকৃতিরও একটা সমানুপাত তীব্রতা দৃষ্ট হয়।

মোটের উপর, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, মস্তিষ্ক-তত্ত্ব, প্রজনন-তত্ত্ব প্রভৃতি কোনও তত্ত্ব দিয়াই এমন কোনও কারণের সন্ধান মিলিল না যাহাতে জড়বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের সৃষ্টি বন্ধ করা সম্ভব অথবা তাহাদের দিয়া সাধারণ বালকদিগের মত কাজকর্ম্ম করাইয়া লওয়া চলে। তাহা হইলে কি এই জড়ত্ব বিধাতার অভিশাপের মত অনিবার্য্য অতর্কিতভাবেই আপতিত হইয়া থাকে? ইহার কোনও প্রতিকার নাই? দেখা যায়, জড়বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্বাভাবিকভাবে জন্ম হইতেই জড় হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে জড়ত্বের কারণ দুর্জ্ঞেয় অথবা অজ্ঞেয়, বাকী ২৫ জনের ক্ষেত্রে অসুখ, অচিকিৎসা, অপুষ্টি, আঘাত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে এই ২৫ জনের জড়ত্বের সম্ভাবনা আমরা কমাইতে পারি, আর বাকী ৭৫ জনের জন্য আমাদের অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহৃদয় রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা তাহাদের জীবনের দুঃখকে আমরা খানিকটা প্রশমিত করিতে পারি। তাহাদের নিকট হইতে আশা করিবার কিছুই নাই, তবে যে সব কার্য্যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না—এইরূপ অল্প পরিশ্রম-সাধ্য এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কার্য্যাদি দিয়া তাহাদের খানিকটা কাজে লাগানও যাইতে পারে।

প্রতিভা রহস্য ও প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা

আমরা ইতোপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, যাহাদের 'সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত' মানুষ বলা হয়, তাহাদের মনস্বিতাংশ হইতেছে ৯০ হইতে ১১০; ইহার পর ১১০ হইতে ১২০ মনস্বিতাংশযুক্ত লোককে বুদ্ধিমানের পর্য্যায়ে ফেলা যায়; ১২০ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশযুক্ত মানুষকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ১৪০এর অধিক মনস্বিতাংশবিশিষ্ট লোককে প্রতিভাশালী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে প্রতিভার এই নিম্নতম সীমারেখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

আমরা যদি ১৩০ মনস্বিতাংশকে প্রতিভার নিম্নতম সীমারেখা বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ১০ জন বা প্রতি শতে একজন করিয়া প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাইব; মনস্বিতাংশের সীমারেখাটি ১৪০ ধরিলে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ৪-৫ জন প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই সীমারেখাটি নিম্নতম মান ১৫০ ধরিলে প্রতি ১০০০এর মধ্যে ২-৩ জনের চেয়েও কম প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সীমারেখাটি আর একটু উপরের দিকে সরাইয়া দিয়া যদি আমরা ১৬০ মনস্বিতাংশকে নিম্নতম স্তর বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে যে কোনও সমাজেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি সহস্রে একজনেরও কম হইবে।

প্রতিভার উৎস

গ্যালটন্ সাহেব (১৮৬৯) এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'প্রতিভা' হইতেছে বংশগতির (heredity) প্রভাবের ফল মাত্র। কন্‌ডোল (condoie) নামক সুইস্ পণ্ডিত বলেন যে, ইহা বংশগতির ফল নহে; সমাজ ও পরিবেশ প্রতিভা সৃষ্টি করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

প্রতিভা সম্বন্ধে হ্যাভেলক এলিসও গবেষণা করিয়া (১৯০৪) দেখিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তিই উদ্ভূত হন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের বংশ হইতে। ক্যাটেলও

অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন। হ্যাভেলক এলিস দেখাইয়াছিলেন যে, এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই মাতা-পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইহাদের জন্ম-সময়ে মাতা-পিতার বয়সের গড় হয় ৩৭ বৎসর। তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল, নারীর চেয়ে পুরুষদিগের মধ্যেই প্রতিভার স্ফুরণ সমধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু হেলিঙ্গওয়ার্থ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সকল দেশেই সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের চেয়ে নারীকে সুযোগ-সুবিধা কম দিয়াছে বলিয়াই নারী তাহার প্রতিভার পরিচয় তেমন দিতে পারে নাই।

ফ্রয়েড বলেন, মানুষের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে একটা কাম-শক্তির প্রেরণা। এই কাম-শক্তির স্রোত যখন প্রতিহত হইয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়, তখনই প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই প্রতিভার সহিত আদিম কাম-শক্তির একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে।

প্রতিভা সম্বন্ধে অ্যাড্‌লারের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলেন—শৈশবে জন্ম বা পরিবেশগত হীনমন্যতা (inferiority feeling) এবং পরে তাহার ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই প্রতিভার স্ফুরণ হয়। বিঠোভেনের সঙ্গীত-প্রতিভার মূলে তাঁহার শৈশবের বধিরতা সম্বন্ধে হীনমন্যতা বোধ এবং পরে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা; ডিমস্থিনিসের বাগ্মিতার মূলে ছিল তাঁহার তোৎলামি ও সেই ত্রুটীটি জয় করিবার চেষ্টা ইত্যাদি। হয়ত জুলিয়াস সীজার বা নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভার মূলেও ছিল তাঁহাদের শারীরিক ত্রুটী সম্বন্ধে তুচ্ছতার অনুভূতি। এর কারণ বোধহয় শৈশবের দারিদ্র্য, পিতৃবিয়োগ প্রভৃতি অনেক সময় প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠালাভের প্রেরণা দান করে। স্যার গুরুদাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি আদরের দুলাল হইয়া মানুষ হইলে হয়ত নিজেদের প্রতিভাকে অনুরূপভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

প্রতিভার শ্রেণী বিভাগ

"বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা" পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি প্রতিভার মধ্যে দুইটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) অনন্যসাধারণ 'সাধারণ বুদ্ধি' (general intelligence) এবং (২) বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা

(special abilities)। তবে এই শ্রেণীবিভাগ দুইটি অন্য-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নির্জ্জলা বিশুদ্ধির মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে-বালকের তীব্র সাধারণ বুদ্ধি আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও তাহার দক্ষতার উদাহরণ বিরল নহে। তবে এক-আধটি বিশেষ ব্যাপারে যাহার দক্ষতা আছে, সে যে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। তীব্র সাধারণ বুদ্ধি যেভাবে সমগ্র জীবনকে প্রভাবান্বিত করে, একটা বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা সেভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। এই হেতু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকেই সজীব করিয়াছে। ইহাই হইতেছে প্রতিভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

প্রতিভাশালীদের চিনিয়া লইবার উপায়

নানাভাবে এই কাজটি করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রতিভাশালী বালকদিগের সম্বন্ধে সাধারণ লোকদিগের বর্ণনা পাঠ করিয়া, (২) প্রতিভাশালী একটি বিশিষ্ট বালক বা বালকগোষ্ঠীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানসম্মত গবেষণার বর্ণনা পাঠ করিয়া, (৩) বড় বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জীবনেতিহাস আলোচনা এবং (৪) বুদ্ধিমাপক ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানগত পরিসংখ্যা সংগ্রহ করিয়া।

প্রথম উপায়ে তেমন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন" গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়, ভৃত্য রাইচরণ অনুকূলের পুত্র খোকাবাবুকে ভালবাসিত বলিয়াই তাহার সব-কিছু কাজের মধ্যেই একটা লোকোত্তর প্রতিভার সন্ধান পাইত এবং তাহার ভবিষ্যতে "জজ পদপ্রাপ্তি" সম্বন্ধে একটা অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিত। এই জাতীয় বিশ্বাস প্রীতি-বিদ্বেষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যাঁহারা মনোবিদ্ নহেন, এমন সমস্ত সাধারণ লোকদিগের বর্ণনার উপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয় প্রণালীটিও খুব নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ যে বালকটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হইল তাহা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাপার হইতে পারে। একজনের পক্ষে যাহা সত্য, অপরের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। তৃতীয় প্রণালীর মধ্যেও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কাজেই চতুর্থ প্রণালীটিকে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা চলে। তবে এই চতুর্থ প্রণালীটি ছাড়া অন্যান্য প্রণালীগুলিও প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে কিছু-কিছু সাহায্য করে। তাহারা পরস্পর পরিপূরক এবং ইহাদের সকলের সম্মিলিত অবদানে প্রতিভা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিভা সম্বন্ধে আরও অনেকপ্রকার প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যেমন প্রতিভাশালী বালকদিগের সহিত সাধারণ বালকের পার্থক্য কি? প্রতিভাশালী বালকেরা কি সকলেই দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাবয়ব? সকলেই কি অসামাজিক? তাহাদের মধ্যে কি একটা পাগ্‌লামীর ভাব আছে?

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা

প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের মতামত, এবং বুদ্ধি, গণমাপক (Group test), বি:ণ টেষ্ট্ প্রভৃতির দ্বারা ২ হইতে ১১ বৎসরের ১৪০ জন মনস্বিতাংশযুক্ত বালক বালিকা বাছাই করিয়া লইয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি গবেষণা করিয়া দেখা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৩৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৮—১৯ বৎসরের ছাত্র লইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে নানা জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ছোট ছেলেগুলিকে বাছাই করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইয়াছিল, যথা—

(১) দুই জাতীয় বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা (Standford Binet Test and National B Test)। (২) দুই ঘণ্টা ব্যাপী অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (The Standford achievement test)। (৩) ৫০ মিনিট ব্যাপী সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। (৪) ৫০ মিনিট ব্যাপী খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহের সম্বন্ধে পরীক্ষা। (৫) বালকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ জানিবার জন্য ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী অনুক্তস্থান পূরণের পরীক্ষা। (৬) দুই মাসের পাঠের সফলতার রেকর্ড। (৭) বালকের পারিবারিক জীবনের ২৫টি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রশ্ন (অভিভাবকেরা ইহার উত্তর লিখিবেন)। (৮) ঐ ২৫ বিষয়েই শিক্ষকদিগের মন্তব্য সম্বন্ধে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্ন (শিক্ষকগণ উত্তর লিখিবেন)। (৯) পারিবারিক স্তরের মান নির্ণয়।

প্রতিভা সম্বন্ধে পরীক্ষায় আবিষ্কৃত তথ্য

এই বিপুল আয়োজনমূলক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, প্রতিভাশালী বালকদিগের ⅓ অংশ আসিয়াছে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীয়া ও ব্যবসাদার শ্রেণী হইতে এবং ৭%-এরও কম আসিয়াছে মজুরশ্রেণী হইতে। দেখা গিয়াছে, এই সমস্ত বালকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে বড় বড় পদাধিষ্ঠিত কৃতী আত্মীয়।

প্রতিভার ব্যাপারে বালক ও বালিকাদের সংখ্যার অনুপাত হইতেছে প্রাথমিক বিভাগে ৭ : ৬ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ২ : ১; মাধ্যমিক বিভাগে প্রতিভাশালিনী বালিকাদের সংখ্যার অনুপাতটি কমিয়া যাইবার কারণ হইতেছে খুব সম্ভবতঃ বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির পূর্ণতা অল্পতর বয়সেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া।

শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতিভাশালী বালক বালিকাদের উচ্চতা, দেহের ওজন, ফুসফুসের শক্তি, পেশীগত শক্তি, পরিপাক শক্তি প্রভৃতি সাধারণ বালক বালিকাদিগের তুলনায় উচ্চ স্তরের। অস্থির পুষ্টি (Ossification) এবং যৌন-বোধ ও যৌনশক্তির বিকাশও ইহাদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নহে, শৈশবে হাঁটিতে শিখা, কথা বলিতে শিখা, দন্তোদ্গম হওয়া প্রভৃতিও ইহাদের শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়।

Standford Achievment Testএর দ্বারা দেখা গিয়াছে, পড়াশুনার ব্যাপারেও ইহারা শ্রেষ্ঠতর। প্রতিভাশালী বালকদিগের মধ্যে প্রতি আটজনের মধ্যে সাতজন বালকই পড়াশুনার ব্যাপারে তিন বৎসরের অগ্রগামিতা দেখাইয়াছে। প্রতিভাশালী বালকবালিকাদের দক্ষতা একমুখী নহে, বহুমুখী। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ইহারা গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি জটিল বা বিমূর্ত্ত (abstract) বিষয়ে বেশী আগ্রহশীল। ইহাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার বয়সের পূর্ব্বেই পড়িতে শিখে এবং অনেকেই তিন চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের আগ্রহ ও কৌতুহলের মধ্যেও একটা বহুমুখিতা দৃষ্ট হয়। ফলে যাহাকে 'হবি' (hobby) বলা হয়, তাহা সাধারণ বালক বালিকাদিগের চেয়ে ইহাদের মধ্যেই বেশী। খেলাধূলায় ইহারা খুব বেশী সময় নষ্ট করে না।

প্রতিভাশালী বালকেরা 'কুণো' ও 'গ্রন্থকীট', তাহাদের আগ্রহ কৌতূহল প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—এ প্রচলিত ধারণা অত্যন্ত ভুল। সামাজিকতা, নেতৃত্ব, সাধারণের সহিত মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা, মানসিক স্থৈর্য্য প্রভৃতি ব্যাপারেও ইহারা শ্রেষ্ঠতর। অসামাজিক আচরণ বা অপরাধপ্রবণতা ইহাদের মধ্যে কম।

অনেকের ধারণা প্রতিভাশালী বালকদিগের নেতৃত্ব, সংঘ ও সংগঠনশক্তি প্রভৃতি কম, তাহাও ঠিক নহে। প্রায়ই দেখা যায়, পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্য্যকলাপে প্রতিভাশালী বালকেরাই নেতৃত্ব করে এবং দায়িত্বের পদ গ্রহণ করে। খানিকটা নীতির প্রেরণাতে, পড়াশুনার ক্ষতি হইবে এই বিচারেও বটে, তাহাদের তুচ্ছ ব্যাপারে মাতামাতি করিতে দেখা যায় কমই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতিভার সম্পর্ক

যে ব্যাপক গবেষণা দ্বারা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণীত হইয়াছিল সেই গবেষণার সাত বৎসর পরে টারম্যান্ সাহেব পূর্ব্ব পরীক্ষিত ৬০০টি ছাত্র লইয়া আবার নূতন করিয়া (follow up) পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই বালকদের মধ্যে মনস্বিতাংশের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। তবে বালিকাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল। বালিকাদিগের মানসিক বিকাশ ও পরিপূর্ণতা যে বয়সে শেষ হইয়া যায় তাহার পর পর্য্যন্ত বালকদিগের মানসিক বিকাশ চলিতে থাকে। এইজন্যই বোধ হয় পরিণত বয়সে বালকদিগের তুলনায় বালিকাদিগের মনস্বিতাংশের হার কিছু কম বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়-জীবনের শেষ দিকেও ছেলেমেয়ে উভয়েরই পড়াশুনার ফল অদ্ভুত ভাল ছিল; পরীক্ষার অকৃতকার্য্যতা তাহাদের প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কলেজ-জীবনেও ইহাদের সফলতার মান সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে উন্নততর ছিল। "ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য"গুলিও ঠিক ছিল। সামাজিক বুদ্ধি, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতিতে ইহারা সাধারণের চেয়ে ভালই ছিল। বালিকাদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালিনী তাহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পুরুষোচিত ভাবভঙ্গী দেখা গিয়াছিল, তবে বালকেরা কিন্তু নারীভাবাপন্ন হইয়া পড়ে নাই।

মোটের উপর এই follow-up পরীক্ষাটি ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি বয়োবৃদ্ধির সহিত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

শুধু ছাত্রজীবনেই যে এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই তাহা নহে। টারম্যান সাহেব তাঁহার প্রথম follow-upএর পর পুনর্ব্বার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রাথমিক পরীক্ষার ১৮ বৎসর পরে এবং follow-up পরীক্ষার ১১ বৎসর পরে ঐ সমস্ত বালক বালিকাগুলি পূর্ণ বয়সে জীবন সংগ্রামে কিরূপ কৃতী হইয়াছিল ইহা দেখিবার জন্য আর একটি "check up test" করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ উত্তরজীবনেও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃতী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির সংখ্যা সাধারণের চেয়ে অনেক কম। এই সমস্ত প্রতিভাশালী বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কলেজে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে আবার শতকরা ৯৩ জন স্নাতক হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উত্তরজীবনে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কিছু বেশী সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর সুযোগ সম্ভাবনা কম বলিয়াই বোধ হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্রতিভা ও বিষয় বিশেষে দক্ষতা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা তীব্র সাধারণ বুদ্ধির দ্যোতক নহে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাড়াতাড়ি যোগ-বিয়োগ করিবার ক্ষমতা, যান্ত্রিকভাবে মুখস্ত করিবার ক্ষমতা, গৎ বাজাইবার ক্ষমতা, কারিগরী, অঙ্কন প্রভৃতির সহিত সাধারণ বুদ্ধির বা প্রতিভার তেমন সম্পর্ক নাই। দিল্লীর সমর দপ্তরের কয়েকটি কেরাণীকে দেখিয়াছি, তাহারা টেলিফোনের "ট্রাঙ্ক কল" হিসাব করিত। তাহারা টাকা আনা পাই-এর বিরাট বিরাট যোগ অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে এবং নির্ভুল ভাবেই করিতে পারিত। অথচ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও তাহারা দিতে পারিত না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর) একজন কেরাণী অসংখ্য পুস্তকের

ক্যাটালগ নম্বর বলিয়া দিতে পারিত—অথচ অন্যান্য ব্যাপারে সে প্রায় নির্ব্বোধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। এমন বহু কেরাণী দেখা যায়, যাহারা বিচ্ছিন্ন নাম সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখাইতে পারে অথচ হয়ত তাহারা আদৌ প্রতিভাশালী নহে। নির্ব্বোধ লোকদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল গৎ বাজাইতে বা কারিগরী কাজ করিতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি অর্থাৎ যাহাদের কাজের মধ্যে কল্পনাশক্তি বা সৃষ্টির পরিচয় আছে এইরূপ লোক আমরা নির্ব্বোধ লোকের মধ্য হইতে পাই না। ট্যারম্যান সাহেব ২৫০০০ জন বালকের মধ্যে মাত্র ২৬টি বালকের সন্ধান পাইয়াছিলেন যাহারা মোটামুটি সাধারণ মনস্বিতাংশ লইয়াও শিল্প বিষয়ে সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। এই হইতে মনে হয়, সত্যিকারের সৃজনী-প্রতিভার জন্য উচ্চ-কোটীর সাধারণ বুদ্ধির (general intelligence) বা প্রতিভার প্রয়োজন হয়।

প্রতিভার সহিত সৃজনীশক্তির যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমরা মানিয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"কেই আমরা প্রতিভা বলিয়া জানি। প্রতিভা সম্বন্ধে যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাতও হয় নাই তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী ও বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার 'প্রতিভা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

কারিগরী, চিত্রবিদ্যা, মুখস্থ করার ক্ষমতা প্রভৃতির সহিত সাধারণ বুদ্ধির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই বটে, তবে জটিল গণিতের সমাধান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ দক্ষতার সহিত সাধারণ প্রতিভা বা বুদ্ধির একটা নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ কার্য্য বহুমুখী বলিয়া জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে তাই বলিয়া প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে সব বিষয়েই লোকোত্তর দক্ষতা দেখাইতে পারেন তাহা নহে,—একটি দুইটি বিষয়ে হয়ত তাঁহারা অসামান্য দক্ষতা দেখাইতে পারেন এবং অন্যান্য বিষয়েও হয়ত সাধারণের চেয়ে কিছু ভাল ফল দেখাইতে পারেন।

অতীতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের প্রতিভা

অতীতে যে সমস্ত ব্যক্তি কৃতী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা কিরূপ ছিল—এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে। এই ব্যাপারটি লইয়া গ্যাল্‌টন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গবেষণা করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ক্যাটেল কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্বে লোম্‌ব্রোসো (Lombroso) বলিয়াছিলেন, বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাল্য-শৈশবে তাঁহাদের ভাবী সম্ভাবনার পরিচয় তেমন কিছু দিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিন্তান্বিতই করিয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই বাল্য-শৈশব হইতেই প্রতিভার প্রাক্-প্রৌঢ়ত্বের (precocity) পরিচয় দিয়াছেন। পরে ক্যাথারিন কক্‌স এই ব্যাপারে গবেষণার দ্বারা লোম্‌ব্রোসোর মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করেন। তিনি ১৪৫০ হইতে যে সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ৩০০ জনের সম্বন্ধে বাল্যজীবনের সহস্র সহস্র তথ্য সংগ্রহ করেন। বংশগতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, মানসিক পুষ্টি ও পরিণতি, বর্ণ-পরিচয়ের বয়স, রচনা, লেখার কাল প্রভৃতি অসংখ্য তথ্যই সংগৃহীত করিয়া কয়েক সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবরণী তৈয়ার করেন।

এইবার কয়েকজন শিশু-মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সহকারীকে লইয়া কাজ আরম্ভ হইল। ইঁহারা জানিতেন কোন্ বয়সে কিরূপ মনস্বিতাংশযুক্ত বালক কিরূপ কাজ করিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্যার আলোকে ইঁহারা এই ৩০০ জন ঐতিহাসিক ব্যক্তির কার্য্যকলাপের তথা মনস্বিতাংশের মূল্য নিরূপণ করিতে লাগিলেন। তিনজন মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীন এবং অন্য সম্পর্ক-নিরপেক্ষ ভাবে কাজ আরম্ভ করিলেন। একটি বিশিষ্ট বয়সে একটি বিশিষ্ট কাজ করিতে হইলে ন্যূনতম যতটা মনস্বিতাংশের প্রয়োজন হয়, ইঁহারা ইঁহাদের আলোচ্য ব্যক্তিদের জীবনেতিহাসের ঘটনাগুলিকে সেই জাতীয় মনস্বিতাংশের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পরে বিভিন্ন ব্যক্তির মনস্বিতাংশ সম্বন্ধে এই তিনজন মনস্তাত্ত্বিকের সিদ্ধান্তের গড় হইতে তাঁহাদের মনস্বিতাংশ নিরূপিত হইল।

দেখা গিয়াছিল যে, এই তিনজন মনস্তাত্ত্বিক এক একজন লোকের বুদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহা তিনজনের ক্ষেত্রেই প্রায় একই প্রকার হইয়াছিল। ফলে এই প্রণালীতে বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের যে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণীত হইয়াছিল তাহা অনেকখানি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলা চলে।

ক্যাথারিন কক্স-এর এই গবেষণার ফলে দেখা গেল, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের শৈশব, বাল্য ও উত্তরজীবনের কার্য্য-কলাপের মধ্যে একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নহে, যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি বাল্যকালে বুদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া লোমব্রোসো অনুযোগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধ্যঙ্কও বাল্যে বা কৈশোরে অল্প ছিল না, ইহাই প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় ছিল ১৬০ এবং কোনও ক্ষেত্রেই ইহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০এর অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

মিলস্, গ্যায়টে (Gocthe), মেকলে, পাসকাল, লেবনীজ প্রভৃতির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০এর উর্দ্ধে ছিল। টারম্যানের মতে গ্যালটন-এর বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় ২০০ ছিল।

এই সমস্ত মহামনীষিগণ বাল্যকালে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। মিল্টন ৮ বৎসর বয়সে গ্রীক্ পুস্তক পাঠ করিতেন, গ্যালটন আড়াই বৎসর বয়সে পড়িতে এবং চার বৎসর বয়সে চিঠি লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

এইভাবে আমাদের দেশের মহাপুরুষদের লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষা করা হয় নাই। পরীক্ষা হইলে দেখা যাইত, যে বালকটি বর্ণ-পরিচয়ের সময় "খ বর্ণ-টি পূর্ব্বে না হইয়া ক বর্ণ-টি পূর্ব্বে হইল কেন" জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে বালকটি পথে চলিতে চলিতে মাইল ষ্টোন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিখিয়াছিল, অথবা যে বালকটি ৭।৮ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা লিখিয়াছিল, ১৩।১৪ বৎসর বয়সে পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'বনফুল' রচনা করিয়াছিল এবং ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গালী হইয়া ব্রজবুলী ভাষায় 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করিতে পারিয়াছিল, তাঁহাদের মনস্বিতাংশ মিল্টন্, গ্যালটন্, ম্যাকলের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ছিল।

জগতে যাঁহারা প্রতিভার বলে কৃতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলের মনস্বিতাংশই যে ২০০র কাছাকাছি ছিল, তাহা নহে। ১৮০এর চেয়ে অল্পতর

মনস্বিতাংশযুক্ত বিখ্যাত লোকের সংখ্যাও কম নহে। লর্ড বায়রণ ও সার ওয়াল্টার স্কট্-এর মনস্বিতাংশ ছিল ১৫০, চার্লস্ ডারউইন্এর ছিল ১৩৫। এ্যাব্রাহাম লিন্কন্, বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্, নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট প্রভৃতির মনস্বিতাংশও খুব বেশী ছিল না। ইঁহারা অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, চরিত্রের দৃঢ়তা প্রভৃতি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের গুণে ১২৫ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশ লইয়াই জীবনে প্রভূত কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করেন। প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিভার সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করা হয় না বলিয়াই অনেক প্রতিভা সম্বন্ধেই আমরা আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারি "ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে!"

প্রতিভাশালী বালকদের শিক্ষাব্যবস্থা

অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, ভ্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, শাসন বা আদরের আতিশয্য, প্রেমের ব্যর্থতা, রাজনৈতিক উত্তেজনা, অকাল যৌনচেতনা, অসাধু পরিবেশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব প্রভৃতি যে কোনও কারণই একক বা সম্মিলিত ভাবে প্রতিভার সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের সমাজের মধ্যে যত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়, প্রকৃতি নিশ্চয়ই প্রতিভার কাঁচামাল হিসাবে তাহার বহুগুণ আমাদের সরবরাহ করিয়া থাকেন।

এই কাঁচামাল হইতে তাহার সাম্ভাবনাগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাঁচা মালগুলি আহৃত হয় প্রকৃতি বা বংশগতির ধারা বহিয়া। এই বংশগতি দিয়াই বুঝিতে হইবে, যে শিশুটি জন্ম গ্রহণ করিল তাহা শুক-শিশু কি বক-শিশু; সে বক-শিশু হইলে শত চেষ্টাতেও তাহাকে শুকের মত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া শুক-শিশুটিকেও অযত্ন ও অবহেলার মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে সে স্বতঃই পাঠ শিখিবে না, সে জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী ও পরিবেশের প্রয়োজন।

অনেকের ধারণা, নির্ব্বোধ শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাই একটা সমস্যার ব্যাপার; প্রতিভাশালী বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যাপারটা ততটা জটিল সমস্যার

বিষয় নহে। কথাটা সত্য নহে। তাহার কারণ আছে। প্রতিভাশালী বালক বালিকারা কোনও একটা বিষয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি একটা বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে, একথা সত্য। কিন্তু শিক্ষার শেষ সমস্যার ইহাতে সমাধান হয় না। প্রতিভাশালী ব্যক্তির অল্প বয়সেই বুদ্ধির দিক দিয়া পরিপক্কতা আসে। ফলে তাহারা তাহাদের সহপাঠীদের সহিত জন্ম-বয়সের দিক দিয়া এক হইলেও মনো-বয়সের দিক দিয়া অনেকখানি বেশী অগ্রসর থাকে। ফলে যৌন-চেতনা ও যৌনবোধ প্রভৃতির দিক দিয়া, মান অভিমান প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার দিক দিয়া, তাহারা সমবয়সী সঙ্গীদের চেয়ে অনেকখানি বেশী পরিপক্ক হইয়া উঠে। তাহা হইতেই আসে নানা জাতীয় অসুবিধা। একটী ৮ বৎসরের ছেলের যদি ১৪।১৫ বৎসরের ছেলের মত পরিপক্কতা আসে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষকেরা তাহাকে "ইচড়ে পাকা" বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন, সহপাঠিরা 'অসভ্য' 'বখাটে' প্রভৃতি বলিয়া বদনাম দিবে, আর পাড়ার বৃদ্ধ মাতব্বরেরা তাহার ভাবী চরিত্রহীনতার আশঙ্কা করিয়া হয়ত তাহাকে কোণঠাসা করিতে চেষ্টা করিবেন। সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে এইভাবে বিরোধিতা পাইয়া সে সমাজবিদ্রোহী বা অসামাজিক হইয়া উঠে এবং বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে! তখন হয়ত খানিকটা বাধ্য হইয়াই সে স্কুল পালাইতে আরম্ভ করে এবং স্কুলের বাহিরের জগতে শাসন-শৃঙ্খলা বা স্নেহের অভাবে সে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সত্যই মন্দ হইয়া উঠে।

এই বিরোধিতা ছাড়াও প্রতিভাশালী বালকদিগেব খারাপ হইয়া যাইবার অন্য কারণ আছে। তাহারা অল্প বয়সেই বেশী বুঝিতে শিখে বলিয়াই তাহার সঙ্গীরা যখন নিছক ছেলেমানুষী করিয়া দিন কাটাইতে থাকে, তখন ইহারা হয়ত গোপনে রাজনৈতিক মতবাদের গহনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ও গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়—অথবা গোপনে প্রেম চর্চ্চায় রত হয় ও পড়াশুনায় অবহেলা করে।

সাধারণ শিক্ষকগণ এই সমস্ত বালকদিগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করিতে

পারেন না এবং ইহাদের পড়াশুনার অবহেলাটির কদর্থ করিয়া পরিস্থিতিকে জটিলতর করিয়া তুলেন। ফলে ইহাদের সম্ভাবনার বিরাট অপচয় হয়।

আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত শিক্ষকই যদি মনস্তাত্ত্বিক হইতেন, অথবা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থায় সকল ছাত্রের মনস্বিতাংশ অভ্রান্ত ভাবে নির্ণীত করিয়া লইয়া যদি প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য পৃথক এবং বিশেষ বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে এই অপচয়টি হইত না। কিন্তু সে ব্যবস্থা আমাদের নাই, আর ব্যাপক বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যবস্থা না করিলে প্রতিভাকে অভ্রান্তভাবে চিনিয়া লওয়াও যায় না। ফলে প্রতিভাশালী বালকেরা পথিপ্রান্তস্থ কস্তূরীখণ্ডের মতই কর্দ্দমখণ্ডের সহিত অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। শুধু ভারতবর্ষেই যে প্রতিভাশালী বালক বালিকাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই, তাহা নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জড়বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কিছু করা হয় নাই।

নির্ব্বোধ বালককে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। কিন্তু লাজুক প্রতিভাশালী বালকটি অনেক সময়েই সাধারণ বালকদিগের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে অনেক সময় চিনিতে পারা যায় না এবং তাহার জন্য বিশেষ প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থাও অবলম্বন করা যায় না। যদি চিনিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার জন্য কিরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা বিধেয়?

(ক) ডবল প্রমোশনঃ ডবল প্রমোশন জাতীয় ব্যবস্থায় ভাল হয় কি? না—। কারণ সহপাঠী বন্ধুদের সহিত জন্ম বয়সের পার্থক্যটা মনোবয়সের পার্থক্যের মতই অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়। সেইজন্য প্রতিভাশালী বালকদিগকে বৎসরে বৎসরে ডবল প্রমোশন দিলে সহপাঠীদের সহিত তাহাদের বয়সের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ফলে প্রতিভাশালী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর বা যুবকদিগের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতে হয়। কিন্তু বালক ও কিশোরের মনোজগৎ এক নহে। তাহাদের অনুরাগ-বিরাগ, আশা-আকাঙ্খা, মনের বহির্মুখিতা, অন্তর্মুখিতা, আগ্রহের বিষয়বস্তু প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই পার্থক্য আছে। সুতরাং পড়াশুনার

ব্যাপারে অগ্রসর বলিয়াই অল্পবয়স্ক প্রতিভাশালী বালককে তাহার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ কিশোরদিগের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতে দেওয়াও ঠিক নহে। ইহাতে সামাজিকতাবোধ ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা প্রভৃতি ব্যাহত হয়, অসমবয়স্ক সহপাঠীদিগের সহিত মেলা-মেশা ঠিক ভাবে সম্ভবপর হয় না। ফলে প্রীতি পাওয়া ও প্রীতি দেওয়ার রাজকীয় অধিকার হইতে প্রতিভাশালী বালকেরা বঞ্চিত হয়। ইহার পরিণাম শুভ নহে। কাজেই বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এই জাতীয় ডবল প্রমোশন দেওয়া ভাল ব্যবস্থা নহে।

(খ) একই শ্রেণীতে উপবিভাগ ঃ কাজেই প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে দুই-এক ক্লাশ ডিঙ্গাইয়া বড় বড় ছাত্রদের সঙ্গে পড়িবার ব্যবস্থা না করিয়া সমবয়স্ক ছাত্রদিগকে একই শ্রেণীতে রাখিয়া সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবার মনস্বিতাংশের তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে ক, খ, গ প্রভৃতি উপবিভাগে ভাগ করিয়া পড়ানই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। 'ক' বিভাগে হয়ত ১১৫ হইতে উর্দ্ধতর মনস্বিতাংশযুক্ত বালকদিগকে রাখা হইল, 'খ' বিভাগে হয়ত ৮৫ হইতে ১১৫ পর্য্যন্ত এবং গ বিভাগে থাকিল ৮৫এর নিম্নতর মনস্বিতাংশযুক্ত নির্ব্বোধ বালকেরা।

এই ক, খ, গ বিভাগ ছাড়া অত্যন্ত অধিক প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য একটি উপবিভাগ এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধদিগের জন্য আর একটি উপবিভাগ খুলিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য বিশেষ উপবিভাগের ব্যবস্থাটি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু ১৯২৭—২৮ খৃষ্টাব্দে ২৩টি রাজ্যে ৪০টি শহরে ১৫০টি শ্রেণীতে প্রায় ৪০০০টি ছাত্রের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফল এত ভাল হইয়াছে যে, যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থার একবার প্রবর্ত্তন হইয়াছে সেখানে আর ইহা পরিত্যক্ত হয় নাই।

(গ) রুচিমত শিক্ষার সুযোগ ঃ প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য বিভাগ ও উপবিভাগের ব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রুচিমত পাঠ করিবার সুযোগ দিয়া, গবেষণা জাতীয় কার্য্যে উৎসাহ ও সুযোগ দিয়া, বিভিন্ন

বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধাদি রচনা করিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার প্রেরণা দিয়া, পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে।

এই নিযুক্ত রাখাটি একটি বড় কথা। অথচ বর্ত্তমানে বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যেরূপ শ্রেণীকেন্দ্রিক (ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে) ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিযুক্ত রাখা খুব কঠিন কাজ। কারণ একটি বিষয় একজন প্রতিভাশালী বালক যত শীঘ্র বুঝিয়া লইতে পারে, সাধারণ ছাত্ররা তত শীঘ্র বুঝিতে পারে না। কিন্তু ক্লাশের পাঠনের সময় একটি প্রতিভাশালী বালক বুঝিতে পারিল বলিয়া ক্লাশের অবশিষ্ট ছাত্রদের অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পাঠ আরম্ভ করা উচিতও নহে, গণতন্ত্রসম্মতও নহে। ফলে সাধারণ ছাত্রদের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে যখন বার বার একটা জিনিস বুঝাইতে হয় তখন হয়ত প্রতিভাশালী বালকটির আগ্রহ শেষ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের পাঠনের মধ্যে সে তখন আর নূতন কৌতূহলের কিছু পায় না বলিয়াই তাহার মন ক্লাশের পাঠন হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। ফলে সে হয়ত তখন অন্য কিছু কাজ না পাইয়া কবি নবীনচন্দ্রের মত পণ্ডিত মহাশয়ের 'পোট্রেট্' অঙ্কন করিতে চেষ্টা করে অথবা পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প বা দুষ্টামি করিয়া সময় কাটাইতে চেষ্টা করে। যাহার দ্রুত-পদবিক্ষেপে চলা অভ্যাস, তাহাকে যদি বৃদ্ধা দিদিমাতা বা ছোট ভগিনীটিকে লইয়া পথে চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যেমন অসুবিধা ও অস্বস্তি হয়, সাধারণ বুদ্ধির সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিভাশালী বালককে পড়াশুনা করিতে হইলে অনেক সময় এই জাতীয় একটা অসুবিধা হয়। ভাল শিক্ষকদিগের তাই উচিত ক্লাশে পড়াইবার সময় এই সমস্ত প্রতিভাশালী বালকদিগের প্রতি সতর্ক ও সহৃদয় দৃষ্টি রাখা এবং প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা।

ব্যক্তি-বৈচিত্র্য

সার জন অ্যাডামস্ বলিয়াছিলেন, শিক্ষা ক্রিয়াটির দুইটি কর্ম্ম আছে, একটি হইতেছে ছাত্র এবং আর একটি হইতেছে শিক্ষার বিষয়। ইহার ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, শিক্ষককে যেমন তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও পণ্ডিত হইতে হইবে, তেমনি তাঁহাকে তাঁহার ছাত্রদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলিও জানিতে হইবে।

অবশ্য জাতি (species) হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার ফলে একজন মানুষ একটা শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং হইতে পৃথক শ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই মনুষ্যজাতি হিসাবে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাগুণের উপাদান আছে, এ কথা সত্য। তাহা হইলেও এই সমস্ত উপাদানের সংস্থান, গ্রন্থন, মাত্রা, পারস্পরিক অনুপাত প্রভৃতির জন্য একটি মানুষ অন্য একটি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ একজন পৃথক শ্রেণীর জীব হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। এইগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের সহিত সঠিকভাবে কারবার করা যায় না। সামান্য একটি সাইকেল চালাইতে হইলেও আমাদের পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখিতে হয় তাহার ব্রেক্‌টি ডান দিকে আছে অথবা বাঁদিকে আছে, ফর্কটি ঠিক আছে না কম-জোরী আছে, তাহা fixed wheel জাতীয় গাড়ী না free wheel জাতীয়। সামান্য একটা সাইকেল চালাইতে হইলেই যদি তাহার সহিত এতটা পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মানুষের সহিত কারবার করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে আরও ব্যাপকতর পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। "মেরী করোলি"র একটি বিখ্যাত উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন বৈজ্ঞানিক তাঁহার শিশু-সন্তানকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জগতের চরমতত্ত্ব হইতেছে একটি শক্তিশালী পরমাণুমাত্র, (mighty atom)—বিধাতা বা ঈশ্বর প্রভৃতি কোনও ঐশী শক্তি নহে। কিন্তু এই তত্ত্বটি ঐ শিশুর মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল যে, এই

নিরীশ্বর জগতে নিজেকে একান্ত অসহায় ও দুর্ব্বল মনে করিয়া সে আত্মহত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

এ জাতীয় ঘটনা অবশ্য খুব স্বাভাবিক নহে। তবে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক অবস্থাতেও এত পার্থক্য আছে যে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার সহিত কোনও কারবারই করা চলে না। কেহ হয়ত অত্যন্ত অভিমানী ভাবপ্রবণ প্রকৃতির, সামান্য শাসন বা তিরস্কারেই সে একেবারে কাতর হইয়া পড়িবে; কেহ হয়ত বহির্মুখী, তাহাকে ঘরের কোণে রাখিয়া পড়াশুনা করাইতে চেষ্টা করিলে তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, ইত্যাদি।

শরীর, মন, বুদ্ধি, আবেগ প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসের সমবায়ে মানুষ এমনই একটা জটিল জীব যে, তাহার শ্রেণীবিভাগটা মোটেই সহজ নহে। যাহাই হউক, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করিলে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মোটামুটি সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে—

(১) **শারীরিক বৈশিষ্ট্য:** উচ্চতা, ওজন, গঠন, মুখাবয়ব, স্বাস্থ্য, শক্তি, কর্ম্মপটুতা প্রভৃতির তারতম্য।

(২) **মানসিক বৈশিষ্ট্য:** বুদ্ধি, স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, অনুভব শক্তি প্রভৃতির তারতম্য।

(৩) **প্রবণতা ও দক্ষতা**—সঙ্গীত, শিল্প-কলা, কারিগরী, সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে তারতম্য।

(৪) **অর্জ্জিত জ্ঞান, রসগ্রাহিতা** প্রভৃতির তারতম্য।

(৫) **আয়ান** (temperament): প্রক্ষোভপ্রবণতা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিরক্তি, সুখদুঃখের উত্তেজনা প্রভৃতির তারতম্যেও একজন মানুষ অন্য একজন মানুষ হইতে পৃথক শ্রেণীর জীব হইয়া পড়ে।

(৬) **ইচ্ছাশক্তি** (volition): ইহার তারতম্যেও ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা ব্যর্থতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেহ বা অধিকতর কর্ম্ম-প্রেরণা অনুভব করে, কেহ বা অব্যবস্থচিত্ত, কেহ বা উদ্যোগী ইত্যাদি।

(৭) **চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ঃ** পরিপক্ক মনুষ্যত্বের পরিচয় এইখানেই খানিকটা সার্থক। চরিত্রের পার্থক্যেই আমাদের মধ্যে কেহ সাধু, কেহ চোর, কেহ আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা স্বার্থের জন্য "মিরজাফরি" করিতে পারে।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা

সাধারণভাবে শারীরিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা খুব কঠিন নহে। Aesthesio meter, Ergograph, dynamometer, algesiometer প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা আমরা চর্ম্মের স্পর্শশক্তি, পেশীর সঙ্কোচনী শক্তি প্রভৃতির পরীক্ষা করিতে পারি; বিণে, টারম্যান্, ব্যালার্ড প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে মানুষের বুদ্ধি বা অর্জ্জিত জ্ঞানেরও খানিকটা পরীক্ষা করিতে পারি। কিন্তু সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাণ ও পরীক্ষা করাটা ততটা সহজ ব্যাপার নহে। মানুষের চরিত্র ও প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াগুলি এমনই জটিল যে, তাহার সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তবে অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার ব্যাপারে যেমন ব্যাপক প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষার ব্যাপারেও তেমনি ব্যাপক পরীক্ষা দ্বারা নানা জাতীয় প্রতিক্রিয়ার নমুনার মধ্য দিয়া একটা মোটামুটি ধারণা স্থির করা যায়।

বর্ত্তমানে ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের জন্য যে উপায়ের দ্বারা মানুষের প্রতিক্রিয়াগুলি নির্ণীত হয় তাহা এই—(১) শব্দের উপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া, (২) বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনা বা ছবির উপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া, (৩) প্রয়োগশালায় নানা জাতীয় পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া, (৪) বাস্তব জীবনের অনুকৃতিমূলক পরিবেশের উপর লক্ষ্য করিয়া।

(১) **শব্দের প্রতিক্রিয়া ঃ** এই পরীক্ষায় পরীক্ষক পরিক্ষার্থীর নিকট এক একটি শব্দ উপস্থাপিত করেন (ইহা মৌখিকও হইতে পারে অথবা লিখিতভাবেও হইতে পারে)। ইহার পর ঐ এক একটি শব্দ তাহার মনের উপর কিরূপ ভাবের উদ্রেক করে তাহা তাড়াতাড়ি প্রাণ খুলিয়া বলিতে বা লিখিতে বলা হয়। অনুষঙ্গের প্রভাবে এক-একটি শব্দ এক-এক

জাতীয় চিন্তার দ্বার খুলিয়া দেয়। ফলে পরীক্ষার্থীর লিখিত বাক্যগুলিতে তাহার মনের গোপন কথা, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়ৈষা, আবেগ, আদর্শ প্রভৃতির রঙ ধরিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, অন্তর্বৃত্ত অথবা বহির্বৃত্ত, জীবনযুদ্ধে জয়ী অথবা পরাজিত, জীবন সম্বন্ধে সে তৃপ্ত অথবা বিরক্ত, জীবনসমস্যাকে সে দৃঢ়ভাবে সমাধান করিতে পারে অথবা অনিশ্চিত ইতস্ততঃভাবে অগ্রসর হয় ইত্যাদি।

কখন কখনও এই শব্দ-অনুষঙ্গ প্রণালীটি আরও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়। পরীক্ষার্থীর নিকট হয়ত এক একটি শব্দ উপস্থাপিত করা হইল। ইহার পরের ঐ শব্দটির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহার রক্ত চলাচল, বুকের স্পন্দন, গ্রন্থির রসক্ষরণ, প্রক্ষোভ প্রভৃতি কিরূপ ঘটিতেছে তাহা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার জন্য অতি সাধারণ শব্দগুলিই ব্যবহৃত হইতে পারে; যেমন নারী, অর্থ, বিবাদ, আত্মীয়, শত্রু, গৃহস্থ, সুন্দরী, পুণ্য, হত্যা, ফুল, বাড়ী, বাগান প্রভৃতি।

(২) **বিশেষ ঘটনা বা ছবির প্রতিক্রিয়াঃ** এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার্থীর নিকট একটি কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়, অথবা ঘটনার ছবি দেখান হয়, এবং তাহার পরেই সেই ঘটনাটির উপর তাহাকে মন্তব্য করিতে বলা হয়। অধ্যাপক Gates এই জাতীয় পরীক্ষার উদাহরণ দিয়াছেন। পরীক্ষার্থীর নিকট একটি সমস্যা এবং তাহার কয়েকটি সমাধান দেওয়া হইল এবং তাহাকে বলা হইল,"যে উত্তরটি তোমার ভাল লাগে তাহা টিক দিয়া জানাও।"

যেমন যদি তোমার নিকট কেহ একটি পেন্সিল ধার চায় তাহা হইলে—
(ক) বল ইহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (খ) বল তুমি ধার দিতে ইচ্ছুক নও।
(গ) বল ইহা হারাইয়া গিয়াছে। (ঘ) তাহাকে পেন্সিলটি দিয়া দিবে।

অথবা—তুমি পরীক্ষার সময় দেখিলে যে তোমার এক বন্ধু চুরি করিয়া লিখিতেছে, তখন—
(ক) এই ব্যাপারটি কাহাকেও বলিবে না। (খ) তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে কাজটি অন্যায় (গ) শিক্ষককে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে (ঘ) ব্যাপারটি চাপিয়া যাইবে।

এইভাবে নৈতিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক, নানা জাতীয় সমস্যা উত্থাপিত করিয়া সেইগুলির উপর পরীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় এবং তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা করা হয়। কিন্তু এই জাতীয় পরীক্ষা কতটা ব্যবহারিক হইবে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ, আমরা জ্ঞানের দিক দিয়া একরকম উত্তর দিতে পারি, আর কর্মের দিক দিয়া অন্যপ্রকার আচরণও করিতে পারি।

এইজন্য অনেক সময় "কি করা উচিত" এই জাতীয় প্রশ্ন না করিয়া "অতীত জীবনে কিরূপ আচরণ করিয়াছ?" এই জাতীয় প্রশ্ন করা হয়। উড্ওয়ার্থ গত যুদ্ধের সময় সৈন্য নির্ব্বাচনের জন্য এইভাবে ১১৬টি প্রশ্নগুচ্ছ লইয়া পরীক্ষার্থীদের স্বভাব, চরিত্র, সম্ভাবনা, সামাজিক উপযোজন (social adjustment), ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দুই একটি প্রশ্নের নমুনা দেখান হইল—

প্রশ্ন	উত্তর
তোমার শৈশবের অভিজ্ঞতা দুঃখের কি?	হাঁ, না
তোমার মনিবগণ কি তোমার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন?	হাঁ, না
তুমি অকারণে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়াছ কি?	হাঁ, না
দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে তোমার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি?	হাঁ, না
তুমি পাগল হইয়া যাইবে এই জাতীয় ভয় কখনও হইয়াছে কি?	হাঁ, না

(সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দিতে হইবে)

(৩) **প্রয়োগশালার পরীক্ষাঃ** ল্যাণ্ডিস্ (Landis) প্রভৃতি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে রাগাইয়া, ভাবাইয়া, প্রলুব্ধ করিয়া, কুতর্কে পরাজিত করিয়া, তাহাদের প্রক্ষোভপ্রবণতা, প্রতিবাদ-সহিষ্ণুতা, সততা, সামাজিকতা প্রভৃতির নিরিখ এই পরীক্ষায় স্থির করেন।

এই ব্যাপারে Downeyর "ইচ্ছাশক্তি-আয়াস" (will-temperament) পরীক্ষাটিও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বারো রকমের পরীক্ষা হয়; যথা—

(ক) **গতিভঙ্গীর ক্ষিপ্রকারিতা** (speed movement test): পরীক্ষার্থী ধীরে ধীরে চলাফেরা করে অথবা ক্ষিপ্রভাবে করে তাহা হস্তাক্ষরের

ক্ষিপ্রতা দেখিয়া অনুমান করা হয়।

(খ) **বাধা সম্বন্ধে স্বাধীনতা** (Freedom from load etc) : কোনও কাজে তাড়াতাড়ি লাগিয়া যাইতে পারে কিনা তাহাও নানা জাতীয় হস্তাক্ষরের পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হয়।

(গ) **বিভিন্ন অবস্থায় খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা** : (flecxibility)—বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দেশে হস্তাক্ষরকে পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ইহা স্থির করা হয়।

(ঘ) **সিদ্ধান্তের ক্ষিপ্রকারিতা** : বিভিন্ন ভাবের বর্ণনা হইতে অবাঞ্ছনীয় বাক্য এবং অনুপযুক্ত শব্দগুলি বাদ দিবার নির্দ্দেশ দিয়া এই জিনিসটি বাহির করা হয়।

(ঙ) **চেষ্টার তীব্রতা** (motor impulsion) : নানা জাতীয় চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে কিছু লিখিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া এই জিনিসটি স্থির করা হয়।

(চ) **প্রতিবাদ সহিষ্ণুতা** (Reaction to contradiction) : কোনও প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ করিলেও নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কতটা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহা স্থির করা হয়।

(ছ) **বাধাবিঘ্ন সহিষ্ণুতা** (Resistence to obstruction) : একজন যখন লিখিতেছে, তখন বাধা পড়িলে কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা দেখিয়া ইহা স্থির করা হয়।

(জ) **সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা** (Finality of judgement) : পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষায় যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় পরিবর্ত্তিত হয় কিনা দেখিয়া ইহা স্থির করা হয়।

(ঝ) **ধৈর্য্য ও গতি-সংযম** (motor control patience etc) : নির্দ্দেশ ক্রমে ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে লিখিতে পারে কিনা দেখিয়া ইহা নির্ণীত হয়।

(ঞ) **খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহ** (Interest in detail) : অপরের লেখা অবিকল নকল করিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্থির করা হয়।

(ত) **আবেগের সামঞ্জস্য** (co-ordination of impulses) ঃ জটিল সংস্থানের মধ্যে খুঁটিনাটি ভুলিয়া না যাইয়া নিভু্ৰ্লভাবে কাজ করিবারক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া (নির্দ্দেশ অনুসারে হস্তাক্ষরের পরীক্ষা দ্বারাও) ইহা স্থির ইহা করা হয়।

(থ) **ইচ্ছাশক্তির অবিরত্তি** (Volitional perseveration) ঃ

Downey-র পদ্ধতিতে এই বারো রকমের পরীক্ষার ফলগুলিকে একে একে নির্দ্দেশ করিয়া সমগ্র ফলগুলির "গ্রাপ্" (graph)-এর সাহায্যে মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বুঝিতে চেষ্টা করা হয়। অবশ্য এই পদ্ধতিতে একটা ব্যবহারিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, তবে ইহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে। শুধু হস্তাক্ষরের ক্ষিপ্রতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে মানুষের জটিল ব্যক্তিত্বের অন্যান্য ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের মনে হয়; Downey-র পরীক্ষার সহিত আরও কতকগুলি অনুপূরক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত অনেকটা পাওয়া যাইতে পারে। এই পরীক্ষার সহিত সমস্যা সমাধানের ক্ষিপ্রতা, Tapping-এর ক্ষিপ্রতা, প্রতিক্রিয়ার সময় পরীক্ষা, বিভিন্ন রং লইয়া সাজাইবার পরীক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষার সমন্বয় করিলে আরও ভাল ফল লাভ করিতে পারা যাইতে পারে।

(৪) বাস্তব জীবনের অনুকৃতিমূলক প্রতিক্রিয়া ঃ প্রয়োগশালায় যে সমস্ত পরীক্ষা হয় তাহা খানিকটা কৃত্রিম। সেইজন্য অনেক সময় স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া মানুষের সাধুতা, অসাধুতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা জিনিসটি বুঝান যাইতে পারে।

ছাত্রদিগকে তিনদিন ধরিয়া পরীক্ষা করা হইল এবং তৃতীয় দিনে তাহাদের নিজেদের খাতায় সফলাঙ্ক দিবার জন্য নিজেদেরই ভার দেওয়া হইল। ছাত্রদের জানানো হয় নাই যে, আগেকার খাতাগুলি শিক্ষক মহাশয় ভাল ভাবেই দেখিয়া রাখিয়াছেন। এখন তৃতীর দিনের খাতায় যদি ছাত্রদের সফলাঙ্কের মান খুব বেশী বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা অসাধু পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

অন্যান্য উপায়েও পরীক্ষা হইতে পারে। খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যাপারে

ছাত্রদিগকে জুয়াচুরি করিবার সুযোগ দিয়া তাহাদের অলক্ষ্যে তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে হয়। একজন হয়ত বারো ফুট্ লাফাইয়া ফিতা দিয়া মাপিবার সময় তের ফুট লাফাইয়াছে বলিয়া পরিচয় দিল, অন্য একজন হয়ত "ফাউল" চাপিয়া গেল, আর একজন হয়ত ছয় বার "চিনিং করিয়া আটবার করিয়াছি বলিয়া ঘোষণা করিল ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা তাহাদিগকে অন্যায় করিবার সুযোগ দিয়া অলক্ষ্যে সেগুলি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা তৈয়ারী করিতে পারি এবং যোগ্যপাত্রের উপর নেতৃত্ব, দায়িত্ব প্রভৃতি দিতে পারি।

বিভিন্ন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক অনুবন্ধ
(Correlation of different personality traits)

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এক জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত কি ভাবে সম্পর্কিত ? এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এইরূপ :

বিষমানুপাত অনুবন্ধ (Negative Correlation) : সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, একজন মানুষ যদি এক বিষয়ে শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে সে অন্য বিষয়ে অবশ্যই দুর্ব্বল হইবে। যে ব্যক্তি পড়াশুনায় ভাল সে শরীরের দিক দিয়া দুর্ব্বল হইবে, উৎকৃষ্ট শিল্পী চরিত্রের দিক দিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে, ভাল গায়ক খানিকটা অব্যবস্থ চিত্ত হইবে, দেহ শক্তিশালী হইলে ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইবে, স্মৃতিশক্তি প্রখর হইলে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দুর্ব্বল হইবে।

সমানুপাত অনুবন্ধ মতবাদ : এই মতবাদ বলে যে, কোনও ব্যক্তির যদি এক বিষয়ে একটা অসাধারণ ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়েও তাহার অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে। যেমন তীব্র প্রতিভা থাকিলে নানা বিষয়ে শিক্ষা করিবার ক্ষমতা অবশ্যই থাকিবে ; শুধু তাই নয়, পেশাগত কর্ম্মদক্ষতা, সামাজিকতা প্রভৃতিও প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহজেই আয়ত্ত হইবে।

ব্যক্তি বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিভাগ (Personality types)

অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, মানুষকে চরিত্রের দিক দিয়া নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মধ্যযুগে চিকিৎসকগণ মনে করিতেন, মানুষের শরীরে নানা

জাতীয় রস (humour) আছে। সেই সমস্ত রসের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্য বিচার করিয়া মানুষকে ক্রোধশীল (choleric), জড় প্রকৃতির (phlegmatic), বিষাদশীল (melancholic) এবং আশাবাদী (sanguine) এই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। আমাদের দেশে কবিরাজগণও বায়ু, পিত্ত ও কফের তারতম্য অনুসারে মানুষের শুধু যে দৈহিক শ্রেণী বিভাগই করিতেন তাহা নহে, তাঁহাদের মতেও এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রভাবে মানুষের চরিত্রেরও বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে।

য়্যুঙ্গ মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া তাহাকে প্রধানতঃ বহির্বৃত্ত ও অন্তর্বৃত্ত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও, তিনি মানুষের চিন্তা, সংবেদন, অনুভূতি ও সংজ্ঞার (intuition) সহিত অন্তর্বৃত্ততা ও বহির্বৃত্ততার সংমিশ্রণজনিত আট প্রকার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

Kretschmer নামক অন্য একজন পণ্ডিত মানুষের দেহের গঠনের দিক দিয়া Athletic type, Asthenic type, Pyknic type এবং Dysplastic type এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। Kracpelin নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক অস্বভাবী মানুষকে manic depressive (খেদোন্মত্ত বাতুল) এবং Dementia praccox (চিত্তভ্রংশী বাতুল) এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। স্বাভাবিক মানুষদেরও Cycloids schizoids এই ভাবে ভাগ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক Neitzhe মানুষকে প্রভুর জাতি ও দাস জাতি হিসাবে ভাগ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগটা হয়ত ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তথা কর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছিল (গীতা ১৮।৪২—৪৪)। ইহা ছাড়া সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের অন্ত নাই।

এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ করিয়া মানুষকে দুই বা ততোধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রায়ই হইয়া থাকে। এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগটি মানিয়া লইলে ইহাই মানিয়া লইতে হয় যে, এক একটি বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া এক এক দল মানুষ পুঞ্জিত হইয়া উঠে এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা জায়গা পড়িয়া

থাকে। ছবি আঁকিয়া (graph) এই ব্যাপারটি দেখাইতে হইলে দুই বা ততোধিক চূড়া এবং মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাযুক্ত বক্ররেখার (bimodal or multimodal curve) সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ খুব সার্থক নহে। Freeman তাঁহার Individual difference নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, মানুষকে এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না; বস্তুতঃ মানুষ এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়াইয়া নাই, পৃথিবীতে মানুষ আছে একটি মাত্র শ্রেণীর,—তাহা হইতেছে সাধারণ শ্রেণীর, এবং এই সাধারণ শ্রেণীর দুই প্রান্তে আছে দু'চার জন লোক, যাহারা সাধারণ হইতে খানিকটা পৃথক।*

এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগের আর একটি ব্যর্থতা এই যে, ইহা মানুষের অসংখ্য ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বৈচিত্র্যগুলিকে খানিকটা পরিমাণে অস্বীকার করিয়া মানুষদিগকে এক একটি দলে পুরিয়া দেয়। কিন্তু ঠিক পুরাপুরি ভাবে সমজাতীয় ব্যক্তিত্বযুক্ত লোক বোধ হয় পৃথিবীতে একজোড়াও মিলিবে না। প্রত্যেক মানুষটি এক একটি অতুলনীয় একক, তাহার ঠিক জোড়া মিলিবে না। অধ্যাপক Gates দেখাইয়াছেন, দুইটি লোকের বৈশিষ্ট্য যদি একই প্রকারের হয় এবং তাহারই মধ্যে যদি একজনের জেদ, যুযুৎসা বা স্বাস্থ্য বেশী হয়, তাহা হইলেই তাহাদের দুই জনের মধ্যে কৃতিত্বের দিক দিয়া আকাশ পাতাল পার্থক্য হইবে। কাজেই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তথাকথিত typeগুলি হইতেছে বাস্তব ব্যাপারটিকে অতিমাত্রায় সরলায়িত করিবার চেষ্টা মাত্র।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া মানুষের শ্রেণী-বিভাগ (type) না থাকিলেও নারী ও পুরুষ ভেদে, গোষ্ঠী ভেদে, জাতি ভেদে, সম্প্রদায় ভেদে, পরিবার বা বংশ ভেদে মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ প্রায়ই স্বীকৃত হয়। এই শ্রেণী বিভাগটি ঠিক কিনা তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

নারী ও পুরুষ ভেদে পার্থক্য

নারী ও পুরুষ ভেদে পার্থক্যটা প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত। তবে এই বিভেদটা যতটা বেশী করিয়া দেখান হয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিভেদটা ততটা নয়। অবশ্য

* There is a single type. the average, around which and from which individuals may diviate as variants.

শারীরিক উচ্চতা, ওজন, শক্তি, দৈহিক ও আকৃতিগত বিভেদটা নর ও নারীর মধ্যে সুস্পষ্ট। তাহা হইলেও কোন কোনও বয়সে এই বিভেদটাও তেমন ভাবে লক্ষিত হয় না।

দেখা গিয়াছে, জীবন-পরিক্রমার সমস্ত অবস্থাতেই নর ও নারীর বুদ্ধিগত পার্থক্যটা দেহগত পার্থক্যের চেয়ে অনেক কম। টারম্যান এবং বার্ট দেখাইয়াছেন, ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে বালিকারা বালকদিগের চেয়ে গড়ে ½ বৎসরের অধিকতর মনো-বয়সের বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বালিকারা বালকদিগের চেয়ে তাড়াতাড়ি যৌবন প্রাপ্ত হয় বলিয়াই হয়ত বৃদ্ধির যুগে বালিকাদিগের মধ্যে বুদ্ধিগত পরিপক্কতাটা অধিকতর মাত্রায় হইয়া থাকে। তবে পূর্ণ বয়সে এই পার্থক্যটা তেমন থাকে না। স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ (perception প্রভৃতির ব্যাপারে নরনারীর মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।

স্কুল জীবনের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতার পার্থক্য খুব বেশী নাই। বার্ট সাহেব ১৯টি স্কুলের ৫০০০ ছাত্র ছাত্রী লইয়া কয়েকটি standardised test লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেখা গিয়াছিল, পড়া, লেখা, বানান ও রচনার দিক দিয়া বালিকারা একটু ভাল, আবার গণিত, হাতের কাজ প্রভৃতিতে ছেলেরা ভাল; ড্রইং-এ উভয়েই সমান, যোগে বালিকারা এবং বিয়োগে বালকেরা ভাল, গুণে উভয়েই সমান, আবার ভাগে ছেলেরা ভাল। এইভাবে উহারা যেন leap frog খেলিয়া একে অপরকে ডিঙ্গাইয়া চলে।

নীতি ধর্ম্ম, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্যটা প্রায় ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

জাতি ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য

অনেকেই মনে করেন, জাতি বা গোষ্ঠীর বিচারে মানুষে মানুষে খানিকটা পার্থক্য আছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, সুইডেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে "বিণে টেষ্ট" দ্বারা বুদ্ধিগত পার্থক্যটা তেমনভাবে ধরা পড়ে নাই।

আমেরিকাতে সৈন্যদলের মধ্যে "আল্‌ফা টেষ্ট"এ নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতকায় জাতিদের তুলনায় অল্পতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা হইতে তাহাদের বুদ্ধির অল্পতা সম্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ইচ্ছাশক্তি, চরিত্র, আয়ান প্রভৃতি ব্যাপারে জাতিগত পার্থক্যটা তেমন ব্যাপকভাবে দেখা যায় না।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব কি ভাবে বিকশিত হইতে থাকে তাহা "চরিত্রের পথে" নামক অধ্যায়ে ইতোপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তবে এই ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি কি তাহা স্থির করিবার জন্য দুই একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। অধ্যাপক Gates-এর মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা: ইহার একত্ব (unity), সামঞ্জস্য (consistency), অবিচ্ছিন্নতা (continuity) এবং নমনীয়তা (flexibility or co-ordination)।

একত্ব: প্রথমে একত্বের কথাই ধরা যাক্। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ব্যক্তিত্ব জিনিসটি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গুণ বা "শক্তি"র সমষ্টি মাত্র নহে, ইহা একটি অখণ্ড একক, একটা "আমি"কে কেন্দ্র করিয়াই অভ্যাস, রস (sentiment) অধিরাজ রস, নীতিবোধ, চরিত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইতে থাকে (২০৯-২১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সংহত চরিত্রই হইতেছে ব্যক্তিত্বের সত্য পরিচয়।

সামঞ্জস্য: এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ফলেই একই জাতীয় উদ্দীপকে বা একই জাতীয় জীবন-সংস্থানে একজন চরিত্রবান ব্যক্তি একইভাবে সাড়া দেয়। তবে যে সকল ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের "ব্যক্তিত্ব"টি সংহতভাবে দানা বাঁধে নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যটি তেমনভাবে দেখা যায় না। অত্যন্ত ক্রোধ, লোভ বা কামের বশে আমরা অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলি। তখন আমাদের স্থায়ী "আমি"টির সঙ্গে যেন উত্তেজিত "আমি"টির সামঞ্জস্য থাকে না। তখনই আমরা বলি—"আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম অথবা আমাতে আর আমি ছিলাম না, তাই এই রকম হেয় কাজ করিয়াছি।"

অবশ্য দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যটি প্রায়ই দেখা যায় না।

অবিচ্ছিন্নতা: জীবন-পরিক্রমায় চলিতে চলিতে মানুষের মধ্যে নানা জাতীয় পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় একই প্রকার থাকে। রোগ, শোক, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত

হয় বটে, তবে ইহা খানিকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মানুষ তাহার চরিত্রগত বিবর্ত্তন ও পরিণতির নানা জাতীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মূল সুরটি বজায় রাখে।

নমনীয়তা: ব্যক্তিত্বের একত্ব এবং সামঞ্জস্যের কথা ইতোপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যেই আবার বৈষম্য ও বৈচিত্র্যেরও অবকাশ আছে। স্যার আশুতোষ "রয়েল বেঙ্গল টাইগার" নামে খ্যাত ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে সিংহের মত রাশভারি প্রতীয়মান হইলেও, তিনিই হয়ত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন রসিক বন্ধু, প্রেমাস্পদ স্বামী, ক্ষমাশীল দাদু, হিসাবী বিষয়ী-ব্যক্তিও হইতে পারেন। অথচ এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে "দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব" "বহু-ব্যক্তিত্ব" প্রভৃতির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে এক জাতীয় ব্যক্তিত্ব অন্য জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিরোধী নহে, তাহা পরস্পরের পরিপূরক। এই জাতীয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা সংহত একক আছে বটে, তবে তাহা কঠিন অনমনীয়তায় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভণ্ডামীর আশ্রয় না লইয়াই অথবা বিষঙ্গের অবস্থা সৃষ্টি না করিয়াই এবং নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই জাতীয় ব্যক্তিরা জগতের সঙ্গে যতটা সম্ভব মানাইয়া চলেন। এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিবার জন্যই সন্ত কবি বলিয়াছেন,

সবসে বসিয়ে সবসে রসিয়ে সবসে লিজীয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে বৈঠহ আপন ঠাম॥

ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থা

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এইটুকুই বুঝিয়াছি যে, মানুষগুলি ঠিক দু'চারটি দলে বিভক্ত নহে। তাহাদের মধ্যে কোনও ব্যাপক type নাই, প্রত্যেক মানুষটিই ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া এক একটি অতুলনীয় একক। কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্যই পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত এবং বর্ত্তমানের শ্রেণী-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা উচিত।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাবিদ্‌গণ বোধ হয় এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা গণকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা না করিয়া ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য গুরুর সহিত শিষ্যের সান্নিধ্যের ও ব্যক্তিগত পরিচয় ও আত্মীয়তার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার আরম্ভ হইত "উপনয়ন"-এর মাধ্যমে। উপনয়নের অর্থই হইতেছে "নিকটে আনয়ন"—শিষ্যকে গুরুর নিকটে আনিতে হইবে, তপোবনের নিকটে, চরিত্রের নিকটে, হৃদয়ের নিকটে আনয়ন করিতে হইবে। সে যুগে ছাত্র ছিল "অন্তেবাসী" অর্থাৎ যে "গুরুর নিকটে বাস করে"। এই অন্তেবাসী ছাত্রদিগেরই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, সুযোগ, সুবিধা প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া গুরুগণ তাহাদিগকে সুপরিচালিত করিতে পারিতেন, আর শিষ্যও প্রকৃত অন্তেবাসী ছিল বলিয়াই গুরুর চরিত্রগত গুণগুলি লক্ষ্য করিবার অবসর পাইত এবং শ্রদ্ধা ও শুশ্রূষার দ্বারা শুধু জ্ঞানই যে আহরণ করিত তাহা নহে, গুরুর অনুকরণ, অভিভাবন প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের চরিত্রকেও সুগঠিত করিবার সুযোগ পাইত। "গণমন" পরিচ্ছেদে আমরা প্রাচীন ইংলণ্ডের গভর্ণেস্ প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ব্যর্থতার কথা আলোচনা করিয়াছি—(১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তাহা এ ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। কারণ তপোবনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণমন, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির সুবিধাগুলিও ছিল অথচ গুরুর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও আত্মীয়তার ব্যবস্থাও ছিল।

বর্ত্তমান স্কুল কলেজগুলিতে যেন একটা ফ্যাক্টরীর আবহাওয়া বিরাজ করে, কিন্তু তপোবনের বিদ্যায়তনে ছিল একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের গার্হস্থ্য আবহাওয়া। এই গার্হস্থ্য আবহাওয়ার মধ্যে অশান্তির বিক্ষোভ নাই, প্রতিযোগিতার তীব্রতা নাই, অপরিচয়ের সন্দেহ নাই, তাই সেখানে পরিচয়ের নিবিড়তা ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সহযোগিতা ও প্রীতি-জাগিয়া উঠে, শান্তি ও আত্মীয়তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র বিকশিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্য যুগের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগেও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। নালন্দা প্রভৃতির মহা-

বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল না। তাহা হইলেও সেখানে প্রতি ছয় সাত-জন ছাত্রের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক ছিলেন।

বর্ত্তমানে আমরা হয়ত ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিচারে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারিব না, তাহা হইলেও যতটা সম্ভব মন্দের ভাল ব্যবস্থা করিতে পারি। এইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করণীয়, যথা—

(১) পাঠ্য-বিষয়কে প্রত্যেক ছাত্রের রুচি প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্থির করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে।

(২) শিক্ষাকে বহুমুখী (multi-lateral) করিয়া প্রত্যেক বালককে তাহার সম্ভাবনার পথ খুঁজিয়া লইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) বিভিন্ন ছাত্রের জন্য বিভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রদের উন্নতির হার সকলেরই সমান দ্রুত-তালে চলে না, এই তথ্যটি জানিয়া শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য বিভিন্ন পাঠ দিতে হইবে।

(৪) প্রতিভাশালী ও জড়বুদ্ধি ছাত্রের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রদের প্রক্ষোভ-প্রবণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সংঘাত এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অভিমানী লাজুক প্রকৃতির ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল হইতে হইবে।

(৬) ছাত্রদের উন্নতির জন্য নূতনভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে ছেলে সকলের চেয়ে বেশী ভাল নম্বর পাইল, তাহাকে লইয়া মাতামাতি একটু কম করিয়া প্রত্যেক ছেলেটিই যাহাতে তাহার সম্ভাবনার উপর অথবা বর্ত্তমান কৃতিত্বের উপর যতটা বাড়্তি কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল তাহা দেখিয়াই তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করিতে হইবে।

মোট কথা হইতেছে এই যে, ছাত্রকে যতটা সম্ভব "অন্তেবাসী" হইতে হইবে এবং গুরুকে যতটা সম্ভব ছাত্রের সহিত সহৃদয় পরিচয় ও আত্মীয়তা গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানের বড় বড় ক্লাশগুলিতে ছাত্রগণ শিক্ষকের নিকট শুধু "রোল নম্বর" (বড় জোর ঘোষ, বোস, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলোপাধি) দিয়া পরিচিত হয়। সুস্থ জাতিগঠনে ও ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

অভ্যাস

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় একটি ট্রেণ দুর্ঘটনায় একটি বাঘের খাঁচার দরজা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে বাঘটি মুক্তি পাইয়া বাহির হইয়া আসে। কিন্তু বহুকালের বন্দী-জীবনে অভ্যস্ত বাঘটি তাহার এই সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার দায়িত্বে এমনই দিশেহারা হইয়া পড়ে যে, পুনর্ব্বার খাঁচায় ফিরিয়া যাইয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। অভ্যাসের এমনই প্রভাব।

অভ্যাসের প্রভাব সম্বন্ধে আর একটি কাহিনীও খুব প্রচলিত আছে। বহুদিনের পুরাতন অবসরপ্রাপ্ত একটি সৈনিক দুই হাতে মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য লইয়া চলিতেছে। হঠাৎ কে একজন সামরিক আদেশের ভঙ্গীতে বলিল "এ্যাটেন্ সন্" (প্রস্তুত)! চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের প্রভাবে ঐ সৈনিকটি তৎক্ষণাৎ হাতের জিনিসপত্র ফেলিয়া দিয়া সামরিক কায়দায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই দুইটি কাহিনীই জেম্স-এর Principles of psychology গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, এই অভ্যাসের ফলেই দুর্গত মানুষ তাহার ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে মানিয়া লইয়া জীবনের গুরুভার টানিয়া চলে, ধনীর দুলালের বিরুদ্ধে তাহারা হিংসা ও বিদ্রোহের অভিযান চালায় না। ইহারই প্রভাবে খনির অন্ধকারের মধ্যে শ্রমিকেরা মুখ বুঁজিয়া কাজ করিয়া যায়, ঝড়-বৃষ্টি-শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া জেলেরা মাছধরার কাজ করিয়া যায়, নাবিকেরা নির্ব্বিবাদে জাহাজের "ডেকে" জীবন কাটায়। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট দুর্ভাগ্যকে আমরা হাসিমুখে বরণ করিয়া চলি এই অভ্যাসের প্রভাবেই।

ইহা অভ্যাসের একটি দিক। ইহার অন্য একটি দিকও আছে। অভ্যাসের ফলেই নৃত্য, কলা, গীত, বাদ্য, শিল্প, কারিগরী—প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করে। ইহারই প্রভাবে মানুষ সহস্র কাজের খুঁটিনাটি পরিকল্পনার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়া যান্ত্রিক অনুবর্ত্তনে কাজ করিয়া যায়; চলা, হাঁটা, কাপড়-জামা-পরা, হাট-বাজার-করা, লোক-লৌকিকতা করা ইত্যাদি প্রতিদিনের শত সহস্র কাজের ব্যাপারে মানুষকে মাথা ঘামাইতে

হয় না। অভ্যাসবশে সব আপনা-আপনি হইয়া যায়। এইটুকু না হইলে সহস্র প্রকার কাজের গোলমালে মানুষ ক্ষেপিয়া উঠিত।

মানুষের যাহা কিছু শিক্ষা দীক্ষা, তাহা অভ্যাসেরই অবদান। যে শিশু একদিন একটা "ওরাং ওটাং"-এর মত বিকৃত ভঙ্গীতে টলিতে টলিতে পদক্ষেপ করে, অভ্যাসের প্রভাবে সেই হইয়া উঠে উদয়শঙ্করের মত নৃত্য-শিল্পী। যে বালক একদিন হাঁস আঁকিতে যাইয়া হাঁসের ডিম আঁকিয়া বসিত, সেই হইয়া উঠে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, র‍্যাফেল, করেজিওর মত চিত্রশিল্পী। অভ্যাসের প্রভাবে তানসেন হইতে বিঠোভেন, ডিমস্থিনিস হইতে বার্ক্-সুরেন্দ্রনাথ, কলিদাস হইতে সেক্সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের জীবনে অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভা ও প্রবৃত্তি ইহাদের সাহায্য করিয়াছে বটে, তবে অভ্যাসই সেই প্রতিভা ও প্রবৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অভ্যাসের ফলে একটা কাজ যন্ত্রে করা কাজের মত সরল ও সহজ হইয়া উঠে। অভ্যস্ত কাজে মনের তরফ হইতে সচেতন আয়াসের প্রয়োজন হয় না, দেহ মনকেও সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয় না। অভ্যস্ত কাজ করিতে-করিতে আমরা অন্য আর একটা কাজও করিতে পারি, অন্য চিন্তাও করিতে পারি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পল্লীগ্রামের মেয়েদের ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটিবার সময় গাল-গল্প করা, খরিদ্দারদিগের সহিত দরদস্তুর করা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এ কাজটি সহজ নহে। এক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক হইলেই ঢেঁকির মুষলের আঘাতে হাত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের গুণে ঐরূপ বিপজ্জনক এবং জটিল কাজটুকুও যান্ত্রিকভাবে হইয়া যায়। ঐ কাজ করিবার জন্য ঊর্দ্ধ-মস্তিষ্ককে আর ব্যস্ত থাকিতে হয় না। ইহা শারীরিক অপচয় নিবারণ করে এবং প্রচেষ্টাকে নির্ভুল, ক্ষিপ্র, নিপুণ ও সুন্দর করিয়া তুলে। প্রথম শিক্ষার্থীর সাঁতারের চেষ্টার মধ্যে হাত পায়ের বহু ব্যর্থ উৎক্ষেপ ও আস্ফালন থাকে, অভ্যস্ত সাঁতারুর সাঁতারের মধ্যে এই ব্যর্থ আস্ফালন নাই, কিন্তু তাহার সংযত ভঙ্গীর মধ্যেই তাহার গতি হয় তীব্রতর এবং ভঙ্গিমা হয় সুন্দর।

এই 'সুন্দর' কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক অভ্যাস জিনিসটি নব নব সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যেরও জনক। আমরা "স্থিতিবাদ" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি পুনরাবৃত্তি (বা অভ্যাস) প্রগতির পরিপন্থী নহে, অভ্যাসের বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই দক্ষতার সৃষ্টি হয় এবং এই দক্ষতাই নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের, নূতন নূতন styleএর সৃষ্টি করে। দক্ষতা অর্জ্জনের জন্য যেমন অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, দক্ষতা রক্ষা করিবার জন্যও তেমনই অভ্যাসের প্রয়োজন হয় (পৃঃ ১৫৬ দ্রষ্টব্য)।

অভ্যাস শুধু যে কাজে নৈপুণ্য, ক্ষিপ্রতা, নির্ভুলতা প্রভৃতি তৈয়ারী করে তাহা নহে, ইহা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অসাধারণ মাত্রায় বাড়াইয়া তুলে। গ্রীক-পুরাণের "মিলো" (Milo) জগদ্বিখ্যাত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন শুধু অভ্যাসের গুণে। তিনি প্রতিদিন একটি বাছুরকে কাঁধে করিয়া ষ্টেডিয়ামের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন। বাছুরটি ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসের গুণে "মিলো"র শক্তিও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পরে যখন বাছুরটি পূর্ণবয়স্ক একটি ষাঁড় হইয়া উঠিল, তখনও "মিলো" পূর্ব্বের মতই তাহাকে তুলিতে পারিত। নিছক অভ্যাসের ফলেই এই অসম্ভব শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছিল।

"মিলো"র ব্যাপারটিকে অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, বর্ত্তমানের বাস্তব "মিলো"দের কথা অস্বীকার করা যায় না। এক হাতে ২৭৭½ পাউণ্ড "Bent Press" করা, দুই হাতে ৩৮৫ পাউণ্ড "clean & jerk" করা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু Joe Nordquest, John David প্রভৃতি ভারোত্তোলকগণ এসব কাজ অনায়াসেই করিয়াছেন।

অভ্যাস যে কি কাজ করিতে পারে না, তাহা হয়ত আমরা সঠিক জানি না। মানুষের দেহ মনের সাধারণ নিয়মগুলি পর্য্যন্ত অভ্যাসের দ্বারা বদ্‌লাইয়া যায়। De Quincy প্রতিদিন যতটা আফিং খাইতেন, তাহাতে বহু লোকের মৃত্যু হইতে পারিত। Coleridge-এর মাত্রাটিও কম ছিল না। আমাদের দেশের বিষ-কন্যাদের কথা অনেকেরই জানা আছে। ইহারা অভ্যাসের দ্বারা

শরীরের মধ্যে এতটা বিষ আত্মস্থ করিত যে, তাহাদের সংসর্গে আসিলে অপরের মৃত্যু হইত।

আহার নিদ্রা শীতাতপের সাধারণ নিয়মগুলিও অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ইহার প্রভাবেই নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবাগণ একবেলা আহার করিয়া সুস্থ শরীরে থাকেন এবং শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীরা হিমালয়ের বুকে বসিয়া তপস্যা করিয়া যান। ইহারই প্রভাবে আকবর, নেপোলিয়ান, নেতাজী প্রায় জিতনিদ্র হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন। স্বাস্থ্যের জন্য যে ন্যূনতম ছয় ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন, এই নিয়মটিও তাঁহাদের কাছে খাটিত না।

এই অভ্যাসের প্রভাবেই কলকারখানার গোলমালের মধ্যে কর্ম্মী-শিল্পীদের অভিনিবেশের অসুবিধা হয় না, ইহার ফলেই সহস্র চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে বর্ত্তমানের শহরের ছেলেরা পড়াশুনায় ব্যাঘাত বোধ করে না। ইহার ফলেই আমরা পোলো হইতে জাগ্‌লিং, সূচীশিল্প হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং, গণিত-বিজ্ঞান হইতে ইতিহাস ভূগোল, সেতার হইতে স্বরোদ, ঢোল হইতে পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম হইতে পিয়ানো সব কিছুই শিক্ষা করিতে পারি।

বস্তুতঃ শিক্ষা ও নৈপুণ্যের মূল কথাই হইতেছে অভ্যাস। শিক্ষার তত্ত্বকথা নামক প্রবন্ধে আমরা থর্ণডাইকের law of exercise, learning by successful variant, প্যাবলএর conditioned reaction প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এইগুলি এক হিসাবে অভ্যাসেরই নামান্তর। মনোবিদ্ যাহাকে conditioned হইয়া যাওয়া বলেন তাহাকেই সাধারণ লোকে "অভ্যাস হইয়া যাওয়া" বলে।

শিক্ষার স্থায়িত্বের একটা বড় সর্ত্ত হইতেছে "Over-learning"; এই Over-learning জিনিসটা অভ্যাসেরই অধিকতর সুযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। একটা প্রক্রিয়ার ফলে যদি কোনও একটা কিছু শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও বহুবার পুনরাবৃত্তি করার নামই Over-learning; এই over-learningএর আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ফলেই সদ্য-সমাপ্ত শিক্ষাটি স্থায়ী হয়, নতুবা তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মুছিয়া যায় ('স্মৃতি' পরিচ্ছেদে, ২৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিরাভ্যস্ত শিক্ষা এইভাবে

মুছিয়া যায় না। এইজন্যই অনেকদিন ধরিয়া একটা ভাষা শিক্ষার পর সেই ভাষার বর্ণমালা ভুলিয়া যাওয়া যায় না। এইজন্যই আমরা হাঁটিতে বা সাঁতার কাটিতে শিখিবার পর তাহা আর ভুলিয়া যাইতে পারি না, চির-পরিচিত আত্মীয়স্বজনের কণ্ঠস্বর ও চলন-ভঙ্গিমা ভুলিতে পারি না।

অভ্যাসের দেহ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

জেমস্ বলিয়াছেন, অভ্যাসের তত্ত্বটি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার ততটা নহে, যতটা হইতেছে পদার্থ-বিদ্যার তত্ত্ব। যে জৈবপদার্থ দিয়া আমাদের দেহ নির্ম্মিত, তাহারই মধ্যে ইহার তত্ত্ব নিহিত আছে। M. Leon Dumont দেখাইয়াছেন, একেবারে নূতন পোষাকের চেয়ে যে পোষাকটি একবার পরা হইয়াছে, তাহা গায়ে ভাল ফিট্ করে, যে চাবিটি কয়েকবার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা ভালভাবে কাজ করে, যে কাগজটিকে একবার ভাঁজ করা হইয়াছে, সেই ভাঁজ কাগজটি সহজেই মুড়িয়া যায়। একটি মচ্কান পা আবার মচ্কাইয়া যায়, হাড়-সরিয়া-যাওয়া-হাতখানি আবার সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাই হইল সমস্ত পদার্থের নিয়ম। নরদেহটাও যখন জৈবপদার্থে তৈয়ারী, ইহার মধ্যেও এই নিয়মটি খাটে। বস্তুতঃ মানুষ হইতেছে কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র; তাহা চলা-ফিরার দিক দিয়াও বটে, প্রক্ষোভের দিক দিয়াও বটে, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়াও বটে। তাই Dr. Carpenter বলিয়াছেন, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক সেই ভাবেই তৈয়ারী হইয়াছে, যেভাবে অভ্যাস করিয়া আমরা তাহাকে তৈয়ারী করিয়াছি।

পদার্থের নিয়মই হইতেছে এই যে, তাহার উপর একটা কিছু পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে তাহাতে সে প্রথমতঃ বাধাই দেয়। কিন্তু পরে আবার সে যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইল, সেই ভাবেই থাকিতে চায়; নূতন পরিবর্ত্তন চায় না। অভ্যাসের মূল কথাটি ইহারই মধ্যে নিহিত আছে; প্রথম বারে যেভাবে কাজটি করা হইল, দ্বিতীয় বারে সেইভাবেই সেটি নিষ্পন্ন হইতে চায়, তৃতীয় বারেও তাই; ক্রমশঃ ব্যাপারটা সরল ও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। কিভাবে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা সম্ভব হয়?

আমরা জানি, যখনই আমরা একটা কিছু কাজ করি, তখনই আমাদের

স্নায়ুগুলির মধ্য দিয়া একটা কর্ম্মনির্দ্দেশের তরঙ্গ বহিয়া যায়। দ্বিতীয়বার যখন আবার সেই জাতীয় কাজ করা হয়, তখন প্রথম-তরঙ্গ-খিন্ন-খাত-কাটা পথ বহিয়াই দ্বিতীয় তরঙ্গ-স্রোতটি চলে; খাতটি তখনও তেমন গভীর হয় নাই বলিয়া তরঙ্গ-স্রোতটি হয়ত একটু এদিক-ওদিক চলিতে পারে, কিন্তু বহুবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির পর খাতটি গভীর হইয়া যায়, তখন আর ভুল প্রক্রিয়া ('শরীর-মানস-যন্ত্র' এবং 'স্মৃতি'-নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) হয় না। অভ্যাসজনিত দক্ষতা সাইন্যাপ্‌স্‌-এর বাধা ভাঙ্গিয়া এই স্নায়ুতরঙ্গের সরলতর যাত্রাপথের ব্যাপার মাত্র। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রায় ১১ শত কোটি স্নায়ুকোষ আছে এবং প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষের প্রান্তে বহুসংখ্যক স্নায়ুকেশ (dendron) আছে। যে কোনও একটি স্নায়ুকেশের পথ বহিয়া জ্ঞান-বহা অথবা কর্ম্ম-বহা স্নায়ুনির্দ্দেশের তরঙ্গ বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে কোটি-কোটি পথ কাটিয়া চলিতে পারে এবং কোটি-কোটি প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই এক-একটি উদ্দীপকের অসংখ্য-প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। এই অসংখ্য প্রকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মধ্য হইতে যতই আমরা সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলি খুঁজিয়া পাই, ততই নিরর্থক প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে, ব্যর্থ অঙ্গচালনার অপচয় নিবারিত হইতে থাকে এবং আমাদের কাজ ক্ষিপ্র, নির্ভুল ও সুন্দর হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" স্নায়ুনির্দ্দেশের ক্ষেত্রেও স্নায়ুতরঙ্গের চলার বেগে স্নায়ুর রাজ্যে খাত কাটিয়া যায় এবং অভ্যাস যতই দৃঢ় হয়, ঐ খাতটি ততই গভীর হইয়া উঠে। তখন স্নায়ুতরঙ্গ ঐ খাত-কাটা পথ হইতে ছিট্‌কাইয়া অন্যপথে ছুটিতে পারে না, অর্থাৎ আর ব্যর্থ-প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তি হইতে পারে না, প্রতিক্রিয়াটা যান্ত্রিক হইয়া উঠে। এই যান্ত্রিক নির্ভুলতা যখন আয়ত্ত হয়, তখনই একটা অভ্যস্ত কাজ করিবার সময় উর্দ্ধ-মস্তিষ্ক অন্য কোনও কাজে মন দিতে পারে।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

কোন কোন মনোবিদের মতে, অভ্যাস হইতেছে অর্জ্জিত নৈপুণ্য, আর প্রবৃত্তি হইতেছে সহজাত নৈপুণ্য। তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তিগুলিই হইতেছে

চরিত্র গঠনের কাঁচা মাল, অভ্যাসের দ্বারা এই কাঁচা মাল হইতে চরিত্রকে গঠিত করিতে হইবে। প্রবৃত্তিগুলি শৈশবেই শক্তিশালী থাকে এবং শৈশবেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। অভ্যাসে এইগুলি দূরীভূত হয় এবং অনভ্যাসে এগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার পর অভ্যাসের দ্বারাও এগুলিকে সহজে সতেজ করিয়া তোলা যায় না। সুতরাং শিশু বয়সেই সময় থাকিতে-থাকিতে সুঅভ্যাস গঠনের দ্বারা যতগুলি ভাল প্রবৃত্তিকে সুসংস্কৃত করিয়া লওয়া যায়, ততই ভাল। অর্থাৎ "Strike while the iron is hot."

এই সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। আমরা জানি সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই সমানভাবে উৎসাহিত করা উচিত নহে। একটি গাড়ীতে যদি দুইটি ঘোড়া থাকে এবং সেই দুইটি ঘোড়ার মধ্যে যদি একটি দুর্ব্বল এবং আর একটি সবল হয়, তাহা হইলে দুইটি ঘোড়াকেই সমানভাবে চাবুক মারিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। সবল ঘোড়াটির রাশ টানিয়া রাখিতে হইবে, আর দুর্ব্বলটিকে ছুটিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে, তবেই গাড়ী ঠিকমত চলিবে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সব প্রবৃত্তিগুলি সমান শক্তিশালী নয়। কাজেই অভ্যাসের দ্বারা কোনও প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে, কোনও প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কোনও প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে, কোনওটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

এইখানে একটি কথা আছে। অভ্যাস দিয়া যদি প্রবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করা যায়, তাহা হইলে অভ্যাস কি প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী? অভ্যাসের সহিত প্রবৃত্তির সম্পর্ক কিরূপ? সাধারণ লোকে মনে করে অভ্যাস হইতেছে দ্বিতীয় প্রবৃত্তি অথবা প্রকৃতি (Habit is a second nature)। অধ্যাপক Gates বলেন, দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি কার্য্যতঃ একই জিনিস (Psychology for students of education পৃঃ ২৩৩), আবার Duke of Wellington বলিয়াছেন "অভ্যাস প্রবৃত্তির দশগুণ শক্তিশালী!"

ম্যাক্‌ডুগাল কিন্তু এতটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অভ্যাস প্রবৃত্তিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বটে, তবে সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার শক্তি অভ্যাসের নাই। বুনো হাঁসকে জন্ম হইতেই

ডানা কাটিয়া মুরগীর সহিত একত্র পালিত করিলে সে উড়িবার অভ্যাস করিতে সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু যখনই তাহার ডানা গজাইবে তখনই সে সুযোগ পাইলে উড়িয়া যাইবে। এখানে প্রবৃত্তির (instinct) জয়ই ঘোষিত হয়। ম্যাকডুগ্যাল বলেন, প্রবৃত্তির একান্ত বিরোধী ব্যাপারে জোর করিয়া অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করিলে প্রাণীরা মনের দুঃখে শুকাইয়া মরিয়া যায়।

আমাদের মনে হয়, চরিত্র গঠন ব্যাপারে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে কার শক্তি বেশী এই বিচারটা বড় কথা নহে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, অভ্যাস দুর্ব্বলতর হইলেও তাহা দ্বারা প্রবৃত্তিকে শাসিত বা সংযত করা সম্ভব। মাটির কলসীর ঘর্ষণে পুকুর-ঘাটের কঠিন শিলাখণ্ডটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ মাটির কলসী শিলাখণ্ডের চেয়ে নিশ্চয়ই নরম। এই শক্তির তারতম্য ছাড়া অভ্যাসের সহিত প্রবৃত্তির আর একটু পার্থক্য আছে। ম্যাক্ডুগাল্-বর্ণিত প্রবৃত্তি হইতেছে গোষ্ঠীর মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু অভ্যাস জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর প্রবৃত্তির সহিত প্রক্ষোভের যে একটা সম্পর্ক আছে, অভ্যাসের সহিত তাহা নাই।

অভ্যাস, স্মৃতি ও অনুষঙ্গ

স্নায়ুতরঙ্গের গতিপথ দিয়াই এই তিনটি জিনিসের ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা যখনই কোনও একটা উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া করি, তখনই স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া একটা তরঙ্গ-স্রোতজনিত "খাত"-এর সৃষ্টি হয়। একই প্রকার উদ্দীপকে বার বার একই প্রকার প্রতিক্রিয়া করিলে স্নায়ুখাতটি গভীরতর হয় এবং পূর্ব্বকৃত কাজগুলি সহজতর হইয়া উঠে। এই ব্যাপারটির নাম অভ্যাস।

স্মৃতি এই অভ্যাসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতীত প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি যখন আরও আত্মসচেতনভাবে করা হয় তখনই আসে স্মৃতির কাজ।

স্নায়ু-নির্দ্দেশের তরঙ্গ-স্রোত যখন ঠিক নেমিখিন্ন পথে চলাচল করে, তখন হয় অভ্যাস বা স্মৃতির কাজ। আর এই স্রোতটি যখন সাইন্যাপ্স-এর মোড়ের মাথায় আসিয়া সোজা পথে চলিতে-চলিতে হঠাৎ একটি গলির পথ বহিয়া দক্ষিণে-বামে ছুটিয়া চলে এবং একটি অভিজ্ঞতার সহিত কাছাকাছি অন্য একটি অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করিয়া দেয়, তখন হয় অনুষঙ্গের কাজ। এই

অনুষঙ্গের ফলে একটি কথা হইতে অন্য একটি কথা মনে পড়িয়া যায়, একটি ঘটনার সহিত কাছাকাছি (বা এক জাতীয়) অন্য একটি ঘটনার গাঁট্‌ছড়া বাঁধিয়া যায়, ফলে একটি ঘটনা ঘটিলেই অন্য ঘটনাটিও মনে পড়িয়া যায়।

অভ্যাস, শিক্ষা ও চরিত্র

শিক্ষার মূল তত্ত্বটি "চেষ্টা ও ভ্রান্তিই" হউক, অথবা "কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াই" হউক, ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একটা বন্ধনী সৃষ্টির ব্যাপার আছে। থর্ণডাইকের Law of exercise এবং আচরণবাদীদের law of reinforcement সূত্র দ্বারা এই বন্ধনীকে দৃঢ়ীভূত করিবার নির্দ্দেশই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অভ্যাসেরই জয়গান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষার স্থায়িত্ব, সফলতা এবং দক্ষতার দিক দিয়া অভ্যাসের অবদান অসামান্য।

চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও অভ্যাসের অবদান সামান্য নহে। অধ্যাপক Gates বলিয়াছেন, একটি সুসমঞ্জস এবং সুগঠিত (integrated) চরিত্র হইতেছে দীর্ঘদিনের নিয়মিত অভ্যাসের ফল মাত্র। W. Jamesও চরিত্র গঠন সম্পর্কে অভ্যাসের উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন, "পরলোকে যে নরক ভোগ করিতে হইল বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই নরকটি আমাদের ইহজগতের নিজ-হাতে-গড়া নরকের চেয়ে ভীষণতর নহে। অভ্যাসের বশে ভুলভাবে চরিত্র গঠিত করিয়া এই দুঃখের নরক আমরা সৃষ্টি করি। যুবকরা যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে শীঘ্রই তাহারা কতকগুলি অভ্যাসের চলমান 'বাণ্ডিল' (bundles of habit) মাত্র হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাহাদের আচরণগুলি দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বে সেইগুলিকে ভালভাবে গঠিত করিবার জন্য তাহারা একটু বেশী যত্ন লইত। আমরা প্রতিদিনই আমাদের যে ভাগ্যকে তৈয়ারী করিতেছি, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক সহজে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। পুণ্য পাপের সামান্য আঁচড়টুকু স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। Jeffirson-এর নাটকের মাতাল রিপ্ ভ্যান্ উইন্‌কিল্ প্রত্যেকটি ক্রটির পরই হয়ত বলিবে 'যাক্ এবারটা ছাড়িয়া দাও, এবারটা গুণিব না'; ভাল, সে হয়ত গণনা নাও করিতে পারে, এবং হয়ত দয়ালু বিধাতাও গণনা না করিতে পারেন, কিন্তু তবুও ইহাকে ঠিকই গণনা করা হইবে। স্নায়ুকোষের গভীরতম

তলদেশে শরীরের অণুপরমাণুগুলি ইহার গণনা করিতেছে, হিসাব রাখিতেছে এবং পরবর্ত্তী প্রলোভনের সময় তাহার বিরুদ্ধে সেগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। আমরা যাহা কিছুই করি না কেন, কঠোর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহা কিছুতেই মুছিয়া যায় না। অবশ্য ইহার ভালমন্দ দুই দিকই আছে। বার বার মদ্যপানের পর যেমন আমরা ক্রমশঃ পাকা মাতাল হইয়া উঠি, তেমনই বিভিন্ন সময়ে কাজের মাধ্যমে নীতির ক্ষেত্রে আমরা সাধুসন্ত হইয়া উঠি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হইয়া উঠি দক্ষ কাজের লোক, আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হইয়া উঠি বিশেষজ্ঞ 'পণ্ডিত'।"

অভ্যাসের ফলেই এই পরিণতিটি সম্ভব হয়।

জেমস্এর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে, যখন মনস্তত্ত্বে স্নায়ুস্রোতের অবদান আদৌ প্রমাণিত হয় নাই, তখনও চরিত্র-গঠনের জন্য অভ্যাসের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক Aristotle ধর্ম্ম জীবনের জন্য অভ্যাস গঠনের উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। Aristotleএর পূর্ব্ব-সূরী Socrates কিন্তু জ্ঞানকেই ধর্ম্ম জীবনের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সক্রেটিসও ভুল করেন নাই; কারণ অভ্যাসের নেমি-খিন্ন পথে চলিতে চলিতে আমরা প্রায়ই নিয়মের দাস হইয়া আচার-অনুষ্ঠানকেই বড় বলিয়া মনে করি, আর বিচারের শক্তি হারাইয়া ফেলি। ইহাতে আমাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয় না। বার্গসঁ (Bergson)-ও বলিয়াছেন, অভ্যাসের অন্ধ আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ তাহার সৃজনী শক্তিকে বিনষ্ট করে।

তাহা হইলে চরিত্র গঠনের দিক দিয়া অভ্যাসের উপযোগিতা কতটুকু? জ্ঞান ও অভ্যাসের মীমাংসাই বা কী? অভ্যাসেরই বা স্বরূপটি কি?

Mather বলিয়াছেন, কোনও একটি কাজকে যান্ত্রিকভাবে করিবার জন্য অর্জ্জিত নৈপুণ্যের নামই অভ্যাস (Habit is an acquired aptitude for some particular mode of automatic action)। এইরূপ automatic actionএর একটা বিপদও আছে। যান্ত্রিকভাবে কাজ করিবার ফলে অভ্যস্ত কাজটি যখন একটা অন্ধ পুনরাবৃত্তির সৃষ্টি করে, এবং নিষ্ঠাহীন গতানুগতিক আচারে পর্য্যবসিত হয়, তখনই তাহার মূল্য কমিয়া যায়।

এই গতানুগতিকতা অনেক সময় আমাদের চিন্তার মধ্যে একটা ঢিলা ভাব লইয়া আসে এবং গতানুগতিকতার পথে চলিতে চলিতে আমরা আর নূতন পথে চলিবার সুযোগও পাই না, নূতন সত্যকেও বুঝিতে পারি না। তখন নীতির ক্ষেত্রে আমরা গোঁড়ামির আবর্ত্তে পড়িয়া স্বাধীন চিন্তা হারাই, আর শিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত টেক্‌নিকের দলে পড়িয়া সৃজনী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করি, ফলে আমাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয় না।

'স্থিতিবাদ' নামক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, অভ্যাসের বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হয়, আবার এখন বলিতেছি অভ্যাস সৃজনী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিরোধী মতবাদের সমন্বয় কি? অভ্যাসের মধ্যে যদি ক্রমাগত উন্নতির অভিযানের মনোভাবটি বজায় থাকে, তাহা হইলেই অভ্যাস নব নব দক্ষতা দান করিয়া নব নব সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করে; আর অভ্যাসের অর্থ যদি হয় গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসান দেওয়া, তাহা হইলে অভ্যাস সৃজনীশক্তিকে ব্যাহত করে।

কাজেই চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়াই হউক আর সৃজনী শক্তির দিক দিয়াই হউক, অভ্যাসকে সার্থক করিতে হইলে অভ্যাসের লক্ষ্য-বস্তুকে জ্ঞানের দ্বারা স্থির রাখিতে হইবে এবং অভ্যাসের প্রচেষ্টাকে সদা-জাগ্রত ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা প্রতিনিয়তই পরিচালিত করিয়া সাধনার অভিযানটি চালাইয়া যাইতে হইবে। এইভাবে কাজ করিলেই কর্ম্মহীন (বা অভ্যাসহীন) জ্ঞানের ব্যর্থতা, আর জ্ঞানহীন অভ্যাসের ব্যর্থতার সমন্বয় হয়—এরিষ্টোটল্ এবং সক্রেটিসের বিরোধী মনোভাবেরও মীমাংসা হয় এবং অভ্যাসের দ্বারা খাঁটি চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব হয়। তবে এই চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে আরও দুই একটি কথা জানা দরকার।

মনের সম্মতি (প্রক্ষোভমূলক) না থাকিলে যান্ত্রিক অভ্যাস আমাদের কোনও স্থায়ী উপকার করিতে পারে না। যে বালক বাপের শাসনের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে অক্ষম ঘৃণা এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ দিয়া লেখাপড়া করিতে বাধ্য হয়, পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও রস (sentiment) তৈয়ারী হয় না, ফলে এই অনিচ্ছুক পড়াশুনাটা তাহাকে পাণ্ডিত্য দিতে পারে না। এই জন্যই A. A Milnerর "The boy comes home" নাটকের নায়ক Philip সৈন্য

বিভাগে দীর্ঘ চার বৎসর প্রাতরুত্থানে অভ্যস্ত হইয়াও ভোরে উঠাটা অভ্যাস করিতে পারে নাই। এইজন্যই Puritan যুগে ঘাড়ে-চাপান সংযম-অভ্যাসটা ইংলণ্ডের লোকের চিত্তে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই দেখা যায়, Restoration যুগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সুদে আসলে তাহাদের অবদমিত কামনার সাধ মিটাইয়া লইয়াছিল।

জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যটাও স্থির না থাকিলে যান্ত্রিক অভ্যাস আমাদের তেমন কোনও উপকার করিতে পারে না। যে বালক না বুঝিয়া "নরঃ নরৌ নরাঃ" মুখস্ত করে, সে অনুবাদ করিবার সময় তাহার অভ্যস্ত বিদ্যাকে বিশেষ কাজে লাগাইতে পারে না। কাজেই অভ্যাসকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে অভ্যাসের সহিত চির-জাগ্রত ইচ্ছাশক্তি, আবেগ এবং জ্ঞানের সমন্বয় করিতে হইবে। তখন অভ্যাসের অর্থ হইবে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসান দেওয়া নহে, অর্জ্জিত নৈপুণ্যের সাহায্যে সাধনার অভিযান চালাইয়া যাওয়া। অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার আরম্ভ, বর্ত্তমানের নৈপুণ্যের মধ্যে ইহার বিকাশ এবং ভবিষ্যতের নব নব সৃষ্টির দিকে ইহার গতি। বর্ত্তমানের দক্ষতায় এবং যান্ত্রিক অনুবর্ত্তনেই ইহার পরিসমাপ্তি নহে। জন্ ডিউইও অভ্যাসের এই অবিচ্ছিন্নতা (continuity) এবং ভবিষ্যৎ-মুখিতার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অভ্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, আমরা (কর্ত্তা বা কর্ম্ম হিসাবে) যাহা কিছু অনুভব করি, তাহার প্রত্যেকটিই অনুভবকারীকে খানিকটা পরিবর্ত্তিত করে এবং ঐ পরিবর্ত্তনটি অনুভবকারীর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাহার ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাগুলির বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়।" সুতরাং সাধারণ লোকে যে মনে করে অভ্যাস জিনিসটা হইতেছে মোটামুটি বাঁধা ধরা উপায়ে কাজ করিয়া যাওয়া মাত্র, তাহা ঠিক নহে। অভ্যাসের ব্যঞ্জনাটা আরও সুদূরপ্রসারী।

ভাল অভ্যাস গঠনের কৌশল

আমরা দেখিয়াছি, অভ্যাস শিক্ষাকে স্থায়ী ও নিপুণ করিয়া তুলে এবং অভ্যাসের দ্বারাই আমরা অধিকাংশ জিনিস শিখি। "শিক্ষার তত্ত্বকথা"

নামক পরিচ্ছেদে শিক্ষার ব্যবহারিক কৌশল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি আলোচিত হইয়াছে তার অধিকাংশই অভ্যাস-গঠনেও প্রযুজ্য।

বন্ধনীবাদ ও অভ্যাস: থর্ণডাইকের law of effect হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অভ্যাসকে তৃপ্তিকর করিতে হইবে। অভ্যাসের প্রক্রিয়াকে ক্রম-কঠোর করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা অতি ধীরে ধীরে করিতে হইবে। অভ্যাস গঠনের সময় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়া দিয়া "মুখতাড়া" দিতে নাই, তাহাতে বন্ধনী শিথিল হইয়া যাইবে। Law of effect হইতে আরও বুঝা যায় যে, অভ্যাসের সময় পুরস্কারের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। শিশুদিগকে যথাযথভাবে উৎসাহ দিয়া এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিষ্টকথা বা দামী জিনিস উপহার দিয়াই যে পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা নহে। শিক্ষার সফলতা এবং সেই সফলতার স্বীকৃতিটাও খুব বড় পুরস্কার। এই সফলতা সৃষ্টির জন্য পাঠ্যবস্তুকে ক্রম-কঠোর করা এবং ছাত্রের প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত সাহায্য করার প্রয়োজন আছে। ভ্রান্ত বন্ধনীর সৃষ্টি যাহাতে না হয়, সেইজন্য অভ্যাসের প্রক্রিয়াগুলিকে একই ভাবে করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ ও অভ্যাস: প্রলোভনে পড়িয়া অভ্যস্ত শিক্ষাটি যাহাতে ব্যাহত (inhibited or unconditioned) না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে প্রলোভন হইতে দূরে রক্ষা করিতে হইবে। অভ্যাসটি ঠিক অভ্যস্ত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বন্ধনটি যাহাতে ক্রমশঃই দৃঢ়ীভূত হয় সেইজন্য অভ্যাসের সাধনার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনভ্যাসে যাহাতে বন্ধনীটি মুছিয়া না যায় সেজন্য অভ্যাসকে নিত্য-প্রতিপাল্য কর্তব্য বোধে করাইতে হইবে। দেখিতে হইবে একদিনের জন্যও যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়।

অভ্যাস সাধনায় কোনও দিন যদি ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে পরবর্তী দিনে অতিরিক্ত অনুশীলনী দ্বারা ব্যাঘাতকে ব্যাহত করিতে হইবে (inhibitions may be inhibited : পৃঃ ২৩১)। তবে এই অনুশীলনটি

"ব্যাগার" বলিয়া মনে করিলে ফল ভাল হইবে না। ইহাকে পবিত্র কর্ত্তব্য অথবা ভালবাসার জিনিস বলিয়া মনে করিয়া যাইতে হইবে।

"Telescoping out"-এর ব্যাপারে (২৪৪ পৃঃ) আমরা দেখিয়াছি যে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসে অনেক সময় শুধু অহেতুক কালক্ষয় হয়। সুতরাং অভ্যাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধেও ছাত্রদের সজাগ রাখিতে হইবে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি বয়স্কদিগের চেয়ে শিশুদিগের উপর অধিক কার্য্যকরী হয় (পৃঃ ২৩১)। সুতরাং অল্প বয়সেই যত বেশী সংখ্যক ভাল অভ্যাস করান যায়, সেই দিকে অভিভাবকদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গেস্‌টাল্ট্ মতবাদ ও অভ্যাস ঃ গেস্‌টাল্ট্ মতবাদের একটা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হইতেছে "অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধি"। এই মতবাদ অনুসারে নিছক যান্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধিই শিক্ষার পক্ষে বেশী সহায়ক। সুতরাং অভ্যাসকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে (পৃঃ ২৪৮)—অর্থাৎ অভ্যাসের প্রতিক্রিয়াটা কেন যে করা হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রকে অভ্যাসের ব্যবহারিক নির্দ্দেশটি দিতে হইবে। অন্ধ অনুশীলনে তাহাকে নিয়মের দাস করিবার কোনও সার্থকতা নাই। নিয়মটা কেন হইল, তাহার উপলব্ধিটা জাগাইতে হইবে এবং দেখাইয়া দিতে হইবে, তত্ত্ব দিয়া যাহা বুঝান হইয়াছে, ব্যবহারিক দিক দিয়াও তাহা সত্য।

অভ্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক জেমস্-এর সূত্র

"Talks to teachers" গ্রন্থে অধ্যাপক জেমস্ (Bain-এর 'moral habit' নামক পরিচ্ছেদের প্রদর্শিত পথে) ভাল অভ্যাস গঠন এবং মন্দ অভ্যাস বর্জ্জন সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন ঃ

প্রথম সূত্র ঃ "নূতন অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের উচিত যতটা সম্ভব মনের জোর (initiative) লইয়া কাজ আরম্ভ করা। যে-সমস্ত ঘটনা এই জোরটিকে আরও দৃঢ়তর করে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কাজের রুটিন এমনভাবে বদলাইয়া দিতে হইবে যাহাতে নতন অভ্যাস সম্বন্ধে

শিথিলতার অবকাশই না থাকে। প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের কাছে শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতি চলিতে পারে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ "নূতন অভ্যাসটি যতক্ষণ না দৃঢ়ীভূত হয় ততক্ষণ কিছুতেই ব্যাতক্রম হইতে না দেওয়া।" একটি সূতার তাল গুটাইতে গুটাইতে একবার মাত্রও যদি তাহা হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনেক পাক গুটাইবার ফল ব্যর্থ হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। একটি বারের পরাজয় বহুবারের জয়ের সঞ্চিত ফলকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। কাজেই অভ্যাস সৃষ্টির মূল তত্ত্বটি হইতেছে যতক্ষণ না পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন দ্বারা শক্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটানা বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়া অভ্যাসকে চালাইয়া যাইতে হইবে।

তৃতীয় সূত্র ঃ "যে অভ্যাস গঠনের জন্য মনস্থ করিয়াছ তাহা প্রথম সুযোগের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাও।" ব্যবহারিক জীবনে যদি অভ্যাসকে আচরণের মধ্য দিয়া কাজে লাগান না হয়, তাহা হইলে শুধু নীতিবাক্যে বিশেষ কিছু মঙ্গল হয় না।

চতুর্থ সূত্র ঃ "ছাত্রদের কাছে নিছক উপদেশ বেশী দিও না।" ভাল উপদেশের চেয়ে ভাল অভ্যাসের আচরণটাই মূল্যবান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের যাহা কিছু কাম্য, তাহা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আচরণের মূল্য দিয়াই কিনিতে হয়।

পঞ্চম সূত্র ঃ "কাজ করিবার শক্তিটিকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য প্রতিদিন একটু করিয়া স্বেচ্ছাকৃত অভ্যাস করিয়া যাইও।" ইহার ফল হয়ত সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় না। তথাপি এই সন্ন্যাসী-কৃত্যের একটা বিরাট্ মূল্য আছে। ইন্‌সিওরেন্স্-এর প্রিমিয়াম্ যেমন বিপদের সময়েই তাহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেয়, ইহাও অনেকটা সেইরূপভাবে কাজ করে।

মন্দ অভ্যাস বর্জ্জন করিবার কৌশল

চরিত্র গঠনের জন্য সময়মত অভ্যাস গঠনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই মন্দ অভ্যাস বর্জ্জনেরও প্রয়োজন আছে। ভ্রান্ত শিক্ষার দোষে আমাদের অনেকের মধ্যেই বহু মন্দ অভ্যাস তৈয়ারী হইয়া যায়। চা, দোক্তা,

নস্য, আফিং, মদ প্রভৃতির নেশা, দেরী করিয়া শয্যা ত্যাগ, বাজে আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করা, হাল্কাভাবে ইয়ার্কি করা, হঠাৎ রূঢ় মন্তব্য করা প্রভৃতি অভ্যাস বহু লোকের মধ্যেই আছে। এগুলি বর্জ্জন করিবার নিয়ম কি ?

দুইটি উপায় আছে। একটি হইতেছে মন্দ অভ্যাসটিকে ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ফেলা (Tapering off), আর একটি হইতেছে একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দেওয়া। ধরা যাইল—আমি দিনে দশ কাপ করিয়া চা পান করি এবং এই অভ্যাসটি আমি ছাড়িতে চাই। কি ভাবে তাহা করিব ? দশ কাপ হইতে আট কাপ, তাহার পর ছ কাপ, পরে চার কাপ, শেষে দুই কাপ—এই ভাবে তাহা ছাড়িব ? অথবা একেবারেই চা পানটা বন্ধ করিয়া দিব ? ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ফেলার মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার ভাব থাকে, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই দুর্ব্বল ইচ্ছা শক্তি দিয়া তেমন লড়াই করা চলে না। ফলে প্রলোভন নূতন করিয়া জয়ী হইতে পারে। তখন শিথিল ইচ্ছাশক্তি শিথিলতর হইয়া যায়, মন্দ অভ্যাসটি আরও চাপিয়া বসে এবং ভবিষ্যতেও তাহাকে জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহার চেয়ে তীব্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই হত্যা করা ভাল। আফিং প্রভৃতি নেশার ক্ষেত্রে বহুদিনের অভ্যাসটা হঠাৎ ছাড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়াটা খুবই কষ্টকর হয় সত্য। তবু তাহা একেবারেই ছাড়া উচিত, তাহাতে কষ্ট হয় হউক, প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয় সেও ভাল, কিন্তু দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি দিয়া চির-লালিত অভ্যাসের সহিত সংগ্রাম করিতে নাই। এইভাবে মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই বর্জ্জন করিলে দুই দিন খুব কষ্ট ভোগের পর অভ্যাসের নাগপাশ কাটাইয়া উঠা হয়ত সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু ধীরে ধীরে এই কাজ করিতে হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা-শক্তির উত্তাপ কমিয়া যায় এবং আদিম জড়তার (inertia) প্রভাবে প্রাচীন অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়া উঠে। এই জন্যই তীব্র ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে মন্দ অভ্যাস কাটান প্রায় অসম্ভব।

নির্জ্ঞান মানস ও শিক্ষাতত্ত্ব
[ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ]

মনোবিদ্যার রাজ্যে ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেতন-মানসটাকেই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করা হইত। এমন কি আচরণবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়, যাঁহারা মনের অস্তিত্বকেই স্বীকার করিতেন না, তাঁহারাও মানুষের সংজ্ঞান (বা চেতন) আচরণ লইয়াই তাঁহাদের গবেষণার অভিযান চালাইয়াছেন। নির্জ্ঞান মানসের অস্তিত্ব, তাহার ক্রিয়া-কলাপ, সংজ্ঞান মনের উপর তাহার সম্ভাব্য প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি লইয়া কেহই তেমন ভাবে কিছু আলোচনা করেন নাই।

নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে প্রথম সমর্থভাবে আলোচনা করিলেন ফ্রয়েড্। নির্ভীক কণ্ঠে তিনিই প্রথম বলেন যে, আমাদের আচরণের উপর নির্জ্ঞানের প্রভাব সংজ্ঞানের চেয়েও বেশী। এই সিদ্ধান্ত করিয়া হয়ত ফ্রয়েডও খানিকটা একদেশদর্শিতা জনিত ভুল করিয়াছেন। তবে তাঁহার ভুলটিই তাঁহার পূর্ব্বসূরীদের ভুলকে আঘাত করিয়া আমাদিগকে সত্যানুসন্ধানে পথ ও প্রেরণা দিয়াছে। তাই আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাত্রদের ঠিকমত চিনিতে ও বুঝিতে হইলে তাহাদের নির্জ্ঞানের রহস্য বুঝিতে হইবে। সেইজন্যই বর্ত্তমানের Educational psychologyতেও ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত নির্জ্ঞান তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ অবশ্যই আলোচ্য।

মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস ও বিবর্ত্তন ঃ

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকডুগাল মন্তব্য করিয়াছেন, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যাহা করিয়াছেন আরিষ্টট্‌লএর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই ততটা করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক ফ্রয়েডের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রটি ছিল স্নায়ুতত্ত্ব ও অধিবিদ্যার (metaphysics) মধ্যবর্ত্তী একটা উষর প্রান্তর মাত্র। এই শুষ্ক উষর পতিত জমির উপরই ফ্রয়েড যে সোনার ফসল ফলাইয়াছেন তাহা যেমনই নূতন, তেমনই বৈচিত্র্যময়। তাঁহার চিন্তাধারার নূতনত্ব

আমাদের এমনই আঘাত করিয়াছে যে, আমরা চমকিত হইয়া উঠিয়াছি। ফলে কেহবা ফ্রয়েড্‌কে লইয়া মাথায় করিয়া নাচিয়াছে, কেহবা তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়া অপাংক্তেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ ফ্রয়েডকে লইয়া যত বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলি উঠিয়াছে,—আজ পর্য্যন্ত কোনও মনস্তাত্ত্বিককে লইয়া ততটা হয় নাই। অথচ ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে নূতন অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হয় নাই। উদ্বায়ু (neurosis) রোগের চিকিৎসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়াই ইহার প্রথম উৎপত্তি। ডাঃ ব্রিলের (Dr. Brill) মতে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার। ডারউইন্, নিউটন্, স্পিনোজা, আইনষ্টাইন্ প্রভৃতি মনীষীদের মত ফ্রয়েডের মতবাদও প্রথমে পাইয়াছে বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান, পরে অপ্রতিবিধেয় ভাবে অধিকার করিয়াছে সমর্থন। ইহার মধ্যে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ সাধারণ মানুষ হইতেছে শ্বেত-শ্মশ্রু প্রাচীনপন্থী সন্ন্যাসীর মত; সে অশাস্ত্রীয় নূতন জিনিসকে সহজে আমল দিতে চায় না—ফ্রয়েডকেও দেয় নাই।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার (বর্ত্তমানে জেকোশ্লাভিয়া) এক ইহুদী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তবে এইজন্য ফ্রয়েডের পড়াশুনার ক্ষতি হয় নাই, তিনি ক্লাশে ভাল ছাত্রই ছিলেন।

ফ্রয়েডের প্রতিভা কোন ক্ষেত্র লইয়া যে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহার যেন কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই সময়ে ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিল এবং তিনি খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যাকেই গ্রহণ করিলেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি ছাত্র হিসাবে ফ্রয়েড ভর্ত্তি হইলেন।

ডাক্তারি পেশাটির প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ ছিল না, তবে স্নায়ু তত্ত্ব ও শরীর তত্ত্বটি তাঁহার ভালই লাগিত। ইহুদী বলিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনা কম ছিল না। এই লাঞ্ছনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইল বিদ্রোহ। সমাজের ধিক্কারে অভ্যস্ত বলিয়াই তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল বেপরোয়া বামপন্থী মনোভাব ও সংস্কারমুক্ত নির্ভীক যুক্তিবাদ। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যে

নির্লজ্জ যৌনবাদ প্রচার করিয়া গোঁড়া সমাজকে আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার ইহুদী রক্তের মধ্যেই তাহার সম্ভাবনা সঞ্চিত ছিল।

ইউনিভারসিটির ছাত্র অবস্থাতেই তিনি Dr. Brucke-এর গবেষণাগারে সহকারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। এখানে স্নায়ুতন্ত্রে তিনি বিশেষভাবে গবেষণা করেন এবং ক্রমশঃ মনোরোগ চিকিৎসার ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। অতঃপর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারি পাশ করিয়া ভিয়েনার হাঁসপাতালে কাজ আরম্ভ করেন। এখানে বাক্‌রোধ (aphasia), বিকলাঙ্গতা, মস্তিষ্কে আঘাতাদি জনিত বিকৃতি প্রভৃতি ব্যাপারে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

এই সময়ে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শারকো (Charcot)-এর নাম শুনিয়া তিনি প্যারিস যাত্রা করেন। শারকো রোগীদিগকে সম্মোহিত করিয়া তাহাদের হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করিতেন। শারকো-এর ছাত্র এবং অনুবাদক হিসাবে তিনি এক বৎসর প্যারিসে অবস্থান করেন। শারকো-এর কাছে তিনি নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন তত্ত্বের সন্ধান পান নাই, তবে অধিকাংশ হিষ্টিরিয়ার মূলে যে একটা অতৃপ্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস আছে, সেই সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।

শারকো-এর অনেক শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে Bostonএর মর্টন প্রিন্স (Morton Prince : ১৮৫৪-১৯২৯) ও প্যারিসের পিয়ার জান-এ (Pierre Janet) প্রসিদ্ধ। মর্টন প্রিন্স সম্মোহনের দ্বারা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিকিৎসা করিতেন এবং Janet বিষঙ্গ (dissociation) সম্বন্ধে খানিকটা রহস্যের সন্ধান পান। Janet বলিতেন মানুষের neurosisএর মূল কারণ হইতেছে একজাতীয় মানসিক দুর্ব্বলতা "Low mental tension", যাহার ফলে তাহার গোপন মনের ইচ্ছার সহিত চেতন মানসের ক্রিয়া-কলাপের সামঞ্জস্য বজায় থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার চেতন মানসের চিন্তাস্রোত একভাবে চলে এবং তাহারই অজ্ঞাতে তাহার গোপন মানসে আর একটি চিন্তাস্রোত অন্য ভাবে চলিতে থাকে। ইহাই হইতেছে বিষঙ্গের অবস্থা। এই বিষঙ্গের সৃষ্টি কেন হয়, অর্থাৎ সংজ্ঞান মনের অজ্ঞাতে একটা অবচেতন মন কেন যে তলে-তলে কাজ করিয়া যায়, ইহার রহস্য নির্ণয়

করিতে যাইয়াই ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের অনেক কিছু আবিষ্কার করেন।

প্যারিস হইতে ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিয়া ফ্রয়েড শার্কো প্রদর্শিত প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। বহু ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সফলতা দেখা যাইল। তবে এই প্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতিও কিছু-কিছু দৃষ্ট হইল। দেখা যাইল যে, সব রোগীকে ঠিক সম্মোহিত করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার ফলটিও খুব স্থায়ী হয় না। তখন তিনি আর একবার ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি Nancy schoolএর ডাক্তারদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সম্মোহিত রোগীদের প্রতি অভিভাবন (suggestion) প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে অভিভাবন প্রয়োগের কৌশল কিছু-কিছু শিক্ষা করিয়া ইনি আবার ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং সম্মোহনপ্রণালী দ্বারাই চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

ফ্রয়েড যে প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন তাহাকে তখনও ঠিক মনঃসমীক্ষণ বলা যায় না, কারণ তখনও তাহা খানিকটা "ঝাড়ফুক্" জাতীয় ব্যাপার ছিল। মনঃসমীক্ষণের কাজে Janetই প্রথম সম্মোহন ক্রিয়াকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে সেজন্য ফ্রয়েড Janetএর কাছে মোটেই ঋণী ছিলেন না,—Janetএর প্রণালীর সহিত তিনি অনেক পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রকৃত ঋণ ছিল ভিয়েনার ডাঃ ব্রুয়ারের (Breuer : ১৮৪২-১৯২৫) কাছে। ডাঃ ব্রুয়ার ফ্রয়েডএর চেয়ে ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন; তাহা হইলেও দুই ডাক্তারের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ডাঃ ব্রুয়ারের পরীক্ষাগারে কাজ করিবার সময়েই এই বন্ধুত্ব ঘটে। ইনি একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসাই তাঁহার কাজ ছিল। একবার তাঁহার হাতে একটি হিষ্টিরিয়া রোগিণী আসে। এই নারীটি পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অসাধারণ ছিল। কিন্তু পক্ষাঘাত, স্মৃতিভ্রংশ এবং মস্তিষ্কের গোলমাল—কোনটিরই তাহার অভাব ছিল না। ব্রুয়ার তাহাকে সম্মোহিত করিয়া দেখিলেন, সম্মোহিত অবস্থায় সেই মহিলাটি অনেক পুরাণ ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেছে। যে সমস্ত ঘটনার আঘাত পাইয়া তাহার এই অসুখের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সমস্ত

প্রক্ষোভমূলক (emotional) ঘটনাগুলি সে বেশ স্মরণ করিতে পারিতেছে। এই জাতীয় অভিজ্ঞতা অবশ্য Janet-এরও হইয়াছিল। তবে ডাঃ ব্রুয়ারের অভিজ্ঞতা আর একটু চমক্‌প্রদ হইল। তিনি রোগিণীকে প্রাণ খুলিয়া অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে বলিলেন। রোগিণী তাহাই করিল। দেখা যাইল, প্রাণ খুলিয়া এই সমস্ত দুঃখের কথা বলিতে-বলিতে রোগিণীর মনটি হাল্কা হইয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিল। ডাঃ ব্রুয়ার ও মনোরোগ চিকিৎসার একটা তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। বুঝিলেন সম্মোহিত অবস্থায় রোগী যদি প্রাণ খুলিয়া তাহার দুঃখের কথা বলিবার সুযোগ পায়, অতীতের নিরুদ্ধ আবেগের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রোগ কাটিয়া যায়। এই তথ্যটির আলোকে ফ্রয়েড এবং ব্রুয়ার আরও কতকগুলি পরীক্ষা চালাইলেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষার ফলগুলি ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত করিলেন। এই পদ্ধতিটিকে তাঁহারা **মানসিক বিরেচন** (mental cathersis) বা **অভিস্ফোট** (abreaction) প্রণালী আখ্যা দিলেন।

যাহা হউক, ডাঃ ব্রুয়ার কিন্তু এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালাইলেন না। তাহার একটি কারণ ছিল এই যে, তিনি সাধারণ রোগের চিকিৎসাতেই ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। আর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি দেখিলেন—এই অভিস্ফোট প্রণালীর চিকিৎসার সময় রোগিণীরা তাঁহার সহিত নাছোড়বান্দা-প্রেমে পড়িয়া যাইত। কাজেই এই নূতন হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য তাঁহাকে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি ছাড়িয়া দিতে হইল।

এই জাতীয় বিপদ ফ্রয়েডেরও হইয়াছিল। তবে তিনি ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, এই ব্যাপারটি **সংক্রমণ** বা পাত্রান্তর (transference) ছাড়া আর কিছুই নহে। চিকিৎসককে একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল পাত্র মনে করিয়া রোগীরা স্বতঃই তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাকে বিকল্প-প্রেম-পাত্র মনে করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। ফ্রয়েড বুঝিলেন, এই সংক্রমণই রোগীর রোগমুক্তির প্রথম পর্য্যায়। কারণ, অতৃপ্ত প্রেম-কামনার মধ্যেই যদি রোগের আদি কারণ নিহিত থাকে, তাহা হইলে একটা বিকল্প-প্রেম-পাত্রের সন্ধান পাইয়া

সে যদি তাহার নিরুদ্ধ প্রেম-নির্ঝরের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মনের ভার হাল্কা করিয়া সে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিবে। তবে এজন্য চিকিৎসকের পক্ষ হইতে একটা অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব বজায় রাখিতে হইবে।

ফ্রয়েডের মতে রোগমুক্তির দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আছে transference neurosis ;—এই অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করে এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনা উজাড় করিয়া দেয়।

রোগমুক্তির তৃতীয় পর্য্যায়ে আছে সংক্রমণের মোহভঙ্গ ; অতীতের অতৃপ্ত কামনার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মোহমুক্তিজনিত রোগমুক্তি।

ক্রমশঃ ফ্রয়েড দেখিলেন যে, এই সংক্রমণ জিনিসটা সম্মোহিত অবস্থায় ভাল হয় না ; তাহা ছাড়া উদ্বায়ু রোগীদিগকে গভীরভাবে সম্মোহিত করাও যায় না। কাজেই তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। তিনি দেখিয়াছিলেন—লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারের ব্যাপারে সম্মোহন জিনিসটা খুবই কার্য্যকরী ছিল। তিনি বুঝিলেন, জাগ্রত অবস্থাতেও রোগীকে শরীর-মন শিথিল করিবার নির্দ্দেশ দিয়া যদি তাহাকে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিতে বলা হয়, তাহা হইলেও সে অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারে। তবে এ পদ্ধতিও খুব কার্য্যকরী ছিল না। তখন অন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। রোগীকে একটি প্রায়ান্ধকার গৃহের মধ্যে একটি ইজি-চেয়ার বা কোচের উপর বসাইয়া তাহাকে বলা হইত "তুমি দেহ-মনকে সম্পূর্ণভাবে শিথিল করিয়া দাও, চোখ দুইটি বুঁজিয়া থাক, এইবার তোমার মনে যা কিছু কথা আসে তাহা বলিয়া যাও, যত তুচ্ছ, যত অর্থহীন হউক না কেন, সব কথাগুলিই বলিয়া যাও"—ডাক্তার অধিকাংশ সময়েই চুপ করিয়া থাকিবেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এই সমস্ত কথাগুলির উপর টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা করিবেন না। ফ্রয়েড এই প্রণালীর নাম দিলেন **মুক্ত অনুষঙ্গ** (Free Association) প্রণালী। এই মুক্ত অনুষঙ্গের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে রোগীর মনের নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি বাহির হইয়া আসিত। ফলে রোগী সুস্থ হইয়া উঠিত।

এই মুক্ত অনুষঙ্গের প্রণালীতে কথা বলিতে বলিতে রোগীরা কখন কখন তাহাদের দেখা স্বপ্নের কথাও বলিত। ফ্রয়েডের ধারণা ছিল, এই স্বপ্নগুলি হইতেছে মনের অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করিবার একটা উপায় মাত্র। তবে স্বপ্নেতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আসল স্বপ্ন-লক্ষিত বস্তু নহে; একটা রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়া স্বপ্নে দেখা জিনিসগুলি আমাদের অতৃপ্ত কামনা পূরণ করে। তখন তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত "স্বপ্নের ব্যাখ্যা" (Jnterpretation of dreams) নামক নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। ফ্রয়েডের মতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। উড্ওয়ার্থ মনে করেন, ফ্রয়েডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে "দৈনন্দিন জীবনের মনোরোগ বিদ্যা" (Psychopathology of everyday life: 1901); ইহাতে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলি মুক্ত অনুষঙ্গের প্রণালীতে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইবার এই স্বপ্ন বিকলন ও মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে তিনি চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। আবার নূতন করিয়া একটি সমস্যার উদয় হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিকিৎসিত রোগীরা অন্য কোনও একটা লক্ষণের রোগ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ফ্রয়েড দমিবার পাত্র নহেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার মনোবিকলন রোগীর জীবনের খুব গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত হয় নাই, খানিকটা ভাসা-ভাসা হইয়াছে, তাই অসুখের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কাজেই রোগীকে পূর্ণভাবে নিরাময় করিতে হইলে তাহার সুদূর অতীতের মধ্যে যে চাপা আবেগের ইতিহাস আছে, যে কামনা-বেদনার জট্ পাকাইয়া আছে, তাহারও সন্ধান করিতে হইবে।

কাজেই মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিকে আরও দীর্ঘায়িত করিয়া তিনি অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন। পথ চলিতে-চলিতে পথের সন্ধান মিলিল। তিনি দেখিলেন, দূর বাল্য এমন কি সুদূর শৈশবের যৌন কামনা ও যৌন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত আছে এই সমস্ত মনোবৈকল্যের মূল কারণ।

শৈশবের যৌন কামনা!—ফ্রয়েড কিন্তু এই নূতন তত্ত্বের আকস্মিকতায় বিচলিত হইলেন না। সত্যকে স্বীকার করিবার মত সাহস ও সংস্কারমুক্ত মন তাঁহার য়িহুদী রক্তের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু শৈশবের স্মৃতির উদ্ঘাটনইবা কিরূপে সম্ভব হইবে এবং রোগমুক্তির জন্য যে সংক্রমণের প্রয়োজন তাহাই বা কিভাবে হইবে? শৈশবের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই অস্পষ্ট, তাহা বাচিকরূপে (Verbal) অভিব্যক্ত নহে। কাজেই তাহাকে পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করা বয়স্ক লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে তাহার প্রয়োজনও নাই। শৈশবের আবেগ অনুভূতিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই রোগী শৈশবের অতৃপ্ত কামনার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া রোগ মুক্ত হইয়া উঠিবে।

আর সংক্রমণের (transference) কি হইবে? শিশুর প্রেমের বস্তু হইতেছে তাহার মাতাপিতা, সুতরাং ডাক্তারকে ঐ মাতাপিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারই উপর রোগী তাহার শৈশবের প্রেম, বিদ্বেষ, তৃপ্তি, বিরক্তি ঢালিয়া দিয়া এই নূতন পিতৃ-প্রতিকল্পের (father substitute) উপর তাহার নিরুদ্ধ আবেগ উজাড় করিয়া দিবে এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তত্ত্বটি হইতেছে শৈশবের "ইডিপাস্ অভিজ্ঞতা"র (a complete re-acting of Œdipus experience) পূর্ণ মহড়া দেওয়া এবং তাহার ফলেই বিস্মৃত নির্জ্ঞানকে চেতন-মানসে ভাসাইয়া তোলা।

কিন্তু এই ব্যাপারটিকে যত সহজে বলা হইতেছে, আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নহে। মুক্ত-অনুষঙ্গ বাস্তবিকই মুক্ত নহে, তাহা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না। ফ্রয়েড লক্ষ্য করিলেন, কি একটা শক্তি যেন অনুষঙ্গের ক্রিয়াকে বাধা দিতেছে, যাহার ফলে নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি যেন ঠিক বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না। মনে হইল, রোগী যেন একটা লজ্জাকর অথবা কষ্টকর ঘটনার কথা চাপিয়া যাইতেছে।

এইখানেই ফ্রয়েড তাঁহার মনোবিজ্ঞানের আর একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। ইহা হইল তাঁহার **অবদমন** (repression) তত্ত্ব। তিনি বুঝিলেন, যে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আমরা আমার জিনিস বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা পাই, সেই জাতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে আমরা মনের অবচেতন স্তরে দাবাইয়া নামাইয়া অবদমিত করিয়া রাখি, তাহাকে কিছুতেই চেতন-মানসে

ভাসিয়া উঠিতে দিই না; ইহাই হইল অবদমনের মূল কথা। হয়ত আমি আত্মীয় বন্ধুর সহিত চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ করিয়াছি, লজ্জাকর পাপ করিয়াছি, সীমাহীন স্বার্থপরতা দেখাইয়াছি, নির্লজ্জ যৌন-কামনা করিয়াছি, আমার নীতিবোধ যাহাতে সায় দেয় না, কাজেই এ সমস্ত গ্লাণিকর অভিজ্ঞতা চেতন-মানসে স্থান পায় না। তাহা অবদমিত হইয়া অবচেতন মনে তলাইয়া যায় এবং আমাদের অজ্ঞাতে জট্ পাকাইয়া **গূঢ়ৈষার** (complex) সৃষ্টি করিয়া মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতেই "দ্বৈত ব্যক্তিত্ব" বিষঙ্গ (dissociation) প্রভৃতি হয়। ["মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

এই অবদমন তত্ত্বের ইঙ্গিত ফ্রয়েড কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। যখন তিনি সম্মোহন ও অভিভাবনের দ্বারা চিকিৎসা করিতেন তখনই দেখিয়াছিলেন যে, রোগীকে উৎসাহ দিলেও সে যেন সব কথা খুলিয়া বলে না, কিছু যেন চাপিয়া যায়। কিন্তু তখনও ফ্রয়েডের মনে শৈশবের যৌন কামনা, নির্জ্ঞান মন, স্বপ্নরূপক, প্রতীক প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এখন এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার ধারণাগুলি ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল,—একটা তত্ত্ব অন্য একটি তত্ত্বের উপর আলোকপাত করিতে লাগিল এবং পরস্পরের আলোকে প্রত্যেক তত্ত্বটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অতৃপ্ত বা অস্বীকৃত কামনা বা শৈশবের আবেগ-প্রতিন্যাসের (emotional attitude) বিস্মৃত স্মৃতিগুলি মুক্ত অনুষঙ্গের প্রভাবে যতই প্রকাশিত হইতে লাগিল, ততই দেখা যাইতে লাগিল যে, প্রায় সমস্ত মনোরোগের মূলে আছে যৌন কামনার ইতিহাস।

কিন্তু এই দীর্ঘ-বিস্মৃত লজ্জাকর অভিজ্ঞতার কথা যখন চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় তখন রোগী কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। আর চাহিবেই বা কেন? সে ত বাস্তবিক সে সমস্ত ঘটনাকে চেতন মানস দিয়া স্মরণ করিতেও পারে না। কাজেই তাহার রোগকে পূরাপুরিভাবে সরাইতে হইলে দীর্ঘদিন ধরিয়া অতীত অভিজ্ঞতার মহড়া দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া, হয়ত দুই তিন বছর ধরিয়া, এই কাজ চালাইয়া যাইতে হয়।

ফলে দেখা যাইতেছে, মনোরোগের চিকিৎসার দিক দিয়া মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি একটা খুব ব্যবহারিক বা কার্য্যকরী জিনিস নহে। এইরূপ দীর্ঘ দিনব্যাপী চিকিৎসা চালাইবার মত সময় এবং আর্থিক অবস্থা খুব কম লোকেরই আছে।

কাজেই বলা যায়, মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতির দিক দিয়া ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি খুব কার্য্যকরী জিনিস হয় নাই। কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সৃষ্ট হইল ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের একটা নূতন সম্প্রদায়!

মনঃসমীক্ষণের কয়েকটি তত্ত্ব

মনঃসমীক্ষণ বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায়। একটি হইতেছে, মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতি, আর একটি হইতেছে এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে সেইগুলি। চিকিৎসা পদ্ধতির বিবর্ত্তন ও স্বরূপ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এইবার ইহার মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

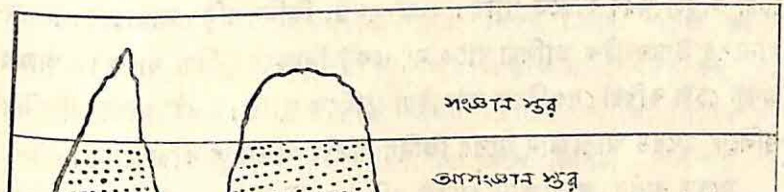
নিয়তিবাদ ঃ মনোবিকলনবাদের মূল তত্ত্বটি হইতেছে প্রত্যেক মানসক্রিয়া সম্বন্ধে বিকল্পবিহীন নিয়তিবাদ (determinism)। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেক কাজটির পিছনেই একটি মূলীভূত কারণ থাকিবেই। তাহার মধ্যে খামখেয়ালি নাই, দুর্জ্ঞেয়ত্ব নাই, পাগলামি নাই, হঠাৎ-ঘটা অহেতুক মেজাজের ব্যাপার নাই, খুসী-খেয়াল নাই, স্বাধীন চিন্তার স্বেচ্ছাচার নাই। এমন কি আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সমস্ত কাজগুলিকে পাগলামি বলিয়া মনে হয়, তাহারও মূলে একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। তবে সেটা হয়ত আমাদের সংজ্ঞান মনের গোচরীভূত নহে, এই পর্য্যন্ত।

সংজ্ঞান মনের গোচরীভূত নহে, এইজাতীয় একটা মনের লীলা যে থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী মনোবিদ্‌গণ স্বীকার করিতেন না। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান কিন্তু এই নির্জ্ঞান মনটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নির্জ্ঞান মনটি সংজ্ঞান মনের একটা প্রাণহীন খোলস মাত্র নহে, ইহা একটা তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল জীবন্ত জিনিস। ইহা

বর্ত্তিষ্ণু (static) বস্তুপুঞ্জ মাত্র নহে, ইহা একটা চলিষ্ণু (dynamic) শক্তি, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকিয়া মানবজীবনকে পরিচালিত করে। এই নির্জ্ঞান মনের সহিত সংজ্ঞান মনের সম্পর্ক কিরূপ ?

মনের গঠন

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনের গঠনের শ্রেণী বিভাগ এইভাবে করা হয়, যথা : সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান (preconscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার বিভাগ স্বীকৃত হয় যথা—ইদ্ (id), অহম্ (ego) এবং অধিশাস্তা (super-ego)। এই দুইটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কশূন্য বা সংযোগশূন্য বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নহে। প্রথম জাতীয় বিভাগের কিছু-কিছু অংশ হয়ত দ্বিতীয় প্রকারের বিভাগের সীমারেখার মধ্যে (নিম্নের চিত্রটি দ্রষ্টব্য) পড়িয়া গিয়াছে।



প্রথমে ইদ্ অহম্ অধিশাস্তার কথাই ধরা যাক। ইহা যেন একটা পর্ব্বতশ্রেণী ও উপত্যকার মত। প্রথম পর্ব্বত শৃঙ্গটি হইতেছে অধিশাস্তা, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কাজেই সূর্য্যালোক ইহার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়। ইহার পরের শৃঙ্গটি হইতেছে অহম্, ইহাতেও দুপুরের সূর্য্যালোক কিছু কিছু পড়ে। কিন্তু ইহার পরে যে সুবিস্তৃত উপত্যকার রাজ্য আছে, তাহাতে সূর্য্যালোক কোনও দিনই পড়িতে পারে না। এই অধিশাস্তা ও অহম্ উভয় শৃঙ্গেরই

উর্দ্ধভাগে আছে আলোকিত সংজ্ঞান স্তর, মধ্যভাগে আছে আলো-আঁধারে আসংজ্ঞান স্তর এবং নিম্নদেশে আছে গভীর নির্জ্ঞান স্তর। ইহার পরে যে ইদ্ নামে উপত্যকাটি আছে, তাহা কোনওদিনই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় না। রূপকটির ব্যঞ্জনা এই যে, অধিশাস্তা ও অহংমনের খানিকটা অংশ চৈতন্য রাজ্যের নিম্নস্তরে থাকিলেও বাকী অংশগুলি চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হয়। কিন্তু ইদের অন্ধকার রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহার সন্ধান চৈতন্যের আলোকে কোনওদিনই পাওয়া যায় না। অথচ এই ইদের অন্ধকার নির্জ্ঞান রাজ্য হইতেই মনের যত কিছু কার্য্য প্রভাবান্বিত হয়।

আমরা সংজ্ঞান মন দিয়া যতটুকু মনে রাখি, তাহার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। কত হাসি-হাসি মুখ, কত অতীতের কাহিনী, কত গীতি, কত গাথা, কত কথাই ত আমরা চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারি। এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের চেতন-মানসের উপরে ঠিক ভাসিয়া থাকে না, একটু নিম্নস্তরে ডুবিয়া থাকে। আমরা একটু চেষ্টা করিয়া সেগুলিকে ভাসাইয়া তুলিতে পারি। এই জাতীয় জিনিস-গুলিকে ফ্রয়েড আসংজ্ঞান স্তরের জিনিস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ফ্রয়েড বলেন, আসংজ্ঞান স্তরেই যদি এত জিনিস লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে আরও গভীর তলদেশে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে কত বেশী জিনিস যে লুক্কায়িত থাকিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে এই পূর্ণ নির্জ্ঞান স্তরের জিনিস-গুলিকে স্মৃতির সাহায্যে উপরে টানিয়া ভাসাইয়া তোলা যায় না। তাহা হইলেও নির্জ্ঞান স্তরের বহু অভিজ্ঞতাই যে আমাদের কাজকর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা নানাভাবে বুঝা যায়, যথা—

(১) আমরা এমন অনেক আচরণ করি যাহার সহিত আমাদের চেতন-মানসের কোনও সম্পর্ক নাই, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নচারী রমণী যখন চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন চেতন-মানসের ইতিহাসে হয়ত তাহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(২) সম্মোহিত অবস্থায় (hypnotised state) লোকেরা বহু-বিস্মৃত অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে। আবার সম্মোহনের পরেই

তাহা ভুলিয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, মনের গভীর তলদেশের নির্জ্জান রাজ্য হইতে এই জিনিসগুলি সম্মোহিত অবস্থায় ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

(৩) মুক্ত অনুষঙ্গের প্রভাবে হঠাৎ কত কথা মনে পড়িয়া যায়, অথচ চেষ্টা করিয়া স্মৃতির সাহায্যে সেগুলি মনে করা যায় না। সুষুপ্তির অচৈতন্য অবস্থায় আমরা বহু সমস্যার রহস্য খুঁজিয়া পাই, গণিতের সমাধান, কাব্যের বিষয়বস্তু, এমনকি বাণী পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই। সজাগ মন এগুলির সন্ধান দেয় না, ইহা নিশ্চয়ই নির্জ্জানের রাজ্য হইতে ভাসিয়া উঠে।

(৪) স্বপ্নবিকলনের ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই আমাদের বহু অসঙ্গত ও অদ্ভুত স্বপ্নগুলির মধ্যে আমাদের অতীত জীবনের বহু বিস্মৃত ইতিহাস লুকাইয়া আছে।

(৫) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহু ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেও আমরা এই জাতীয় একটা ইতিহাসের সন্ধান পাই। নিরুদ্ধ ক্রোধ, অতৃপ্ত কামনা, বন্ধ্যা অভিমান, দমিত ঘৃণা, গোপন বিদ্বেষ প্রভৃতি মনের অতল তল হইতে এইগুলিকে সৃষ্টি করে। একটি মহিলা একটি হোটেলে যাইয়া নিজের নাম লিখিতে যাইয়া নিজের বংশগত উপাধির বদলে লিখিয়া বসিল অন্য এমন একজনের উপাধি যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু হয় নাই। মহিলাটির অতৃপ্ত কামনা তাহাকে ঐ ভুলটি করাইল। একটি ছেলে হাতের লেখা শিখিবার সময় M অক্ষরটিকে সব সময়ে উল্টাইয়া Wর মত করিয়া লিখিত। এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখা গেল, নামের আদ্য অক্ষরে M আছে এমন একজন লোক তাহার বিধবা মাতার সহিত প্রায়ই আলাপ করিতে আসিত। বালকটি ইহা পছন্দ করিত না, তাই M অক্ষরটিকে উল্টাইয়া দিয়া এই বিরক্তির প্রকাশ করিত। ইহাতেই বুঝা যায়, নির্জ্জান মন তাহার অজ্ঞাতেও এইভাবে কাজ করিয়া যাইত।

(৬) নির্জ্জান মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একটি বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মনোবিকলন দ্বারা মনোরোগের সাফল্য দেখিয়া। মনোবিকলনের দ্বারা মনের গোপন কথা মনের গভীর তলদেশ হইতে ভাসাইয়া চৈতন্যের আলোকে তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মনোরোগও সারিয়া যায়।

ফ্রয়েড মনে করিতেন, এই নির্জ্ঞান মনটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুদূর অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু য়্যুঙ্গ বলেন, এই নির্জ্ঞানের রাজ্য আরও সুদূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা জাতকের জন্মান্তর-প্রসারী গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই নির্জ্ঞানের স্তর হইতে সংজ্ঞানের স্তরে অতীত ইতিহাসগুলি ভাসিয়া উঠে কি ভাবে? ইহা সহজে ভাসিয়া উঠে না, অবদমনের বাধা সরাইয়া তাহাকে তুলিতে হয়। আসংজ্ঞানের স্তর হইতে অবশ্য লুপ্ত স্মৃতিকে অনুষঙ্গের প্রভাবে সহজেই টানিয়া তুলা যায়, তবে নির্জ্ঞানের স্তর হইতে অতীত স্মৃতিকে টানিয়া আনিবার সময় মনে হয় কে যেন তাহাতে বাধা দিতেছে। ফ্রয়েড প্রথমতঃ ভাবিতেন, একটা প্রহরী (censor) যেন নির্জ্ঞানের নোংরা চিন্তাগুলিকে জাগ্রত মন-মহারাজের খাস কামরায় প্রবেশের অনুমতি দেয় না। তাই এই বাধা। তাই নির্জ্ঞানের স্মৃতি মনে পড়িয়াও মনে পড়ে না। সেই জন্যই সম্মোহিত অবস্থাতেই তাহা আসে, কারণ সম্মোহনের সময় প্রহরী বেচারী ঘুমাইয়া থাকে।

এইবার আমরা ইদ্, অহম্ ও অধিশাস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইদ্ (Id): ইহা হইতেছে মানুষের আদিম প্রাণশক্তি, তাহার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সক্রিয় উৎস। অনেক সময় ইদ্ ও নির্জ্ঞানকে একই জিনিস বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইদ্ ও নির্জ্ঞান ঠিক একই জিনিস নহে। কারণ নির্জ্ঞান স্তরটি অহং এবং অধিশাস্তা মনের মধ্যেও কিছু কিছু আছে, তবে ইদের নির্জ্ঞান বহু ব্যাপকতর। ইদের বৈশিষ্ট্য কি? নির্জ্ঞান মনের মতই ইহা অনীতিমূলক, সুখ-দুঃখ অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অযৌক্তিক। তবে ইহার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই হইতেছে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির (instincts) মূল, আবার ইহাই লিবিডো বা কামশক্তির উৎস, ইহার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে সমস্ত অবদমিত চিন্তার বিদ্রোহী শক্তিগুলি, ইহার মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত অভ্যাসাদির প্রেরণা।

অহম্ (Ego): ইহা এক হিসাবে "ইদ্"এর বিপরীতধর্ম্মী শক্তি। শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যতই সে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হইতে

থাকে, ততই বুঝিতে পারে যে তাহার সকল দাবী পূর্ণ হইতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে এই পরিচয়ের মাঝেই যেন "ইদ"এর খানিকটা অংশ ঠেকিয়া শিখিয়া "অহম্"এ পরিণত হয়। অহম্ ইদ-এর অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী-গুলিকে প্রশ্রয় দেয় না, সে দুনিয়ার খবর রাখে "কত ধানে কত চাল" হয়, সে জানে অন্যায় লোভ ও অসংযত কামনা পরিণামে সুখের চেয়ে দুঃখই আনে বেশী ; তাই সে ইদের সব আব্দারকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই সে এক হিসাবে 'ইদ' এর প্রতিস্পর্দ্ধী শক্তি (antithesis)। ইদ-এর সহিত অহম্-এর বিরোধটা তীব্র হইলে দেখা দেয় এক জাতীয় মনোবৈকল্য।

অধিশাস্তা ঃ দুনিয়ার সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের ফলে ইদ-এর খানিকটা অংশ যেমন অহম্এ পরিণত হইয়া ইদএর দাবীকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ অহম্এর খানিকটা অংশ যেন মাতাপিতার (বিশেষ ভাবে পিতার) অভিজ্ঞতার দ্বারা সংযত হইয়া সামাজিক বিধিনিষেধ পাপপুণ্যবোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয় এবং শিশুর কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এই শক্তিটির নাম অধিশাস্তা। ইহাই হইতেছে শিশুর আদিম নীতিবোধ বা বিবেকবোধ। তবে ইহা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সম্ভাব্য নীতিবোধ হইতে আরও ব্যাপকতর জিনিস, ইহা পিতৃপুরুষাগত নীতিবোধ হইতে সৃষ্ট।

লিবিডো ঃ ফ্রয়েডীয় দর্শনে লিবিডো তত্ত্বটি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। লিবিডো কাহাকে বলে ? ইহার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলিয়াছেন, লিবিডো হইতেছে সেই প্রবৃত্তির শক্তি যাহাকে প্রেম (কাম) এই নামের দ্বারা অভিহিত করা যায়। (the energy of those instincts which have to do with all that may be comprised by the word love) *

ফ্রয়েডের মতে এই কামশক্তিই হইতেছে আমাদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস। এইজন্যই ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। বলা হয় ফ্রয়েডীয় মতবাদ হইতেছে "বিশ্ব যৌনবাদ" (pan

* য়ুঙ্গ [jung)-এর মতে এই লিবিডো হইতেছে আরও ব্যাপকতর জিনিস ; ইহা বার্গস-এর "elan vital"-এর এবং ম্যাগডুগালের জীবন প্রয়াস (horme) জাতীয় জিনিস।

sexualism)-এরই নামান্তর। ফ্রয়েড কিন্তু এই অভিযোগে আদৌ বিচলিত হন নাই। তিনি বলেন, যৌন-বোধ (sex) কথাটির সহিত যে "ছি' ছি" জড়াইয়া আছে, তাহার কোনও যুক্তি নাই; ইহার প্রভাব আমাদের জীবনে একটা অনস্বীকার্য্য সত্য, এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই ইহা বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল। বস্তুতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় শিশুরও একটা যৌন ইতিহাস আছে এবং অতি শৈশব হইতেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু পদে পদে সে পায় বাধা। কাজেই তাহার মনে আসে একটা ব্যর্থতা ও অবদমন। এই লিবিডোর অবদমনই হইল যত প্রকার সমস্যার মূল।

জন্মের সময় অতি শৈশবে লিবিডোর পরিতৃপ্তির কোনও নির্দ্দিষ্ট শারীর কেন্দ্র নাই। সমগ্র শরীরেই তাহা পরিব্যাপ্ত থাকে। পরে ক্রমশঃ এক একটি কেন্দ্রে তাহার পীঠস্থান তৈয়ারী হয়। প্রথম পীঠস্থান হয় ওষ্ঠে। তখন ওষ্ঠ দ্বারা মাতৃস্তন্য চুষিয়া শিশু যে আনন্দ পায়, তাহাই তাহার যৌন আনন্দ। বালকের নখ খুঁটা, আঙ্গুল চোষা প্রভৃতি এই আনন্দেরই ভিন্নরূপ।

ইহার পরে আছে তথাকথিত "annal phase"; এই সময় সে মলত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা একটা আনন্দ পায়। পাঁচ বৎসর বয়সে আসে phallic primacyর অবস্থা এবং তাহারও পরে আসে latencyর যুগ বা অনুপক্রম কাল। ইহার পর বয়ঃসন্ধির যুগ হইতেই স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া দ্বারা মানুষ তাহার লিবিডোর তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা পায়।

এই যৌন জ্ঞানের বিবর্ত্তনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে আছে 'আত্মরতি'। নিজের দেহ, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াই তখন লিবিডোর কারবার। ইহার পরের অবস্থায় আসে "সমরতি"র (homo sexuality) যুগ; তখন নিজেকে ছাড়িয়া সমজাতীয় যোনির বালকবালিকা লইয়াই মানুষের লিবিডো যেন পরিতৃপ্তি দাবী করে। সর্ব্বশেষে আছে লিবিডোর স্বাভাবিক পরিণতি, তখন নারী পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে লইয়া তৃপ্তি কামনা করে।

লিবিডো স্রোত

লিবিডো স্রোত তাহার গতিপথে নিম্নলিখিত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে—

১। বাহিরের দিকে স্বাভাবিক ভাবে

২। ভিতরের দিকে স্বরতি বা নার্শিসিজম্-এর সৃষ্টি করিয়া,

৩। বাধা পাইয়া সংবন্ধন (fixation)-এর সৃষ্টি করিয়া,

৪। পশ্চাৎমুখী হইয়া "প্রত্যাবৃত্তি"র (regression) পথ গ্রহণ করিয়া,

৫। প্রতিহত হইয়া অবদমনের সৃষ্টি করিয়া,

৬। পথ পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্গতির সৃষ্টি করিয়া।

নার্সিসিজম্ ঃ 'জীবন পরিক্রমা' পরিচ্ছেদে নার্সিসিজম্-এর জটিলতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই নার্সিসিজম্ শৈশবের একটি স্বাভাবিক অবস্থা। ফুলের কুঁড়ি যেমন নিজের গন্ধ নিজের বুকেই জড়াইয়া মাতোয়ারা থাকে, শিশুও তেমনি নিজের সম্বন্ধে একটা অন্তর্মুখী প্রেম লইয়া মাতোয়ারা থাকে। কৈশোরেও এই জাতীয় একটা অবস্থা আসে। ইহাও অস্বাভাবিক অবস্থা নহে।

নার্সিসিজম্এর একটা অস্বাভাবিক দিকও আছে, ফয়েড্ তাহাকে Secondary Narcissm বলিয়াছেন। এই অবস্থায় লিবিডো স্রোত বহির্মুখী হইয়া কোনও প্রিয়জনের উপর প্রবাহিত হইতে না পারিয়া অন্তর্মুখী হইয়া একটা অলীক কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা একটা অস্বাভাবিক পরিণতি গ্রহণ করিলে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে তাহাকে 'অন্তর্বৃত্ততা' বলে। অবশ্য এই অন্তর্বৃত্ততা আর য়্যুঙ্গের অন্তর্বৃত্ততা এক জিনিস নহে।

লিবিডোর স্বাভাবিক গতি হইতেছে বিপরীত যোনির স্ত্রীপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া সন্তানসন্ততি উৎপাদন। এই গতির ফলে লিবিডো স্রোত যখন নিজেকে ছাড়িয়া বহির্মুখী হইতে আরম্ভ করে, তখন ভালবাসাটা প্রথম নিবদ্ধ হয় মাতা (অথবা পিতার) প্রতি ; ইহাকে ইডিপাস্ অথবা ইলেক্‌ট্রা ("জীবন-পরিক্রমা" পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য) অবস্থা বলা হয়।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ঃ লিবিডো স্রোত যখন তাহার পরিক্রমার পথে অগ্রসর না হইয়া অতীত শৈশবের কোনও প্রিয়জনের উপর নিবদ্ধ হইয়া থাকে তখনকার অবস্থাটিকে প্রত্যাবৃত্তি বলা হয়। একটি যুবক হয়ত একটি নারীর প্রতি আসক্ত হইল, পরে ঐ প্রেম ব্যর্থ হইয়া তাহার প্রেমস্রোত প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় সে হয়ত অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত ছেলে হইয়া অস্বভাবী মন বিশিষ্ট হইয়া পড়িল।

অবদমন (Repression) : লিবিডো স্রোত যখন কোনও বাহিরের পাত্রকে আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না অথচ প্রেম-স্রোতকে অন্য খাতেও প্রবাহিত করাইতে পারে না, তখন তাহার বিরুদ্ধ স্রোত মনের গোপন তলে তলাইয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে অবদমন বলে। অধিশাস্তার শাসন মানিয়া চলিবার ক্ষমতা নাই, এই অবস্থায় সযত্নপোষিত অতৃপ্ত কামনা মনের নির্জ্জান স্তরে নামিয়া যাইয়া জট পাকাইয়া আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে। অবদমনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা ("মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উদ্গতি (Sublimation) : লিবিডো স্রোত যখন ব্যাহত হইয়া সমাজ কল্যাণকর বা নীতি-ধর্ম্মমূলক কোনও খাতে প্রবাহিত হয় তখন তাহার উদ্গতি হয়। মানুষের যত কিছু সভ্যতা ও কৃষ্টি, তাহা এই উদ্গতির ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষ প্রতিনিয়তই সমাজকল্যাণের বেদীমূলে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থপর-কামনাকে বলি দিতেছে। সেই বলির রক্তে রাঙা হইয়াই মানুষের সভ্যতার গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Life and death instinct : ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনের শক্তিগুলির মধ্যে প্রায়ই একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (polarity) দৃষ্ট হয়। লিবিডো চায় নিরঙ্কুশ আনন্দ, অহম্ (ego) তাহাকে বাধা দিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় বাস্তব পরিবেশের অসুবিধার কথা, লিবিডো চায় বাহিরের ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কাম প্রবৃত্তির তৃপ্তি, আর 'ইগো' চায় আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টি। এই লিবিডোর প্রেরণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রে 'ইগো'র প্রেরণাও অসত্য নহে। তাই গোড়ার দিকে ফ্রয়েড একমাত্র "লিবিডো" তত্ত্বের দ্বারা মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া ego motive and libido motive এই দুইটি তত্ত্বকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যদি "লিবিডো"কে য়্যুঙ্গএর মত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দুইটি প্রতিস্পর্দ্ধী তত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইত না। যাহাই হউক, ফ্রয়েড পরে দেখিলেন যে, জীবনের প্রয়োজনেই যেমন কাম প্রবৃত্তির একটা দাবী আছে, আত্মরক্ষা স্বার্থবোধ প্রভৃতিরও তেমনই একটা

দাবী আছে। কাজেই লিবিডো এবং অহম্এর আপাতঃপ্রতীয়মান দ্বন্দ্ব সত্বেও তাহাদিগকে একটা ব্যাপক প্রবৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তিটির নাম দিলেন জীবন-প্রবৃত্তি (life instinct)।

এই জীবন-প্রবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তি কি হইবে? ফ্রয়েড তাহার নাম দিলেন মৃত্যু-প্রবৃত্তি (death instinct)। মৃত্যু যখন জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তখন জীবনলীলার মধ্যেই মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন আয়োজন চলিতেছে। এই দুইটি প্রবৃত্তিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবন-প্রবৃত্তি (life instinct or eros) জীবন ও বৃদ্ধির মূল কথা, আর মৃত্যুপ্রবৃত্তি (death instinct or Thanatos) ক্ষয় ও ধ্বংসের মূল কথা। Eros প্রেরণা দেয় প্রেম ও সৃজনীশক্তিকে এবং Thanatos প্রেরণা দেয় ঘৃণা ও ধ্বংসকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতজনিত মনোবৈকল্য (Traumatic neurosis), হিষ্টিরিয়া, দুঃস্বপ্ন, শিশুদিগের অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিমূলক (repetition compulsion : ১৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) খেলাধূলার মধ্যে দেখা যায়, আমরা যেন বাধ্য হইয়াই অতীতের দুঃখের অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবৃত্তি করি। এই সমস্ত দেখিয়াই হয়ত ফ্রয়েড একটা ধারণা করিয়াছিলেন যে, দুঃখ-বিলাসও আমাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। এই দুঃখ-বিলাস আত্মমর্ষণ প্রভৃতি (masochism) মধ্যেই ফ্রয়েড মৃত্যু-প্রবৃত্তির সন্ধান পান।

প্রশ্ন আসিতে পারে, প্রাণীর জীবনে মৃত্যুর প্রবৃত্তি কি স্বাভাবিক হইতে পারে? ফ্রয়েড বলেন, হাঁ পারে। ইহার প্রেরণা অন্তর্মুখী হইলে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত, আত্ম-নিগ্রহ, আত্মহত্যা প্রভৃতি করিতে চেষ্টা করে, আর বহির্মুখী হইলেই আঘাত করিতে, ধ্বংস করিতে, জয় করিতে চেষ্টা করে।

Mental mechanism : আমরা দেখিয়াছি, ফ্রয়েডের মতে লিবিডোই হইতেছে মানুষের আদিম প্রেরণা। সে যেন প্রতিনিয়তই বলিতেছে—

"আমি অশান্ত আমি অবাধ্য, যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য,
তাহারে ধরিব সবলে ;
আমি নির্ম্মম আমি নৃশংস সবেতে বসাব নিজের অংশ
পর মুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।"

কিন্তু তাহার এই অবাধ লোলুপতা পূর্ণভাবে তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই ধাক্কা খাইয়া উদ্গতির প্রভাবে সে সৃষ্টি করে কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-কলা প্রভৃতি। কিন্তু সকলের পক্ষে এই উদ্গতি সম্ভব হয় না। কঠোর বাস্তব যখন বাধার অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া আমাদের কামনা-স্রোতকে প্রতিহত করে অথচ উদ্গতির দ্বারা যখন আমরা জীবনে অন্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই না, তখন অচেতন মন নানা কৌশল সৃষ্টি করিয়া আমাদের ব্যর্থতা ও অসামঞ্জস্যের একটা অপব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি। অবচেতন মনের এই যে কৌশল ও কারসাজিগুলিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে "Defence mechanism" বলা হয়। কোন কোনও পণ্ডিত ১৭ প্রকার mechanism স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অবদমন (repression), reaction formation, প্রক্ষেপ (projection), ঐকাত্ম (Indentification), যুক্ত্যাভাস (rationalization), অন্তর্বৃত্ততা (introversion) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান মনোবিদ্যা ফ্রয়েডীয় সব তত্ত্বগুলিকে স্বীকার না করিলেও, অন্যভাবে এই সমস্ত mechanismগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

মনোরোগ বিদ্যা ও অস্বভাবী মনোবিদ্যা

ফ্রয়েডীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইহা অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের শাস্ত্র, ইহাতে সাধারণ মনস্তত্ত্বের কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই আপত্তি ন্যায্য নহে। কারণ যে মনোবৈশিষ্ট্যগুলি অস্বভাবী (abnormal) মনের জিনিস বলিয়া মনে হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পতর মাত্রায় দৃষ্ট হয়। আমাদের সমস্ত মনোবৈকল্যের মূল কারণটি আছে পরিবেশের সহিত মানাইয়া চলিবার ব্যর্থতার মধ্যে। কাজেই এই ব্যর্থতা যাহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত অভাগা প্রতিবেশীদের দুঃখের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা সাবধানে পথ চলিতে পারিব; তাহারা যে ভুল করিয়াছে, আমরা হয়ত আর সে ভুল করিব না। অস্বভাবী মনোবৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকেই বেশীভাবে ফুটাইয়া তুলে বলিয়া ইহার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

Rickman মনোবৈকল্যগুলির এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, যথা—

(১) **সংক্রমনজাত মনোবৈকল্য** (Transference neurosis) : আবেশিক উদ্বায়ু (obsessional neurosis), বিপরিনামী হিষ্টিরিয়া (conversion hysteria), উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়া (anxiety neurosis) প্রভৃতি। অহং আর ইদ্-এর দ্বন্দ্বে এইগুলি সৃষ্ট হয়।

(২) **নার্শিসিজম-জাত বৈকল্য** : খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive), patho neurosis প্রভৃতি—এই ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটি হয় অহং এবং অধিশাস্তার মধ্যে।

(৩) **বাতুলতা** : ভ্রম বাতুলতা (paronia) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Demantia praecox) প্রভৃতি ; অহং এবং বাস্তব পরিবেশের সহিত সংঘর্ষ হইতে এই বৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

(৪) **উদ্বায়ু** : উৎকণ্ঠা উদ্বায়ু (anxiety neurosis), স্নায়বিক অবসাদ (neurasthenia), hypochondria, প্রভৃতি।

(৫) **আঘাত বৈকল্য** (Traumatic neurosis)।

তবে Rickman-এর এই শ্রেণীবিভাগটি সর্ব্বজন স্বীকৃত নহে। Kracpelin প্রভৃতি মনোরোগের শ্রেণী বিভাগ অন্যভাবে করিয়াছেন। শ্রেণীবিভাগ যাহাই হউক, মনোবৈকল্য সম্বন্ধে এই তত্ত্বগুলি সর্ব্বজনস্বীকৃত : (১) প্রত্যেক বৈকল্যেরই একটা সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও ইতিহাস আছে। (২) মানসিক রোগগুলি হইতেছে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত একটা বিদ্রোহ ও সন্ধির চেষ্টা হইতে প্রসূত। (৩) এই রোগগুলির মধ্যে দুইটি প্রতিক্রিয়া আছে, একটি হইতেছে বিকল্প পরিতৃপ্তির চেষ্টা এবং আর একটি হইতেছে কষ্টভোগ।

স্বপ্নতত্ত্ব

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হইতেছে, নিদ্রিত অবস্থায় উদ্দীপকের বিরুদ্ধে এক প্রকার মানস প্রতিক্রিয়া (Mode of re-action of the mind to stimulate activity during sleep)। প্রত্যেক সুস্থ লোকের পক্ষেই স্বপ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ইহার তিনটি মূলতত্ত্ব আছে : (১) ইহা নিদ্রার

সহায়ক (২) স্বপ্নের প্রত্যক্ষীভূত জিনিসগুলির (manifest content) পিছনে সব সময়েই একটা গোপন উদ্দেশ্য (latent content) থাকে এবং (৩) ইহা সব সময়েই একটা অতৃপ্ত কামনার পূরণ করে।

সুতরাং স্বপ্ন 'শুধু স্বপ্নমাত্র—মস্তিষ্ক-বিকার' নহে। ইহার পশ্চাতে অবদমিত অতৃপ্ত কামনার একটা ইতিহাস আছে, একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বও আছে। ইহা নিদ্রাকে রক্ষা করে কিভাবে? ইহা অতৃপ্ত কামনার দুঃখকর বা লজ্জাকর অনুভূতিকে একটা নির্দোষ ছদ্মরূপ দিয়া দুঃখ হইতে আমাদের বাঁচায়। যখন সে এই নির্দোষ রূপটি দিতে পারে না, তখনই স্বপ্নটা দুঃস্বপ্ন হইয়া আমাদের অতীত অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করে।

মনের গোপন কামনাকে সে ছদ্মবেশে ঢাকিয়া প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া নির্জ্জান স্তর হইতে সংজ্ঞান স্তরে পৌঁছাইয়া দেয় এবং অতৃপ্ত অবদমিত কামনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া অবদমনের গূঢ়ৈষা হইতে মনকে মুক্ত করে। এই ছদ্মবেশটি ঠিকমত না হইলে হয় প্রহরীর শাসনে অবদমিত কামনা উপরে আসিতেই পারে না অথবা স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন হইয়া আমাদের পীড়া দেয়। ফলে সার্থক বা সফল স্বপ্নগুলি সব সময়েই মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। দরিদ্র বালক দুগ্ধ মনে করিয়া চালগুড়া মিশ্রিত জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে ও তাহার কান্না থামায়; আমরা সেইরূপ স্বপ্নের প্রতীক-পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়া অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি করি ও মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ('মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব' নামক পরিচ্ছেদে অজিতকুমার ও অনীতার স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি দ্রষ্টব্য) হইতে মুক্ত হই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া গোপন কামনাকে স্বপ্নের চেতন-মানসের স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্য স্বপ্নের নানা জাতীয় কৌশল আছে। যথা—

(১) **নাটকীকরণ** (dramatization): ইহার দ্বারা মনের বিমূর্ত্ত চিন্তাগুলি মূর্ত্ত হইয়া যেন নাটকীয় কুশীলবের ভূমিকায় স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করে। ইহার ফলেই স্বপ্নের গোপন কথাটি ছদ্ম মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়।

(২) **সংক্ষেপন** (condensation): সংক্ষেপনের প্রসঙ্গে ইহাই বুঝিতে

হইবে যে, স্বপ্নের প্রত্যক্ষ জিনিসের [manifest content] চেয়ে গোপন কথা [latent content] অনেক বেশী আছে। স্বপ্নের সময় ইহার কিছু রাখিয়া উহার কিছু ছাড়িয়া, এমন একটা অখণ্ড ছবি তৈয়ারী করা হয়, যাহা পূর্ণভাবে কাহারও মধ্যেই নাই। হয়ত রামের পোষাক আর শ্যামের চোখমুখবিশিষ্ট একটি মূর্ত্তি দেখা যাইল, ইহাতে দুই জনেরই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপিত হইয়া ঐ স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তিটি সৃষ্ট হইল।

(৩) **অভিক্রান্তি** [displacement] বা স্থানান্তরীকরণঃ ইহা দ্বারা মনের গোপন ভাবগুলি অন্য এমন একটি ভাবের দ্বারা স্থানান্তরিত হয় যাহা নীতির দিক দিয়া খানিকটা সমর্থনযোগ্য। ইহা দ্বারা একটি অংশ দ্বারা সমগ্রের সঙ্কেত দেওয়া হয় না, খানিকটা দূরের জিনিস দিয়া তাহার ইঙ্গিত করা হয় এবং স্বপ্নটির ব্যঞ্জনার ভারকেন্দ্র সরিয়া যায়। ফলে পরিচিত ঘটনাটিও অনেকটা অপরিচিত বলিয়া মনে হয়।

(৪) **অনুযোজন** [Secondary elaboration]ঃ অহম্‌এর যুক্তি-প্রবণতার ফলে অনুযোজন প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নের অবিশ্বাস্য জিনিসগুলি বিশ্বাস্য করিয়া তোলা হয়। স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী ব্যবহার করা হয় এবং অবদমিত কামনাগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। ফলে অতৃপ্ত গোপন কামনাগুলি খানিকটা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

অনেক সময় অবশ্য কাছাকাছি অতীতের ঘটনা বা কামনা হইতেই স্বপ্নের মালমশলাগুলি আহৃত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা আহৃত হয় শৈশবের যৌন কামনা হইতে। তবে স্বপ্নের সময় যৌন ব্যাপারগুলি কতকগুলি প্রতীক চিহ্নের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আবির্ভূত হয়। এই প্রতীকগুলির মধ্যে মনুষ্যদেহ, গৃহ বা প্রাসাদরূপে এবং পিতা ও মাতা রাজা ও রাণী (বা বড় বড় লোক) রূপে আবির্ভূত হয়। জন্মের সহিত সব সময়েই জলের সম্পর্ক এবং এবং মৃত্যুর সহিত কোনও প্রকার যাত্রার প্রসঙ্গ থাকে। স্বপ্নে দেখা ছাতা, ছড়ি, ছুরি, বন্দুক, মাছ, সাপ প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের এবং দোয়াত, বোতল, বাক্‌স, পকেট প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত প্রতীক, এবং নাটকীকরণ, সংক্ষেপন,

অভিক্রান্তি প্রভৃতির সাহায্যে স্বপ্ন আমাদের অতৃপ্ত কামনার পূরণ করে।

তবে এই তত্ত্বটিরও যে ব্যতিক্রম আছে ইহা পরবর্তী যুগের লেখায় ফ্রয়েড (Beyond pleasure principle নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) স্বীকার করিয়াছিলেন। মৃত্যু প্রবৃত্তি অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিবাদ (repetition compulsion), যুদ্ধজনিত আঘাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা স্বপ্নের মধ্য অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করি, অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি করি না।

এইবার অধ্যাপক Flugel-এর Introduction of Psycho Analysis হইতে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করিয়া স্বপ্ন প্রসঙ্গের শেষ করিব।

একটী নারী স্বপ্ন-বিকলনকারীর নিকট চিকিৎসাধীন ছিল। সে স্বপ্ন দেখিল, একজন মিস্ত্রী পিয়ানো সারাইতে আসিয়াছে, সে পিয়ানোর ভিতর হইতে কতকগুলি বীজ বাহির করিয়া লইতেছে। স্বপ্নটি ছোট, কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্নের অনেক তথ্যই নিহিত আছে।

স্বপ্নদর্শিনী নিজেই পিয়োনো। এই রূপকের প্রয়োজন কি? তিনি গান বাজনা ভালবাসিতেন, একটু-আধটু বেহালাও বাজাইতেন। জীবনের কঠোরতা যথেষ্ট ছিল, তাই তাঁহার ইচ্ছা হইল একটু পিয়োনোর কাছে যাই। যথা ইচ্ছা তথা স্বপ্ন। তিনি নিজেই স্বপ্নে পিয়ানো হইয়া যাইলেন। ইহা হইল এক নম্বরের ইচ্ছাপূরণ। পিয়ানোর মিস্ত্রী হইল মনোবিকলনকারী ডাক্তার। দুইজনেরই কাজ হইতেছে রোগের চিকিৎসা; একজন বাদ্যযন্ত্রের, আর একজন মনোযন্ত্রের চিকিৎসা করেন। তিনি বীজগুলি তুলিতেছিলেন কেন? বীজ হইতেছে যৌন কামনার প্রতীক। ডাক্তার রোগিণীর অন্যায় যৌন কামনাগুলি তুলিয়া লইয়া তাহাকে সুস্থ করিতেছেন। ইহাই হইল স্বপ্নটির মাধ্যমে আর একটি কামনার পূরণ।

স্বপ্নটির অন্য অর্থও হইতে পারে। বীজগুলির অর্থ লিবিডোর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা কিছু—যেমন সন্তানাদি। মনোবিকলনকারী (অর্থাৎ মিস্ত্রীটি) হইতেছে ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ চিকিৎসক। নারীটী তাহার সাহায্যে সন্তান প্রসব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

অপর অর্থও হইতে পারে। মনোবিকলনকারী ডাক্তারের সহিত নারীটী transfrenceএর প্রভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছে। তাহা হইলে বীজগুলি তুলিয়া লইবার অর্থ কি? ইহা একটা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কামনার ছদ্মরূপ। নারীটির ঐ ডাক্তারের সহিত যে সঙ্গমপ্রার্থনা তাহার মধ্যে নৈতিক সমর্থন নাই বলিয়াই বীজের প্রবেশ-প্রার্থনাটিকে নির্গমনের রূপ দিয়া স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইতেছে।

ফ্রয়েডের অনুবর্ত্তীগণ

ফ্রয়েডীয় দর্শনে মনোবৈকল্যের প্রধান কারণ হইতেছে অবদমিত যৌন কামনা। ফ্রয়েডের শিষ্যবর্গ বিশেষভাবে এ্যাড্‌লার (Adler) ও য়্যুঙ্গ (Jung) এই ব্যাপারে খানিকটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। নির্জ্ঞান মন, অবদমন প্রভৃতিকে ইহারাও স্বীকার করেন তবে ফ্রয়েডের একতরপা যৌনবাদ ইহারা ঠিক স্বীকার করেন না। এ্যাড্‌লার বলেন, আমাদের সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা হইতেছে শক্তির আকাঙ্ক্ষা (will to power), যৌন কামনা নহে। এই শক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইলেই যে হীনমন্যতার (inferiority complex) সৃষ্টি হয় তাহাই হইতেছে আমাদের মনোবৈকল্যের মুল কারণ। তিনি বলেন, জীবনের পথে চলিতে হইলে জীবনের তিনটি জিনিসের সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়—একটি হইতেছে পরিবেশ, একটি কর্ম্মজীবন এবং আর একটি হইতেছে প্রেম ও প্রেমাস্পদ। এই তিনটি ব্যাপারে শিশু তাহার শৈশবে যে ভাবে বাধা বা সাহায্য পাইবে, সেই ভাবেই তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে।

আমরা অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাই শক্তির কামনা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শক্তি কামনার অন্তরায় হয় বিরুদ্ধ জীবন-পরিবেশ (যেমন দারিদ্র্য), এবং অনুপযুক্ত দেহযন্ত্র (যেমন কানা, খোঁড়া বা কালা হইয়া জন্মান)। তিন প্রকারে ইহার সমাধান হইতে পারে, যথা—(১) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (Successful compensation), (২) পরাজয় ও পলায়ন (defeat or retreat) এবং (৩) মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিপূরণজনিত অস্বভাবী আচরণ।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ফলে বধির বিঠোভেন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং তোত্‌লা

ডিমস্থেনিস্ বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণও বিরল নহে। প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষাফলে বঞ্চিত হইয়া যে শৃগাল দ্রাক্ষাফল টক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল অথবা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যে ব্যক্তি কুনো প্রকৃতির হইয়া পড়ে তাহাদের মধ্যে ইহার উদাহরণ মিলিবে। তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ মিলে বহু কুচক্রী সয়তানের মধ্যে। "হাবা, কালা, কানা, খোঁড়ার এক কাঠি বাড়া" প্রবাদটি ইহাদের প্রতিই প্রযোজ্য। একদিক দিয়া ইহারা ছোট ও দুর্ব্বল বলিয়াই সয়তানির মধ্য দিয়া শক্তির পরিচয় দেয়।

এ্যাড্‌লারের মতে, আমাদের জন্মগত ও পরিবেশগত ত্রুটির মধ্যে একটা সার্থক সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই আছে সুস্থ মনুষ্যত্ব এবং শিক্ষার মূল কথা হইতেছে বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়া হীনমন্যতার অনুভূতি হইতে আমাদের রক্ষা করা। যে বালক অঙ্ক বা ইংরাজী ভাল পারে না. তাহাকে যদি গায়ক বা শিল্পী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, অথবা নানা জাতীয় ঐচ্ছিক বিষয় লইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে একটা সার্থকতার পথ পায়।

ফ্রয়েডের সহিত য়্যুঙ্গ-এরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে। য়্যু বলেন, মানুষের মধ্যে দুইটি প্রধান শ্রেণী বিভাগ আছে। একদল মানুষ হইতেছে অন্তর্বৃত্ত এবং আর একদল বহির্বৃত্ত। অন্তর্বৃত্ত লোকেরা চিন্তা-প্রবণ ও আত্ম-বিশ্লেষণপরায়ণ হয়, তাহারা বহির্বিশ্বের কোলাহল হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে এবং বাহিরের দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে যেন খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বহির্বৃত্ত লোকেরা ইহার ঠিক বিপরীত-ধর্ম্মী। লোকের উপস্থিতিতে ইহাদের উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ইহারা আত্ম-প্রচার ও কর্ত্তৃত্ব ভালবাসে।

য়্যুঙ্গ বলেন, জগতের যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার সহিত মানুষকে কারবার করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার কাজ বেশী করিতে হয়, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার চেয়ে চলাফেরা, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা প্রভৃতির কাজ বেশী করিতে হয়। কিন্তু সকলেই সব রকমের কাজের জন্য উপযুক্ত নহে। একজন বহির্বৃত্ত লোককে যদি তাহার বর্ত্তমান জীবন-সংস্থানের ফলে চিন্তা ও আত্ম-বিশ্লেষণের কাজ বেশী করিতে হয় অথবা

একজন অন্তর্বৃত্ত লোককে যদি বহির্ম্মুখী কর্ত্তব্যের কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনে আসে ব্যর্থতা ও কর্ত্তব্যদ্বন্দ্ব, ফলে সৃষ্ট হয় মনোবৈকল্য। সুতরাং আমাদের মনোবৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে য়্যুঙ্গের মতে বর্ত্তমানের জীবন-সংস্থানটির উপরেই জোর দিতে হইবে, সুদূর অতীতের শৈশবের অবদমনের উপর নহে।

এইখানেই হইতেছে য়্যুঙ্গের মতবাদের সহিত ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরাট পার্থক্য। য়্যুঙ্গ বলেন, শৈশবের অবদমন আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে কিন্তু তাহা হইতে অনেকের মধ্যেই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান জীবন-সংস্থানের সহিত যদি আমরা খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারি তাহা হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ

এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের অবদান কি তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণ class-teaching-এর দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন যে খুব বেশী আছে, তাহা মনে হয় না, কারণ ক্লাশের রুটিন-বাঁধা শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মনঃসমীক্ষণের জটিল ও দীর্ঘায়িত চিকিৎসা-পদ্ধতির কোনও অবকাশ নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মনঃ-সমীক্ষক হওয়াও সম্ভব নহে। তাহা হইলেও প্রত্যেক শিক্ষক এবং অভি-ভাবকের মনোবিদ্ হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষক মনোবিদ্ হইলে ছাত্রগণের স্খলন পতন ত্রুটিগুলিকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনি মনোবিদ্ হইলে অপরাধী ছাত্রদিগকে একটা ঘৃণ্য অপাংক্তেয় পশু-শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিবেন না এবং শাস্তি ও তিরস্কার দিয়া অপরাধী ছাত্রকে নূতন নূতন পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়া পরিপক্ক অপরাধী করিয়া তুলিবেন না।

কিছু কিছু সংশোধনী ব্যবস্থাও যে তিনি করিতে পারেন না তাহা নহে। একটু চেষ্টা করিলেই তিনি ছেলেদের দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ও খেলাধূলার বিশেষত্বগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের মনের খবর লইতে পারেন এবং প্রয়োজন-

বোধে অভিভাবকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বস্তুতঃ শিশুদের প্রতি দিবসের আচরণ ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া ছাত্রদের মনের গোপন ইতিহাসের ("মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) অনেকখানি সন্ধান পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় অভিজ্ঞ শিক্ষক একটা সজাগ এবং অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়া তাঁহার ছাত্রদের আচরণগুলি লক্ষ্য রাখিতে পারেন।

মনঃসমীক্ষণ আমাদের আর কিছু দিক আর নাই দিক, অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা নিশ্চয়ই দিয়াছে যে, ছাত্রদের সহিত শিক্ষককে বন্ধুভাবে মিশিতে হইবে এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিতে হইবে।

কবি বলিয়াছেন "প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরম্"—কাদা ধুইয়া ফেলার চেয়ে কাদা যাহাতে না লাগে সেই ব্যবস্থাটাই ভাল। চিকিৎসাতত্ত্বেও এই সত্যটি প্রয়োজনীয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগমুক্তির চেয়ে নীরোগ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দেহটিই বেশী কাম্য। শরীরের স্বাস্থ্যের মত মনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও ইহা প্রযুজ্য। মনঃসমীক্ষকগণ এই মানসিক স্বাস্থ্যের সন্ধান দিয়াছেন।

মনোরোগ চিকিৎসার দিক দিয়া এ্যাড্‌লারীয় মনোবিদ্যা স্কুল পাঠশালাতেই বেশ খানিকটা কাজ করিতে পারে। ছাত্রদের হীনমন্যতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নানা জাতীয় সার্থকতার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। শারীরিক ত্রুটিজনিত হীনমন্যতায় উপযুক্ত ডাক্তারি চিকিৎসার দ্বারা অসুখকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারেন এবং নানাভাবে Successful compensation-এর দ্বারা তোত্‌লা বালক হইতে নূতন ডিমস্থিনিস্ এবং বধিরপ্রায় শিশু হইতে নূতন নূতন বিঠোভেন তৈয়ারি করিতে পারেন।

য়্যুঙ্গের মনোবিজ্ঞানও ব্যবহারিক দিক দিয়া অনেকখানি কাজ করিতে পারে। এই মনোবিজ্ঞান অন্তর্বৃত্ত বহির্বৃত্ত বালকদিগের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে নিয়োজিত করিতে নির্দ্দেশ দিবে। ফলে সমাজের বহু ক্ষেত্রেই যে সোজা খাপে বাঁকা তরোয়াল পুরিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করা হয়, তাহা আর হইবে না; যার সেখানে যোগ্য স্থান সেই স্থানে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া বহু অকল্যাণের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে।

বাল্য-কৈশোরের দুষ্ক্রিয়তা

কৈশোরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের দেহ-মনে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিতে থাকে। এই পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, মানুষের শৈশব ও যৌবনের আকৃতি গঠন করিবার জন্য দুইজন পৃথক শিল্পী-দেবতা আছেন। এই সময়েই যৌন-চেতনা নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে ও সংবেদন-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, নূতন নূতন বিষয়ে কৌতুহল জাগ্রত হইতে থাকে, কাব্য-কাহিনীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এই সময়েই বালক ও বালিকারা পুরুষ ও নারীর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরস্পর পৃথক হইয়া যাইতে থাকে। ফলে, মনের গহনের পরিবর্ত্তনগুলি গোপন রাখা সম্ভব হইলেও আকৃতিগত পরিবর্ত্তনকে প্রতিরোধ বা গোপন করা যায় না।—কবি যাহাকে বলিয়াছেন "বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন;" বালিকারা এই সময়েই সেই নারীসুলভ আকৃতি লাভ করিতে থাকে এবং বালকদের মুখেও গুম্ফের রেখা ফুটিয়া উঠে এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত ও ভগ্ন হইয়া যায়। ফলে, একটা লজ্জার অনুভূতিতে কেহ কেহ জড়সড় হইয়া সঙ্কোচের সহিত একপাশে সরিয়া যায় এবং খানিকটা অন্তর্বৃত্ত (introvert) হইয়া পড়ে। এই অন্তর্বৃত্ত ভাবটি অস্বাভাবিক হইয়া অনেকে বাস্তব জীবন হইতে সরিয়া কল্পনার জগতে আশ্রয় লয় এবং শেষ পর্য্যন্ত অস্বভাবী মনোবিশিষ্ট হইয়া উঠে এবং কাহারও কাহারও মধ্যে চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (Demantia praecox) লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণ যাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না, তাহাদের মধ্যেও অনেক বালকই কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ কি?

(১) দেহবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, দুষ্ক্রিয়তা হইতেছে জন্মগত ব্যাপার, ইহা বংশগতির একটা অনিবার্য্য পরিণতি। গ্যাল্টন, গাডার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভাল ও মন্দ লোকের বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, সাধু ও অসাধু হওয়ার উপর বংশগতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধ

মতবাদও আছে। A De Condolle প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন—বংশগতির চেয়ে পরিবেশের প্রভাব বলবত্তর। পাপী হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে না, পাপ জিনিসটা জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনা।

(২) ক্যানন লিওপোল্ড, লেভি প্রভৃতি গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্ এবং অনেক সন্নাসী ও ব্যায়ামবিদ্গণের ধারণা, মানুষের বহু আচরণের মূলেই আছে তাহার শরীরস্থ নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিসমূহের রস-ক্ষরণের ক্রিয়া। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বেশী ক্রিয়াশীল হইলে জাতক হয়ত অত্যন্ত চঞ্চল, ক্রোধপরায়ণ ও দুঃসাহসী হইয়া উঠে। সুতরাং এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক রসক্ষরণে তাহার আচরণ অসামাজিক হওয়াও বিচিত্র নহে। আবার থাইরয়েড, থাইমাস প্রভৃতির রসক্ষরণের স্বল্পতা হইলে যৌন-চেতনা বিলম্বিত হইয়া অথবা প্রাচুর্য্য হইলে যৌন-চেতনা অকালে প্রবুদ্ধ হইয়া মানুষকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) অনেকের বিশ্বাস, নির্বুদ্ধিতা বা উনমানসতার সহিত দুষ্ক্রিয়াশক্তির একটা সম্পর্ক আছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, অধিকাংশ দুষ্ক্রিয়াসক্ত বালক-বালিকার বুদ্ধির মাপ বা মনস্বিতাংশ হইতেছে ৭০ হইতে ৮০র মধ্যে। কিন্তু এই তথ্যটি হইতে জোর করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নির্বুদ্ধিতার সহিত অপরাধপ্রবণতার একটা কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে। বুদ্ধির দৈন্য অন্যায়ের পথে প্রযুক্ত করে, ইহা ততটা সত্য নহে, যতটা সত্য হইতেছে যে, বুদ্ধির দৈন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঠিক পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। নির্বোধকে বুদ্ধিমান দুষ্ট বালকেরা যতটা খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান বালককে ততটা পারে না।

(৪) ফ্রয়েড বলেন, মানুষের আদিম কাম-প্রেরণাই নিমিত্তভেদে বিভিন্ন বিবর্ত্তনে মূর্ত্ত হইয়া আমাদের অপরাধপ্রবণতাকে উৎসাহিত করে। তাঁহার মতে, যে আদিম 'ইদ্' (id) লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহার দাবী সব সময়েই 'অধিশাস্তা মন' (Super-Ego) দ্বারা স্বীকৃত হয় না। ফলে তাহার 'অহমটি' (Ego) যখন 'ইদ্'-এর অসংযত দাবী ও অধিশাস্তার অসম্ভব নৈতিক শাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনেক দাবীই অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানের রাজ্যে গূঢ়ৈষা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাহার পরই জাতকের এই সমস্ত নিরুদ্ধ কামনাগুলি নীতি ও সামাজিকতার নেমিক্ষিপ্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া অসামাজিক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ফলে সে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, সমাজ যাহাকে ভাল বলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শুচিতা নীতি প্রভৃতিকে অবহেলা করিয়া একটা ছদ্ম আস্ফালনে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহকে ব্যক্ত করিতে চায়।

এই অপরাধপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের জীবন-স্রোতের গোমুখীর দিকে উজান বহিয়া দেখিয়াছে, অতি শৈশবেই জাতকের মুখকাম, পায়ুঃকাম প্রভৃতি যুগেই মাতা-পিতার পালনের দোষে হয়ত জাতকের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। সে খবরটি হয়ত জাতক নিজেও জানে না, আর মাতা-পিতাও জানে না। যে শিশু শৈশবে অবাধে মাতৃস্তন্য পান করিবার সুযোগ পায় নাই, সে হয়ত পরিণত বয়সে অসহিষ্ণু ও অসন্তোষপরায়ণ হইয়া উঠে, যে শিশু মলত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যধিক শাসন-তাড়ন পাইয়াছে সে হয়ত পরিণামে জেদী, দুঃখবাদী বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা কৈশোরের অপরাধপ্রবণতার নানা জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছে।

বাল্য-কৈশোরে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি একটা উদ্ধত অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ইহা নাকি অধিশাস্তা তথা পিতার অভিভাবকত্বের প্রতি ছদ্ম বিদ্রোহের প্রতীক। যে পিতা শিশুকে পদে পদে বিধি-নিষেধের শাসনে সংযত করিয়াছে এবং তাহার স্বাধীন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, উত্তরকালে জাতক সমাজকে সেই পিতার ভূমিকায় দেখিতে পায় এবং সেই জন্যই পিতার প্রতি তাহার নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহকে সমাজের প্রতি বিদ্রোহ দিয়া পরিতৃপ্ত করে। এই বয়সে স্কুল পালানোর মধ্যেও ঐ জাতীয় বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে।

মিথ্যা-ভাষণ আর একটি অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধটির মধ্যেও আছে নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রেরণা। ইহার মধ্যে পাপ ততটা নাই, যতটা আছে মনের ব্যাধির লক্ষণ, একটা অবদমিত কামনার ইতিহাস। এই মিথ্যা ভাষণগুলিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে মনের গূঢ়ৈষারই পরিচয় মিলে।

চৌর্য্য আর একটি অপরাধ। ইহার মধ্যেও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া আছে।

যে সমস্ত জিনিস জাতক চুরি করে, অনেক সময়েই তাহা হইতেছে ইপ্সিত যৌন পদার্থের প্রতীক। কাজেই এই জাতীয় চুরিগুলিকে অবদমিত যৌন-লিপ্সা এবং যৌন-প্রতীক সংগ্রহের মধ্য দিয়া অতৃপ্ত যৌন-কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দল বাঁধিয়া গুণ্ডামি করাও কৈশোরের আর একটি অপরাধ। ইহার মূলেও আছে অধিশাস্তা মনের বিরুদ্ধে 'ইদ্'-এর বিদ্রোহ। বাল্যকৈশোরের অনেক অবাঞ্ছনীয় বিশেষত্বের মধ্যেই বিদ্রোহটির পরিচয় পাওয়া যায়; ছাত্রদের বইপত্র নোংরা করা, খাতা নষ্ট করা, কালি ছিটাইয়া দেওয়াল অপরিচ্ছন্ন করা—এই সমস্তের মধ্যেও আছে এই বিদ্রোহের প্রেরণা এবং এই সমস্ত বিদ্রোহের অধিকাংশের মধ্যেই আছে আদিম যৌন কামনার বিকল্পবিহীন দাবী।

(৫) এ্যাড্‌লার কিন্তু ফ্রয়েডের মত এই নিরুদ্ধ যৌন-কামনাকেই অপরাধ-প্রবণতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে শক্তির আকাঙ্ক্ষা (will to power) আছে, সেইটির উপযুক্ত খোরাক না পাওয়া, অথবা ব্যাহত হওয়ার জন্য হীনমন্যতা বোধ এবং অসামাজিক উপায়ে এই হীনমন্যতাকে জয় করিবার চেষ্টার মধ্যেই আছে অপরাধ-প্রবণতার কারণ।

মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধকেও এই এ্যাডলারীয় সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য অনেক মিথ্যা ভাষণের মধ্যেই যে নির্জ্ঞান মনের গূঢ়েষার প্রেরণা আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না; তবে সব মিথ্যাই এই গূঢ়েষার ফল নহে। লোককে তাক্ লাগাইয়া দিবার জন্য যে সব চমক্‌দার নাটকীয় মিথ্যা কথা বলা হয়, নিজের শক্তি সামর্থ্য সাহস সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিয়া চাল দিয়া যে মিথ্যা কথা বলা হয় তাহার মূলে আছে হীনমন্যতার প্রতিবাদ।

আমাদের জীবনের পাপতাপ অনেকখানি কমিয়া যাইত, যদি আমরা নিজের বাহাদুরী প্রচার করিবার জন্য অপরের আত্ম-সম্মান বোধে আঘাত না করিতাম। অত্যন্ত শিশু বয়সে পর্য্যন্ত আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত তীব্র থাকে এবং সেই আত্মসম্মান বোধে আঘাত পাইলে শিশু পরিণামে বেপরোয়া ও অসামাজিক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে এ্যাডলার বর্ণিত একটি গল্প আছে। একটি বালক দেখিত যে, তাহার মাতাপিতা বাহিরে যাইবার

সময় বাক্‌স তোরঙ্গে চাবি দিয়া যাইতেন। সে ভাবিল, মাতাপিতা তাহার সাধুতায় সন্দেহ করিতেছেন। ইহাতে তাহার অপমান বোধ হইল এবং মাতা পিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে সে চুরি আরম্ভ করিল। ছয় বৎসর বয়সের চুরির অভ্যাস তাহার কুড়ি বৎসর বয়সেও কাটিল না।

ইতোপূর্ব্বে চুরি সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার কথা বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ্যাডলার বর্ণিত এই চুরিটি সে জাতীয় নহে। ইহার মধ্যে নিরুদ্ধ যৌন-কামনার ইতিহাসও নাই, আর অপহৃত পদার্থগুলিও যৌন-পদার্থের প্রতীক নহে। এ্যাড্‌লার বলেন, আমাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার মূলেই আছে হীনমন্যতার প্রতিবাদ। শৈশবে অপমান বোধ, বাহাদুরী প্রকাশে বাধা পাওয়া, দেহগত তুচ্ছতা বা রিক্ততার অনুভূতি, স্নেহ ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া—এই সমস্তই শিশুকে পরিণামে সমাজদ্রোহী ও অপরাধপ্রবণ করিয়া তুলে। বাল্য কৈশোরের দুষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে জাতকের গৃহ, সঙ্গী-সহচর, সমাজ-পরিবেশ, তাহার দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি, এই সমস্তের প্রভাবও কম নহে।

(৬) Clifford Shaw দুষ্ক্রিয়তার সহিত সমাজ-পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুষ্ক্রিয়তার মাত্রার সহিত সমাজ-পরিবেশের একটা অনুবন্ধ (correlation) আছে। চিকাগো সহরে রেলপথের ধারে বস্তি, কলকারখানা প্রভৃতি অঞ্চলে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বস্তি হইতে স্থায়ী বসতবাটীযুক্ত লোকালয়ের দিকে যতই যাওয়া যায় অপরাধ-প্রবণ বালক-বালিকার সংখ্যা ততই হ্রাস পাইয়া থাকে। সিরিল বার্টও লণ্ডনে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে ফিলাডেল্‌ফিয়া, বোষ্টন্‌, ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শহরেও একই প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। William Healey দেখাইয়াছেন, চিকাগো এবং বোষ্টন্‌ শহরে যত বালক অপরাধের জন্য ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেই ছিল কুসঙ্গের প্রভাব।

(৭) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—দারিদ্র্যও অপরাধ-প্রবণতার একটা কারণ। আমরা কিন্তু দারিদ্র্যকে অপরাধপ্রবণতার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া মনে করি না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার গুরুদাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে এ্যাব্রাহাম্‌ লিংকন্‌ পর্য্যন্ত বহু মহাপুরুষই দরিদ্রের সন্তান ছিলেন;

তবে সহরের যে দারিদ্র্য মানুষকে ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁসি করিয়া শিবির-জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, যে দারিদ্র্য মানুষের লজ্জা-আব্রু কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে খোঁয়াড়ের পশুর জীবনে টানিয়া আনে, যে দারিদ্র্য অভাবের তাড়নায় গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণীর মধ্যে কলহ ও অশান্তি লইয়া আসে, সে দারিদ্র্য অনেক সময়েই মানুষের অপরাধপ্রবণতাকেও বাড়াইয়া তুলে।

অপর পক্ষে, দরিদ্রের সংসারে বালক যদি দেখে—মাতা পিতা নীতিধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন, দুঃখের অন্ন সুখ করিয়া খাইতেছেন, মাতাপিতার মধ্যে মত-বিরোধ নাই, ভোগের উদগ্র কামনায় প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতির চেষ্টা নাই, ভাগ্যদেবতা ও ভগবানকে অভিশাপ দেওয়া নাই, বরং পুত্রকন্যার লালন-পালনের জন্য দুঃখ-বরণ আছে, ত্যাগ আছে, ধৈর্য্য আছে, আত্মত্যাগ আছে—সেরূপ ক্ষেত্রে দরিদ্রের সংসার বালকদের সচ্চরিত্র গঠনে সহায়কই হইয়া উঠে।

(৮) পারিবারিক শান্তি ও শুচিতা বালকের অপরাধপ্রবণতার একটি বড় প্রতিষেধক এবং ইহার অভাব অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ। পারিবারিক অশান্তি বালকের মনোজগতের উপর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। সমাজতত্ত্ববিদ্ Harncl Hart এবং E. B. Hart দেখাইতেছেন, গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বালকবালিকার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, একটা প্রীতির বন্ধন এবং একাত্মতা আছে। কাজেই পারিবারিক অশান্তিতে যে পক্ষই দুঃখ পাক না কেন, সেই দুঃখের অনেকখানি অংশ বালক বালিকার হৃদয়ে আঘাত করে। ফলে আহতের প্রতি একটা অক্ষম সহানুভূতি এবং আঘাতকারীর প্রতি বন্ধ্যা বিরক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বে সে আর্ত্ত হইয়া উঠে। অথচ আঘাতকারীকেও সে আত্মীয় ও প্রীতির কেন্দ্র বলিয়া জানে। এই প্রীতির কেন্দ্রই যদি বিরক্তির কাজ করে, তাহা হইলে মোহভঙ্গের ব্যর্থতা কম পীড়াদায়ক হয় না। এই ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে কাতর হইয়া বালকের মধ্যে একদিকে যেমন একটা তিক্ততা ও আর্ত্তভাব জাগিয়া উঠে, তেমনই অপর দিকে একটা অক্ষম বিদ্রোহ পুঞ্জিত হইতে থাকে। ফলে, পরিণামে তাহারা বেপরোয়া ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে

August Eichhorn নামক একজন ভিয়েনার মনোবিদ্ দেখাইয়াছেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যতগুলি দুষ্ক্রিয়াসক্ত বালক আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশের গৃহেই শান্তির আবহাওয়া ছিল না। L. Buta W. Hattwick নামে Winnetkaর আর একজন শিশু-মনোবিদ্ লক্ষ্য করিয়াছেন, যে সকল গৃহে শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে, সেই সকল গৃহের বালক বালিকারা শান্ত, ভদ্র, সহযোগী ও পরমতসহিষ্ণু হয়; অপর পক্ষে যে সকল গৃহে পারিবারিক শান্তি নাই, সেই সকল গৃহের বালক-বালিকারা হিংসাপ্রবণ, প্রক্ষোভী, অসন্তোষপরায়ণ ও পরমত-অসহিষ্ণু হয়। এই বালক- বালিকারা উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে পর্যন্ত নিজেদের মানাইয়া চলিতে পারে না। সিরিল বার্ট দেখাইয়াছেন, পারিবারিক অশান্তির জন্য যে সমস্ত গৃহে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অথবা মাতাপিতার মধ্যে একজন পৃথকভাবে বাস করে, তাহাদের পুত্রকন্যারা প্রায়ই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হিসাবে সমগ্র অপরাধী বালকবালিকার শতকরা ৫৮ ভাগই আসে সেই সব ক্ষেত্র হইতে যেখানে পারিবারিক অশান্তি সুখের গৃহ-নীড়টি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

(৯) এই গৃহ-শান্তির সহিত প্রয়োজন হইতেছে শৃঙ্খলা এবং পুত্রকন্যার প্রতি মাতা-পিতার সহৃদয় মনোযোগ। যে পিতা বাড়ির কোন খবরই রাখিতে চাহেন না, অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যিনি আনন্দের উদ্দেশ্যে ক্লাব, সভা-সমিতি বা সিনেমায় ঘুরিতে থাকেন অথবা আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সন্ধানে বাড়ী-বাড়ী টিউশানি করিয়া বেড়াইতে থাকেন—পুত্র-কন্যার দিকে ফিরিয়া তাকাইবারও সময় পান না অথবা তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও করেন না, তাঁহাদের পুত্র-কন্যার ভাল হইবার আশা কম।

(১০) অপর পক্ষে, ভালবাসা ও শৃঙ্খলার আতিশয্যে যাঁহারা প্রতিনিয়তই ছেলের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হইবার সুযোগ না পাইয়া প্রায় চিরকালই 'নাবালক' থাকিয়া যায়। এই হিসাবে মাতা-পিতার মনোযোগের অভাব পুত্রকন্যার অপরাধপ্রবণতার যত বড় কারণ, মনোযোগের আতিশয্যও তত বড় কারণ। মনোযোগের মত শাসন-ব্যবস্থারও একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন। অত্যন্ত কড়া শাসনে বালকবালিকা

দুর্বিনীত ও একগুঁয়ে এবং শিথিল শাসনে অসামাজিক ও অভিমানী হইয়া উঠে।

(১১) স্কুল পাঠশালায় বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থ্যর মধ্যেও অপরাধপ্রবণতার কারণ অনেকখানি নিহিত আছে। বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্র "সিকুলার' হইয়াছে এবং শিক্ষাব্যবস্থাও "সিকিউলার" ও নির্ব্যক্তিক হইয়াছে। শিক্ষকদের রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ছাত্রদের প্রভাবান্বিত না করে, সেইজন্য শিক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিক ভাবে পড়াইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত বা ব্যক্তিগত চরিত্রের স্পর্শ হইতে ছাত্রগণ বঞ্চিত হয়। ক্লাশটি যত বড় হয়, পাঠন ব্যবস্থাও ততই ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হইয়া গণকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, শিক্ষকের আচরণ ততই আনুষ্ঠানিক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে পাঁচটি stepযুক্ত Herbartian method-এ অভিজ্ঞ "শিক্ষক-যন্ত্র"টির পরিচয় ছাত্ররা যতটা পায়, "শিক্ষক-মানুষ"টার পরিচয় ততটা পায় না।

ইহা ছাড়া বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে "হাউস্ সিস্টেম্" (house system) পরীক্ষা ব্যবস্থা, আন্তঃক্লাশ-খেলাধূলা, স্পোর্টস্ প্রভৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতা জিনিসটাকে যতটা উৎসাহ দেওয়া হয়, সহযোগিতাকে ততটা উৎসাহ দেওয়া হয় না। অথচ সমাজজীবনে সংঘর্ষ এড়াইয়া বন্ধুভাবে চলিতে হইলে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিযোগিতা রজোগুণাত্মক, ইহা আত্মোন্নতির সহায়ক হইলেও অনেক সময়েই অসামাজিক ও উত্তেজক কার্য্যে মানুষকে প্রযুক্ত করে। কিন্তু সহযোগিতা সত্ত্বগুণাত্বক, সমাজের স্থিতি ও শান্তির জন্য ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। অথচ বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার দিকেই লক্ষ্য করা হয় বেশী। একেই ত বর্ত্তমান শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতাই হইতেছে জীবন-সংগ্রাম-মূলক ও প্রতিযোগিতামূলক, তাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ অপর মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও সম্ভাব্য শত্রু বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। অপরাধপ্রবণতা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা অপ্রতিবিধেয় ভাগ্য-ফল। তাহার উপর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও সেই প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করিয়া আমরা প্রত্যেক ছাত্রটিকে প্রত্যেকের শত্রু করিয়া অপরাধ- প্রবণতাকে বাড়াইয়া তুলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা "সিকুলার" বলিয়া শিক্ষকদের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ানো এবং তাহার জ্ঞানপরীক্ষা করিবারই অধিকারটুকু দেওয়া হইয়াছে, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে খবরদারী করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ১০ বৎসর এবং কলেজ শিক্ষায় ৪ বৎসর পাঠাভ্যাসের পর যে ছাত্র স্নাতক হইয়া গৃহে ফিরিল, তাহার চরিত্রের কোনও পরিচয়ই তাহার ডিপ্লোমার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ ১৪ বৎসরের মধ্যে সেই স্নাতকটি কবে কোন গরীব দুঃখীকে কতটা দান করিয়াছে, দেশ ও দশের জন্য কতটা আত্মত্যাগ করিয়াছে, সমাজসেবায় কতটা দুঃখ বরণ করিয়াছে, এ ইতিহাস স্নাতকের ডিপ্লোমার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে কত বার মিথ্যাকথা বলিয়াছে, অসামাজিক আচরণ করিয়াছে, প্রবঞ্চনা করিয়াছে, মনুষ্যত্বের বিচারে তাহার কত বার "স্খলন পতন ত্রুটি" হইয়াছে, এ পরিচয়ও স্নাতকের ডিপ্লোমার মধ্যে লেখা থাকে না। অপর পক্ষে, পড়াশুনায় ভাল হইলেই ভাল চাকরী পাওয়া যায়, মান ও মর্য্যাদা পাওয়া যায়, সমাজে "ভাল-ছেলে" বলিয়া খাতির পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ছাত্রমহলে "ভাল ছেলে" এই কথাটার অর্থই হইতেছে 'পড়াশুনায় ভাল'; স্বভাব চরিত্রের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই।

এই লাভ-ক্ষতির হিসাব ছাড়া আর একটি কারণে মানুষ সংযত হয়। ভয়ের জন্য পাপ করিব না, ইহা হইতেছে নিম্নস্তরের কথা। ভাল কাজকে ভালবাসি বলিয়া ভাল কাজ করিব, ইহাই হইতেছে আদর্শের কথা। এই আদর্শের ব্যবস্থা স্কুল কলেজে নাই। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অপমানের মধ্যে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষক ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের "দিনগত পাপ ক্ষয়ের" অধ্যাপনার মধ্যে আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে আদর্শের অভাবেও ছাত্রদের অপরাধ-প্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে।

(১২) কৈশোর হইতেছে hero worship-এর যুগ। এই সময়ে তাহারা জীবনের আদর্শ নেতার নির্ব্বাচন করে। কিন্তু আজ সমাজে নৈতিক আদর্শ স্থানচ্যুত হইয়া ভোগ ও প্রতিষ্ঠার আদর্শ বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কিশোর কিশোরীরাও সত্যকারের মহাপুরুষদের পরিত্যাগ করিয়া জনপ্রিয় খেলোয়াড় অথবা নটনটীকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। ইহারা দেখে, এই

নটনটীর দল লক্ষ্মীর অনুগ্রহে সুখে দিন যাপন করে, খবরের কাগজে তাহাদের ছবি প্রকাশিত হয়, লোকের মুখে-মুখে তাহাদের নাম প্রচারিত হয়। আর ইহারই পাশে তাহারা দেখে, একজন দরিদ্র অধ্যাপক হয়ত অন্ন সমস্যার সমাধানে ক্লান্ত হইয়া জীবনে কোনও প্রতিষ্ঠাই অর্জ্জন করিতে পারিল না। কাজেই ঐ অধ্যাপকটির চেয়ে ঐ নটনটীগুলিকেই কিশোর কিশোরীরা hero বলিয়া মনে করে ও তাহাদের জীবনের অনুকরণ করে।

(১৩) Dr Arnold তাঁহার 'Culture and Anarchy' নামক গ্রন্থে সভ্যতার দুইটি দিক দেখাইয়াছেন—Hellenism বা বুদ্ধি বিচারের দিক, আর Hebraism বা নিষ্ঠার দিক। ইউরোপ এবং এদেশেও মধ্যযুগে মানুষ নিষ্ঠার দিকটিতে বেশী নজর দিয়া "গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের" আবর্ত্তে পড়িয়াছিল এবং বর্ত্তমানে নিষ্ঠার চেয়ে বুদ্ধিকে বড় করিয়া "চালাকীসর্ব্বস্ব" হইয়া নিষ্ঠা আদর্শ প্রভৃতি হৃদয়গত গুণগুলিকে অস্বীকার করিতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিদ্‌গণ এই দিকটিতে তেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন না। তাঁহারা I. Qর গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া হৃদয়ের সমৃদ্ধিকে কোনও মূল্যই দিতে চাহিতেছেন না। এই ভ্রান্ত আদর্শের জন্য বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে আর এক জাতীয় ভার-সাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। আজ আমরা নির্জ্জলা মিথ্যা ভাষণকে বিজ্ঞপ্তির নাম দিয়া 'চল' করিয়া লইয়াছি, অপপ্রচারকে "প্রোপাগাণ্ডা" নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছি, অন্যায় যুদ্ধকে tactics নাম দিয়া প্রশস্তি করিতেছি এবং smartness ও প্রগল্‌ভতাকে বুদ্ধি নাম দিয়া সভ্যতার আস্ফালন করিতেছি। কিন্তু যে সভ্যতা মস্তিষ্কের ঐশ্বর্য্যে হৃদয়ের মাধুর্য্যকে অস্বীকার করে, অপরাধপ্রবণতা তাহার অনিবার্য্য ফলমাত্র।

প্রতিকারের উপায়

এই অবস্থার প্রতিকার কি? কি উপায়ই বা অবলম্বনীয়?

অপরাধপ্রবণতার নিদান সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু-আলোচনা করিয়াছি। এখন এই নিদানসমূহের আলোচনা হইতেই প্রতিকার সম্বন্ধেও কিছু-কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই সম্বন্ধে প্রথম কথা

হইতেছে—"প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরম্"। কারণ, দেখা গিয়াছে, দুষ্ক্রিয়তা একবার কাহারও মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহা প্রায় অনারোগ্য ব্যাধির মতই তাহাকে পাইয়া বসে। ফলে সাময়িক ভাবে তাহা সারিয়া যাইলেও আবার শতকরা ৮৮টি ক্ষেত্রে ইহার পুনরাবৃত্তি হয় এবং ৭০টি ক্ষেত্রে বাল্যের দুষ্ক্রিয়তা পূর্ণ বয়সে নূতন করিয়া দেখা দিয়া থাকে।

(১) দুষ্ক্রিয়াসক্তি জিনিসটা যদি জন্মগত ব্যাপার হয় তাহা হইলে জন্মোত্তর যুগে তাহার আর প্রতিকার নাই।

(২) গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্যে যদি অপরাধপ্রবণতা আসে, তাহা হইলে তাহারও প্রতিকার আছে। উপযুক্ত চিকিৎসা; এ্যাড্রিনাল্ প্রভৃতি গ্রন্থির রস ইন্‌জেক্‌সান প্রভৃতির দ্বারা এবং বিভিন্ন জাতীয় যৌগিক আসন অভ্যাসের দ্বারা এই রসক্ষরণের সমতা বিধান করা যাইতে পারে।

(৩) উনমানসতাজনিত অপরাধপ্রবণতা প্রতিকারের উপায় হইতেছে, এই সমস্ত নির্ব্বোধ বালকদের নজরে রাখা এবং ইহারা যাহাতে বুদ্ধিমান শয়তান জাতীয় বালকদের সংসর্গে মিশিতে না পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

(৪) ফ্রয়েড-পন্থিরা এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়া-সক্ত যুবকদের মনোবিকলন করিয়া তাহাদের নির্জ্ঞান মনের গূঢ়ৈষাকে সজ্ঞান মনের স্তরে ভাসাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তবে এই ব্যবস্থাটি সকলের অধিগম্য নহে। কারণ, ইহার জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন তাহা সকলের আয়ত্ত নহে।

(৫) এ্যাডলারীয় হীনমন্যতা দুষ্ক্রিয়তার কারণ হইলে তাহার প্রতিকার সহজলভ্য না হইলেও, প্রতিশোধের উপায় খানিকটা আছে। ছাত্রদের পাঠ্য-জীবনে প্রচুর ঐচ্ছিক বিষয়ের সুযোগ দিয়া, Extra curricullar activities প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, ছাত্রদের বাহাদুরির পথ খুলিয়া দিতে হইবে, তাহাদের আশা-আকাঙ্খাকে সহৃদয়তার সহিত দেখিতে হইবে, তাহাদের আত্ম-সম্মান বোধকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা শুধু বিদ্যালয়েই করিলে চলিবে না, ছাত্রদের গৃহ-পরিবেশকেও উহার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে।

এই জন্য রাষ্ট্র হইতে প্রত্যেকটি অভিভাবককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসামূলক মনোবিদ্যার "চেয়া

সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত মনোবিদ্যার (Individual Psychology) ব্যাপক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফলে, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্রকে বুঝিতে পারিব, তাহার জীবনের গোপন দ্বন্দ্ব, গোপন ব্যর্থতা, গোপন বিদ্রোহের কারণ জানিতে পারিব। তাহাতে অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

অপরাধীকে বিশেষ বিশেষ অপরাধী-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই অবস্থার প্রতিকার সহজে হয় না। আর জেলখানার নির্জ্জন বাস বা নির্য্যাতনও সহজে অপরাধীকে শান্ত ও ভদ্র করিয়া তুলিতে পারে না। সমাজে বাস করিতে করিতেই যে বালক অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন আরও স্নেহপরায়ণ সমাজ-পরিবেশ। বুঝিতে হইবে—স্নেহ ভালবাসায় জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই বালকটি সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সে বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে হইলে প্রয়োজন আরও স্নেহ, আরও প্রীতি ও সহানুভূতি এবং মধুরতর সমাজ-পরিবেশ।

(৬) সমাজ-পরিবেশ মন্দ হইলে তাহা হইতে ছেলেদের সাবধানে রাখা সত্যই কষ্টকর এবং আদর্শ সমাজ-পরিবেশের মধ্যে নূতন করিয়া বসতবাটী নির্ম্মাণ করা অথবা পুত্রকন্যাকে আদর্শ পরিবেশে মানুষ করিবার জন্য Residential College প্রভৃতিতে পাঠানও অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে। তবুও বালকবালিকাদের সঙ্গীদের দিকে যদি একটু দৃষ্টি রাখা যায় এবং মন্দ সঙ্গীর প্রভাব হইতে তাহাদের দূরে রাখিলে অনেকটা ভাল ফল হইতে পারে।

(৭-৮) দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রতিকার আমাদের অনেকেরই হাতে নাই। তবে গৃহপরিবেশকে খানিকটা শান্তিময় করিয়া তুলিতে আমরা অনেকেই চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। আমাদের দাম্পত্য-জীবন শান্তিময় ও সংঘাত-বিহীন হইলে পুত্রকন্যাদের ভদ্র ও সাধু হইবার সম্ভাবনা অনেকখানি থাকে।

(৯-১০) ইহার পর প্রয়োজন হইতেছে অভিভাবকদের অবহিত হওয়ার। পুত্র কন্যার পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁহারা সচেতন ও সুশিক্ষিত হন, অতি শাসন, অতি আদর ও অতি উদাসীনতার আতিশয্যগুলি বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা যদি ছেলেমেয়েদের পালন ও শাসনের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেও অবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে।

(১১-১২) বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ছাত্রদের নৈতিক আচরণের রেকর্ড রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের আচরণকে সংযত করা যাইতে পারে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া সংযত আচরণ করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতে পারে। তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাসনের ভয়ে ছেলেরা অন্যায় কাজ করিবে না, ইহা তেমন বড় আদর্শ নহে। ইহার চেয়ে বড় আদর্শ হইতেছে যে, ছেলেরা ভাল কাজকে ভাল বাসিবে বলিয়া ভাল কাজ করিবে; এইজন্য প্রয়োজন ভাল কাজ করিবার জন্য প্রবৃত্তি তথা রসবোধ সৃষ্টি করা।

(১৩) বুদ্ধির সঙ্গে নিষ্ঠার ভারসাম্যের অভাবের জন্য যে অপরাধপ্রবণতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন একদল অন্নসমস্যামুক্ত রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব-দল-নিরপেক্ষ ত্যাগী ও আদর্শবাদী সমাজ-ব্যবস্থাপকের, যাঁহাদের নিষ্ঠা কোনও প্রলোভনেই বিচলিত হইবে না। যে তপোবন-সভ্যতাকে আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, সেই যুগে এইরূপ একদল জ্ঞানতপস্বী তৈয়ারী করা হইয়াছিল। এই সমস্ত তপোবনচারী অধ্যাপকেরা গৃহী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগব্রতী ছিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য লইয়া সমাজ হইতে দূরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় দিন যাপন করিতেন। তখনও রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া অনেক হইয়াছে, বণিকের সপ্তডিঙ্গা দেশ দেশান্তরে পাড়ি দিয়াছে, নাগরিক সভ্যতা তাহার বিলাস ব্যসন ও চৌষট্টি কলা লইয়া মাতামাতি করিয়াছে আর নগর হইতে দূরে থাকিয়া এই সমস্ত সন্ন্যাসী সমস্ত ভোগ, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, রাজার জন্য রাজ-নীতি, যোদ্ধার জন্য ধনুর্ব্বেদ, চিকিৎসকের জন্য আয়ুর্ব্বেদ, ভোগীর জন্য কাম-শাস্ত্র এবং যোগীর জন্য যোগ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

এইরূপ ব্রতধারী দলকে নূতন করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। এই জাতীয় ত্যাগী আদর্শবাদী অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অনুরাগী মহাপুরুষের সংখ্যা অল্প হইলেও কোন যুগেই ইঁহারা একেবারে বিরল নহেন। সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে এই সমস্ত চিত্তবান লোকদিগকে যদি প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শকে দেশের কিশোরকিশোরীরা সম্মান করিতে শিখিবে, ইঁহাদের নিকট হইতে পথের নির্দ্দেশ পাইলে, অপরাধপ্রবণতা অনেক কমিয়া যাইবে।

প্রেষণা ও উপযোজন

'নোদনা ও প্রেষণা' নামক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, মনোবিস্থার ইতিহাসে প্রেষণা (motivation) কথাটির একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। এই প্রেষণাকে বর্ত্তমান মনোবিদ্‌গণ, বিশেষভাবে আমেরিকার মনোবিদ্‌গণ, মানুষের সমস্ত জটিল কার্য্যকলাপের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই প্রেষণার স্বরূপ কি? যে শক্তি প্রাণীদিগকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়, বিশিষ্টভাবে তাহাদিগকে প্ররোচিত করে এবং তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে স্থায়ী (Sustain) করিয়া রাখে, তাহাকেই প্রেষণা বলা হয়।

যাহা আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয় তাহাকে অনেক সময় উদ্দীপক (Stimulus) বলা হয়। কিন্তু প্রেষণা ও উদ্দীপক ঠিক এক নহে। কাহাকে হয়ত একটি মশক দংশন করিল। সে তখন তাড়াতাড়ি ঐ দংশনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি চড় মাড়িয়া মশকটিকে হত্যা করিল। এই ক্ষেত্রে এই উদ্দীপকটি ক্ষণিকের মধ্যেই আবির্ভূত হইল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়া গেল। এই উদ্দীপককে প্রেষণা বলা যায় না। তাহা হইলে প্রেষণার লক্ষণ কি? যে উদ্দীপককে আমরা প্রেষণা বলিব তাহার লক্ষণ হইতেছে—(১) ইহা খানিকটা স্থায়ী প্রকৃতির হইবে। (২) এই উদ্দীপকটির মধ্যে একটা অস্বস্তিকর কিছু থাকিবে। (৩) এই অস্বস্তির জন্যই এমন একটা কিছু করিতে ইচ্ছা করিবে যাহাতে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা দূর করা যায়। (৪) এই ইচ্ছার মধ্য দিয়া যে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উদ্ভব হইবে তাহা নানাভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে এবং এই কার্য্যের লীলা যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহা চলিতেই থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অস্বস্তিকর অবস্থাটি বিদূরিত না হয়।

পরিণত বয়সে মানুষের এই প্রেষণা নানা জাতীয় হইলেও, সেই বিচিত্র প্রেষণার মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা কয়েকটি মাত্র শারীরিক কামনার (Craving) সন্ধান পাই। অধ্যাপক Gates এইভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিশ্বাস